

অর্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্দশ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২৩—মাঘ ১৩২৪

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্ এ, বি এল্

অর্চনা-কাৰ্যালয়,

১৮ নং পার্কসীচরণ ঘোষের মেন, অর্চনা পোষ্ট—কলিকাতা হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস ঘর
কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা রাধাপ্রসাদ মেন (হুকিমা ষ্ট্রীট) মণিকা প্রেসে
প্রিন্টপেছনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়	[লেখক ও লেখিকাগণের নাম]	পৃষ্ঠা
অগ্নি-পরীক্ষা (গল্প)	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	৭০
অস্তুরে (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার দে	২৭৩
অন্ধ (গল্প)	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্	২৫১
অনাথের মা (গল্প)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৪২৬
অপরাধী (গল্প)	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	২৩০
অভেদে (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার দে	১২৬
আবাহন (কবিতা)	শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়	৩৪৫
আদর্শ কোথায়?	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	৪৬৬
ঐতিহাসিক স্মৃতি-সহায়	শ্রীকালিকানন্দ মাজিনা	৩৪৬
কণ্ঠহার (গল্প)	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্	৩২৮
কবি ও সমালোচক	ঐ	১৮৭
কবি ভুবনমোহন	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	২৩৪
কালির দমন	[ওপারের কথার লেখক]	১৩৪
কোনে	শ্রীমতীন্দ্রনাথ সোম, এল্, এম্, এম্	২৭৪
খনা ও লীলাবতী	শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	৩২১
খাঁটি বাঙ্গালা কথার বিশেষত্ব	শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ	১৮১
গৃহস্থের বৌ (গল্প)	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	১৯
গোবর্দ্ধন-ধারণ	[ওপারের কথার লেখক]	২১০
গ্রন্থ-সমালোচনা	শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র	৩৭, ৭৯, ১৬০, ২০০, ২৮০
ঐ	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	১২০
ঐ	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	৪৬৮
“ঘোড়ার ডিম”	ঐ	২৯৫
চিত্রকর (গল্প)	শ্রীঅবনীকুমার দে	১৭৩
ছিন্নহস্ত (বিদেশী গল্প)	ঐ	১৪৯
জননী ভারতবর্ষ (কবিতা)	শ্রীসত্যমাধন মুখোপাধ্যায়	২৭৯
দীপালী (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার দে	৩৭৬
নবীন লেখকের পৃষ্ঠা	...	৩৪৫, ৪২৬
‘নৈষধচরিতে’ নাস্তিক- বাদের আলোচনা	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	৪১, ১০১, ১৫৮

বিষয়	[লেখক ও লেখিকাগণের নাম]	পৃষ্ঠা
পক্ষিগতি ও পতঙ্গজাতির বিকাশের ভেদ	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, বিদ্যানিধি এম্-এ	৩২৫
পঞ্চভূত	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	২৮১, ৩৩৬
পরলোকের অর্থ	শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র	৩৫৮
পরিমল	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	৩৬১
পাপের অধিকার (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার দে.	৪৬৫
পুত্র-দায় (গল্প)	পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৬৭
পুত্রহারা (গল্প)	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	১২৪
প্রতিবাদ	ব্রজরাজ	৪৫৭
ঐ উত্তর	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ	৪৬৩
প্রতীক্ষা (বিদেশী গল্প)	শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল্	৩০২
প্রত্যাখ্যান (গল্প)	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্	৪৫৪
প্রিয়তর (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার দে	১৭৮
প্রেমের স্বর (বিদেশী কবিতা)	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ	২১৬
ফরাসীর চক্ষে হিন্দু থিয়েটার	শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্-এ	২২৮
বজ্রলেপ	পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৪১৩
বাঙ্গালার পল্লীগাম	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	৩৬
বিচিত্র প্রসঙ্গ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম্-এ, বি-এল্	৪২৫
বিধির বিধান (গল্প)	শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল্	৫২
বীজের প্রসার	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	২১৪
বৌদ্ধ-নীতি-সুধা	৩রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর	১১৬
ভাষা-বিত্রাট	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	১১৪
ভিন্ন ফুলের রেণু	ঐ	১৭০
ভূদেব চরিতম্	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	২০৭
ভূদেব-প্রসঙ্গ	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্	৮৮
ভেক-তরু	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্	২৬৫
মতিমালা (গল্প)	ঐ	১০৮
মহাযুদ্ধের সহিত ভারত- বর্ষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক	অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সূর্যাদার, বি-এ	১৮৩
মহামহোপাধ্যায় ৩শিষ্য- কুমার শাস্ত্রী	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	৪৪৩

বিষয়	[লেখক ও লেখিকাগণের নাম]	পৃষ্ঠা
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, স্বরস্বতী, বিজ্ঞাবিনোদ, এম-এ, বি-এল	২৯, ৫৯, ৯১
মীমাংসা-দর্শনে অলৌকিকবাদ	শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ	৪৩৩
"য"এর কথা	শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ	২০৮
"রত্নমালা" পরীক্ষা	শ্রীহারগচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১০৫, ২৮৮
রাসলীলা	[ওপারের কথার লেখক]	১৩, ৪৭, ৮১
শাস্তি (কবিতা)	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	৩৪৬
শিশুর বর্ণমালা	শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ	২৮৯
শ্রীচৈতন্য	অধ্যাপক শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ	২৪১
শ্রীশ্রীকালীপূজা রহস্য	[ওপারের কথার লেখক]	৩৭৭
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন	ঐ	৪১৫
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা তত্ত্ব	ঐ	৩৪৮
সত্যের আবরণ (বিদেশী গল্প)	শ্রীনির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩৭
সংস্কৃত নাটকে কিছুকের চিত্র	অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ	১
সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়	ঐ	১৬২
সমালোচনার বিড়ম্বনা	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	৩৮৫, ৪০২
স্মন্দন (কবিতা)	রায় শ্রীবকিমচন্দ্র মিত্র বাহাছর, এম-এ, বি-এল	৭৭
স্থিতি পরিবৃতি (Metathesis)	শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ	১৪৬
সাহিত্য ও সমাজ	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪০
সাহিত্য-পঞ্জিকা	শ্রীকুমদাস চন্দ্র	৯৭, ১৪৫
সাহিত্য-প্রসঙ্গ	ঐ	৯৭, ৩১২
ঐ	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল	১৩৭, ২২৪
ঐ	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ	৩৯২
সাহিত্য-সমাচার	শ্রীকুমদাস চন্দ্র	১৯৯, ৩৯৫
সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়	মোলবী মোহাম্মদ কে, টাদ	৬৭
ঐ (প্রতিবাদ)	শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ	১০৫, ২৬০
ঐ ঐ	মোলবী কে, টাদ	২১৭
সুভদ্রা (কবিতা)	শ্রীমতী উর্বাশতা ঘোষ	৩৪৬
সেকেন্দ্রিয়ার কুতবখানা ও উদগুপুর	শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ	৫৫১
বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রবাদ		
হারজিৎ (গল্প)	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ	১২৭
হিতপদাবলী	হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬০
হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, বিদ্যানিধি	৩৯৭
জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ		
হিন্দুর দেবতত্ত্ব (তারাদেবী)	শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ	১২১

অর্কচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্দশ বর্ষ ।]

ফাল্গুন ১৩২৩ ।

[প্রথম সংখ্যা ।

সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের চিত্র ।

[লেখক—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ ।]

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নয়টী রসের কথা বলা হইয়াছে, হাস্যরস তাহার বিদূষক ও সংস্কৃত নাটকে মধ্যে অগ্রতম । প্রধানতঃ বিদূষকের সাহায্যেই তাহার কার্য্য । নাটকাদিতে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়া থাকে । তাই বলিয়া বিদূষকের যে আর কোনও মূল্য নাই, তাহাও বলা যায় না । ইংরাজী নাটকের Jester এর কার্য্য বিদূষক ত করেই, অধিকন্তু নায়কের প্রণয়-ব্যাপারে (love-intrigue) সাহায্য করিতেও এই বিদূষকের প্রয়োজন হয় । সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন “শৃঙ্গার ব্যাপারে চেট, বিট, বিদূষক প্রভৃতি নায়কের সাহায্য করিয়া থাকে ।” (১)

এই চেট, বিট ও বিদূষক প্রভৃতি “প্রভুভক্ত, শুদ্ধচিত্ত উপহাসাদিতে নিপুণ,

∴ বিদূষকের গুণ ।

কুপ্তিত রমণীর মানভঞ্জে দক্ষ ।” (২) ইহাদিগের

मध्ये আবার বিদূষকের নাম হইবে কুসুন, বসন্ত কিংবা

এইরূপ একটা কিছু । বিদূষকের শারীরিক-চেষ্টা-যুক্ত অর্থাৎ চটপটে হওয়া এবং কলহে প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন । নিজের অদ্ভূত বৈশ ও ভাষার দ্বারা

(১) শৃঙ্গারেহস্য সহায়ঃ বিটচেটবিদূষকাদ্যাঃ স্যঃ ।

(২) ভক্তা নরস্ব নিপুণাঃ কুপ্তিবধুমানভঞ্জে শুদ্ধাঃ । সাহিত্যদর্পণঃ ৩৫০

ইহাকে হাসাইতে হইবে। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে বিদুষকের জ্ঞান থাকা চাই। (১)

দেখা যাউক প্রকৃত পক্ষে বিদুষকের এই সকল গুণ আছে কি না ?

সাহিত্যদর্পণকার বলেন, বিদুষকের নাম হইবে কুসুম, বসন্ত প্রভৃতি।

বিদুষকের নাম ও আকৃতি। রত্নাবলীর বিদুষকের নাম বসন্তক। কিন্তু বিশ্বনাথ 'আদি' শব্দ ব্যবহার করিয়া জানাইয়াছেন যে ইহা

ব্যতীত অন্য নামও বিদুষকের হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 'শকুন্তলা'র বিদুষকের নাম মাধব্য। মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদুষকের নাম গৌতম। মৃচ্ছকটিকের বিদুষকের নাম মৈত্রেয়। যাহাই হউক নাম লইয়া কিছুই আসে যায় না। এই জন্য আমার মনে হয় বিদুষকের লক্ষণে নামের উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত।

বিদুষকের কার্য হাস্যরসের উদ্দীপন করা। সুতরাং তাহার আকৃতিও কিছু অদ্ভুত রকমের হওয়া দরকার। ভরত মুনি বলিয়াছেন "বামন (বেঁটে), দস্তুর (দাঁতো), কুঞ্জ (কুঁজো), দ্বিজন্মা (ব্রাহ্মণ), বিকৃতানন (বিকৃতমুখ বিশিষ্ট), খলতি (টেকো) এবং পিঙ্গলাক্ষ (কটাচোখো) দেখিয়া বিদুষক সাজাইবে।" (২) কিন্তু এখন জানিবার উপায় নাই যে এইরূপ লোক দেখিয়া বিদুষক সাজান হইত কি না ? কারণ বিদুষকের আকৃতি সম্বন্ধে কোথাও কিছু উল্লেখ নাই। তবে তাহাকে যে আদর্শ রূপবান্ পুরুষ করা হইত না তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিক্রমোর্কশীতে রাজা পুরুষবা যখন বিদুষকের নিকট উর্কশীর রূপবর্ণনা করিলেন, তখন বিদুষক অবশ্য বলিয়াছিল "কিং তাবৎ তত্রভবত্যা রূপেণ অহমেব দ্বিতীয়ো নিক্রপিতঃ ?" "রূপের তুলনায় উর্কশীর নীচেই আমি, এই বুঝি আপনার অনুমান ?" কিন্তু তাহার এই পরিহাস বাক্য বিপরীত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। জয়দেব কবি (৩) বিরচিত প্রসন্ন-রাঘব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আমরা একজন বামন ও একজন কুঞ্জ দেখিতে পাই, তথাপি তাহারা বিদুষক নহে, যদিও নির্মৌক্ত কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কবি সামাজিকগণকে হাসাইবার জন্যই ইহাদিগকে আসরে নামাইয়াছেন।

- (১) কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কুম্বপূর্বেণভাবাদ্যৈঃ
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদুষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজঃ । সাঃ দঃ ৩ । ৪২
- (২) বামনো দস্তুরঃ কুঞ্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদুষকঃ ॥ নাট্যশাস্ত্রম্ ২৪।১০ ৬
- (৩) এই জয়দেব গীতগোবিন্দকার জয়দেব নহেন।

বামন । (আপনাকে দেখিয়া সবিম্বরে) ওঃ আমার চেহারাটা কি লম্বা ।
এরূপ লম্বা শরীর নিয়ে যদি আমি এখানে চলাফেরা করি তা হ'লে (কে জানে
আমার মাথায় লেগে) দরজার মাথাটাই হস্ত ভেঙ্গে যাবে । কাজেই আমাকে
একটু হেঁট হ'য়েই চ'লতে হচ্ছে ।

কুঞ্জ (প্রবেশ করিয়া) । বলি ও ভায়া বামন, এখন দেখছি সব গুণে
গুণী হ'য়েছিস্ ।

বামন । কি রকম ?

কুঞ্জ । আগে ছিলি বেঁটে, এখন হ'লি কুঁজো ।

বামন (রাগিয়া) । দূর বেটা মুরু-খু । তুই নিজের কুঁজ পরের ঘাড়ে
চাপাতে চাস্ । তুই-ইত বেটা কুঁজো । আমি বলে পাছে দরজার মাথা ভেঙ্গে
যায়, তাই হেঁট হ'য়ে চলছি ।

কুঞ্জ (হাসিয়া) । হাসালি রে বেটা হাসালি । এক বিঘৎ চেহারা নিয়ে তুই
বেটা দরজার মাথা ভাঙ্গবি !! (আবার রাগিয়া) ওরে মিথ্যাক মুখফোঁড়, কে
বলে আমি কুঁজো ? (১)

বামন । কেন, যোয়ান্ ঘাড়ের পিঠের মত তোর পিঠে ওই যে মাংসের
পেঁডলা রয়েছে ওই ব'লে দিচ্ছে ।

কুঞ্জক । ওরে নিরুন্ধি ! ওই মাংসের চিবিটা কি জানিস্ ? ওটা আমার
সৌভাগ্যলক্ষ্মীর তাকিয়া ।" (২)

(১) বামনঃ । (আত্মানং বিলোক্য সবিম্বরম্) অহো অগ্রানাং মে তুঙ্গদম্ । অপি নাম
ঐদৃশৈরঙ্গৈরত্র সঞ্চরতা ময়া দ্বারশিখরং ভজ্যতে । তৎ কুঞ্জো ভূত্বা সঞ্চরিয়ামি ।

কুঞ্জঃ (প্রবিশ্য) । বয়স্য বামনক, ইদানীং সকলগুণসম্পন্নোহসি !

বামনঃ । কথমিব ?

কুঞ্জঃ । প্রথমমেব বামনঃ ইদানীং পুনঃ কুঁজঃ প্রাপ্তঃ ।

বামনঃ (সক্রোধম্) । অরে মুর্খ কথমাত্মনঃ কুঞ্জদঃ পরস্মিন্ আরৌপরসি । নমু তমেব
কুঞ্জকঃ । ময়া পুনর্দ্বারশিখরভঙ্গশক্তিতেন আত্মনি কুঁজদমারোপিতম্ ।

কুঞ্জ । (বিহস্য) কথং বিতপ্তিমাত্রেন তবাত্মেন দ্বারশিখরং ভজ্যতে । (পুনঃ সক্রোধম্)
অরে অলীকবাচাল, কেন তব কথিতমহং কুঞ্জক ইতি ?—প্রসন্নরায়বে তৃতীয়োহঙ্কঃ ।

(২) বামনঃ । নমু অনেনৈব দৃপ্তবৃষভককুদসদৃশেন পৃষ্ঠস্থিতেন মাংসস্তবকেন উদ্বাহিতেন ।

কুঞ্জঃ । অরে মতিশূন্য ! কথময়ং মাংসস্তবকো মে সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা উপধানগেতুকঃ ।

—প্রসন্নরায়বে তৃতীয়োহঙ্কঃ ।

উপরে যে কথোপকথন উদ্ধৃত হইল, তাহা রাজাস্তঃপুরচারী দুইটা ভৃত্যের ।
বিদুষকের বেশভূষা । সুতরাং ইহা হইতে বিদুষকের আকৃতি কিছুই বুঝা যায় না । তাহার বেশভূষা ব্রাহ্মণোচিত করা হইত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । কারণ ব্রাহ্মণ-সুলভ আদব-কায়দা তাহার ছরস্ত । কেহ প্রণাম করিলে তাহাকে স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করা চাই এবং কেহ যদি প্রণাম না করিল তাহা হইলে তাহাকে ভৎসনাও করি আছে । যখন উর্ব্বশী আসিয়া রাজা পুরুরবাকে অভিবাদন করিলেন, তখন বিদুষক তাঁহাকে এইরূপে তিরস্কার করিয়াছিল । “আপনার এ কিরূপ আকেশ । রাজার প্রিয় বয়স্য ব্রাহ্মণকে বন্দনা করিলেন না ?” (১) অতএব যে লোক ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সম্মানের উপর দাবী বসাইতে চায়, তাহাকে ব্রাহ্মণের মত সাজানই সম্ভবপর । একটা বিষয়ে কিন্তু কোনও সন্দেহ নাই, সেটা বিদুষকের হস্তের দণ্ডকাষ্ঠ বা লাঠী । এই দণ্ডকাষ্ঠটা আবার সরল নহে কিন্তু কুটিল । কখনও বা ইহাকে ভাগ্যের মত কুটিল বলা হইয়াছে । (২) কখনও বা ধনের হৃদয়ের মত কুটিল বলা হইয়াছে । (৩) কখনও বা এই দণ্ডকাষ্ঠকে কুটিল বলিয়া ভৎসনাও করা হইয়াছে । (৪) “আমার মত সরল লোকের লাঠী হইয়া তুই এত কুটিল হইলি কেন ?”

যদিয়া থাকিয়া বক্তৃতা করিলে লোক হাসান যায় না । কাজেই বিদুষককে খুব ‘চটপটে’ হইতে হইবে । তাহাকে বিদুষকের শারীরিক চেষ্টা, অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি । নানারূপে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া লোক হাসাইতে হইবে । তাই বলিয়া সে যে খুব কস্মর্ষ তাহাও নহে । যে কার্যে সাহসের প্রয়োজন সে কার্য সে না করিতে পারিলেই বাঁচে । তাহাকে বীরোচিত কার্য করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করা হয় নাই, লোক হাসাইয়াই তাহার কর্তব্য শেষ । এই নিমিত্তই মৃগয়া-ব্যাপার তাহার ভাল লাগে না । (৫) এই নিমিত্তই

(১) কীদৃশী স্থিতিভবত্যাঃ ? রাজঃ প্রিয়বয়স্যো ব্রাহ্মণো ন বন্দ্যতে ?

—বিক্রমোর্কশাম্ ২ ।

(২) অস্মাদৃশভাগধেরকুটিলেন—মৃচ্ছকটিকে ১মঃ অঙ্কঃ ।

(৩) পিতৃনজনহৃদয়কুটিলেন—রত্নাবল্যাম্ ২য়ঃ অঙ্কঃ ।

(৪) বিদুষকঃ । তো অহমপি ভাবদ্ এতঃ দণ্ডকাষ্ঠমুপালপ্যো বজুকস্ত মে কথং ত্বৎ কুটিলোহসীতি ।—অভিজ্ঞান শকুন্তলে ৬ষ্ঠঃ অঙ্কঃ ।

(৫) “বিদু । এতস্ত মৃগয়াশীলস্ত রাজঃ বয়স্ত ভাবেন নির্বিম্বোহস্মি” । শকু ২ ।

অশ্বের অনুধাবনে তাহার সন্ধিস্থল শিথিল হইয়া যায় । (১) কিন্তু সে লক্ষ্যবস্তুর নৃত্য প্রভৃতিতে খুব নিপুণ । (২) “বসন্তক । ‘বয়শ্চ আমিও বধুর পরিজনদিগের মধ্যে নৃত্য করিয়া মদনমহোৎসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি ।’

রাজা । ‘তাই কর ।’

বিদু । ‘আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।’

এই বলিয়া চেতীদ্বয়ের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল ।” (৩)

কিন্তু সাহসের কার্য্যে বিদূষক পশ্চাৎপদ । ইহার কারণ তাহার স্বভাব ভীকৃত্য । যে বাতাসে কিছু উড়িয়া পড়িতে দেখিলে সাপের খোলস মনে করে । (৪) ভূত দেখিলে বা ভূতের আশঙ্কা থাকিলে যে জ্ঞান-হারা হইয়া যায়, কি করিয়া সে সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে ?

“(শুনিয়া সভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজার হাত ধরিয়া এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) ।

বিদু । বয়শ্চ আসুন পলাইয়া যাই ।

রাজা । কেন ?

বিদু । এই বকুল গাছে কোনও ভূত আছে ।

রাজা । ধিক্ মূর্খ । বিশ্বস্ত-হৃদয়ে যাও । এরূপ ভূতের প্রভাব এখানে কি করিয়া সম্ভব ?

বিদু । বেশ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতেছে । যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আগে গিয়া নিজেই শুনুন ।” (৫)

(১) “ভুরগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ রাত্নৌ নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি” । শকু ২ ।

(২) “বিদু । ভয়তু, ভয়তু, ভবান্ । জিতসম্মাতিঃ । (ইতি নৃত্যতি)” রত্না ৩ ।

(৩) “বসন্তকঃ । ভো বয়শ্চ অহমপি এতেবাং বধুপরিজনানাং মধ্যে নৃত্যন্ মদনমহোৎসবং মানয়িষ্যামি ।

রাজা । এবং ত্রিয়তাম্ । ১

বিদু । যদাজ্ঞাপয়তি ভবান্ (ইতি উপায় চেতৌসর্ধ্যো নৃত্যতি)” রত্না ।

(৪) “কিং ভূজঙ্গনির্দোকঃ খাদিতুং মাং নিপতিতঃ ?”—বিক্রমোর্কণ্যাম্ ২ ।

(৫) (আকর্ণ্য সভয়ং নিবৃত্ত্য রাজানং হস্তে গৃহীত্বা সমস্রমন্ ?

বিদু—ভো বয়শ্চ এহি পলায়াবহে ।

রাজা—কিমর্থম্ ।

বসন্ত—ভো ত্রিতপিন্ বকুলপাদপে একোহপি ভূততিষ্ঠতি ।

কিন্তু যখন স্থিরীকৃত হইল সেটা ভুল নহে, একটা শারিকামাত্র তখন তাহার লক্ষ্য দেখে কে ?

“বসন্তক । যদি তাই হয় । তবে আমাকে বাধা দিবেন না ।

(সক্রোধে লাঠী তুলিয়া) আরে দাসীপুত্রী । দাঁড়া মুহূর্তমাত্র দাঁড়া । খলের হৃদয়ের মত কুটিল এই লাঠীর দ্বারা পাকা কংবলের মত তোকে গাছথেকে মাটিতে ফেলব ।” (১)

সুতরাং বিদূষককে ভীক বলাটা ঠিক হয় নাই । যেখানে বিপদের আশঙ্কা নাই সেখানে তাহার মত সাহসী আর কে ? যখন দুঃখ জিজ্ঞাসা করিলেন “সখে, শকুন্তলা দর্শনে কোতূহল আছে কি ? বিদূষক বলিল “প্রথমে অবাধ কোতূহল ছিল, কিন্তু এখন রাক্ষস বৃত্তান্ত শুনিয়া সবাধ হইয়াছে ।” কিন্তু বিদূষককে রাজধানীতে পাঠাইতে হইল, রাক্ষসের কবলে আর যাইতে হইল না । তখন বিদূষকের সাহস দেখে কে ?

“বিদু । আপনি তা ব’লে আমাকে রাক্ষসভীক বলে ঠাওরা’বেন না ।

রাজা । হে মহাব্রাহ্মণ, তোমার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা সম্ভব নয় ।” (২)

যাহাদের অপকার করিবার কোনও ক্ষমতা নাই তাহাদের উপর সে অতুলনীর বিক্রম দেখাইতে পারে । আশ্রমকুল, পারাবত, শারিকা—এই সকল পদার্থই তাহার বীর্যপ্রকাশের স্থান । (৩)

কিন্তু মূচ্ছকটিকের বিদূষক একটু স্বতন্ত্র ধরণের । বিপৎকালেও তাহার

রাজা—ধিঃমূর্খ । বিশক্রং গম্যতাম্ । কুত ঈদৃশানাঞ্চ অত্র প্রভাবঃ ?

বসন্তক—সুটাক্ষরমেব মনুষ্যতে, যদি মম বচনে ন প্রত্যয়ঃ তদগ্রতো ভূত্বা স্বয়মেব আকর্ণয় ।” ব্রহ্ম ২ ।

(১) ভো বদ্যেবং মা ধলু মাং নিবারয় । (সরোঃ দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যমা) আঃ দাস্তাঃ পুত্রি
* * * তিষ্ঠ, তিষ্ঠ তাবনুহুর্ভম্ । এতেন পিশুনজনহৃদয়কুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন
পরিপকমিব কপিথকলম্ অশ্রাদ্ বকুলপাদপাদ্ আকৃত্য ভূমৌ পাতয়ামি । ব্রহ্ম ২ ।

(২) “রাজা । মাধব্য অপ্যস্তি তে কোতূহলং শকুন্তলাদর্শনং প্রতি ।

(৩) “ভো বরস্য তিষ্ঠ তাবদ্ অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়ামি” । শকু ৩ ।

“দাস্যাঃ পুত্র দুষ্টপারাবত তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাবদেতেন দণ্ডকাষ্ঠেন

স্বপকমিব চূতকর্ম্ম অশ্রাৎ প্রাসাদাৎ ভূমৌ পাতরিয়ামি” । মূচ্ছ ৫ ।

বিদু । “প্রথমমপরিবোধমাসীদ্ ইদানীং তু সপরিবোধম্ ।”

বিদু । ভো রাক্ষসভীকং মা মামবগচ্ছ ।

রাজা । ভো মহাব্রাহ্মণ, কথমিদং ঘনি সম্ভাব্যতে ?”—শকু ২ ।

সাহস দেখা যায় । বসন্তসেনা যখন অন্ধকারে রাজশালক শকারের হস্ত হইতে পলাইয়া গিয়া চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লইল তখন শকার বসন্তসেনা ভাবিয়া চারুদত্তের দাসী রদনিকাকে ধরিল ।

রদনিকা । আৰ্য্য মৈত্রেয় আমার দুর্দশা দেখ ।

* * *

বিদূষক । (সক্রোধে লাঠি তুলিয়া) । না তা হবে না । আরে নিজের গৃহে কুকুরও ভীষণ হয়, আমি ও ব্রাহ্মণ । আমাদের ভাগ্যের মত বাঁকা লাঠির দ্বারা তোর মাথাটা যুগধরা বাঁশের মত প্রহারে প্রহারে চূর্ণ ক'রে, দেব । (১)

বাস্তবিকই স্ফুটীছাড়া এই মূচ্ছকটিকের বিদূষক । ইহার কথা পরে আরও বলিব ।

বিদূষক মুখের ও কলহপ্রিয় । কোন্দলে তাহার ঋষি নারদের মতই আনন্দ ।

বিদূষকের কলহপ্রিয়তা ।

তবে পার্থক্য এই যে, নারদ নিজে কলহ করেন না, অপরের মধ্যে কলহ বাধাইয়া থাকেন, বিদূষক নিজেই

কলহ করিতে ভালবাসে । তাহার মুখের বুলি “দাশ্ৰাঃ পুত্র” । তবে যদি কেহ ইহা হইতে বুঝিয়া থাকেন যে বিদূষকের কলহ, মারামারিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত । যেখানে মারামারি হয় বিদূষক তাহার নিকট দিয়াও যায় না । তাহার যত বীরত্ব মুখে । এই মৌখিক বীরত্বে সে রাজসেনাপতিকেও পরাস্ত করে । যখন সেনাপতি আসিয়া রাজা দুঃস্বপ্নকে মৃগয়া সম্বন্ধে উৎসাহিত করিতেছিল, তখন বিদূষক ক্রোধাক্র হইয়া বলিল—‘যাও আর উৎসাহ বাড়াইতে হইবে না । অনেক কষ্টে ইঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি । একদিন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে নরনাসিকালোলুপ বৃক্ক ভল্লকের মুখে পড়িবে ।’ (২)

তাহার কলহের প্রধান অস্ত্র—নিন্দা ও গালি । সেটা আমরা তাহার নামের

(১) “রদনিকা । আৰ্য্য মৈত্রেয়, পশ্য মে পরিভবম্ ।

* * *

বিদু । (সক্রোধঃ দণ্ডকাঠমুদাস্য) মা তাবৎ । ভো স্বকে গেহে কুকুরোহপি তাবৎ চণ্ডো ভবতি, কিং পুনরহং ব্রাহ্মণঃ ? তদেভেন অস্মাদৃশভাগধেয়কুটিলেনদণ্ড-কাঠেন দুষ্টস্য শুক্বেণুকস্যেব মস্তকং তে প্রহারৈঃ কুটম্বিষ্যসি ।”

—মূচ্ছকটিকে ১মঃ অঙ্কঃ ।

(২) ‘অপেহি রে উৎসাহহেতুক । অত্র ভবান্ প্রকৃতিমাপন্নঃ । ভং তাবৎ অটবীমাহিও-মানো জীর্ণকর্স্য কস্যাপিমুখে পতিষ্যসি ।’ শকুন্তলা ২য়ঃ অঙ্কঃ ।

ব্যুৎপত্তি হইতেই বুঝিতে পারি । (১) কিন্তু তাহার এই নিন্দাপ্রিয়তা সময়ে সময়ে তাহাকে বিপদগ্রস্ত করে । রাণী বাসবদত্তার বেশ ধারণ করিয়া রাজার প্রেম-পাত্রীসাগরিকা রাজার সহিত মিলিত হইবে এ কথা জানিতে পারিয়া রাণী-বাসব-দত্তা নিজেই সঙ্কেতস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সাগরিকাত্রমে রাজা তাঁহার সহিত প্রেমালাপ আরম্ভ করিলেন । বিদুষক বলিল—‘সাগরিকে আপনি নির্ভয়ে প্রিয় বয়স্কের সহিত আলাপ করুন । আপনার মৃদুমধুর বাক্য ‘প্রিয় বয়স্যের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করুক । আজিও তাহা দেবী বাসবদত্তার কটুবাক্যে সজ্জরিত হইয়া আছে ।’ (২)

বলা বাহুল্য বিদুষকের মুখে নিজের নিন্দা শুনিয়া রাণীর মনে বিশেষ আনন্দ হয় নাই । তিনি জনান্তিকে পরিচারিকা কাঞ্চনমালাকে বলিলেন—‘শুনছিষ্ কাঞ্চনমালা আমি হ’লাম কটুভাষিণী আর যত প্রিয়ভাষী ঐ বসন্তক ।’ (৩) কাঞ্চনমালাও নিজের অঙ্গুলি তর্জন করিয়া বলিলেন, ‘হতভাগা এই কথা তোকে আনার মনে কোরতে হবে ।’ (৪) পরে বিদুষককে সত্যসত্যই এই কথা মনে করিতে হইয়াছিল, কারণ ক্রুদ্ধা বাসবদত্তার আদেশে কাঞ্চনমালা বিদুষককে লতা-পাশে বাধিয়া উত্তম মধ্যম দিয়াছিল ।

এরূপ মর্শাস্তিক বাক্য বিদুষক ব্যবহার করে যে তাহা শুনিতে শ্রোতার আপাদমস্তক জলিয়া উঠে । বসন্তসেনার গৃহে গিয়া তাহার মাতাকে দেখিয়া পরিচারিকাকে বিদুষক বলিল—‘অহো অশ্রাঃ ডাকিণ্ডাঃ উদর বিস্তারঃ !’ ‘অহো এই ডাকিনীর কি বিশাল উদর ।’ মালবিকাগ্নিমিত্রে ছুইজন নাট্যাচার্য্যকে রাগাইবার জন্য বিদুষক বলিল—‘মিছামিছি ইহাদিগকে বেতন দিয়া লাভ কি’ ? (৫) রাণী ধারিণী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—‘তুমি বড়ই কলহপ্রিয় ।’ (৬) রাণীর এই উক্তি আমরা সর্কাস্তঃকরণে সমর্থন করি ।

(১) বিশেষণ দ্বয়রূপে নিন্দাভিত্তি বিদুষকঃ ।

(২) ভবতি সাগরিকে বিশ্রদ্ধা ভূত্বা প্রিয়বয়স্যমালাপয় । অদ্যাপি তাবদেব্য্যাঃ বাসবদত্তায়াঃ
সুপ্ত বচনৈঃ কটুকিতৌ কর্ণৌ মৃদুমধু মৃদুমধুরবচনোপস্থাসঃ ।

—রত্নাবলী তৃতীয়োঃ ২ কঃ ।

(৩) ‘হস্তে-কাঞ্চনমালা, অহমীদৃশী কটুবচনা । আর্ধ্যবসন্তকঃ পুনঃ প্রিয়ঃবদঃ’ ।

— রত্না, তৃতীয়োঃ ৫ কঃ)

(৪) ‘হতভাগ প্রিয়বাসি ইদং বচনম্’ । (রত্না ৩)

(৫) ‘কিং মুখা বেতন দানেন এভয়োঃ’ । মালবিকাগ্নিমিত্র—১মোঃ ২ কঃ ।

(৬) ‘নমু কলহপ্রিয়োগ্ণি’ ।

ঐ

উপরে বাহা বলা হইল তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় বিদূষক নম্রভাবে
বিদূষকের পরিহাস- কীরূপ দক্ষ । কথায় কথায় তাহার পরিহাস ।
কুশলতা । এই পরিহাসের পাতাপাত বিচার নাই । সে রাজাকে
পর্যাস্ত ছাড়িয়া কথা কয় না । পূর্বে বলা হইয়াছে রঘাবলী নাটকের দ্বিতীয়
অঙ্কে বিদূষক একটা শারিকাকে ভূত মনে করিয়া রাজার হাত ধরিয়া টানাটানি
করিতে লাগিল । কিন্তু যখন শুনিল সেটা শারি—ভূত নহে—তখন সে রাজার
উপরে 'উল্টা চাপ' দিল । সে বলিল—“ভোঃ বয়স্য ত্বং ভয়ালুকঃ যেন শারিকাঃ
ভূত ইতি মন্তয়সে” “বয়স্য তুমি নিশ্চয়ই ভীক, যেহেতু একটা শারিকাকে ভূত
মনে করিতেছ ।”

রাজা উত্তর করিলেন—ধিক্ মূর্খ ! তুমি নিজে বাহা করিয়াছ তাহা আমার
স্বন্ধে চাপাইতেছ ।

মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে বিদূষক এবং চেটের কথোপকথন বড়ই হাস্যো-
দ্দীপক ।

বিদূ—কুস্তীরক, ভিতরে আয় ।

চেট—(প্রবেশ করিয়া) আর্থা, বন্দনা করি ।

বিদূ—আচ্ছা, তুই এ রকম হৃদ্দিনে অন্ধকারে এসেছিস্ কেন ?

চেট—তিনি এসেছেন (এষা সা)

বিদূ—কেরে কে ? (কা সা কা)

চেট—তিনি গো তিনি ? (এষা সা)

বিদূ—অরে দাসীপুত্র, হুর্ভিকপীড়িত বৃড়ো তিধিরীর মত তুই সাঁ সাঁ কচ্ছিস
কেন বন্ দেখি ?

চেট—তুমিই বা কাকের মত কা কা কচ্ছ কেন বল দেখি ?

বিদূ—খুলে বল ।

চেট—(স্বগতঃ) আচ্ছা এই ভাবেই বলি । (প্রকাশে) আচ্ছা,
তোমাকে একটা প্রশ্ন করি ।

বিদূ—তোর মুখে লাথি ।

চেট—বলি জান কি আঁবের বোল কবে হয় ?

বিদূ—গ্রীষ্মকালে যে বেল্লিক গ্রীষ্মকালে ।

চেট—না গো মশায় তা' নয় ।

বিদূ—(চারুভক্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া) ওরে মূর্খ কবে বসন্তে ।

চেট—তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করি। সুসুন্দর গ্রাম কে রক্ষা করে ?

বিদু—রাস্তা রে বেটা রাস্তা ।

চেট—না গো তানয় ।

বিদু—(চারদিককে জিজ্ঞাসা করিয়া) সেনা রে বেল্লিক সেনা ।

চেট—এইবার ছটো কথা এক সঙ্গে করে বল দেখি ।

বিদু—সেনা বসন্তে । সেনা বসন্তে ।

চেট—না গো ঘুরিয়ে বল ।

বিদুষক—(ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) সেনা বসন্তে ।

চেট—অরে মূর্খ পদ ছটো উন্টিয়ে বল ।

বিদু—(নিজের পদদ্বয় ঘুরাইয়া) সেনা বসন্তে ।

চেট—ওরে নির্বোধ কথা ছটো উন্টিয়ে বল ।

বিদু—(অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) বসন্ত সেনা ।

এইরূপে কোথাও বা বুঝিয়া কোথাও বা না বুঝিয়া আপনার নম্ভাষণের দ্বারা বিদুষক সামাজিকগণের হাস্যরস উদ্দীপিত করে ।

বিদুষকের চরিত্রে এই সকল লঘুতা থাকিলেও তাহার একটা গুণ আছে—

বিদুষকের প্রভুভক্তি । সে বড়ই প্রভুভক্ত । প্রভুর কথায় সে উঠে বসে । সেটা যে কেবল তোষামোদ তাহাই বা কি করিয়া

বলা যায় । প্রভুর হুঃখে সে হুঃখী, প্রভুর সুখে সে সুখী । যদি তাহার এই প্রভুভক্তি আস্তরিক না হইত, তাহা হইলে কোথাও না কোথাও সে ধরা পড়িয়া যাইত । যদি তাহার প্রভুভক্তি অকৃত্রিম না হইবে তাহা হইলে রাজাই বা কেন তাহাকে নিজের রহস্যগুলি সব জানাইবেন । যদি সে রহস্য বিদুষক কখন প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া থাকে, সে তাহার প্রভুভক্তির অভাবে নহে,— নিবুদ্ধিতার ফল । রাজাও বিদুষককে শুধু বিদুষক বলিয়াই জানেন না, তাহাকে নিজের অন্তরতম বন্ধু বলিয়াই ভাবেন । সেইজন্য যখন বিদুষক ছয়স্তুকে বলিল— ‘মহারাজ, আমার আবার সৌন্দর্য্য দেখিবার বাকী কি ? আপনিই ত আমার ময়ন সমক্ষে রহিয়াছেন ।’ তখন ছয়স্তু বলিলেন ‘সর্ব্বঃ খলু কাস্তমাস্মানঃ পশ্যতি’ সকলেই নিজকে (নিজের বস্তুকে) সুন্দর দেখে ! রাজার এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি আপনাকে তাহার বয়স্ক হইতে ভিন্ন মনে করিতেন না । যদি প্রাণে প্রাণে টান না থাকে তাহা হইলে এতটা কি সম্ভব ?

এই প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে মুচ্ছকটিকের বিদুষক । যখন চাক-

দত্তকে ভবযজ্ঞগায় মুক্তি দিবার নিমিত্ত মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন এই বিদূষক—এই মুখর, চপল, অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই চণ্ডালগণকে কি বলিয়াছিল জানেন? “ভোঃ ভদ্রমুখা মুঞ্চত প্রিয় বয়শ্চাম্ চারুদত্তম্ মাম্ ব্যাপাদয়ত” হে ভদ্রগণ প্রিয়বয়স্য চারুদত্তকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে বধ কর। কি মহান, কি উদার এই স্বার্থত্যাগ! যখন চারুদত্ত দারিদ্র্যের চরম সীমায়, যখন সৌভাগ্য-লক্ষী তাহার প্রতি একান্ত অপ্রসন্ন, যখন বন্ধুরাও তাহার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না তখনও এই চপল ব্রাহ্মণ ছান্নার মতই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, চারুদত্তের আহত গরিমায় সাঙ্ঘন্যের পীযুষ ধারা ঢালিয়া দিয়াছে, জননী যেমন পুত্রকে সকল দুঃখ সকল বিপদ সকল অমঙ্গল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন, তেমনই করিয়া তেমনই মেহের সহিত তেমনই আগ্রহের সহিত সে চারুদত্ত ও তদীয় দুঃখ রাশির মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারুদত্তের দাসী রজনিকা যখন শকারের হস্তে লাক্ষিতা হইল, বিদূষকই তাহাকে, সে কথা জানাইয়া ব্যথিত চারুদত্তের হৃদয়ে আরও ব্যথা দিতে নিষেধ করিল।

বিদূষকের আরও একটা গুণ তাহার চরিত্রের নিশ্চলতা। নির্দোষ হাস্য

বিদূষকের শুদ্ধ চরিত্র। পরিহাস বড়জোর নিন্দা ইহাতেই তাহার আড়ম্বর-

শূন্য দিনগুলি কাটয়া যায়। লাম্পট্য কাহাকে বলে সে তাহা জানে না। এই জগতই রাজাস্তঃপুরে তাহার অবাধগতি। রাণীরাও তাহার সহিত আলাপ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না।

কিন্তু নিজে প্রণয়-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হইলেও সে রাজার প্রণয়কার্যে সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজা অগ্নিমিত্র মন্ত্রীর সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত এমন সময় বিদূষক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, “অয়মপরঃ কার্যাস্তুরসচিবোহস্মাকমুপস্থিতঃ” এই আমার কার্যাস্তুরের (প্রণয়-ব্যাপারের) মন্ত্রী আসিয়া হাজির। বস্তুতঃ মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক রাজার প্রণয়-ব্যাপারে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিজের নিবুদ্ধিতা বশতঃ সহায়তা করা দূরে থাকুক সে নানারূপ বিঘ্নই উপস্থিত করিয়াছে। উর্ধ্বশী সংক্রান্ত রহস্য ভেদ করিয়া দিয়া বিদূষক রাজা পুরুষকে রাণী ওশীনরীর বিরাগভাজন করিয়া তুলিল। ছয়শত অবশ্য এ বিষয়ে কতকটা সাবধান হইয়াছিলেন। যখন বিদূষকের নগর যাত্রা স্থির হইয়া গেল, পাছে সে শকুন্তলা সংক্রান্ত রহস্য ভেদ করিয়া ফেলে এই ভয়ে ছয়শত বলিলেন—“দেখ বয়শ্চ, শকুন্তলা সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি

সব মিথ্যা কথা। 'ভুলিয়া যাও।' নির্বোধ বিদুষকও তাহা এমন ভাবেই বিশ্বাসিত হইয়াছিল যে যখন শকুন্তলা রাজসভায় নীত হইলেন তখনও রাজাকে মনে করাইয়া দিবার জন্য তাহার পূর্ব কথা স্মরণ হইল না। তথাপি বিদুষক প্রণয়-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। দৌত্যকার্য পূর্বপরিণীতা মহিষীগণের চক্ষে ধুলিপ্রদান, নিভৃতে প্রণয়িনীর সহিত প্রভুর মিলন ঘটান ইত্যাদি তাহার ডারেরী খুঁজিলে পাওয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য, এই দুইটা কথা বিশ্বনাথ বিদুষকের লক্ষণের মধ্যে ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—একটা বিদুষকের নির্বুদ্ধিতা অপরটা তাহার উদরিকতা। প্রথমটার কথা পূর্বেই স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে, অপরটির কথা এই স্থানে কিছু বলিব।

বিদুষক উদর সর্বস্ব। ভোজন পাইলে তাহার আনন্দ দেখে কে? সকল স্থানেই সে ভোজনের সম্ভাবনা দেখে। (১) ভোজনের মত অনায়াসসাধ্য আর কিছু সে জানে না। (২)

বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে সে জগৎকে মোদকময় চিন্তা করে। "হী হী ভো এষঃ খণ্ড মোদক সদৃশঃ উদিতো রাজা ওষধীনাম্" "হাঃ হাঃ মোয়ার মত চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন।" কিন্তু এখানেও মূচ্ছকটিকের বিদুষক স্বতন্ত্র স্বরণের। সূত্রধার যখন তাহার গৃহে ভোজনের জন্য বিদুষককে পুনঃ পুনঃ অধুরোধ করিল তখন সে বলিল—“ভোঃ অন্তঃ ব্রাহ্মণঃ নিমন্ত্রয়তু ভবান্” “তুমি অন্ত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর।” বিদুষকের পক্ষে নিমন্ত্রণত্যাগ অদ্ভুত নহে কি?

এই সকল দোষগুলি যখন আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করি, তখন দেখিতে পাই, বিদুষকের পক্ষে দোষগুলিও বাস্তবিক গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল দোষ না থাকিলে সে হাস্যরসের অভিনয় করিতে পারিত না। কাজে কাজেই সংস্কৃত নাটক কতকটা বৈচিত্র্যহীন হইত। বৈচিত্র্যই নাটকাদির জীবন। সে বৈচিত্র্য না থাকিলে, জগতের সাহিত্য মধ্যে সংস্কৃত নাটক যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে তাহা সম্ভবপর হইত না। অতএব সংস্কৃত নাটকের পঞ্জর স্বরূপ এই বিদুষক। তার পরে এই যে দোষগুলি সেগুলি তাহার শুদ্ধ চরিত্র, প্রভু-ভক্তি গুণে ঢাকিয়া যায়। কাজেই আমরা বিদুষককে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না।

(১) সর্বত্রৌদরিকস্যাভ্যবহার্যামেব বিবয়ঃ—(বিক্রমোর্কশী ৩)

(২) সর্বমপি উদরিকস্য অভ্যবহারে এব পর্যাবস্যাতি। (রত্নাবলী ২)

রাজা—বয়স্য একস্মিন অনায়াস-সাধ্যো কর্মণি শ্রবতা সহায়েন ভবিষ্যৎ।

বিদুষক—বিঃ মোদকখণ্ডিকারাম্।—(শকুন্তলা ২)

রাসলীলা ।

[“ও পারের কথা”র লেখক]

কালের অনন্ত প্রবাহে কত সহস্র সহস্র পৌর্নমাসী বামিনীর ঘটনা-
বলী বুদ্ধদের ত্রাস দেখা দিয়াই বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ষাপরের একটি মাত্র
লীলা—যাহা ৩৬৫০ বর্ষাবন ধামে কোন শরৎকালীন এক রজনীতে সংঘটিত হইয়াছিল
—শত শত বাঁট প্রতিবাতের মধ্যেও ভারতবাসী উহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।
কিন্তু হায় ! সেই লীলাকে ধর্মজীবনের কীর্তিস্তম্ভ না করিয়া দেশাচার, লোকা-
চার প্রভৃতি নানা কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া হিন্দুগণ এক্ষণে উহাকে মলিন হইতে
মলিনতর করিয়াছেন। সুতরাং সেই লীলা জাতীয় কলঙ্ক বলিয়া উপেক্ষিত
হইতেছে। মনে হয়, এবিধ আচরণের জন্য ভারতের আজ এই দশা !

এই লীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকাগণ শ্রীমতী রাধা সহ বোল শত গোপ-
মহিলা। স্থান—সন্নিকটস্থ উপবন। লীলা—প্রত্যেক মহিলা সহ একজন মাত্র
•শ্রীকৃষ্ণ এত শত শ্রীকৃষ্ণ আকারে আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত ছিলেন। এমন
কি; যে কোন কারণে কোন কোন মহিলা সেই লীলায় যোগদান করিতে
পারেন নাই, তাহারাও স্ব স্ব গৃহে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ ও সম্ভাষণ
সুখ কখন প্রত্যক্ষ ও কখন বা প্রাণে প্রাণে উপভোগ করিয়াছিলেন।

ভাগবত গ্রন্থ ব্যতীত কোন জাতির ধর্ম বা অল্প পুস্তকে এবশ্রকার ঘটনার
উল্লেখ নাই। আধুনিক বিজ্ঞান ও বুদ্ধগণ এই রহস্য ভেদে পশ্চাৎপদ। হিন্দু-
জাতির মধ্যে যাহারা এই লীলার পৃষ্ঠপোষক, তাহাদের দশাও তদ্রূপ। সুতরাং
কোন শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত জীব এই ঘটনা কেবলমাত্র কল্পনা-প্রসূত বা ভাষার
অলঙ্কার মাত্র, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি ? সুতরাং
এই লীলায় প্রশ্রয় প্রদান করা দারুণ বর্করাজ বা ভীষণ অশ্লীলতার পরিপোষক,
এ কথা বিদেশীয়গণের সহিত বিদেশীয় প্রণালীতে শিক্ষিত ভারতবাসীও মিশ্র-
চিত্তে বলিবেন না কেন ? মানবের হৃদয়াকাশে শ্রীকৃষ্ণের স্মার্তীয় লীলা মধ্যে এই
লীলা সম্বন্ধে যে হর্ভেদ্য তমসাবরণ রহিয়াছে বা শ্রীকৃষ্ণের সেরক সেবিকাগণের
মধ্যে যে দারুণ কুসংস্কার বা কুৎসিত ধারণা কালিনা-অন্ধরে খোদিত রহিয়াছে,
উহার জন্য হিন্দুজাতির শিক্ষিত সমাজ ও যাজক শ্রেণী দোষী নহে কি ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জনসাধারণের যে বিশ্বেষের বা অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়, উহার জন্ত বৈষ্ণব-সমাজও দায়ী নহেন কি? ইহা অকর্ষবাঁচ্য নহে কি?

কুমুদিনী-কান্ত শরৎকাল কি মাধুর্যাপূর্ণ, কি আনন্দপ্রদ ও কি শান্তিদায়ক, প্রকৃতি-সেবক কবিই আপন ভাষায় ব্যক্ত করিতে সক্ষম। উপবনে প্রভাসিত শরৎ-শশীর কিরণজাল ও তত্রস্থ মৃদুমন্দ-সঞ্চারিত পবন কোন্ প্রাণে স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি আনয়ন না করে? জনতা ও মলিনতা পূর্ণ মানব-সমাজের ও মানব-সমূহের পরিবর্তে চিত্তরঞ্জিনী-শান্তিময়ী প্রকৃতি দেবীর বিশাল ক্রোড় কি আনন্দ-প্রদ ও কি প্রকার চিত্তের উৎকর্ষতা সাধক, যাহারা কোন দিন—কোন সময়ে ক্রমেকের জন্ত এই অমূল্য সুখ উপভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা এক মুখে নয়—শত কণ্ঠে ইহার গুণানুকীর্্তন করিবেন। স্মৃতিরাজ্য কাল ও লীলাস্থান নির্বাচন-শক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ—এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক মাত্র— তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

রাসলীলা যথাসম্ভব সুলভাবে আদিরসের লীলা মাত্র। অত্যাচ্ছ জানের ও অপরিসীম প্রেমের সন্মিলনে সূক্ষ্মতম ভাবে যে বিহার সুখ, যে আনন্দ ও যে শান্তি উপভোগ হইয়া থাকে, উহারই নাম আদিরস। জানের ও প্রেমের আকার নাই বটে, কিন্তু উহাদের কার্যকারিণী শক্তি আছে। এই জানের ও প্রেমের সন্মিলনে লৌকিক বা পশুবৎ বিহারকার্য না থাকিলেও সূক্ষ্মতম ভাবে সম্ভোগ কার্য অহোরহঃ সাধিত হইতেছে। এবম্প্রকার সম্ভোগের সুফল অনন্ত জীবন ও অনন্ত সুখ। ইহাই সচ্চিদানন্দময় বা সচ্চিদানন্দময়ী অবস্থা। আদিরসের অবস্থায় মানব-মন আত্মাসম চৈতন্যময়ী হইয়া শিবলিঙ্গস্থ গৌরীপটু ভাবাপন্ন হয়। সেই মন তখন প্রেমময়ী ভাবে জীবদেহস্থিত সর্বগুণাকর আত্মার সহিত সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিয়া অনন্তের খেলায় যোগদান করে। জীব এই অবস্থায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এক্ষণে আদিরসের গতি-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপেই বলা যাউক।

সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অগোচর নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্ম সহ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের উপাদান পূর্বোক্ত অত্যাচ্ছ জ্ঞান ও অপরিসীম প্রেম। উভয়ের সন্মিলনে মহা-শক্তির আবির্ভাব। সীমাবদ্ধ ও নানা অগুণে পূরিত জীবের পক্ষে এই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্ত ব্রহ্মের সগুণাবস্থাও বাক্য-মনের অগোচর। সগুণ ব্রহ্ম হইতে অবতারগণের অভ্যুদয়। অবতার-

গণের নিম্নাবস্থা দেব-দেবীগণের । তবে ৬কালী, দুর্গা প্রভৃতি যে উদ্দেশ্যে কল্পিত হইয়াছে, উহা সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা । দেবদেবীগণের নিম্নাবস্থা—উপদেবতাগণের । উপদেবতাগণের নিম্নাবস্থা—প্রেতলোকের । তৎপরে জগৎবাসীর । তবে ইহলোকবাসীর অধিকাংশ জীব প্রেতলোক হইতে অধিগমন করিলেও অবতার, দেবতা ও উপদেবতা শ্রেণী হইতেও অল্প সংখ্যায় মর্ত্যধামে আসিয়া থাকেন । আবার ক্রমবিকাশ বিধানে অল্প সংখ্যক জীব পশু হইতে মানব মানবী আকার ধারণ করিতেছে ।

সগুণ ব্রহ্মের আত্মায় অবস্থা ও অবতার-রাজ্য হইতে ইহলোক পর্য্যন্ত মনোময় অবস্থা । মনোময় অবস্থা সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম কিন্তু কালিমা আকার বিশিষ্ট ও স্থলাকার বিশিষ্ট । সগুণ ব্রহ্মে যেমন আদিরসের খেলা অহোরহঃ চলিতেছে, মনোময় অবস্থায় ও স্থলত্ব অনুসারে ক্রমশঃ অল্পমাত্রায় কিন্তু স্থলভাবে সেই একই ক্রিয়া সাধিত হইতেছে । সুতরাং মানবের সম্ভোগ সূখ অতীব অকিঞ্চিৎকর । মানবের মনে যেমন পশুবৎ উপাদান বিদ্যমান, তেমনি সীমাবদ্ধ জীবের সম্ভবপর অত্যুচ্চ উপাদানও আছে ; সুতরাং জীব এ রাজ্যের অল্পক্ষণস্থায়ী, কষ্টপ্রদ ও হেয় সম্ভোগ সুখের তৃষা বর্জন করিলে দেহাবসানে নিঃসন্দেহে উচ্চতম বিহার-সুখের অধিকারী অধিকারিণী হয় । এই মার্গা জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে ও কি উপায়ে সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, সেই সেই কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য মহাপুরুষগণ একমাত্র জীবের কল্যাণ-সাধনায় মানব আকারে আবিভূত হইলেন । ৬বৃন্দাবন ধামের রাসলীলাও এই মহান উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল । হায় হিন্দু বৈষ্ণব-সমাজ ! নারিকেল ফলের অন্তঃস্থ সন্ধের (শাঁসের) প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি না রাখিয়া বহিরাবরণের (ছোবড়ার) জন্য লালসিত ! মনে হয়, সত্যের ও চিন্ত্যশীলতার অভাবে বরং উচ্ছ্বাসের ও বাহ্যাদম্বরের আধিক্যবশতঃ অকর্ম্মই ধর্ম্মবাচ্য হইয়াছে ! এইজন্য কর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পন্থা জগতের শীর্ষ স্থানে আসন না পাইয়া দিন, দিন অনাদৃত হইতেছে ! তাহা হইলে বৈষ্ণব-সমাজের বিধেয় নয় কি, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন না করিয়া আপনাদিগকে সংযত করা ? তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শে ভারতবাসী হিন্দুজাতি উন্নত হইবার সম্ভাবনা নহে কি ? তাহা হইলে হীনতা নিরসনকারী হিন্দু আখ্যার সমুচিত সম্মান রক্ষা হয় না কি ?

এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে, এই লীলার গোপগণকে যোগদান

করিবার অবসর না দিয়া কেবল মাত্র মহিলাগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া-
ছিলেন কেন ? উত্তর :—

১। বুড়ো শালিক-পাখীকে বিধি মত শিক্ষা প্রদান করা হইলেও সে নিজ
সাধা-বুলি সাধিবেই সাধিবে। তেমনই জাগতিক চিন্তায় ও কার্যে অভিজ্ঞত
গোপগণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠা গোপ-রমণীগণ সংস্কার বশতঃ আপন আপন ধারার
চলিবেই চলিবে ; সুতরাং তাহাদিগকে নূতন কিছু শিক্ষা প্রদান করী পণ্ড্রম
মাত্র ।

২। কাঁচা বাঁশই নতশীল। এই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ কোতুকচ্ছলে গোপ-বালক-
গণকে আদর্শ দেখাইয়া কত কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু সকল মহিলা সে শিক্ষা
লাভের অবকাশ পান নাই ।

৩। রমণীকুল সাধারণতঃ ভক্তিময়ী ও সামান্ত আদরে বা মিষ্ট কথায় বিগ-
লিতা হইয়েন, এই জন্ত তাহাদিগকে অভিক্রটি মত কর্মসাধন সহজসাধ্য ।

৪। শত শত নারীর মধ্যে পুরুষগণ থাকিলে নারীগণের সংকোচ আসিবার
কথা। ইহা ব্যতীত পুরুষগণের চিন্তের বিক্ষিপ্ততা বা উৎক্ষিপ্ততার জন্ত সেই
চিন্তা নারীকুলের প্রতি প্রধাবিত হইয়া নারীকুলের বিশেষ ক্রতিসাধন
করিতে পারে ।

৫। নিজ ইষ্টকে কান্তভাবে সাধন বিশেষতঃ পুরুষদিগের পক্ষে বিশেষ শুভ-
কর। এই উপায়ে মানব-মানবীর প্রবল কাম রিপূর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া
বিশেষ সম্ভাবনা ।

৬। মানব অথবা চিন্তাকুলতার ও অধীরতার জন্ত ইচ্ছাশক্তির হ্রাসে অধি-
কাংশ জীব নারীশ্রেণীভুক্ত ।

৭। প্রকৃত আদর্শ দেখাইয়া মানবকে পাশববৃত্তি হইতে আদিরসের
অধিকারী করা ।

পুরুষদিগের রক্ষমূল ধারণা যে, প্রকৃতি-দত্ত বাহু অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জন্ত
তাঁহারা বাস্তবিক পুরুষবাচ্য বা এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদের জানা কর্তব্য
যে, নিজ নিজ মনের ও কর্মের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা হিসাবে বিধাতার বিধানে
তাঁহারা বাহ্যভাবে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, উচ্চ বা নীচ জাতি ও পুরুষ ন
কীব অথবা নারীশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন ও হইবেন। সুতরাং জাত্যভিমান বা পুরুষ
বাচ্য হইবার সাধ নিজ নিজ মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। প্রবল ইচ্ছাশক্তি
ক্রমে ও তীব্র বৈরাগ্য বন্ধে জীব জাগতিক সাধ্যসাধোর, হর্ষ বিবাসের ও অব্য-

বহিঃ চিত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইলে পুরুষবাচ্য হয়েন। বৈরাগ্য অর্থে ইহা বুঝা
 ক্তব্য যে, কেবলমাত্র গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গৃহত্যাগ করা বৈরাগ্য-
 বাচ্য নহে। দম্ভে বৈরাগ্য, লোভে বৈরাগ্য, ক্রোধে বৈরাগ্য, হিংসায় (বা
 ঈর্ষায়) বৈরাগ্য, কুৎসায় বৈরাগ্য, অসত্যে বৈরাগ্য, অধৈর্য্যে বৈরাগ্য, আলস্যে
 বৈরাগ্য, উচ্চাসে বৈরাগ্য, অকর্ম্মে বৈরাগ্য, অভিমানে বৈরাগ্য, অসন্তোষে
 বৈরাগ্য, অকৃতজ্ঞতায় বৈরাগ্য, স্বার্থপরতায় বৈরাগ্য, আত্মপ্লাষায় বৈরাগ্য,
 যা-তা ভাবনার বৈরাগ্য, যা-তা বাসনার বৈরাগ্য, যা-তা কর্ম্মসাধনে বৈরাগ্য,
 মনয়ের অসৎ ব্যবহারে বৈরাগ্য, যা-তা বাক্যব্যয়ে বৈরাগ্য, যার-তার সঙ্গ-
 করণে বৈরাগ্য, ওপরমস্তকে হস্ত বুলাইয়া উদরান্ন বা পাংথের বা অর্থের সংস্থানে
 বৈরাগ্য—প্রকৃত বৈরাগ্যবাচ্য। এবদ্বিধ বৈরাগ্যে মানব প্রকৃত পুরুষবাচ্য হয়েন
 —তবেই প্রকৃত কর্ম্মবীর হওয়া ও ধর্ম্মজীবন লাভ করা সম্ভব।

গোপ-মহিলাগণ 'আত্মহারা' অবস্থায় লীলাস্থলে ধাবিতা হইয়াছিলেন।
 কেবল মাত্র একজনের নিমন্ত্রণে ধাবিতা হইয়াছিলেন। তিনি কিন্তু এক
 অপ্ৰাপ্তবয়স্ক বালকমাত্র। অবশ্য স্বীকার্য্য, সে নিমন্ত্রণে এমন কোন অপার্থিব
 আয়োজন ছিল, যাহার জন্ত কুলকামিনীগণের নিকট সংসার-বন্ধন শিথিল হইল,
 সম্ভ্রনাতির স্মৃতি বিলুপ্ত হইল, কাহারও স্বামীর, কাহারও পিতার ও কাহারও
 অগ্রাণ্ড অভিভাবকগণের তাড়না নিষ্ফল হইল। সে নিমন্ত্রণে এমন অলৌকিকতা
 ছিল যে, সম্পূর্ণ পরাধীনা ও পরমুখপ্রেক্ষিণী মহিলাগণ সমাজের শাসনকে উপেক্ষা
 করিয়া নিঃসঙ্কোচের ও নিঃশয়ের বসনে-ভূষণে সজ্জিতা হইলেন। নিমন্ত্রণ-স্থলে
 উপনীত হইবার জন্ত কোন প্রকার যানের বা বাহনের বন্দোবস্ত ছিল না। মহিলা-
 গণ পদব্রজেই ধাবমানা হইয়াছিলেন, জাগতিক যাহা-কিছুর সহিত নিজ নিজ
 প্রাণ-মনেরও মমতাশূন্য হইয়া। সেই লীলাস্থলে থিয়েটারের বা গীতাভিনয়ের
 বা বায়স্কোপের বা সার্কাসের আয়োজন ছিল না; সেই লীলাস্থলে কোন প্রকার
 মুখরোচক আহাৰ্য্য সামগ্রী ভাবে ভাবে রাখা ছিল না; সেই লীলাস্থলে
 নানা দেশীয় মনোহারী সামগ্রীর মেলা বসে নাই; সেই সন্মিলনীতে
 কোন প্রকার পার্থিব পারিতোষিক পাইবার সম্ভাবনা ছিল না; সেই
 সন্মিলনীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যায়ের মত বিদ্যায় পাইবার বা কাঙ্গালী ভোজনের
 মত আয়োজন করা হয় নাই; সেই স্থলে কুমারী-ভোজনের বা সধবা-
 বৃত-উদ্‌যাপনের কথা ছিল না। কিন্তু সেই লীলাভূমিতে বোলশত মহিলা
 কুলে কালিয়া দিয়ার জন্ত ছিলেন—একমাত্র বালক শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের কলর,

সমাজের কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক, হিন্দুজাতির ও ধর্মের কলঙ্ক—শুধু কলঙ্ক নহে, কলঙ্কের স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজিত—একমাত্র বালক শ্রীকৃষ্ণ ! এইরূপ বিচার-বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার জন্ত তোমার খুর চতুর্দিকে এ অধম বার বার প্রণিপাত করে । তোমার খাতিরে মানিয়া লইলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ বালক মনে, তখন যৌবনারূঢ় হইয়াছিলেন । জিজ্ঞাসা করি, কেবল দশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ছয়শত মিনিটে ষোলশত মহিলার সর্বনাশসাধন করা সম্ভব কি ? এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিচারকগণের দারুণ মস্তক বিকৃতির লক্ষণ নহে কি ? কোন কোন সমালোচকপুস্তক বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । ষাঁহাদের গৃহে ও বাহিরে অশান্তিই সম্বল, তাঁহাদের ফর্তব্য নয় কি— আপন আপন উচ্ছৃঙ্খল আত্মীয়-স্বজনের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার বা নিজ নিজ উর্দ্ধতন কর্মচারীকে বা প্রভুকে স্ববশে আনিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের গুরুপদে বরণ করা ? বুদ্ধিমান হইয়া কেন ভ্রাতৃবর্গ হেলায় দিন হারাইতেছ ?

‘আত্মহারা’ চিন্তাবৃত্তি নিরোধের অবস্থা । সে অবস্থায় জীবের মন এক চিন্তাকে প্রধান করে বা এক কার্যে নিমগ্ন থাকে । সে অবস্থায় মনের যাবতীয় স্তরগুলি সেই একই চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকে । সে অবস্থায় জীবের মন সেই চিন্তায় বা সেই কার্যে এমন ভাবে নিয়োজিত থাকে যে, তাহার জাগতিক সম্বন্ধ বিলীন হইয়া যায় । সে অবস্থায় সেই চিন্তনীয় সামগ্রী বা বাহ্য কিছু সকলই মনের ভোজ্যসেব্য হইয়া যায় । সে অবস্থায় সেই চিন্তনীয় উপাদান জগন্ময় পরিব্যাপ্ত—ইহাও গোচরীভূত হয় । ইহাই সাধনের একটা উচ্চাবস্থা । শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-কৌশলে ব্রজাঙ্গনাগণ এবশ্রকার অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়াকাশে শিক্ষাদাতার কোন কথা খোদিত ছিল বা সেই শিক্ষকের মূর্তি মানসপটে জাগরুক ছিল । মানব আপন-আপন মনকে বশতা স্বীকার করাইতে অক্ষম, কিন্তু সমগ্র বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের পদানত ছিল । কেবল মাত্র মনুই ষাঁহাদের সম্বল, তাহাদের গৃহে ও বাহিরে অশান্তিই প্রাপ্য-পণ্ডা । তাহাদের কাহাকে বশতা স্বীকার করান অসম্ভব । সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, শ্রীকৃষ্ণ মনের অতীত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া রাসলীলা কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । আত্মীয় অবস্থাই মনের অতীত অবস্থা । আত্মা—জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিসম্বৃত । যে অবস্থা চক্ষু সবেও অক্ষম ও কর্ণ সবেও বধির সম কাল ক্লেপণ করিতে না হয়, উহাই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা । প্রকৃত

জ্ঞানী ব্যক্তি ত্রিকালজ্ঞ । সুতরাং সাধারণতঃ যাহা জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়, উহা বুদ্ধিমত্তার অবস্থাভেদে মাত্র । প্রকৃত প্রেম জ্ঞানের লক্ষ্মী-শ্রী । জ্ঞান-রূপ ফলের বা ফুলের মিষ্টতা বা সৌরভ—প্রেম । ইহা মানব মনকে স্বার্থপরতার ও জাগতিক যাবতীয় আসক্তির পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি প্রভৃতি নানা সদগুণে বিভূষিতা করায় । মনঃপ্রাণ স্নিগ্ধকর ও শান্তিদায়ক অনির্বচনীয় টানের নাম প্রেম । সেই অবস্থায় একজনের সংগুণগুলি অপরের নিকট বিশেষ ভাবে আদৃত হয় । সেই টানে দৈহিক সম্বন্ধ বা জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া একজনের মনের সহিত অণুর মনের (দেহের নয়) ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় । পরে উভয় মন চিরকালের জন্ত অভেদ ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া উহার আশ্রয়সম অবস্থায় উপনীত হয় । পরে উভয়ের গুণ পরিণয় হয় । প্রকৃত জ্ঞানের ও প্রকৃত প্রেমের সম্মিলনে এক মহাশক্তির অভ্যুদয় হয় । এই শক্তি হইতে ইচ্ছাশক্তি বিকশিত হয় । তৎপরে ইচ্ছা-ফুল হইতে কর্ম-সুফল পরিলক্ষিত হয় ।

[ক্রমশঃ ।

গৃহস্থের বোঁ ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

• আঁজা হাঁ, আমি বাঙ্গালী । ইনি আমার স্বামী । ইনি এ দেশী, তেলেগু । না, লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই । অপরিচিত লোকের বিষয় কথা কওয়া মানুষের স্বভাব, বিশেষ যেখানে সমস্যা আছে । বাস্তবিকই বিদেশে আসিয়া দেশের লোকের সাক্ষাৎ পাইলে লোকের কৌতূহল জন্মে ।

• আমি সাত বৎসর দেশ ছাড়া । সাত বৎসর এই সমুদ্রের খেলা দেখিতেছি, সাত বৎসর দেখিতেছি এই বড় বড় চেউগুলা এই পাহাড়টার গায়ে আছড়া-আছড়ি করিতেছে । এ পাহাড়টার নাম ডল্‌ফিন্‌স্ নোজগা . সমস্ত ভিজাগাপ-টম আর ওয়ালটেরার সহর পাহাড়ের উপর । অবশ্য এইটাই খুব বড় পাহাড় । প্রায় এক মাইল সমুদ্রের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে তাই ইহার এত শোভা ।

• কি বলিতেছেন ? কোথা বাড়ি ? আপনাদের বাড়ী কলিকাতা ? পাঁচ বছ

মিলিয়া পূজার ছুটিতে এখানে আসিয়াছেন? আমার পূজা নাই। আমি খুঁটান।

বিশ্বয় হইতেছে কেন খুঁটান হইলাম? খুঁটান না হইলে আমার উপায় ছিল না। ইনি খুঁটান। ইনি আমায় উদ্ধার করিয়াছেন। ইনি আমার ত্রাণ-কর্তা। খুব কাল কুচকুচে চেহারা বটে। না, না, লজ্জিত হবেন না। কালোকে কালো বলিবেন তাহাতে লজ্জা কি? বিশেষ তখন আপনারা বৃষ্টিতে পুরেন নাই যে আপনাদের ভাষা আমরা কেহ বুঝিব। ইনি বাঙ্গালা বুঝেন না।

ই্যা! কেন খুঁটান হইলাম? ইহাকে বিবাহ করিব বলিয়া, ইহার স্ত্রী হইব বলিয়া, সমাজে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান পাইব বলিয়া। তখন কত বাবু, কত রাজা আমার তোষামোদ করিত, আমার ভালবাসা পাইবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিত, কত অর্থ আনিয়া পায়ে ঢালিয়া দিত, কত কাপড়, কত অলঙ্কার, কত জহরৎ উপহার দিত। কিন্তু সব গোপনে। সমাজে কেহ আনাকে স্বীকার করিতে পারিত না। সমাজে আমার স্থান ছিল না, আমি সমাজের উপরে ছিলাম। আমাকে একজন বড় মানুষের ছেলে একখানা বাড়ি দান করিয়াছিল। যে দিন সে রেজিষ্ট্রী করা দানপত্র আনিয়া আমার পায়ে কাঁচ রাখিয়া বলিল—“সুশীলা এখন বুঝলে আমার ভালবাসা কত গভীর”, সে দিন আমি হাসিয়া তাহাকে বলিলাম—“তোমার ভালবাসা গভীর হ’তে পারে না, কারণ তুমি মূর্খ। মূর্খ কি ভালবাসিতে পারে?” সে না আশায় ভৎসনা করিলেন। আমি ভয়ে তাহার হাত ধরিলাম, বলিলাম—“ভাই ঠাট্টা করছিলাম, আমি তোমা বই কাকেও জানি না।” হতভাগ্য একেবারে স্বর্গ হাতে পাইল! তাহার পরদিন সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর কাণের হীরার টপ্ চুরি করিয়া আনিয়া আমার কাণে পরাইয়া দিল।

আচ্ছা বসিতেছি। এ ধবজাটা নাকি ওলন্দাজদের। তাহারা প্রথমে এ দেশটা অধিকার করে। ওঃ! আমার কথা? শুনুন। স্বামীকে বসিতে বলি। উনি ইংরাজী বলেন—তেলেগু বলেন। বাঙ্গালা জানেন না। আমি তিন রকম ভাষাই জানি, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাণের জিনিস, অন্তরের সামগ্রী। এই সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে এক একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে পূজার ঢাকের বাজনা শুনি। সত্য কথা, ভাষা জননী, জন্মভূমি জননী। আপনারা দেশে বসিয়া যুগে একথা বলেন বটে কিন্তু আমরা প্রবাসী, আমরা এ সত্য যেমন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি তেমন আপনারা পারেন না।

বুঝিয়েছেন বোধ হয় আমার কি উপজীবিকা ছিল। আমি কি স্বণিত সংসারে বাস করিতাম, কি পাপ-মলিন বৃত্তি শিখিয়াছিলাম। আমার এই রূপের কুহকে কত লোক আশ্চর্য হইত, আমার সঙ্গীতে কত যুবক গৃহছাড়া হইত, কত সাধবী নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিত, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে! আমি মথমলের শস্যায় শয়ন করিতাম, বহুমুগা বেনারসি সাড়ি দাসীদের দান করিতাম। এখন আমার এই কাপড়খানি পোষাকী—ইহার মূল্য মাত্র তের টাকা। কিন্তু এই কাপড়ে—কি বলছেন? এই কাপড়ে আমার রূপ বাড়িয়াছে? না লজ্জিত হইবেন না। হ্যাঁ! বাস্তবিক বাড়িয়াছে—কাপড়ের জন্য নয়, মনের সুস্তোষের জন্ত, তৃপ্তির জন্ত।

তখন বহুমুগা সাজে সজ্জিত থাকিতাম, অল্প বারান্দার ঈর্ষায় জলিয়া মরিত, আমার নিজের ভগ্নী হিংসায় আমার সঙ্গে কত ঝগড়া করিত, কত ধনী, কত বিদ্বান, কত উকিল, ব্যারিষ্টার, ডেপুট হাকিম আমার মুখে প্রেমের সম্ভাষণ শুনিবার জন্ত লালায়িত হইত, কিন্তু তবু আমার প্রাণে তৃপ্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। এই সমুদ্রের ছটফটানি হুড়ুম হুড়ুম অচঞ্চল ভাবটা আমি খুব বুঝিতে পারি। সাগর রত্নগর্ভা, ওর ভাঙারে এত রত্ন এত সম্পদ ওর সমৃদ্ধি অসীম বলিলে চলে, তবু ওর কি চঞ্চল ভাব, কি অশান্ত জীবন। দিন নাই রাত নাই বালুকার উপর হুঙ্কার দিয়া আসিতেছে কিন্তু তরঙ্গগুলা চূর্ণ বিচূর্ণ হুইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। সাগর কি চাহে তাহা সে নিজেই জানে না। যাহা পাইয়াছে তাহাতে সে তৃপ্ত নহে, যাহা পায় নাই তাহা পাইতে সে ব্যগ্র। আমারও প্রাণ এমনই ছিল। আমারও মনের তরঙ্গগুলা এমনি উত্তাল, এমনি অশান্ত ছিল। নূতন লোক দেখিলেই জয় করিবার বাসনা হইত; একবার জয়লাভ করিতে পারিলে আর সে বিজিত অপদার্থ গুলার কথা ভাবিতাম না, সেগুলার অসার ভালবাসার উপর ঘৃণা হইত। যাহাকে মা বলিতাম তাহার প্ররোচনায় সে অপদার্থগুলার কাণে মুখস্থ-করা প্রেমের কথা ঢালিয়া দিতাম, তাহারা তাহাদের ঘরের ধন সম্পত্তি আনিয়া আমার শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিত; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত, ইঙ্গিতে একটু প্রেমের কথা বলিলে প্রত্যেকে মনে করিত, আমি তাহারি।

• হাসিতেছেন? আপনারা শিক্ষিত। জানি না আমার মত কোন পাপীয়াসী আপনাদের একরূপ ভাবে নাচাইয়াছে কি না। আমি কত পণ্ডিত, কত বিদ্যা-দিগ্গজকে বাঁদর নাচাইয়াছি। একজন খুব পণ্ডিত ছিল—বিলাতে সকল পরীক্ষায়—যাক বাস্তবিক সমালোচনা।

আমরা হই ভগ্নী ছিলাম—আমি সুশীলা, আর আমার ছোট চপলা। আমাদের মা ছিলেন। পরে শুনিয়াছি তিনি জর্ননী নহেন, বাল্যকালে কোন প্রকারে আমাকে ও চপলাকে হস্তগত করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা কি চণ্ডালের কন্যা তাহা কেহ জানে না। তিনিও জানেন না। তিনি একশত এক টাকায় আমায় কিনিয়াছিলেন। তবু তিনি আমার মা—কারণ বেশ্যা হইলেও আমি ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম তাঁহাকে ভালবাসিয়া। তিনি আমাদের কোন অভাব বোধ করিতে দেন নাই, খুব স্নেহে পালন করিয়াছিলেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, গান বাজনা শিখাইয়াছিলেন। অবশ্য নিঃস্বার্থ ভাবে শিখান নাই—কিন্তু লেখাপড়া না শিখিলে আজ আমি গৃহস্থের স্ত্রী হইতে পারিতাম না, পাপের মাত্রাটা বুঝিতাম না, আমার জীবনের গতিটা সেই পৃথিবীর ভিতর আবদ্ধ থাকিত, সে খাত হইতে নূতন খাতে পরিবর্তিত করিতে পারিতাম না। বোধ হয় বিলাসিতার রহস্যটা না বুঝিলে দারিদ্র্যের ভূমিতে প্রাণটা ভরপুর করিতে পারিতাম না, এত সচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারিতাম না। নাটক পড়িতাম, নভেল পড়িতাম, সতীত্বের কথা পড়িতাম, সতীত্বটা কি তাহা প্রথমে বুঝিতাম না; উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রাণের ভিতর যেন কিসের একটা অভাব বোধ হইত। যেন কোন একটা অজানা দেবতা দিব্য মূর্তি বিকাশ করিয়া অর্ঘ্য লইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিত। ভালবাসা পেশা ছিল, মুখে কত ভালবাসার কথা বলিতে পারিতাম, দিবারাত্র কত প্রণয়ের মধুর আলাপ শুনিতাম, কিন্তু ভালবাসার যে একটা প্রকৃত স্বরূপ আছে, তাহা বুঝিতাম না। পুস্তকে ভালবাসার কথা পড়িতাম, ভাবিতাম এ কথাটা যেন কল্পনা। একনিষ্ঠার কথা শুনিয়া হাসিতাম, ভাবিতাম সে সব কথার কথা, একনিষ্ঠা মানুষের স্বভাবের বিরোধী একটা আদর্শ, সে আদর্শ কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না, ভবিষ্যতে কেহ কখনও একেশ্বরের পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে না। কিন্তু তখনও যেন প্রাণের মধ্যে কি একটা অজানা বৃত্তির জন্য একনিষ্ঠ ভাবে ব্যগ্র থাকিতাম। তখন অতটা বুঝি নাই, এখন জানি, জীবনের যত শক্তি সব একটা সিদ্ধির অগ্নি নিয়োজিত। লম্পট বহু নারীর ভঙ্গনা করে সেই একনিষ্ঠার সম্পূর্ণ সুখটুকু ভোগ করিবার অগ্নি। সেটুকু পায় না বলিয়াই সে একের পর এক অনেক গণিকার দায়িত্ব হয়। যে প্রথমেই সেটুকু পায় সে আর অগ্নির দিকে তাকায় না।

একটা কথা বড় মনে বাজিত। অত গৃধীরীর সুখ, সর্ষকি, ঐশ্বর্যের মধ্যে

একটা রহস্য বড় অতৃপ্তির সৃজন করিত । আমি দেখিয়াছি, একেলা থাকিলে প্রায় সকল হিন্দু সন্তান দেব মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দেব দেবীকে প্রণাম করে । কিন্তু আশে পাশে পরিচিত সাহেব বা শিক্ষিত বাবু থাকিলে আর তাহাদের হাত উঠে না, মস্তক নত হয় না । বোধ হয় সে মনে মনে দেবীর আরাধনা করে, কিন্তু প্রকাশ্যে দেবীকে আরাধ্যা বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না । আমারও উপাসনায় আমার ভক্তেরা ঐরূপ ভক্তি দেখাইত । প্রকাশ্যে কেহ আমাকে স্বীকার করিত না । আমি অনেক প্রমোদ-বাসরে নাচ গান করিতে যাইতাম । যাহারা আমার মুখের একটা কথা শুনিলে আপনাদের ধন্য মনে করিত, তাহারা প্রকাশ্যে আমার বন্ধু স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত । বৃষ্টিভাম প্রকাশ্য সমাজে আমার ভালবাসা দোষের । সমাজের চক্ষে আমি হেয় একথাটা বৃষ্টিভাম, কিন্তু একথাটা মর্মে প্রবেশ করিল কবে, তাহা বলিতেছি ।

আমাদের পল্লীতে কেবল বারবিলাসিনীরা বাস করিত । আমাদের বাড়ীতে কেবল আমরা দুই ভগ্নী ও আমাদের পালয়িত্রী থাকিতেন । অন্যান্য বাড়িতে একাধিক বেশ্যা পরিবার বাস করিত । আমাদের অনেক অর্থ ছিল বলিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অবধি আমরা অপর বেশ্যার সহিত থাকিতাম না । বৃহৎ অট্টালিকার নিয়ের কতকগুলো কক্ষে হিন্দুস্থানী চাকর থাকিত, কতকগুলো শূন্য থাকিত । আমাদের একবার এক বৃদ্ধা দাসী দেশে গিয়াছিল । তাহার স্থলে একটি যুবতী কর্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল । দাস দাসীর নিয়োগ প্রভৃতি কার্য পালয়িত্রী করিতেন, সাংসারিক কোন ছোট কথা আমরা কহিতাম না । দাসী ঘোমটা টানিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল । মা কথা কহিলেন, বেতন স্থির হইল । আমরা রূপার আলবোলায় সোনার নলে তামাক খাইতে-ছিলাম, জরির জুতা পায়ে, অঙ্গে রেশমী সাড়ী রেশমী জামা । দাসী বড় সম্ভ্রান্ত ভাবে আমাদের প্রতি চাহিতেছিল । কি যেন একটা সন্দেহ, কি যেন একটা সমস্যা তাহার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল । সে কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—মা আপনারা কি, বলছিলাম মা আপনারা—

আমার একটু কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হইল । আমি বলিলাম—আমরা কি জাত জিজ্ঞেস করছ ? তুমি কি জাত ?

সে বলিল—মা আমরা সদগোপ ।

আমি বলিলাম—আমরা ব্রাহ্মণ, একেবারে কুলীন । দেখ না, কেমন পোষাক পরিচ্ছদ, আলবোলার কেমন বেনারসী নল ।

যুবতী বিস্ময়ে আমাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সেই শঙ্কা-জড়িত বিস্ময়ের ভাবটা মাতার অসহ্য বোধ হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মর মাগী শ্রাকা। জানেন না যেন, এপাড়ায় কাজ করতে এসেছ জান না আমরা কি জাত ?

চপলা বলিল—আমরা নাচওয়ালী, মজুরো করি।

তাহার পর সুর করিয়া সে দাসীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল—আমরা যখন যার কাছে থাকি, তখনই তার মন জোঁগাই।

চপলাকে অস্পৃশ্য ভাবিয়া যুবতী সরিয়া গেল, সে বলিল—ওমা! তোমরা বেউসো ? না বাপু এখানে আমি কাজ করব না।

এই কথাটা বলিবার সময় তাহার মুখে একটা বিষম গর্ক ফুটিয়া উঠিল। সেই গর্কের জ্যোতিতে তাহাকে অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া মনে হইল। আমার মনের মধ্যে সেই লুকান ভাবটা যেন জাগিয়া উঠিল। যে ভাবটাকে ধরিতে পারি নাই, যে ভাবটা নিজেকে গোপন রাখিয়া আমাকে এত দিন অন্যাত্ত করিতেছিল, আজ যেন সে ভাবটা ধরা দিল। আমার ত গর্ক করিবার-কিছুই নাই, আমি তো একটা নীতির জন্ত এমন ভাবে ঐশ্বর্যময়ীদের মুখের উপর দস্ত করিতে পারি না।

চপলা তাহার কথার অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। সে পূর্ব রাত্রে এক এটর্নি বাবুর সহিত একটু অধিক মাত্রায় সুরা পান করিয়াছিল। গানের বেসের মত মদের নেশার একটা রেশ থাকে। সে সময় মানুষ বড় গিটখিটে হয়, শরীরে সে সময় একটা বেদনা হয়। চপলা বলিল—মাগির যত বড় মুখ তত বড় কথা। পরে আছিস তো ছেঁড়া শ্রাকড়া, আমাদের কাছে কাজ করলে তোর বরাত ফিরে যেত।

দাসীর চক্ষে একটা জ্যোতি ফুটিল। আমি আজও সেটা বিস্মিত হইব না। আপনারা আপনাদের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কণ্ঠার চক্ষে সে জ্যোতি অহরহঃ দেখিতেছেন, আমার মত লোকের পক্ষে সে দিন সে জ্যোতি নূতন ছিল। তাই আপনারা পবিত্রতার জ্যোতি, সতীত্বের তেজ দেখেন না। সে পুণ্য আলো আপনাদের বিরিয়া থাকে। আমি সেই পরিচারিকার চক্ষে সেই স্বর্গীয় দীপ্তি দেখিলাম। যে দেশের পরিচারিকা এমন হইতে পারে সে দেশের সীতা দমরতী কি ছিল ? অকস্মাৎ এই কথাগুলো আমার মনে হইল। দাসী বলিল—“ধাক্ আমার ছেঁড়া কাপড়। আমার এই হাতের নোয়া, মাথার

সিন্দূর ঘেন ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা থাকে । আমি তোমাদের কুবেরের ঐশ্বর্যি
চাই না ।”

যুবতী ফিরিয়া সিঁড়িতে নামিতেছে, আমি ছুটিয়া তাহার হাত ধরিলাম ।
সে ভয় পাইয়াছিল । কিন্তু পলাইল না । আমার মুখের দিকে চাহিল । তাহার
চোখে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত ছিল—আমি সতীত্বের বলে বলীয়ান, আমাকে
বেশ্যায় কি করিতে পারে ?

আমি বলিলাম—ওগো তুমি যে দেবী । তুমি দাসী বৃত্তি ক’র না । তুমি
এই হীরের বালা নাও, এর টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার এস । আমি তোমায়
আবার টাকা দ’ব । ওগো তোমার স্বামীকে এনো দেখব ।

সে হাসিয়া বলিল—মা ও বালা আমি নব না । কেন বুঝছেন ? মা কালী
তোমার ভাল করবেন ।

আমি বুঝিলাম । সে গণিকার দান লইবে না । হাঃ রে ভারতবর্ষ !
হাঃ রে বাঙ্গালা দেশ ! আমি বলিলাম—আচ্ছা তোমার স্বামী ! তাঁকে একবার
দেখাবে ! ই্যাগো ! সে কি খুব সুন্দর !

সে এবার একটু হাসিল । আহা ! কালো রঙ্গে এত সৌন্দর্য্য থাকে । সে
বলিল—আমার স্বামী হাঁসপাতালে । মোটরগাড়ি চাপা পড়েছেন । তাই মা
খাটতে এসেছি । তিনি মা সামান্য লোক ।

মুর্থ রমণী ! যাহাকে ভগবান এমন স্ত্রীরত্ন দিয়াছেন তিনি সামান্য লোক !

না কাঁদি নাই । একটু দম নিলাম ! অন্য কথা বলিব ? না ; এখন আপনাদের
শুনিত্তেই হইবে । ছাড়িব না । দেশের লোক কি কম ছলভ পদার্থ ! দেশে
থেকে বুঝিতে পারেন না । স্বামী চেয়ে রয়েছেন । কিছু বুঝিতেছেন না ।
নিল্লু ? কোপারকায়া ? কমলাপল্লু ! নেহেরু, নেহেরু ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন
জল পান করিব কি না, ডাব খাইব কি না, কমলা লেবু দিবেন কি না । না
কিছু চাই না ।

তখনই আবার বিলাসিতার মধ্যে পড়িলাম । আরসীতে মুখ দেখি-
লাম । • ঢল ঢল লাবণ্য, শোলাপ কুলের মত বর্ণ । • মুখে একটা কিসের
অভাব ? না, না সে যুবতী সিঁথায় সিন্দূর দিয়া সুন্দরী দেখিতে হইয়াছিল ।
সিঁথায় সিন্দূর দিলাম, উহ ! হাসিলাম । মাথা মুণ্ড ! জগতে কেবল স্ফূর্তির
অন্ত আসা ! সতীত্ব । ছেঁড়া কাপড়, স্বামী হাঁসপাতালে ! পরের বাড়ির দাসত্ব !

সীতাদেবীরও সুখের শেষ ছিল না। দময়ন্তীরও তাই! কেবল কষ্ট! কেবল কষ্ট! বিলাসিতার ক্রোড়ে 'গা' ভাসাইলাম। আনন্দের কোয়ারার তলায় বসিলাম। কিন্তু—

না। দাসীটা একেবারে প্রাণে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল। রামায়ণ মহা-ভারতে বড় বেশী সুখ পাইতাম। জানকীর জন্ত কাঁদিতাম। এমন কি মন্দোদরীর জন্তও একদিন চোখের জল পড়িল। আহা! রাবণরাজা যাহাই হউক তাহার তো স্বামী! রামচন্দ্র রাবণকে মারিলেন, বেশ ভাল! কিন্তু তাহার পূর্বে মন্দোদরীর প্রাণটুকু লয়েন নাই কেন?

একদিন কাণীঘাটে গেলাম। ছোট ছোট বধু দেখিলাম, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা গৃহিণী দেখিলাম, সকল বয়সের বিধবা দেখিলাম। সবারই অবস্থা মন্দ, সবাই দারিদ্র্যের নির্ভুরতার জর্জরিত, কিন্তু গৃহস্থের মেয়ে সবারই মুখে একটা পবিত্র ভাব! আমার ঝলসান রূপের দিকে, আমার চমকুদার বেনারসির দিকে সবাই দেখিল বটে কিন্তু কাহারও চক্ষে ঈর্ষা নাই। ছোট ছোট দরিদ্র গণিকাগুলো আমাদের দেখিলে যেমন একটু ব্যগ্র হয়, আলাপ করিতে চায়, মনে মনে হিংসা করে ইহারা তেমনি আমাদের অস্পৃশ্য ভাবিয়া দূরে থাকিতে চাহিল। এ ভাবটা পূর্বে দেখিয়াছি কিন্তু এত বুঝি নাই।

আমার কার্যে শৈথিল্য দেখিয়া জননী বিরক্ত হইলেন। বিহারের একটা কোকেনখোর জমিদারের ছেলে আমার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আমি তাহার নিকট মতির সাতনর আদায় করিতে পারি নাই বলিয়া মা বড় বিরক্ত হইলেন। চপলা চিরকাল আমার ঈর্ষা করিত, সে মাতার ক্রোধে ইন্ধন জোগাইল। তিনি সর্বদাই আমার অপমান করিতেন। আমার প্রাণে শান্তির একান্ত অভাব হইল।

এমন সময় নারায়ণ আমার উদ্ধারের জন্ত—ওঃ নারায়ণ বলিতেছি? আমি ধুঁটান বটে! কিন্তু বীণাকে মানি বলিয়া নারায়ণকে ফেলিতে পারি নাই। ধুঁটদেব পবিত্র; তাঁহার ধর্মাবলীগণ উদার; সে কথা পরে বলিব।

আমার উদ্ধারের জন্ত ইনি একদিন আসিলেন। বিদেশী লোক আসিলেই মা ভাবিতেন একটা মশু বড় শীকার। একজন বাঙ্গালী উকীলের সঙ্গে ইনি আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন। উকীল লোচনবাবু এদেশে হাওয়া খাইতে আসিয়া ইহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। উকীল বাবু আমাদের স্বভাব জানিতেন। তিনি মাতাকে

বলিলেন—ইনি মাদ্রাজের ছদ্মবেশী রাজপুত্র ইত্যাদি। তখন বাস্তবিক ইনি কাছারিতে পঞ্চাশ টাকা বেতনের আমলা ছিলেন। জননী ইঁাকে দেখাইয়া বলিলেন—“দেখ্ সুশীলা আর আলিস্যি করিস্ নি। কপাল গুণে এমন রাজপুত্র এসেছেন, আহা! বাবাজি লোচন বেঁচে থাক্! ইংরিজি টিংরিজি ব'লে সন্তুষ্ট করিস্। দেখিস্ মা! এবার তোকে নতুন ঘোড়া কিনে দ'ব। ওদের দেশে একখানা বাড়ি! বুঝি অল্টেরারে! মাঝে মাঝে হাওয়া না বদলালে তোদেরই শরীর খারাপ হয় বাছা।”

আমি নায়ডুর দিকে দেখিলাম। লোচন উকীলের দিকে দেখিলাম। হাসিয়া বলিলাম—“এ আবার কাল পাষাণের দেবতা কোথা থেকে আনলে?” হায় হায় তখন বুঝি বাস্তবিকই ইনি দেবতা!

কুহকিনীর মায়া! তিন দিনে ইনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন আবেগ ভরে বলিলেন—আমি তোমায় বিবাহ করিব!

বিবাহ! সুপ্তসিংহ জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাতালের উক্তি নয়, উন্মাদের উক্তি নয়। দেখিলাম এঁর চোখে নিশ্চল দৃষ্টি।

আমি বলিলাম—আমি যে বেশ্যা! আমার প্রকাশ্যে বার করতে পারবে? তোমার মা বোনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে? আমার অতীত ভুলতে পারবে?

ইনি বলিলেন—কোন লজ্জা নাই! তোমার ভিতর ধর্ম আছে! যাদের আমরা বিবাহ করি পূর্বজন্মে তা'রা কি ছিল কে জানে? ধর্ম আজ তুমি জন্মালে, অতীতটাও জন্মের কথা। মাদ্রাজে চলে যাব সেখানে নূতন জীবন নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা! তুমি যদি সাধ্বী হ'তে পার, একনিষ্ঠ হ'তে পার, আমি হাতে স্বর্গ পাব।

প্রথম একটু ঠাট্টা অথচ একটু আবেগের সহিত কথাবার্তা হইতেছিল। ক্রমশঃ দেখিলাম ইনি খুব আন্তরিক ভাবে কথা কহিতেছেন। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। যত পাপ করিয়াছি, যত কুকার্য করিয়াছি, সমস্ত বলিলাম। ইনি বলিলেন—সব জানি। আমিও অনেক পাপ করেছি। সবাই পাপ করে। পাপ করি বলিয়াই পুণ্য এত ভালবাসি। তোমার পাপ কিছু না।

আমি বলিলাম—কিন্তু বেঙ্গাকে ঘরে নিলে তোমার স্বামীর লোক কি বলবে? তোমার পিতা রাজা কি বলবেন? তুমি রাজপুত্র—

ইনি হো! হো! করিয়া হাসিলেন! বলিলেন—রাজপুত্র! রাজস্ব-শ্রমের রাজস্ব থাক্। আমি ভিজাগাশটমের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের আমলা—

মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পাই। তিন কুলে কেহ নাই। না না, তুমি আমার পত্নী হতে পার না। আমি পরিহাস—

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বলিলাম—মেটুকু প্রতিবন্ধক ছিল, সেটুকু কেটে গেল। আর আমার চিন্তা নাই। আমি আপনার পায়ে আত্মসমর্পণ করলাম। আপনি কেবল ভালবাসবেন, ঘৃণা করবেন না। আমার যা' কর্তব্য আমি করব।

স্থির হইল আমি ধর্মপত্নী হইব। কি আনন্দ! কি পুলক! কোন পর পুরুষ আমার দিকে সকাম দৃষ্টিতে চাহিলে পাপ অর্জন করিবে। আমার দিকে? এই জঘন্য মাংসপিণ্ডে একটা পবিত্রতা আসিবে। হা! ভগবন্! স্বামীর জগ্ন স্বহস্তে ভাত রাঁধিব, ঘর ধুইব, কাপড় কাচিব, বাসন মাজিব! স্বামীর জগ্ন! কথাটার যেন যাহ ছিল। আমি আনন্দে ভরিয়া উঠিলাম। তত আনন্দ যেন সেই বিলাসের মধ্যে কোনও দিন পাই নাই।

‘তাহার পর ছোট কথা! হিন্দু সমাজ আমার লইবে না। লোচন বাবুর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিলাম। তিনি উৎসাহ দিলেন। তিনি সংবাদ লইলেন। ব্রাহ্মসমাজ কুঠাবোধ করিল। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা! বৃথা দস্ত! উদার খৃষ্ট ধর্ম আমাদের গ্রহণ করিতে চাহিল। ইসলামও বাহু প্রসার করিল। কিন্তু আমরা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলাম। বীণ্ড খৃষ্টকেও ভজনা করি—হিন্দু ধর্মের আদর্শের কাছেও মাথা হেঁট করি। সীতা দময়ন্তীর আদর্শ মাতা মেরীর আদর্শে মিলাইয়া এক নূতন ধর্ম সৃজন করিয়াছি। কিন্তু আমি স্ত্রী! গৃহস্থের স্ত্রী! বাড়ী হইতে পলাইয়া ইহাঁর পদসেবা করিতেছি সাত বৎসর। কেহ জানে না আমি কোথায় আছি। এখন জানিলেও ভয় নাই। আজ আমার মা ধরিতে আসিলে সেই দাসীর মত জ্যোতি দেখিবে। স্বামীর রক্ষন করি, কাপড় কাচি, বাসন মাজি, গৃহ পরিষ্কার করি, তবু সুখে আছি, শান্তিতে আছি, গর্বে আছি।

ক্ষমা করিবেন। আমি উঠি। কি বলছেন? আমি দেবী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও কথা বলবেন না। আমি ছিলাম পাপী কিন্তু এখন আমি ধর্মপত্নী! গরীব গৃহস্থের বৌ! এই আমার যথেষ্ট উন্নতি! এই আমার যথেষ্ট অভিব্যক্তি! আচ্ছা নমস্কার।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী ।*

[শ্রীশরচ্ছত্র ঘোষাল, সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ এম্-এ, বি-এল্ ।]

কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরীতে অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে । এই সকল পুঁথি আলোচনা করিলে প্রাচীনকালে কোচবিহার রাজ্যে সাহিত্য-চর্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । এ পুঁথিগুলির মধ্যে অধিকাংশই কোচ-বিহার লেখক কর্তৃক রচিত । একটি বিশেষ জনপদের, প্রাচীন সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছিল, সেই সাহিত্যের সহিত সমসাময়িক বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, সাহিত্য হিসাবে এই সকল গ্রন্থগুলি কোন্ শ্রেণীর ও তাহার রচয়িতা পণ্ডিতমণ্ডলীই বা কতটা বাহিরের ভাব গ্রহণ ও বাহিরের সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন, এই সকল প্রশ্নের সমাধান এই পুঁথিগুলি পাঠ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে যাহারা প্রবৃত্ত, তাঁহাদের এই সকল পুঁথি পাঠ অপরিহার্য । প্রত্যেক পুঁথিতেই রচয়িতার নাম ভণিতায় পাওয়া যায় । অধিকাংশ বাঙ্গালা পুঁথি রাজ-আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল । রচয়িতা গ্রন্থে সেই রাজার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । কতকগুলি গ্রন্থে রচনা কালও প্রদত্ত হইয়াছে । এই সকল সন তারিখ দ্বারা ইতিহাসে স্বীকৃত কোচবিহার রাজগণের প্রাদুর্ভাবকাল যাচাই করা যাইতে পারে । কোনও কোনও পুঁথিতে তৎকালীন কোচবিহার নগরের বর্ণনা, বা সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পুঁথিগুলির প্রয়োজনীয়তা যে অল্প নহে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

পুঁথিগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে ; সংস্কৃত পুঁথি, আসামী পুঁথি ও বাঙ্গালা পুঁথি । সংস্কৃত পুঁথিগুলি সবই রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণাদির অংশবিশেষের নকল । এ সকল গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং পুঁথি হিসাবে এই গ্রন্থগুলির মূল্য তত অধিক নহে । তবে একটা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আছে বলিয়া মনে হয় । অনেকেই

* কোচবিহার সাহিত্য-সভার ১লা অধিবেশন ১৯২৩ তারিখের অধিবেশনে গঠিত ।

জানেন আজ পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির প্রত্যেক শ্লোকের প্রকৃত পাঠ নির্ধারণ হয় নাই। এক এক পুঁথিতে এক এক রকম পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে পাঁচ সাতখানি পুঁথি মিলাইয়াও আশানুরূপ সঙ্গত অর্থ করিতে পারা যায় না। এই সকল স্থলে কোচবিহারের পুঁথিগুলির পাঠ কি ও এই পাঠের দ্বারা মূল গ্রন্থের সঙ্গত অর্থবোধে কোনও সহায়তা হয় কি না, তাহা নিপুণভাবে আলোচনা করা উচিত।

আসামী পুঁথিগুলি প্রায় ভক্তিরসাম্প্রিত বৈষ্ণবগ্রন্থ। পূর্বাঞ্চলের রাজা-গণের অত্যাচারে শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদর নামক বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকগণ কোচবিহার রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ 'মহাপুরুষিয়া' নামক বৈষ্ণবমত শঙ্করদেবই প্রথম প্রবর্তন করেন। কোচবিহারের তদানীন্তন রাজা নরনারায়ণ ইহাকে আশ্রয় দেন। মধুপুর ও দামোদরপুরের ধাম এখনও ঐ সমস্ত বৈষ্ণব প্রচারকগণের কীর্তি বোষণা করিতেছে।

এই সময় হইতে বৈষ্ণবমত কোচবিহারে প্রসার লাভ করিতে থাকে। বিভিন্ন ধামগুলিতে ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়মিতরূপে পঠিত হইতে থাকে। বৈষ্ণব ভক্তগণও নিজেদের গৃহে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল রাখিতে আরম্ভ করেন। শঙ্করদেব আসাম হইতে এ দেশে আগমন করেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি মিশ্রিত আসামী ভাষায় রচিত। পরে তাঁহার পদানুবর্তী অত্যাচারী বৈষ্ণব লেখকগণও ঐ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। এইরূপে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় কোচবিহার হইতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। আসামে মুদ্রিত বহু গ্রন্থ হইতে উহা সংকলন করিতে হইবে। তবে যে কয়েকখানি পুঁথি এখানে আছে, তাহা হইতে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

টেটু লাইব্রেরীতে ও মধুপুরধামে যে সকল প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত আছে, তাঁহার অধিকাংশই আসামে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সূত্রাং পাঠান্তরের তুলনা ভিন্ন এ পুঁথিগুলিরও অত্র কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

সংস্কৃত ও আসামী পুঁথিগুলি অপেক্ষা এখানকার বাঙ্গালা পুঁথিগুলির মূল্য অধিক। সংস্কৃত ও আসামী পুঁথির তুলনায় বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যাও অধিক। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সমগ্র ভারতে আদৃত ও তাহাদের পুঁথি বিভিন্ন দেশে বিক্রি হইয়াছে। কাজেই সেগুলি অনেক পূর্বেই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। বহু দেশে বহু প্রকারের সংস্করণও হইয়াছে। আসামী পুঁথিগুলিও আসামপ্রদেশবাসীর চেষ্টায়

মুদ্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ এই গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ রূপে পরিগণিত হওয়ায় এতদুর্ন্যাবলম্বী জনগণ সাগ্রহে এগুলিকে মুদ্রিত করাইয়াছেন, বাঙ্গালা পুঁথিগুলির কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় নাই। কারণ বাঙ্গালা পুঁথিগুলি প্রায় সকলই কোচবিহার বাসীর লিখিত। স্থানীয় রাজসাহায্য বা জনসাধারণের উৎসাহ ব্যতিরেকে এগুলির মুদ্রাঙ্কণ সম্ভব নহে। বাহিরের লোকে এ সব গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া মুদ্রিত করাইবে সে আশাও করিতে পারা যায় না।

অথচ এই সকল পুঁথি রচয়িতাদের মধ্যে কোচবিহারের অধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ একজন। কোচবিহারের রাজাদের মধ্যে আর কাহারও রচিত গ্রন্থ আমরা পাই নাই, তবে অত্র অত্র রাজাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পুঁথি বিশেষে দৃষ্ট হয়। রিপুঞ্জয় দাস ও গোবরাছড়া নিবাসী বিদ্যারত্ন উপাধিধারী কোনও ব্রাহ্মণ রচিত “মহারাজ বংশাবলী” নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে মহারাজ নরনারায়ণের “স্বকৃত মল্লদেবী নামে অভিধান” ছিল। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ উহা প্রকাশ করেন। ছুঃখের বিষয় ঐ মল্লদেবী অভিধান এক্ষণে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে বর্ণিত পুঁথির বচনমাত্রে নির্ভর করিয়া উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে হইতেছে। আবুল ফজল স্বরচিত ‘আকবর-নামা’য় লিখিয়াছেন যে মল্লদেব আকবর বাদসাহের প্রশংসাসূচক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও এককালে মহারাজ নরনারায়ণের আর একখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। কতকগুলি ষ্টেট লাইব্রেরীতে ও কতকগুলি কোচবিহার দ্বার আফিসে রক্ষিত আছে। এই সকল গ্রন্থের ভণিতায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোট নয়খানি গ্রন্থে হরেন্দ্রনারায়ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত একটি ধণ্ড কবিতা ও কয়েকটি সঙ্গীত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভণিতায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম থাকিলেই যে গ্রন্থগুলি হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত তাহার প্রমাণ কি? অর্থপ্রদান রাজা মহারাজা অত্র ব্যক্তি দ্বারাও ত গ্রন্থ লিখাইয়া লইতে পারেন। আপত্তিটা যে একেবারে অসঙ্গত তাহা আমরা বলি না। যে দেশের প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে “ত্রীর্ষাদেধৈবকাদীনামিব ধনম্” অর্থাৎ “ধাবক” নামে

কবি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীহর্ষের নিকট অর্থ পাইয়াছিলেন” এই কথা দেখিতে পাই ও যে দেশে এই কথার অর্থ করা হয় “মহারাজ শ্রীহর্ষ অর্থ দ্বারা অপর কবিকে দিয়া রত্নাবলী প্রভৃতি নাটিকা লিখাইয়া নিজ নামে প্রকাশ করেন” সে দেশে এ আপত্তি ওঠা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘মহাভারত’ স্যর রাধাকান্ত দেবের ‘শককল্লক্রম’ প্রভৃতি রচনার ইতিহাস যখন অনেকেরই সুবিদিত, তখন এই আপত্তির পোষক কোন প্রমাণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা মন্দ নহে।

জয়নাথ ঘোষ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক ও মহারাজের মুনসী ছিলেন। তিনি “রাজোপাখ্যান” * নামক কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়া মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে শ্রবণ করাইয়া পঞ্চগ্রাম পুরস্কার লাভ করেন। জয়নাথ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং এই হেতু তাঁহার গ্রন্থের ঐ অংশকে ‘প্রত্যক্ষ খণ্ড’ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বর্ণিত কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। অবশ্য স্থলে স্থলে অতিরঞ্জন-দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের অন্ততঃ ‘প্রত্যক্ষ খণ্ডের’ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

জয়নাথ মুনসী লিখিয়াছেন “ভূপতির তখন হইতে কবিতা-শক্তি। সংস্কৃত পুস্তক সকল ভাঙ্গিয়া ভাষাপদ করিতেন এবং নানা প্রকার গান সকল তাল মান রাগ রাগিনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন”। (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়)

ইহাতে স্পষ্টই উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে গ্রন্থ রচনা করিতেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি খাসনবীশ কাশীনাথ লাহিড়ীর মৃত্যুর পর বিশেষ ক্ষুণ্ণ লাভ করিয়াছিল এবং তিনি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ সকল বাঙ্গালা পণ্ডে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ লাহিড়ীর মৃত্যু হয়। ইহার পর হইতেই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির অনুবাদে প্রদৃত হন, জয়নাথ এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ রচনা সম্ভব ছিল

* এই গ্রন্থের একমাত্র পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখায় রক্ষিত আছে। ঐ পুঁথি নকল (যাহা কোচবিহার সাহিত্য-সভা সংগ্রহ করিয়াছেন) হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্ । মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল, যৌবনেই বা তিনি কিরূপ ভাবে কাল যাপন করিতেস তাহা এ প্রসঙ্গে জানা আবশ্যিক । যদি আমরা দেখিতে পাই, গ্রন্থ-রচনার যে জ্ঞান, যে শিক্ষা লাভ আবশ্যিক ও যে চর্চা, যে অবসর প্রয়োজন, তাহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ঘটিবার সম্ভাবনা কোন কালে ছিল না, তাহা হইলে বরং আমাদের মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যখন গ্রন্থ-রচনার উপযোগী জ্ঞানলাভ করেন নাই এবং গ্রন্থ-রচনার অবসরও পান নাই, তখন তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি কখনও তাঁহার লিখিত হইতে পারে না । কিন্তু তাঁহার বাল্য-শিক্ষার কথা জয়নাথ স্পষ্টই লিখিয়াছেন “শ্রীশ্রীমহারাজার পার্সীতে, বাঙ্গলা ও অগ্নাগ্র শিক্ষার্থে সাহেব অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন । অষ্টাহের দিবস মহারাজার যাহা শিক্ষা হইত তাহার পরীক্ষা দিতেন । তিন মাসান্তর অক্ষর দেখার নিমিত্ত পার্সী ও বাঙ্গলা লিখিত গবর্গর কৌন্সিলে প্রেরিত হইত । পার্সী পড়ার কারণ মৌলভী মেহের আলি লিখনের কারণ লাল স্বরূপ সিংহ খাসনবীশ নূতন প্রবৃত্ত হইল । আর অল্পদিবসেই নানা বিদ্যাতে অভ্যাস হইতে লাগিল ।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়) ।

শুধু তাহাই নহে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ পার্সী ও বাঙ্গলা' কিরূপ দ্রুত লিখিতেন ও তাঁহার হস্তাক্ষর কত সুন্দর হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও জয়নাথের গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায় । জয়নাথ বলেন—“শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর হইয়াই পার্সীতে বাঙ্গালাতে সচ্ছন্দ আর খোসখৎ অক্ষর হইল । সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন । বরং পার্সীতে এমন খোসনবীশ লেখক সন্নিবৃত্ত নাই ।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৮ম অধ্যায়) ।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কৈশোরে ও বাল্যে হরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল ও সে ব্যবস্থা যে নিষ্ফল হইয়াছিল, জয়নাথের কথা বিশ্বাস করিলে তাহা বলিতে পারা যায় না । ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত পত্র-ব্যবহারে হরেন্দ্রনারায়ণ যে দৃঢ়চিত্ততা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । এ জ্ঞান, এ নৈগুণ্য আশিক্ষিতের হইতে পারে না ।

• গ্রন্থরচনা করিবার অবসরও তাঁহার যথেষ্ট ছিল । শৈশবে বহু বিপজ্জালে জড়িত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু বাল্যে সে

অনুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে তাঁহার মানসিক উদ্বেগজনক বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে ঘটনাগুলি তাঁহার সমস্ত সময় অধিকৃত করিতে পারে নাই। তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতদের গ্রন্থে হরেন্দ্রনারায়ণের পূজাৰ্চনা, ক্রীড়া, বিহার, বসন্ত-উৎসবের আমোদ-প্রমোদের বৈকল্প চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে রাজা যে কেবল রাজ্য-চিন্তাতেই দিবস ঋাত্রি যাপন করিতেন তাহা বোধ হয় না। পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা যে প্রায়ই কালযাপন করিতেন তাহার পরিচয়ও পুঁথিবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণের পুত্র ব্রজসুন্দর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'হিতোপদেশে'র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইনি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সম-সাময়িক ছিলেন। উক্ত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের শেষে ইনি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ, অন্তঃপুর, উদ্যানাদি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মহারাজ কি কি করেন তাহাও জানাইয়াছেন। উক্ত অংশ অতীব দীর্ঘ। কতিপয় পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

কমতা নামত নানাস্ত গুণধাম ।
 ভূতলে অতুল দেশ মহেন্দ্র-বিশ্রাম ॥
 সেই দেশে ভূপবেশে বিহারিতে হর ।
 নির্মাণ করিছে এক অপূর্ব নগর ।
 বিহার তাহার নাম গুণের সাগর ।
 তাহার স্বরূপ বলি অবধান কর ।
 পূর্বে ও পশ্চিমে তোরসস তরঙ্গিনী ।
 যেন মন্ডাকিনী মন আনন্দ-দাগিনী ॥
 তার মাঝে বিরাজে প্রাচীর চারিপাশে ।
 যেন বেত কাঞ্চিনী অথরে প্রকাশে ॥
 সেই তোরসস তরঙ্গিনী করি সীমা ।
 আবাসের উত্তর দক্ষিণে অমুগমা ॥
 কুত্রম তটিনী দুই আছে সুগভীর ।
 বিনা তরী না পারি তাঁরিতে, যার নীর ॥
 নগর সমুখে ক্রয় বিক্রয়ের স্থান ।
 সর্বাঙ্গরূপে তাত করে অধিষ্ঠান ॥
 ত্রিতীয় অঙ্গনে সৌধ সদনের মাঝে ।
 মদনমোহন দেখ সজীক বিরাজে ॥

অঙ্গন পশ্চিমে শোভা করে নৃপতির ।
 সুমেরু শিখর তুঙ্গ রঙ্গিন মন্দির ॥
 সেই মন্দিরের মাঝে রৌপ্যসিংহাসন ।
 সতত বিরাজে নব ভূবার কিরণ ॥
 সেই রঙ্গমন্দিরের উত্তর পশ্চাত ।
 আছেন রুচির এক প্রাচীর উচ্চাত ॥
 প্রাচীরের তলে পথ আছে মনোহর ।
 সেই পথে যাতায়াত করে যত নর ॥
 অঙ্গনস্থ ধরি দ্বারপাল বীরগণে ।
 সেই দ্বার রক্ষা করে সাবধান মনে ॥
 তাহার পশ্চিমে আছে তৃতীয় অঙ্গন ।
 অঙ্গনের উত্তর দক্ষিণে সুশোভন ॥
 দেবালয় সম দুই আলয় সুন্দর ।
 অঙ্গন পশ্চিমে আছে প্রাসাদ-প্রবর ॥
 পদা সুমধুর মন্দ মারুতের গতি ।
 নিদ্রা সময় তাত বিরাজে নৃপতি ॥
 তাহার দক্ষিণে আছে চতুর্থ অঙ্গন ।
 তাহাতে বহু সৌধসম গৃহগণ ॥

পূরমাঝে বিরাজে প্রাসাদবহুতর ।
 দক্ষিণে প্রাচীর উত্তরে সরোবর ॥
 কিবা পুরী নির্মাইছে নৃপতি কেশরী ।
 বিরাজে তাহার মাঝে রাজরাষ্ট্রেশ্বরী ॥
 ধরাপতি তারিণীচরণ করি ধ্যান ।
 নিত্য হোম করে নিত্য নেয় বলিদান ॥
 তারিণীর ভবন পশ্চিমে মনোহর ।
 ব্যায়াম মন্দির এক আছে মন্দর ॥
 বিশ্বাসভাজন পোষ্য মঙ্গলগণ সনে ।
 মল্লশ্রম করে তথি নৃপ পঞ্চাননে ॥
 তাহার পশ্চিমে আছে বিচিত্র অঙ্গন ।
 সুদা বিকসিত তাহে কুসুম-কানন ॥
 কাননের পূর্বদিশে ব্যায়াম-মন্দির ।
 আর তিন দিশে আছে কচির প্রাচীর ॥

দক্ষিণ প্রাচীরে সিংহদ্বার মনোহর ।
 ভূতলে অতুল নাহি তুলনা অপর ॥
 উদ্যানের মাঝে শোভে উচ্চ মঞ্চস্থান ।
 নন্দন উদ্যানে যেন পুষ্পক-বিমান ॥
 কার-বিনির্মিত চারু মঞ্চ মনোহর ।
 আশ্রয়া বিরাজে যেন কাকন-শিখর ॥
 তাহার উপরে বিহারের মহীপাল ।
 সঙ্কন-পালন পিতা দুর্জনের কাল ॥
 বিরাজ করেন সঙ্গে লইয়া সমাজ ।
 তারাগণ সনে যেন পূর্ণ বিজয়াজ ॥
 মহারাজ বিলাসমঞ্চের সন্নিহিত ।
 পশ্চিম দিশেত চারু প্রাচীরে আবৃত ॥
 অস্তঃপুর বর্ণয়িতে শক্তি আছে কার ।
 থাকুক মনুষ্য, দৃশ্য নহে দেবতার ॥”

এই সকল পংক্তি হইতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজপ্রাসাদের এক-
 খানি নক্সা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে । ইহার মধ্যে যে রঙ্গমন্দির, পুষ্প-
 কানন মধ্যে মঞ্চ প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার
 কোন কোন গ্রন্থে ঐ সকল স্থলে বসিয়া সেই সেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন লিখি-
 যাছেন । হরেন্দ্রনারায়ণ মহাভারতের ঐষিকপর্বের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ
 করিয়াছেন । এই গ্রন্থের শেষে আছে—

“আধিন মাসত শুরু দ্বাদশীদিনত ।
 প্রহর মধ্যত শনীহৃত বাসরত ॥
 পুস্তক সমাপ্ত চারু কুসুম-কাননে ।
 সরোবর তীরে মন্ত্রশালা স্থশোভনে ॥”

অন্য কোনও পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করিলে এরূপ ভাবে প্রাসাদের মধ্যবর্তী
 পুষ্পোদ্যানমধ্যে মন্ত্রশালায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইল এ কথা লিখিতেন না । এতদূর
 মিথ্যা সৃষ্টি করিবার কোনও প্রয়োজনও তাঁহার থাকিবার সম্ভাবনা নাই ।

[ক্রমশঃ ।

বাঙ্গালার পল্লীগ্ৰাম ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

পল্লীগ্ৰামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে বাঙ্গালী সসন্মানে জীবিকা-উপার্জন করিতে পারে, এ সত্য মহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন বুঝিয়াছে যে, কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজের দ্বারে দ্বারে চাকুরি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে কোন প্রকারে ধ্বংসের কবল হইতে স্বদেশের রক্ষা নাই। পল্লীজীবন জাতীয় জীবনের ভিত্তি, পল্লীসমাজ বাঙ্গালী সমাজের প্রাণ। সমাজদেহে বলসঞ্চার করিতে হইলে পল্লীজীবন উন্নত করিতে হইবে, পল্লীসমাজে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সহরে ছত্রিশ জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য প্রথায় সভাসমিতি করিয়া চক্কানিনাদ করিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। আমরা কি চাহি তাহা আমরা বুঝিয়াছি। কেবল সেই আদর্শ লাভ করিবার শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব আমাদেরকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। সেই কর্মশীলতা ও সামর্থ্য বাহাতে বাড়িতে পারে, তজ্জন্ত আমাদের জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

দেশ প্রথম চাহে শিক্ষা। মুখস্থ বিদ্যা নয়, তর্ক করিবার জন্ত মহাজনের বাক্য আবৃত্তির ক্ষমতা নয়—প্রকৃত জ্ঞান, আসল শিক্ষা—বাহার বলে আমাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয়, আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বাড়ে, যে বিদ্যায় আমরা সকল বিষয়ে অত্রান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারি, যে শিক্ষার বলে আমরা প্রতি পদে গ্রামপথে চলিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সময় ছাত্রদের মনে দেশের প্রকৃত উন্নতির কামনা থাকে। তাহাদের মনে যখন আদর্শ গঠন হয়, তখন তাহারা যদি সে আদর্শের মধ্যে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীর মূর্তি না দেখিতে শিখে তাহা হইলে অনেক কষ্টের লাভ হয়। যে আদর্শ সহজলব্ধ, যে আদর্শ দেশের অভাব মোচন হয়, ছাত্রেরা সে আদর্শের চিত্র দেখে না। বি-এ পাশ করিয়া নিজের জন্মভূমি পল্লীগ্ৰামে বসিয়া সম্মান লাভ করিব, চাষাভূষাকে বিদ্যাদান করিব, তাহাদের উচ্চজীবনের পথ দেখাইব, দেশের অনশিল্লীদের নূতন পথ দেখাইব, তাহাদের সহিত নিলিয়া কর্ম করিয়া আমাদেরও জীবিকার উপায় করিব তাহাদেরও উন্নত করিব—এ সকল স্বপ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মোটে দেখে না। ডেপুটি হইব, হাকিম হইব, বড় প্রফেসর হইব, উকীল হইব, এইসব জল্পনা কল্পনা করিয়াই মনের মধ্যে তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা চিত্র আঁকিয়া

রাখে । যখন দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক সাধ্য-সাধনা, তোষামোদ, উৎসাহিত্তি করিয়াও তাহারা দাসত্ব করিবার অধিকার পায় না, ওকালতির গাউন পরিয়াই সার রাসবিহারী হইতে পারে না, তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া ভাবে যে তাহাদের জীবনের মধু ফুরাইয়াছে, তাহারা নিরাশ অন্তরে অলস হইয়া সহরে বসিয়া নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করে । জীবন নিষ্ফল হয়, দেশের শক্তির হ্রাস হয়, স্বদেশের ভবিষ্যৎ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করে ।

দেশের ছেলেদের শিক্ষার সময় তাহাদের মনে যে সকল আদর্শের সৃষ্টি হয় সেই সকল আদর্শের মধ্যে পল্লীগামে বাস করিব, নিজের গ্রামে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিব এ আদর্শ বদ্ধিত হইলে ছাত্রেরা পরে হতাশাস হইয়া না । উচ্চ আশার পূরণ হইলেই মানুষ সুখী হয় । প্রাণে অসম্ভব আশা পুষিলে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয় । ভবিষ্যতে পল্লীগামে বসিয়া দেশের উন্নতি করিব—এ আশা সামান্য মনে হয় । কিন্তু বাস্তবিক এ আশা সফল করিতে হইলে যত শক্তি, যত কর্মনীতির আবশ্যিক তাহা একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় ।

[ক্রমশঃ ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

স্বাস্থ্য-নীতি—‘স্বাস্থ্য-সমাচার’র সম্পাদক, প্রসিদ্ধ ডাক্তার ঐযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বসু এন-বি মহাশয় ‘স্বাস্থ্য-সমাচার’ হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়া ‘স্বাস্থ্য-সমাচার-পুস্তকাবলী’ সম্পাদন করিতেছেন । এই পুস্তকাবলীর—১ম ও ২য় সংখ্যার নাম ‘স্বাস্থ্য-নীতি—‘ব্যক্তিগত’ ও ‘গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-নীতি’ এবং দুই সংখ্যার মূল্য যথাক্রমে ৮০ ও ৮০ মাত্র ।

যাহারা ‘স্বাস্থ্য-সমাচার’র নিয়মিত পাঠক তাহারা এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সহিত বিশেষ পরিচিত । প্রাজ্ঞল ভাষায় এই ‘স্বাস্থ্য-নীতি’ প্রকাশ করিয়া ডাক্তার বসু মহাশয় দেশের অশেষ উপকারসাধন করিতেছেন । সামান্য শিশু পর্যন্ত এই নীতির বিধানগুলি শিক্ষকের বিনা সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । অসার রাবিশ উপন্যাস-গল্প প্রভৃতির যুগে, আমাদের রোগজীর্ণ দেশে এইরূপ পুস্তকাবলীর প্রকাশ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । উচ্চ, মধ্য ও লোয়ার আইমারি-বিদ্যালয় সমূহের কতৃপক্ষগণ এই পুস্তকগুলি বালকদের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সাধু অনুষ্ঠানে সহায়তা করুন ইহা আমাদের অনুরোধ । তাহা না করিলে এবং এই পুস্তকাবলী—‘গৃহ-পঞ্জী’র-স্তায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিক্রয় না করিলে বুকিব বাঙ্গালী এখনও গুণেব আদর করিতে শিখে নাই ।

প্রথম সংখ্যায়—প্রাতঃক্রিয়া, স্নান, আহার, জলপান, পরিধান, পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম

ও নিছা এবং সংঘর্ষ এই কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সংখ্যার বিষয়গুলি—
গৃহ, বায়ু, জল, খাদ্য ও রোগ। চিকিৎসা শাস্ত্র ভিত্তি করিয়া সম্পাদক মহাশয় স্বীয়
পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় এই অকাট্য বিধানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণে ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে প্রতিবৎসর শত শত লোক
কালকবলিত হইতেছে। এখং জলের বিশুদ্ধি-রক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে আমরা কতটা
অমনোযোগী, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশিত 'জল' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্নোক্ত অংশটুকু পাঠ
করিয়া পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন—

লোকের অজ্ঞতার জন্ত নানারূপ মলসংযুক্ত হইয়া জল যেমন দূষিত হয়, সেই প্রকার
প্রশ্রাব দ্বারাও তদনেকা অধিক দূষিত হইয়া থাকে। প্রশ্রাবের স্থানে যে সকল বিষবৎ বস্তু
সঞ্চিত থাকে তাহাও বর্ষার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলাশয়ে পড়ে। তাহাতেও জল
অত্যন্ত দূষিত হয়।

জলে প্রশ্রাব করিলে জঘন্য প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়, এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া
অনেকে জলে প্রশ্রাব করিয়া জলকে দূষিত করেন। স্নানাদি কালে অনেকে পুকুরের কিঞ্চিৎ
উপরে জলের একপার্শ্বে প্রশ্রাব করিয়া থাকেন। আর এই মূত্র গড়াইয়া জলের সহিত
মিশ্রিয়া যায়। নিজে মূত্রত্যাগ করিয়া বা স্বচক্ষে অশ্রুকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াও কেহ
সাবধান করেন না বা হন না।

কোন কার্যের জন্ত জলে নামিলে বা ঘাটে হাত পা প্রভৃতি ধুইতে গেলে শৈত্য লাগিয়া
অনেক সময় প্রশ্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এরূপ স্থলে জলের নিকটে কোন স্থানে প্রশ্রাব করি
হয়। শিশুরা কিংবা শযামূত্র ও অশ্রু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বিছানা বা কাপড়ে প্রশ্রাব করিলে
তাহা পুঙ্করিণীতে ধুইলেও জল দূষিত হয়। শিশুদিগকে প্রশ্রাব না করাইয়া স্নান করাইতে
লইয়া গেলে তাহারাও জলে প্রশ্রাব করিয়া জল দূষিত করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্ত আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই পুঙ্করিণীতে
নামিয়া প্রশ্রাব করিয়া থাকেন। তাহারা এতই অজ্ঞানাক্ষ যে, এই মূত্রদূষিত জল ব্যবহার
করিলে যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাহা আদৌ মনে করেন না। তাহারা জলকে নারায়ণ বলিয়া
জানেন বটে, তথাপি প্রায়ই তাহারা ঘাটের জলে প্রশ্রাব করিয়া থাকেন। ঘাটের যেখানে
প্রশ্রাব করেন তাহারই নিকট হইতে খট বা কলসপূর্ণ করিয়া ব্যবহারের জন্য জল আনিয়া
থাকেন। এই মূত্রের অধিক বা অল্পাংশ যে জলের সহিত অবশ্যই মিশ্রিয়া আসে, তাহা স্বচক্ষে
দেখিয়াও অজ্ঞতা জন্ত সে দোষ অনুভব করিতে পারেন না। তাহারা এই দূষিত অম্পৃশ্য
বিষবৎ জল দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করেন এবং স্নেহাস্পদ সন্তান ও গুরুজনদিগকে তাহা খাইতে
দিয়া থাকেন। অধিক কি নিজেরাও পান করিতে যুগা বোধ করেন না। অনেক সময় ঐরূপ
জল দ্বারা পবিত্র দেবার্চনা করিতেও তাহাদের মনে যত্ন, সঙ্কোচ বা পাপ বোধ হয় না। এ-
রূপ বিষবৎ জলপানে অভ্যাস বশতঃ কত যে শিশুর প্রাণ নষ্ট হয় তাহার আর সংখ্যা করা যায়
না। যে জলাশয়ের জল কম, এই সকল দোষে তাহার জল অতি শীঘ্র মারাত্মক হইয়া থাকে।
যে জল সর্বদাই বহু থাকে তাহাতে এ সকল দোষ অতি গুরুতররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রস্রাব যেমন অপকারী ঘর্মও তেমনই অপকারী। শরীরের ক্ষয় প্রাপ্ত ও অসার অংশ যেমন প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয় সেইরূপ ঘামের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এজন্য ঘাম লাগিলেই, শরীরে ও কাপড়ে দুর্গন্ধ হয় এবং ঘানের পর জল দূষিত হইয়া থাকে। জলে নামিয়া স্নান করিলে, শরীরের ঘর্ম ও ময়লা এবং কাপড়ের ময়লা জলের সহিত মিশিয়া জলকে দূষিত করে। ধোপারা ময়লা কাপড় জলে কাচিয়া জল খারাপ করে। পণ্ডপক্ষীদিগকে জলে নামাইয়া স্নান করাইলে তাহাদের গাত্রমল দ্বারা জল দূষিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি—চাউন, ডাল, তরিতরকারি ও মৎস্য মাংসাদি পাক ও ভোজনপাত্র সকল পুষ্করিণীর জলে ধোত করাতে এবং অল্প নানাপ্রকারে জল দূষিত হয়।

অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার আছে যে, জলে মরা মানুষ ফেলিয়া দিলে তাহার মঙ্গলতি হয়। এই সংস্কারের জন্ত নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ প্রভৃতির জলে প্রায়ই মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই জন্ত জল দূষিত হয়। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা প্রসবের পর ফুল ও রক্ত ইত্যাদি ঘটে পুরিয়া জলে ফেলিয়া দেয়, ক্রমে তাহা পচিয়া জলে মিশ্রিত হওয়ার জন্য জল খারাপ হয়। পশুদির মৃতদেহও অনেক সময় জলে ফেলিয়া দেওয়ার জন্ত জল দূষিত হয়। কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে ঘায়ের পূঁজ ও রক্ত বিড়ালে শুঁকিলে যা দূষিত হয় ও সহজে শুকায় না। এজন্য তাহার পূঁজ ও রক্ত মাথা নেকড়াগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া জল দূষিত করেন।

রক্ত মাথা কাপড়, পুঁষভরা কাপড়, পিকনান, কফযুক্ত কাপড়, গোবর-ছড়ার হাঁড়ি ইত্যাদি এবং ময়লা হাত পা ধোত করার জন্ত জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা সকল প্রকার ময়লা দ্রব্যাদি ঘাটে লইয়া ধুইয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যাদির যে যে অংশ জলের সহিত মিলিত হয় তাহাই ক্রমে পচিয়া উঠে এবং জলকে খারাপ করে।

প্রায়ই গ্রামবাসী লোকদিগকে প্রত্যহ পুষ্করিণীতে যাইয়া মুখ ধুইতে দেখা যায়। তাহার মুখ প্রক্ষালন কালে নেত্রমল, দন্তমল, জিহ্বার মল, কক ও খুতু প্রভৃতি জলে নিক্ষেপ করিয়া জল দূষিত করিয়া থাকেন।

নিমগ্ন উপলক্ষে অনেক লোকের একত্রে আহাৰ হইয়, অহ রাত্রে তাহার প্রায় সকলেই ঘাটে গিয়া আচমন করেন। ইহা দ্বারা জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হয়।

আমরা যে ঘাটের জল পাই সেই ঘাটের জলেই রোজ রোজ খুতু ফেলিয়া থাকি। পোয়াল ঘর পরিকার করিয়া, ঘর নিকাঠিয়া, বা ঘুটের দেড়ি দিয়া আমরা ঘাটে গিয়া হাত পা প্রভৃতি পরিকার করি এবং মল ত্যাগ করিয়া অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া থাকি। ইহা কি কম লজ্জার কথা? যে জল আমরা পান করিব সেই জলেই পশুশিষ্ঠা ও মনুষ্য বিষ্ঠার সংযোগ।

বোকনো, কড়া, হাতা, বেড়ি ইত্যাদি রন্ধনের পাত্র, ভোজনপাত্র ও তৈজনপাত্রাদি প্রথমতঃ ঘাটে ভিজান হয় পরে এই সকল দ্রব্য ঘাটেই মাজা ও ধোয়া হইয়া থাকে। তৎপরে তাহাদের অংশ ডাউলের অংশ, তরকারী ও মৎস্য ইত্যাদির টুকরা জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, ক্রমে তাহা জলমধ্যে পচিয়া জল দূষিত করে। আর আহাৰান্তে যে উচ্ছিষ্টাংশ পুষ্করিণীর পাড়ে ফেলা হয় কালে তাহা বৃষ্টির জলের সহিত পুষ্করিণী মধ্যে নীত হয় এবং বহু পচিতে থাকে, ততই জল খারাপ হয়।

মৎস্য ও মাংস জলে ধুইলে ঐ সকল খাদ্য জ্বোর অনেক অংশ জলে মিশিয়া পচিতে থাকে। বিবিধ চর্ম রোগ (খোস পাঁচড়া) ও সংক্রামক (কলম্ব) রোগের পূঁজ সামুড়ি ইত্যাদি অনেক ঘাটের জলে ধুইয়া থাকেন। কখন কখন বস্ত্রলগ্ন বড় বড় ঘাঘের পূঁজ রক্তাদি ঘাটেই প্রকাশিত হয়। মৎস্য এবং মাংসের তান্ত অংশ এবং ভক্ষণের পর তাহাদের কাটা, হাড় ও চর্বিভ পরিত্যক্ত অংশ সকল জলেই ফেলা হয়।

অনেক স্থানে মনুষ্য, গরু ও অন্যান্য মৃত প্রাণীর দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রাণীর দেহ ক্রমশঃ পচিয়া জলকে দূষিত করে।

পুকরিণীর পাড়ের বড় বড় গাছ সকলের জীর্ণ পত্রাদি জলে পড়ে এবং পচিয়া জল দূষিত করে। ভাল, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষই পুকরিণীর ধারে ধারে লাগাইবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত। ইহাদের দ্বারা জল কোনরূপ দূষিত হয় না। কিন্তু সাধারণের স্বভাৱ হেতু নানা প্রকারের বৃক্ষলতাাদি পুকরিণীর পাড়েই জন্মিয়া জলকে পরিণত হয় ও তাহাদের গলিত পত্রাদি দ্বারা সর্বদা জল দূষিত হয়। সময় সময় জল এত ঘন হয় যে সূর্যরশ্মি পর্য্যন্ত পুকরিণীতে পড়িতে পারে না। কাজেই জলাশয়ের উপর উপযুক্ত রৌদ্র ও বাতাস খেলিতে না পাওয়ার জল দূষিত হয় এবং স্বাভাবিক উপায়েও বিশোধিত হইতে পারে না।

পাট ও শন পচাইবার জন্য আজ কাল বঙ্গদেশের সর্বত্র জন ধারণ হইতেছে। পাটের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ার কৃষকেরা ধান ও অন্যান্য চাষ পরিত্যাপ করিয়া কেবলই পাট ও শনের চাষ আবাদ করিতেছে।

এই সকল পাট পাকিবার পর, কাটিয়া জলে পচাইতে হয়। এই পাট গাছ হালুকা বলিষ্ঠ তাহার সহিত বড় বড় মাটির চাপড়া বাকিয়া পুকরিণী, ডোবা ও মদী প্রভৃতিতে ডোবান হয়। এই সকল পাট পচার জন্য জল দুর্গন্ধবুস্ত্র হয় ও তাহাতে এনোফিলিস্ নামক ম্যালেরিয়াবাহী মশকেরা শাবক উৎপাদন করে ও ম্যালেরিয়া বিধ ব্যাপ্তির সহায়তা করে। যতই পাটের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে।

অনেকে পুকরিণীতে বাঁশ ও অন্যান্য কাষ্ঠ জব্যাদি ভিজাইয়া রাখিয়া সেগুলি মজবুদ করিয়া থাকেন। এই সকলের দ্বারাও জল দূষিত হয়।

জলে দ.ম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি থাকিলে তাহারাপুচিয়া জল ধারণ করে। এই সকল দাম ও পানি পুকরিণী পরিষ্কার করিবার কালে প্রায়ই পুকরিণীর কিনারায় নিকিপ্ত হয় এবং তাহার পুনরায় পচিয়া বর্ধার জলের সহিত মিলিত হইয়া পুকরিণীর মধ্যে আদিয়া পড়ে ও জল বিশেষরূপে দূষিত করে।

‘নৈষধচরিতে’ নাস্তিকবাদের আলোচনা। *

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ।]

স্বয়ম্বরের পর নববধু দময়ন্তীকে লইয়া রাজা নল, সানন্দচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, আর ইন্দ্রাদি দেবতারা হতাশ হৃদয়ে নিজ নিজ রত্নময় বিমানে আরোহণপূর্বক ধরাধাবন পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া আবার স্বর্গের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, নবভূপতি কলি, কামক্রোধাদি সৈন্ত সমভিব্যাহারে মহা আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়াছেন। সেই বিস্তীর্ণ জনসমুদ্রে দেবগণের সমীপবর্তী হইলে একজন নাস্তিক,—যেন স্বেগে পাইয়া— দেবগণকে শুনাইতে লাগিল,—

যাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য উভয়েরই অভাব, তাহাদের জীবিকা সংস্থানের কৃত্রিম অগ্নিহোত্র, বেদ, মীমাংসা, দণ্ডগ্রহণ, ভ্রমধারণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এই উপায়ে কিছু উপার্জন করিয়া নিজ নিজ জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারিবে। তাহাদের ত আর কূটবুদ্ধির প্রসাদে বর্ণনা পূর্বক বা দৈহিক শক্তির প্রভাবে বলপূর্বক ধনার্জনের সামর্থ্য নাই। সুতরাং ধর্মের দোহাই দিয়া, উপার্জনের একটা পন্থা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই বেদাদির সৃষ্টি,—পরমার্থতঃ তাহা কিছুই নহে। কাজে কাজেই যাহারা বৈদিক বিধি-নিষেধ অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

•তোমাদের শাস্ত্রে আছে, ‘ব্রাহ্মণ অমুক কাজ করিলে পতিত হয়,’ ‘শূদ্র এই কাজ করিলে নিরয়গামী হয়,’ ইত্যাদি। অারে ছাই, ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণ কি আর বিত্ত্ব আছে যে, তাহাদের একটা বাধাবাধি নিয়ম থাকিবে? সকলেই যে জাতিসঙ্কর-দোষে ছষ্ট।

‘শুদ্ধিবংশধরীশুকো পিত্রোঃ পিত্রোর্ধদেকশঃ ।

তদনন্তকুলাদোষাদদোষা জাতিরন্তি কা ॥’

মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় বিত্ত্ব হইলে বিত্ত্ব সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু অন্ধাদি সংসারে এই বিত্ত্ব কি সম্ভবপর? পিতামহ পিতামহী ও মাতামহ

মাতামহীর বিশুদ্ধি হইলে পিতা ও মাতার বিশুদ্ধি হইবে, আবার সেই পিতা-মহাদির মাতাপিতার বিশুদ্ধি হইলে তাহাদের বিশুদ্ধতা হইবে, এইরূপে যদি অনন্ত কুল-পরম্পরার বিশুদ্ধি থাকে, তবেই ব্রাহ্মণকুমারাদির বিশুদ্ধতা হইতে পারে। কিন্তু এই বিশুদ্ধি ত কোনও রূপেই নিরূপণ করা যায় না। কাজেই ‘আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ,’ ‘তুমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়’ ইহা ত নিঃসন্দেহে বলিতে পার না। তা’র পর পুরাণাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে জানিতে পারা যায়, সকল জাতিরই মূল পুরুষ, ব্যভিচার-দোষে কলঙ্কিত। ইন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি গুরু দারাসক্ত ছিলেন, ব্রহ্মা কণ্ঠাগমন করিয়াছিলেন, ইহা পুরাণই সাক্ষ্য দিতেছে। কাজেই মূল পুরুষের ব্যভিচার-নিবন্ধন অধস্তন সকল বর্ণই নিশ্চিতরূপে অবিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। নিজের দোষে বা পূর্বপুরুষের পাতকে কেহই বিশুদ্ধ নহে। তোমরাই বলিয়াছ,—অপ্যেকপঙক্ত্যাং নান্দ্রীয়াং সংযতেঃ স্বজনৈ-রপি। কো হি জানাতি কিং কশ্চ প্রচ্ছন্নং পাতকং ভবেৎ।” ‘বাহু “শৌচাচার দেখিলেও অত্যন্ত আত্মীয়ের সহিতও এক পংক্তিতে ভোজন করিবে না; কে জানে, কাহার কোন প্রচ্ছন্ন পাপ আছে।’ এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কোনও জাতিই বিশুদ্ধ নাই। সূতরাং জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়া সকলের স্বেচ্ছাচারের অনুবর্তন করাই বিধেয়। জাতি ধর্মের মুখ চাহিয়া নিজের সূতের পথ কণ্টকাকীর্ণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পরস্পরিগমন করিলে পাপ হয়, এরূপ শাস্ত্র তোমাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্মই রচিত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও ঈজরাজ চন্দ্র, গুরুপত্নীর সহিত লীলা করিয়াছিলেন,—সূতরাং তোমরা ইহাতে পাপের ভয় কর কেন? তোমরা বল, “সন্নিগ্ধেহপি পরে লোকে ত্যাজ্যমেবাস্তভং বৃধেঃ।”—পরলোকে সন্দেহ থাকিলেও পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কেন না, যদি পরলোক থাকে, তাহা হইলে নরক ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। যখন বিপ্রতিপত্তি আছে, তখন পরলোক বিষয়ে নিশ্চয়ত্বক বুদ্ধি হইতে পারে না। তোমরা বল, পাপ করিও না,—অন্যাস্তরে নরকাদি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আর আমরা বলিতেছি, যে পাপ করিল, সে ত চিত্তানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, নরকভোগ হইবে কাহার? এইরূপ বিপ্রতিপত্তি নিবন্ধন পরলোকে সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি বল, সন্দেহস্থলে সে কাজ না করাই যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে তোমরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কর। কেন না, তাহাতে যে পণ্ডিত্য করা হয়, তাহাতেও সাম্প্রদায়িক মতে দোষশ্রুতি আছে।

সাংখ্যচার্যেরা—“ন হিংস্রাং সর্বাভূতানি” । “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে বলেন যে, যাগাদিতে যে বৈধী হিংসা করা হয়, তাহাতেও পাপ হয় । সুতরাং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও পাপের সংশয় হইল । যদি পান্থিক দোষ পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ত্যাগ কর, নতুবা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও । পাপে তোমার ভয়ই বা কি ? যাহাতে তোমার ‘আত্মা’ এইরূপ বুদ্ধি হইতেছে, সেই দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে পাপ তোমার কি অনিষ্ট করিতে পারিবে ? যদি বল, আত্মা দেহাতিরিক্ত, দেহ নষ্ট হইলেও দেহান্তরে সেই আত্মা পাপের ফল-ভোগ করিবে । এ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, তোমার ‘এতদেহবিশিষ্ট আত্মাতে’ই ‘অহং’-প্রতীতি হইতেছে, সেই তুমি পাপ করিলে অত্র দেহবিশিষ্ট আত্মা সেই পাপের ফল ভোগ করিবে, ইহা কোন্ দেশী ব্যবস্থা ? যদি একজন পাপ করিলে অত্র লোকে তাহার ফলে দুঃখভোগ করে, তাহা হইলে রাম পাপ করিলে শ্রাম তাহার ফল ভোগ করে না কেন ? যে হেতু, সামান্ততঃ ‘আত্মত্ব’ ধর্ম তাহাতেও বর্তমান আছে । সুতরাং মৃত্যুর পর স্কৃত-দৃষ্টিতে ফলে পুণ্য পাপ ভোগ করিতে হয়, বা শ্রাদ্ধাদি কার্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে প্রেতের পরিতৃপ্তি হয়, এ সকল প্রচারকের প্রবাদ মাত্র । বেদে ধূর্তেরাই বলিয়াছে যে, আত্মা দেহব্যতিরিক্ত । ‘আমি স্থূল,’ ‘আমি সূক্ষ্ম’ ইত্যাদি রূপে দেহকেই সকলে আত্মা বলিয়া জানে, এই প্রাত্যক্ষিক অনুভবের অপলাপ করিয়া ঋতি বলিতেছে কি না,—“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ । অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হৃত্তে হৃত্তমানে শরীরে ॥” আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সে নিত্য, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার নাশ হয় না । সুতরাং দেহকে ক্ষীণ করিয়াও পারলৌকিক সেই স্থিরাত্মার কল্যাণার্থ ধর্মার্জন কর—এই সকল শাস্ত্র ধূর্ততাপূর্ণ নয় ত আর কি ? ধূর্তেরাই অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে মণি-মাণিক্যে বঞ্চিত করিয়া কাচ সংগ্রহ করিবার জন্ত প্ররোচিত করে । তোমরা বলিতে পার, বেদ ধূর্তরচিত হইল কেমন করিয়া ? —পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্র হইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; তখন অশ্বমেধাদি যাগ করিলে যে স্বর্গাদি ফল লাভ হয়, ইহাও অনুমান করিয়া লইতে হইবে । বেদের একাংশ যখন সত্য হইল, তখন অপরাংশ মিথ্যা বলিবার হেতু কি ? এইরূপে সমস্ত বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—

“একং সন্ধিঞ্চয়োস্তাবদ ভাবি তত্রেষ্টজন্মনি ।

হেতুমাহঃ স্বয়ংদীনসামানস্তথা বিটাঃ ॥”

তোমাদের ধর্ষতার কথা আর কি বলিব ? একজনের পুত্র-কামনায় তোমরা পুত্রোষ্টি যাগ করিলে । তা'র পর যদি তাহার পুত্র হয়, তাহা হইলে তোমরা বল, আমরা যজ্ঞমানের জন্ত রুদ্রজপাদি করিয়াছি, তাই পুত্র হইল । আর যদি পুত্র না হয়, কিংবা পুত্র হইয়া যদি অকালে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা অমনই গাহিতে আরম্ভ কর, 'এ যাগের অঙ্গভঙ্গ হইয়াছিল । নিশ্চয়ই যাগের সমস্ত সামগ্রী বিলুপ্তভাবে সংগৃহীত হয় নাই, দক্ষিণাও হয় ত যথানিয়মে দেওয়া হয় নাই,—যজ্ঞমান বোধ হয় বিতুষাঠ্য করিয়াছিল !' দেখ, ইহা ধর্ষতা নয় ত আর কি ? পুত্রের উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি—এই উভয় কল্পের মধ্যে একটা হইবেই । দুই পক্ষেই তোমরা হেতু কল্পনা করিয়া রাখিয়াছ ।

তোমাদের সংহিতাকার মনুও এক মহা প্রবঞ্চক ছিল । সে নিজে মন্বন্তরাধিপতি রাজা ছিল, তাই নানা উপায়ে ধনাগমের জন্ত—'অমুক কাজ করিলে এই দণ্ড' 'অমুক পাপ করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত'—এই সকল ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছে । সুতরাং আমাদের বিধান গুন,—

• "কঃ শমঃ ক্রিয়তাং প্রাজ্ঞাঃ প্রিয়ান্বিতৌ পরিভ্রমঃ ।

ভ্রমীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কৃতঃ ॥"

তোমরা যে যাগযজ্ঞাদি কর, তাহা কি কামনায় ? স্বর্গে গিয়া উর্ব্বশী প্রভৃতি সুন্দরী রমণীগণের সাহচর্যে সুখভোগ করিবে, এই প্রত্যাশায় ত ? তাহা হইলে আর শাস্তি বা সংযম রহিল কোথায় ? ইহা অপেক্ষা ইহলোকেই বিবিধ সুন্দরী রমণীর সংসর্গে সুখভোগ করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় ? নরকের ভয় ত সুদূর-পরাহত । এই দেহ ভস্ম হইয়া গেলে তাহা কি আর ফিরিয়া আসিবে ?

তোমাদের শাস্ত্রে যে বলে, এই কাজ করিলে তির্য্যগ্ঘোনিতে জন্ম হয় । তাহাতেই বা ভয় কি ? সর্পাদি সরীসৃপেরাও নিজের সজাতীর তরুণীসন্তোগ, ভেকভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে অমিত সুখানুভূতি লাভ করে । সুতরাং পাপের ফলে তির্য্যগ্ঘোনিতে জন্ম হইলেও তাহাতেও সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না, তবে আর পাপে অনিষ্টের আশঙ্কা কি ?

তোমাদের দার্শনিক বিচার সমূহও অপূর্ব্ব !—

'স্বক ব্রহ্ম চ সংসারে মুক্তৌ তু ব্রহ্ম কেবলম্ ।

ইতি ষোড়শিত্তিমুক্ত্যন্তিবৈদিকী বেদবাদিনাম্ ॥"

মায়াবাদী বৈদান্তিক বলিতেছেন কি না,—সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম দুই-ই আছে, মৌক্ষদশায় অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া গেলে জীব আর থাকিবে না । এই

মোক্‌কের অভিনায়ে আবার লোকের প্রাণপণ যত্ন ! আত্মার জগুই সম্ব, সেই আত্মারই যদি উচ্ছেদ হইয়া গেল, তবে তাদৃশ মোক্‌লাভের আশায় মূর্খ ভিন্ন আর কে যত্নবান্ হইবে ?

তা'র পর শ্রায় বৈশেষিক মতে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা—এই নববিধ বিশেষ গুণধ্বংসের নাম মুক্তি। তাঁহার আবার এই মোক্‌কের প্রমাণরূপে শ্রুতি প্রদর্শন করেন যে, “অশরীরং বাবসন্তুঃ প্রিয়া-প্রিয়ে ন স্পৃশ্বতঃ” ; মোক্‌কাবেস্থায় সুখ বা দুঃখ কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকে না। এইরূপ মুক্তি হইলে ত ভারী লাভ হইল ! এরূপ হইলে মুক্ত পুরুষের সহিত পাষণের আর প্রভেদ রহিল কি ? মুক্ত পুরুষের সুখ নাই, সুখের অনুভবও নাই। ইহা অপেক্ষা সংসারাবস্থাই ভাল। যদিও সংসারে দুঃখ আছে, তবু ত বহু সময়ে সুখানুভূতিও হয়। যে মোক্‌কে প্রস্তুতের সহিত কিছুমাত্র অবিশেষ থাকে না, সেইরূপ অপূর্ক মোক্‌কের জগু লোকে লালায়িত হইবে কেন ? যে শ্রায়শাস্ত্রে এইরূপ অপূর্ক মোক্‌কের কথা বলা হইয়াছে, তাহার রচয়িতা গৌতম। সত্যই তিনি গৌতম—গৌশ্রেষ্ঠ ; তাহা না হইলে কি আর চৈতন্যবিশিষ্টের পরম পুরুষার্থরূপে শিলাত্মরূপ মুক্তির ব্যবস্থা করেন ! এই ঋষির ‘গৌতম’ নামটা অর্থ—

“মুক্তয়ে ষঃ শিলাত্মায় শাস্ত্রমুচে সচেতসাম্ ।

গৌতমং তমবেক্ষ্যেয যথা বিখ তথৈব সঃ ॥”

নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, ঈশ্বর জগৎকর্তা, সর্বজ্ঞ, করুণাময় ও অবদ্য-বাক্ । তাঁহার উচ্চারিত বলিয়াই বেদ-বাক্য সমস্ত সত্য। যদি তিনি করুণাময় ও সত্যবাদীই হন, তবে তিনি একবার ‘তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হউক’—এইরূপ অব্যর্থ বাক্য উচ্চারণ করিয়া কৃপা-প্রার্থী আমাদিগকে কৃতার্থ করেন না কেন ?

“দেবশ্চেদস্তি সর্বজ্ঞঃ করুণাভাগবদ্যবাক্ ।

তৎ কিং বাগ্ বায়মাত্রাঃ কৃতার্থয়তি নার্বিনঃ ॥”

‘কাজেই ঈশ্বর নামে কেহ আছেন, ইহা উন্নতের প্রলাপ মাত্র।

তা'র পর দেখ, তোমাদের শ্রায়, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি কোনও দর্শনেরই পরস্পর মতের ঐক্য নাই, শ্রায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে আছে।—“শকোহনিত্যঃ কার্যাত্মাৎ, ঘটবৎ”—শক্‌ নিত্য নহে, যেহেতু, তাহা কার্য ; ষাহার উৎপত্তি আছে, সে কখনও নিত্য হইতে পারে না, যেমন ঘট। আবার মীমাংসকেরা

বলেন,—“শব্দো নিত্যঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহত্বাৎ, শব্দত্ববৎ”—শব্দ নিত্য, যেহেতু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ, তাহা অনিত্য হইতে পারে না, যেমন শব্দত্ব। এইরূপ পরস্পর অনুমান করিয়া নৈয়ায়িকেরা শব্দের অনিত্যত্ব ও মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে ত ‘স্বন্দোপস্বন্দ ত্রায়ে’ উভয় মতকেই অপ্রমাণ বলিতে হয়। আবার বৈদান্তিকেরা বলেন, “গগনং অনিত্যং বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহগুণাশ্রয়ত্বাৎ, ঘটবৎ”—আকাশ নিত্য নহে, কারণ তাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহগুণ যে শব্দ, তাহার আশ্রয়, যাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ গুণের আশ্রয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না, যেমন ঘট। নৈয়ায়িকেরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া অনুমান করেন যে, “গগনং নিত্যং দ্রব্যত্বে মতি নিরবয়বত্বাৎ আত্মবৎ”—গগন নিত্য, যে হেতু তাহা নিরবয়ব দ্রব্য; নিরবয়ব দ্রব্য অনিত্য হইতে পারে না, যেমন আত্মা। এরূপ ক্ষেত্রে গগনের নিত্যত্ব, বা অনিত্যত্ব, কোনটাই প্রমাণ-সিদ্ধ হয় না। এরূপ অবস্থায় বেদ, স্মৃতি, দর্শন—সমস্ত অগ্রাহ করিয়া সকল সুখের মূলীভূত স্বৈচ্ছাচারিতার অনুবর্তন কর। চৌর্য্যবৃত্তি হইতে যদি নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে দারিদ্র্য পরিপুষ্ট হইবে, আর অভক্ষ্য বনিয়া লগুন, শূকর-মাংসাদি সুস্বাদু আহাৰ্য্য পরিত্যাগ করিলে নিজের উদরকে বঞ্চনা করা হইবে।

“দৈন্যসায়ুধামৈলমমভক্ষাঃ কুক্ষিবঞ্চনা ।

স্বাচ্ছন্দ্যমচ্ছতানন্দকন্দলীকন্দমেককম্ ॥”

কলিরাজের সম্প্রদায়ভুক্ত এই নাস্তিকের ঐদৃশ কর্ণপীড়াকার দুর্ভাক্য শুনিয়া দেবাধিপতি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—“কে রে এই ভাবে বেদাদি শাস্ত্রকে ছষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া ধর্মের মর্মে আঘাত দিতেছে?” ইন্দ্র তখন হস্ত দ্বারা নিজের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া সাহস্কারে বলিলেন,—

“লোকত্রয়ঃ ত্রয়ীনেত্রাং বজ্রবীৰ্য্যস্কুরংকরে ।

ক ইথং ভাষতে পাকশাসনে ময়ি শাসতি ॥”

“পাকাসুরমর্দনকারী আমি ইন্দ্র, এখনও বজ্রহস্তে বৈদিক বিধিনিষেধ অনুসারে ত্রিভুবন শাসন করিতেছি,—আমাকে এইভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াও কোন্ দুর্ভক্ত বেদের প্রামাণ্য অগ্রথা করিবার অভিলাষ করে?”

শাস্ত্রে আছে, “বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ”—সেই বজ্রাস্ত্রধারণকারী ইন্দ্রকে সাক্ষাৎ সন্ধানে প্রত্যক্ষ করিয়াও যে পামর শাস্ত্রের অমর্যাদা করিতে চায়, তাহার ত সামান্য সাহস নহে,—এই অভিপ্রায়েই ইন্দ্রকে ‘বজ্রবীৰ্য্যস্কুরংকুর’ রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে।

[ক্রমশঃ ।

রাসলীলা ।

[“ওপারের কথা”র লেখক]

যিনি শিশুকালে ও বাল্যাবস্থায় হাসিতে খেলিতে নানা অলৌকিক কৰ্ম সম্পন্ন করিয়া—বিশেষতঃ গোবর্দ্ধন ধারণ ও কালীয় দমন কার্য দ্বারা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের কৰ্মে সুসিদ্ধ হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি বৃন্দাবনের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে অসামান্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি কৌতুকচ্ছলেও কর্তব্য সাধনের ও ধর্মজীবন গঠনের পন্থাগুলি শিক্ষা প্রদানে যত্নশীল ছিলেন ও যিনি বৃন্দাবনে অবস্থান কালে আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন, তিনি কি তুমি-আমি একজন! বিধাতা যদি দিন দেন, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কৰ্মের মূলতত্ত্ব এ মুখ্যতটুকু ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব ও যতটুকু সামর্থ্যে সম্বলান হয়, জ্ঞাপন করিতে সচেষ্ট হইবে। তবে আপাততঃ জাগতিক কর্তব্য সাধনে ত্রুটি থাকিয়া এই সুমহৎ কৰ্ম সম্পাদন করাও অধমের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

মনের স্বধর্ম—কোন সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইলে উহা তদনুরূপ কৰ্ম সাধিতে বিশেষ যত্নশীল হয়। রাসলীলার পূর্ব হইতেই গোপ-বালক ও মহিলাগণের শ্রীকৃষ্ণের কৰ্মাবলীর দ্বারা বন্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহাদের সহিত একপ্রাণ। প্রতিভায় ও শক্তিমত্তায় যিনি শীর্ষস্থানীয়, তিনি যদি কাহাকে অবজ্ঞা চক্ষে না দেখেন, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষণে কেই বা উদাসীন হয়? এই প্রকার ব্যক্তিকে তাঁহাদের একজন বলিলে মুখোজ্জ্বল হয় না কি? এই প্রকার ব্যক্তির নিকট উন্নত মস্তকও আপনা হইতে অবনত হয় না কি? এই প্রকার ব্যক্তি যদি প্রেমের বন্ধনেও আবদ্ধ করেন, তাঁহাকে “আমার” “কেবল মাত্র আমারই” বলিতে সাধ হয় না কি? আরো সাধ হয় না কি শুনি—সাধ মিটায় শুনি, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে “তিনি আমার”? সংসার-তাপে তাপিত কোন্ প্রাণ-মনঃ এই প্রকার শান্তি ও আনন্দদায়ক মহাপ্রাণকে আপন্যার করিতে লোলুপ না হয়? যদি কাহারও সুবিধা থাকে, এই প্রকার মহাপ্রাণের শ্রীমুখ হইতেই শুনে যে, “আমি তোমার” (হাম্ তেরা), তিনি কি এই সাধটুকু অবহেলে বিসর্জন দিতে পারেন? যদি কোন ললনা

স্বৈচ্ছায় কাহার নিকট আপনাকে বিক্রিত করেন, তাঁহার কি প্রাণে প্রবল তৃষা হয় না যে, তিনি স্বকর্ণে শুনে বা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার প্রাণের দেবতা তাঁহারই ? বৃন্দাবনের ললনাগণ স্বৈচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের গুণে বিমোহিতা হইয়া আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিক্রিতা করেন নাই কি ? যাহারা কাহারও সামান্য গুণে বিমোহিতা ও সামান্য আদরে পরিতুষ্টা হইবেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য গুণে বিমুগ্ধা ও অপারিসীম প্রেমে বিগলিতা হইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি ? কমনীয়, লোভনীয় ও আদরণীয় পরমধন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের মধ্যেই পাইয়া, তাঁহারা কোন্ প্রাণে সাধ না পোষণে যে, শুনে— একবার মাত্র শুনে—তাঁহারই শ্রীমুখে যে “তিনি তাঁহাদের” ? যাহাদের হৃদয়ে যত্নে প্রোথিত বীজ, বীজাকার হইতে বিশাল তমালবৎ আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদের সুফল লাভের আশা দিনের দিন বলবতী হয় না কি ? এই সাধ— এই প্রাণের তৃষা মিটাইবার জন্য বৃন্দাবনের গোপ-মহিলাগণ আপন-হারা অবস্থায় লীলাস্থলে ধাবমানা হইয়াছিলেন । জাগতিক অকিঞ্চিৎকর যাহা কিছু লাভের আশার মানব এদিক্ সেদিক্ করিয়া কত দিকেই না ধাবিত হইতেছে । সেই সাধ মিটাইবার জন্য প্রাণ, মন ও দেহ উৎসর্গ করিতেছে ও এমন কি কত-না অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম সাধন করিতেছে ; কিন্তু যাহাতে কদর্যা আচরণের বা স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই ও যাহার নিকট বীভৎস আচরণের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তবে আছে—নিঃসন্দেহ আছে, প্রাণ ঢালাঢালি কারবারও আছে, বিপুল পরিমাণে আছে—সেই সুখ, সেই আরাম, সেই আনন্দ ও সেই শান্তি, যাহা আর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব, সেই মহাপ্রাণের দিকে, সেই মহান্ শক্তির দিকে ও সেই মহান্ প্রেমিকের দিকে নির্ভরে ও নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনঃপ্রাণ প্রবাহ আকারে ধাবমানা হইবে না কেন ? এ গতি রোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব কি ? সূর্য্য কর্তৃক আকর্ষিত বারিরাশি বাষ্পাকারে দিনমনির দিকে ধাবিত নহে কি ? সেই সন্মিলনীতে, সেই শুভ রজনীতে ও সেই লীলাস্থলেই গোপমহিলাগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন যে, তাঁহাদের প্রাণের সাধ মিটিবে । মিটিবে—নিঃসন্দেহ মিটিবে—তাঁর, সেই তাঁর, সেই প্রিয়-বদনের, সেই কমনীয়ের, সেই পরমধনের, সেই বড় সোহাগের, সেই বড় গরবের শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে স্বকর্ণে শুনিবেন ও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবেন—সাধ মিটাইয়া উপলব্ধি করিবেন—“আমি তোমার” !

পূর্ব হইতেই উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহিলাগণ লীলাস্থলে উপস্থিত হইলেন । আর দেখিলেন, তাঁহাদের প্রাণধন বা তাহাদের চিন্তার ভোজ্য-সেবা সামগ্রী তাঁহাদেরই জন্ত মহাসা বদনে অপেক্ষা করিতেছেন । হাসিতে হাসি টানিল, তাই গোপীগণের বদনেও হাসি দেখা দিল । দুই হাসির প্রবাহ এক সঙ্গে নীরবে মিলিত হইয়া লীলাস্থল আনন্দমাত্রায়ক হইয়া উঠিল । নিশাপতি নিশীথ রজনীকে বিরলে পাইয়া যে হাসিতে ধরাকে হাসান, এ হাসিও তদ্রূপ । মহিলাগণ একে একে অগ্রসর হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ এক এক করিয়া সকল মহিলার করকমল শ্রীহস্তে লইলেন । মরি—মরি—কি স্পর্শ ! সেই স্পর্শে প্রত্যেকের অবসাদ ঘুচিয়া গেল ; সেই স্পর্শে দেহে, প্রাণে ও মনে এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল ; সেই স্পর্শে দেহ রোমাঞ্চিত হইল ; সেই স্পর্শে প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল ; সেই স্পর্শে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি কি-যেন-কি-এক অননুভূতপূর্ব পুলকে বাজিয়া উঠিল ; সেই স্পর্শে মন আনন্দে আপ্লুত লইল, সেই স্পর্শে নয়ন ঝর ঝর করিতে লাগিল ও সেই স্পর্শে ব্রজাঙ্গনাগণ প্রাণ-রমণের পদতলে লুপ্তিত হইতে সাধ পুষিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কোন মহিলাকে সে অবসর প্রদান না করিয়া প্রত্যেক মহিলার গণ্ডদেশে চুম্বন করিলেন ও প্রত্যেকের কর্ণে কর্ণে বলিলেন, সেই কথা—যাহা পুরাতনেও নূতন—ভাষার সার—গীতের সুর, সোহাগের বাঁধ—গর্কের চূড়ান্ত—প্রাণের তেজঃ ও মনের আকাঙ্ক্ষা । সেই কথা—যাহার দান মুচকি হাসি ও প্রতিদান চুম্বন । সেই কথা—আমি তোমার (হাম তেরা) । যাহা কত শত জীবন-তরীকে প্রতিকূল বায়ুতে অকালে নিমজ্জিত করিয়াছে । আবার অনুকূল বায়ুতে দুই দশটা তরীকে ভবপারের অন্ত পারে লইয়া গিয়াছে । শশাঙ্ক কিরণজাল যেমন সমুদ্রকে দেখিয়া আশ্বহারা হইয়া চলিয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শনে, চুম্বনে ও স্খামাখা ‘আমি তোমার’ বাণী শ্রবণে গোপীগণের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল । গোপীগণ তখন মর্মে মর্মে বুঝিলেন যে, তাঁহাদের প্রাণধন, তাঁহাদেরই বটে । তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহারা নিজ নিজ অভি-মত স্থানে যাইতে লাগিলেন । যাইতে যাইতে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাথী । এই দৃশ্য দর্শনমাত্র বিশ্বয় আসিয়া গোপীগণের মানব-সুলভ সংশয়কে সাথী করিয়া লীলাভূমি হইতে অন্তর্হিত হইল । তৎপরে তাঁহারা উপরিষ্ঠা হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ সহ আলাপন মানসে ; কিন্তু অল্পক্ষণ আলাপনের পর প্রাণের আবেগ রুদ্ধ না রাখিতে পারিয়া গীত আরম্ভ করিলেন । পরে প্রত্যেকে ‘আপনি মাতিয়া নৃত্যগীতে লীলাভূমি ও উপবন মাতাইলেন । তৎপরে হাসির

ডবল উঠিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে অশ্রুধারা হাতের অনুগামিনী হইল। সে এক অভিনব দৃশ্য! আবার নৃত্য সহ গীত ধরিলেন ও দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণও কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন। অহা—কি আনন্দ! কি আনন্দ! গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণসহ উপবিষ্টা হইলেন ও শ্রীঅঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। তন্দ্রাও অবসর বুঝিয়া দেখা দিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণেই অবসর লইলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই অবসরে লীলাভূমি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণের চমক ভাঙ্গিল ও আশে পাশে দেখিতে লাগিলেন। যাহাকে খুঁজিতেছিলেন, তিনি সে স্থানে নাই, ইহাও মর্মে মর্মে বুঝিলেন। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয় অকঁকারময় হইল ও সমস্ত লীলাভূমি তাঁহাদের প্রতীয়মান হইল—তিমিরাক্রকারে আবৃত। চারিদিকে হাহারব উঠিল। প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ ইত্যাদি সম্বোধনে উপবন মুখরিত হইল। মহিলাগণ উন্মাদিনীর মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাতি পাতি অধুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। তৎপরে ক্লাস্ত শ্রান্ত হইয়া নয়নজল সঞ্চল করিলেন, কেহ বা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহ বা আপনাকে অগরাধিনী সাব্যস্তা করিয়া আপনাকেই ধিকার দিতে লাগিলেন, কেহ বা অন্ত সখীর গলদেশ ধরিয়া “আমার কি হইল” বলিয়া ক্রন্দনের বোল তুলিলেন, কেহ বা “আমিই কৃষ্ণ” বলিয়া বন্ধিম ঠামে দাঁড়াইলেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের অমুকরণে অপর সখীর গণ্ডদেশে চুষন করিতে লাগিলেন। তৎপরে গোপীগণ ক্লাস্ত হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্ব স্ব অঞ্চল পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে শয়ন করিলেন। এই অবসরে তন্দ্রাদেবী আবার রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণেই লীলাভূমি ঘোর নিস্তক্ৰতায় নিমজ্জিত হইল। সেই অবস্থায় গোপীগণ দেখিলেন, তাঁহাদের প্রাণধন তাঁহাদের শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া মহাস্য বদনে বলিতেছেন :—

“তোমাতে আমি সৈ পশি,

যাপিব লো সারা নিশি,

এই সাধ এবে পুশি এসেছি লো ফিরে আমি।”

এই স্বপ্নদর্শনে গোপীগণ ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া বসিলেন ও চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ববৎ লীলাভূমি শ্রীকৃষ্ণশূন্য, ইহাই বুঝিলেন। তখন কোন উপায় না দেখিয়া, হতাশ হইয়া চক্ষু মুদিতা করিলেন। অমনি দেখিলেন, যাহাকে তাঁহারা কত অধুসন্ধান করিয়াও পান নাই—তিনি—সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়-নিকুঞ্জবনে বিরাজিত! সে রূপ—সে অসামান্য রূপ দর্শনে কিয়ৎক্ষণ চক্ষু কন্মীলন করিতে পারিলেন না। তৎপরে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাদের শিরোদেশে । আরও দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দেহের শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে ; এইবার সভয়ে চাহিলেন, চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের জীবন-সর্বস্ব তাঁহাদেরই পার্শ্বে । বিফারিত মননে চারিদিক্ দেখিলেন । দেখিলেন, লীলাস্থল শ্রীকৃষ্ণময় । ত্রস্তে উঠিলেন, উঠিয়া উপবনের দিকে ধাবিত হইলেন, শশধরের দিকে দেখিলেন ; দেখিলেন, তথাও শ্রীকৃষ্ণ । তৎপরে দেখিলেন— নভোমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, লতায় লতায় শ্রীকৃষ্ণ, পত্রে পত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও তৃণে তৃণে শ্রীকৃষ্ণ । পাছে প্রিয়তমের শ্রীমুখে পাদক্ষেপ করেন, এই ভয়ে অঞ্চল পাতিলেন, নিজ নিজ চরণ কমল উঠাইলেন ও কত কি উপায় উদ্ভাবন করিলেন । কিন্তু তবুও দেখেন—শ্রীকৃষ্ণময় দেহ, বসন ও বসুকরা । অবাক্ হইলেন, কি করি, কি করি বলিয়া লজ্জিত হইলেন । সরমে চলিয়া পড়িলেন । সেই অবসরে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহাদিগকে স্বক্রোড়ে টানিয়া লইলেন । কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, গোপীরা কেহই তাহা জানিলেন না । হঠাৎ মুরলী-ধ্বনি শুনিলেন । নয়ন মেলিয়া দেখেন নিশাপতি বিদায় লইয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান । শুনিলেন, মুরলীবদন ললিত রাগিণীতে গাহিতেছেন :—

“উঠ উঠ প্রেমময়ী রাসেশ্বরী আমার ।

তুমি যথা, আমি তথা, তুমি আদি একাকার ।”

● মহিলাগণ সেই ইঙ্গিত বুঝিলেন । পরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । তাহারাও মর্মে মর্মে বুঝিলেন,—

বিখাসে মিলায় পরম রতন

যুগ পর যুগ করিল দোষণা ।

সেই নিশি অবসান হইতে বৃন্দাবনধানে এই লীলার যবনিকা পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদিন না নিগুণ ব্রহ্ম এ বিশ্বকে উঠাইয়া লইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্ম ও অবতারাদি ভাবেও আকারে ইহা নৃত্যলীলাবৎ পূর্কোক্ত কারণে সাধিত হইবে । ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই লীলা কোন নর-নারী কর্তৃক ইহ-লোকে সাধিত হইলে ব্যভিচারে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । সুতরাং এই লীলার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ও আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে সংযত না করিয়া এবিধ কার্যে প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত অকর্তব্য ও গর্হিত কর্ম ।

● এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মহিলাগণকে “আমি তোমার” বলা শ্রীকৃষ্ণের অসঙ্গত কর্ম করা হয় না কি ? একমাত্র মনই তাহাদের সম্বল, তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ভার্য্যা ব্যতীত অস্ত্র বমণীকে “আমি তোমার” এই কথা কোন

প্রকারে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহ অশ্রায় আচরণ। কিন্তু যিনি বয়সে বালক মাত্র ও যিনি নিজ কর্ম দ্বারা প্রতিপন্ন করাইয়াছিলেন যে, তিনি সমগ্র বৃন্দারন-বাসীর, তিনি মহিলাগণকে “আমি তোমার” এই কথা বলিয়া গর্হিত কর্ম করিয়াছেন, ইহার সুবিচার তাঁহারাই করিতে সক্ষম, যাঁহাদের মস্তক কলুষিত ভাবের বা রোগ-শোকের বা সাংসারিক অসচ্ছলতার জগ্ৰ বিকৃত হয় নাই। এ অধমের জিজ্ঞাস্য আত্মায় অধিপতি কোন মহাপ্রাণ কর্তৃক কোন পাঠক সম্ভাষিত হইয়াছেন কি? যদি কাহারও সে ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, মনে হয়, তিনিই এ প্রকার সম্ভাষণের অমূল্যতা সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে সক্ষম হইবেন। ফল কথা, এই ভাগ্যোদয় যাঁহার হইয়াছে, তিনি সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী। তাঁহার ব্রত সময়ের সদ্যবহার করা ও নিজ নির্দিষ্ট যাবতীয় জাগতিক কর্ম দেনা চুক্তি হিসাবেও প্রাণ মন ঐক্য করিয়া সাধন করা। তিনি বৃথা বাক্য ব্যয় বা পরচর্চা করিয়া বা অনাবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কালক্ষেপণ করিতে নিতান্ত বীতরাগ।

মনেই পার্থক্য বিদ্যমান, আত্মায় কিন্তু সে পার্থক্য নাই। মনের পার্থক্য বশতঃ জীব আপন-আপন জাগতিক যাহা কিছুর জগ্ৰ চিন্তাশ্রিত। এই পার্থক্য বশতঃ একজনের সামগ্রী বা যাহা কিছু অণ্ডের অধিকারভুক্ত নয়। আত্মা সর্বস্থানে ও সর্বজীবে অবস্থিত। সুতরাং সর্বস্থান ও সর্বজীব আত্মার অধিকার ভুক্ত। এই জগ্ৰ মনের অতীত অর্থাৎ আত্মায় শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলে বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন “আমি তোমার” সুতরাং সাধারণ জীবের নিকট যাহা অকর্তব্য শ্রীকৃষ্ণকে সেই বিধানের বশবর্তী করা অসংযুক্ত নহে কি?

[ক্রমশঃ ।

বিধির বিধান ।

[লেখক—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াণ, বি-এ]

(১)

শক্তিগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জানিত যে, দত্তদের বাড়ীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী উবারাণীর সহিত ঐ গ্রামেরই বিনোদবিহারীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহ একান্ত বাঞ্ছনীয়ও ছিল, কারণ উষা ও বিনোদ উভয়ে শৈশবে একত্র

লালিত পালিত, আর তাহার উপর উষার মাতা মৃত্যুকালে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাকে স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিবার সময় এই বিবাহ দিবার জন্ত অমুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং সকলের বিশ্বাস ছিল এ বিবাহ হইবেই! কিন্তু যখন সকলে শুনিল যে, এই বিবাহে উষার পিতা অমত করিতেছেন, তখন সতাই অনেকে বিস্মিত হইল! দত্তদের বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী উষারানীর বিবাহ সেই গ্রামে দিলে বিষয় সম্পত্তি-রক্ষার ব্যবস্থাও হইবে আর দত্তজা সর্বদা কন্যা জামাতার তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন এ সকল সুবিধার কথা ভাবিয়াও তিনি কেন যে এ বিবাহে অস্বীকৃত তাহা অনেকে প্রথমে ধারণাতেই আনিতে পারে না। সময়ে প্রকাশ পাইল যে দত্তজার ইচ্ছা তাহার জামাতা বিদান হয়। মূর্খ বিনোদকে তিনি জামাতা করিতে অনিচ্ছুক। তবে যদি বিনোদ বিলাত গিয়া অন্ততঃ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাটা পাশ করিয়া আসিতে পারে তাহা হইল তাহার পক্ষে দত্তবাড়ীর জামাতা হওয়া অসম্ভব না হইতেও পারে। এমন কি, বিলাত-গমনের ব্যয়টা পর্য্যন্ত দত্তজা বহন করিতে স্বীকৃত আছেন। বিনোদ এই সৰ্ত্তে সম্মতি-প্রকাশ করিলেও তাহার মাস্তা একড়ারে পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হইলেন না। সুতরাং বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। দত্তজার ঐকান্তিক ইচ্ছা বিলাত প্রত্যাগত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার জামাতা হয়। তাহার ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। ডাক্তার শনীপদ বসু উষাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং ভক্তিতব্যের অখণ্ডনীয় বিধানে চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় শনীপদের সহিত কিশোরী উষার শুভ বিবাহ এক বাসন্তী সন্ধ্যায় সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

(২)

সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দত্তজা ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল পরে আজ এক সপ্তাহ হইল উষা তাহার স্বামীর সহিত শক্তি-গ্রামে আসিয়াছে। পৈত্রিক সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্তই এই আগমন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। প্রতিবেশিনীর বাটীতে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া আসিয়া উষা তাহার দ্বিতল কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া উদ্যানের দিকে চাহিয়া নকি ভাবিতেছিল। সে আজ বড় উন্মনা—অতীতের মধুর স্মৃতিগুলি একে একে তাহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া আজ তাহার রমণী-হৃদয়কে ঝড়ই উৎপীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বাহিরে বৃক্ষে লতায়, বনে উপবনে,

পুষ্করিণী-বর্কে, প্রাসাদশীর্ষে সর্বত্র রক্ত-জ্যোৎস্নার বন কিরণ ধারা আসিয়া
 লুটাইয়া পড়িতেছিল। সেই শুভ্রবাসে সজ্জিত হইয়া সমগ্র শক্তিগ্রাম যেন
 আজ পুলকে স্পন্দন করিতেছিল, কিন্তু এ সকল প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দ-
 র্যের দিকে উষার দৃষ্টি ছিল না। সে ভাবিতেছিল, তাহার শৈশব-কাহিনী !
 সেই বাল্যের স্মৃতিগুলি কত মধুর—কত প্রাণারাম ! তাহার নন্দসখা
 বিনোদের কথা আজ বড় স্পষ্ট হইয়া নানা মূর্তি ধরিয়া তাহার মানসপটে ফুটিয়া
 উঠিতেছিল ! উষা আশৈশব শুনিয়া আসিতেছিল যে, বিনোদই তাহার ভাবী
 স্বামী। এই দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায়ও যুবতী উষা তাহার বাল্য-স্মৃতি বিস্মৃত
 হইতে পারে নাই। সেই অতীতের মধুর স্মৃতি যখনই তাহার প্রাণে জাগিত
 তখনই সে উন্মনা হইয়া পড়িত।

একদিন উষা গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। সেই দিন আবার
 সেই বিনোদের সঙ্গে দেখা ! দীর্ঘকাল পরে সহসা তাহার বাল্য-সহচরকে
 দেখিয়া উষা সত্যই আশ্চর্যবিস্মৃত হইয়াছিল। নতুবা যখন বিনোদ জিজ্ঞাসা
 করিল, 'চিন্তে পার কি উষা !' সে সহসা উত্তর দিয়া বলিল, 'ভুলিবার
 সাধ্য কি'—

বিনোদের নয়নে একটা বক্র হাসি ভাসিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা !
 কিন্তু সে ত তখন জানিত না যে, এ বিনোদ আর বাল্যের সেই বিনোদ এক
 নহে। তাহার অতীতের বিনোদ এখন চরিত্রহীন !

তারপর একদিন এক প্রতিবেশীর বাটীতে বিনোদের সহিত তাহার
 সাক্ষাৎ। সেখানেও তাহাকে দেখিয়া বিনোদ বলিয়াছে, 'জান কি উষা !
 আমি আজও বিবাহ করি নাই !' কথাটা উষা গ্রামে আদিবার পরেই
 শুনিয়াছিল। স্মরণ্য নূতন নহে। কিন্তু ঐ করটা কথার ভিতর এমন একটা
 কিছু ছিল—অন্ততঃ এমন একটা হতাশার—বেদনার সুর বাজিতেছিল যে,
 তাহার মুর্ছনাটুকু উষা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাই বহুক্ষণ
 পূর্বে বাটা ফিরিয়াও সে বেশ-পরিবর্তন না করিয়াই অগ্রমনে বাতায়ন-সম্মুখে
 দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল,—কেন এমন হয় ? মানুষের কথা সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণধার
 শলাকার ছায় কেন অস্ত্রের মর্শ্বশূল বিদ্ধ করে ? ইহা বাতীত আরও একটা
 গুপ্ত কারণ ছিল, যাহার জগৎ অতীতের কথা স্মরণে উষা আজ এত বাধা
 অনুভব করিতেছিল। এই সাত বৎসরের মধ্যে সে কখনও গণ্যার্থ তৃপ্তিলাভ
 করে নাই। তাহার নারী-হৃদয়ের একটা অংশ একেবারে শূন্য ছিল। প্রৌঢ়দের

সীমায় পদার্পণ করিয়া শশীপদ যুবজনোচিত চাপল্যের—বিলাসবিত্তমের অতীত হইয়াছিলেন। আর বিশেষতঃ তিনি নারীর মনোরঞ্জন অপেক্ষা কার্য্যকেই শ্রেয় জ্ঞান করিতেন। উষা কিন্তু এটা মোটে বুঝিত না। স্বামীর মৌখিক দুটো আলাপ—কর্কশ সংসারের নীরস কথা তাহার প্রাণে তৃপ্তি আনিতে পারিত না, তাহার বুদ্ধি প্রাণে শাস্তির বারিধার বহাইতে পারিত না। তাই বোধ হয় বালাবন্ধুর কয়েকটা কথায় সে আজ বড়ই বেদনা অনুভব করিল—তাই সে এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজেকে বড়ই অসহায়, বড়ই দীন বোধ করিতেছিল। তাহার নারী-হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশ হইতে একটা অব্যক্ত হাহাকার ধ্বনিত হইতেছিল, তাহার কান্না আসিতেছিল।

(৩)

সে নিশা জ্যোৎস্না-প্লাবিত। উষা স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছে তাহার স্বামী আসিয়া বলিল—“দেখ উষা আমি একবার বাইরে যাব।”

“কোথা?”

“আর বল কেন! ‘ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে’! এই এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামের সকলে আমাকে বড় ডাক্তার বলে মনে করেছে! পশ্চিম পাড়ায় কে নরু হাজরা আছে, সে এসে ধরেছে তার ছেলেকে একবার দেখতে যেতেই হবে। সে খালি মাথা নড়ছে আর চীৎকার করছে। ছোট ছেলে—বড় কষ্ট হচ্ছে তার! যা হোক, আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব, আস্তে ঘণ্টাখানেক দেবী হ’তে পারে।”

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর উষা পেয়ালের বশে উঠানে প্রবেশ করিল, যদি উন্মুক্ত স্থানের নিশ্চল বাতাস তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ককে শান্ত করিতে পারে! সে ধীরে ধীরে গিয়া মল্লিকার বেড়া-ঘেরা একটা বেদীতে উপবেশন করিল। তাহার মনে পড়িল, এই স্থানটিই তাহার সর্কাপেক্ষা প্রিয় ছিল। পটুবস্ত্র পরিহিতা সে এই বেদীতে বসিয়া রাশি রাশি বেলা, যাতী, যুঁই, মল্লিকা, সেফালি কুমুম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহদেবতার পূজার জন্তু মালা গাঁথিত! একদিন বিনোদ ছুষ্ঠামী করিয়া তাহার খালা ছুঁইয়া দেওয়ান, মনে পড়িল, সেদিন সে ঠাকুরকে তাহার গাঁথা মালা দিতে পারে নাই। সে কারণ সে দিন সে পিতার নিকট বিনোদের জন্তু কত না লজ্জিতা হইয়াছিল!

যুবতী ধরণীপৃষ্ঠে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল। সহসা কিসের শব্দে সে চমকিতা হইল! ও কিসের শব্দ, কে আসিতেছে না? মানুষই ত’ বটে!

ভীতিপূর্ণ স্বপ্নে যুবতী লক্ষ্য করিল—দেখিল, বৃহপাদক্ষেপে আসিয়া তাহার সম্মুখে একজন দাঁড়াইল! তখন ভয়ে উষার কথা কহিবার শক্তি ছিল না! বিনোদ ডাকিল, “উষা! ভয় পেয়েছ?” উষার সাহস আসিল, সে বলিল, “তুমি কি করে এখানে এলে?”

“পাঁচিল টপকে! ঠুধা! আমিই ত’ নরু হাজরাকে পরামর্শ দিয়ে শশী ডাক্তারকে ডাক দেওয়াই। বেশ ফন্দী করি নাই উষা!” এই বলিয়া বিনোদ পিশাচের অটুহাসি হাসিল। কি তীব্র হাসি! উষার অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে সে বলিল, ‘এত রাত্রে—এই নিরুজ্জনে—’ বাধা দিয়া বিনোদ রু লল, “উষা! এই টানের আলোর এই সেই বাল্যের পরিচিত স্থানে তোমাকে দেখে সেই দশ বৎসরের পুরাতন কথাগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওঃ কি সে দিনগুলোই গিয়েছে!” তখন উষার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল! অতি কষ্টে সে জড়িতস্বরে বলিল, “যাও বিনোদ দাদা! বাড়ী যাও!”

• বিনোদ উষার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া ডাকিল ‘উষা!’

“দোহাই তোমার, আমার প্রলোভন দেখিও না—তোমার পায়ে পড়ি চলে যাও! এ কি! তুমি টল্ছো যে! মদ খেয়েছো নাকি?”

“আশ্চর্য্য হ’লে নাকি? মদই যে এখন আমার মঙ্গী!”

উষা বলিল, “ছিঃ তুমি মাতাল!”

“সবই ত জান উষা! তুমি আশা দাও, আমি আবার মানুষ হব!”

গর্জিয়া উঠিয়া উষা বলিল—“কি, তুমি আমার বিশ্বাসঘাতিনী হ’তে বল?”

বিনোদ হাসিল, —“ওসব আমি বুঝি না! আমি তোমায় ভালবাসি, ব্যস্ এই যথেষ্ট। সত্য বল দেখি উষা! তুমি এই বিগত যৌবন বৃদ্ধের সহিত বিবাহে সন্ধ্যী হয়েছ কি না? নিশ্চয়ই না। আমি সাত বৎসর পরে তোমাকে দেখেই তা বুঝেছি! কেন এ কৰ্ম্মভোগ উষা! চল আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাই!”

উষা চীৎকার স্বরে বলিল, “দোহাই তোমার, তুমি এখান থেকে যাও, তুমি পিশাচ!”

“না উষা! আমি মানুষ! তোমাকে ভুলিতে গিয়াই আজ আমি চরিত্রহীন—মাতাল!”

• বিনোদ উষার দিকে অগ্রসর হইল! উষা আতঙ্কে পিছাইয়া গেল!

চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও জনমানব নাই, সুধার পরিবর্তে চন্দ্র যেন হলাহল ঢালিতেছে!

এই নির্জন রাতে তাহার সম্মুখে এক মাতাল লালসামদিরনেত্রে তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে! এ সময় কে তাহাকে রক্ষা করিবে! যুযুতী তখন উর্কে চাহিল, মনে মনে স্বামী-দেবতার চরণ স্মরণ করিয়া বলিল—প্রভো, এই আসন্ন প্রলোভনের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিবার মত বল দাও, আমার নারী-ধর্ম রক্ষা কর!

সহসা বিনোদ উষার হাত ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে যুযুতী সর্পাহতার শ্বাস আতঙ্কিত হইয়া সবলে হাত ছিনাইয়া লইল, বলিল, “বদি এখনই তুমি এস্থান না ত্যাগ কর, আমি চীৎকার করিব!”

বিনোদ পৈশাচিক হাসি হাসিয়া বলিল, “আর সকলে আসিয়া দেখিবে—এখানে তুমি আর আমি আছি! সেটা বড় রমণীয় দৃশ্য হবে—না?”

উষার কান্না আসিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল “পিশাচ! ঈশ্বর কি নাই?”

বিনোদ আবার হাসিয়া উঠিল। সহসা দূরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। উষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, “ঐ বুঝি আমার স্বামী আসিতেছেন। দোহাই তোমার আমার বাঁচাও—আমার মান বাঁচাও—শীঘ্র পালাও।” বিনোদও চমকিত হইল। সে ভাবিল, প্রাচীরের পাশেই পথ, সেই পথে ডাক্তার আসিতেছেন। আর বাগানও নিরাপদ নহে—এ চন্দ্রালোকে সে কোথায় লুকাইবে? তাহার মাথায় এক নূতন মতলব খেলিল। সে বলিল, “আজ তোমায় বাঁচাইতে পারি—কিন্তু প্রতিদান চাই।” উষা তখন কম্পিত ওষ্ঠ দস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিল, বলিল “রক্ষা কর, তোমার ঋণ পরিশোধ করবো”।

“উত্তম! তুমি সটান গিয়ে দরজার নিকট ডাক্তারের সহিত দেখা কর। তাঁকে বল একটা মাতাল কি পাগল এত রাতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—সে বৈঠকখানায় বসে আছে। এই কথা বলে ডাক্তার বাবু সন্দেহ করবেন বলে বোধ হয় না।”

(৪)

ডাক্তারের বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত হইয়া বিনোদ পকেট হইতে দিয়া-শালাই বাহির করিয়া বাতি জ্বালিল ও একটা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল। তাহার তখন সত্যই কষ্ট বোধ হইতেছিল। একটা সিগারেট ধরাইয়া এক টান ধূমপান করিয়া সে উহা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার দেহ অসাড় হইয়া আসিতেছিল, খাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

ডাক্তার ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কি কষ্ট হচ্ছে ?”

বিনোদ বলিল, “তা’ জানি না। তবে বুকটা কি রকম কচে। অবশ্য আমার এ রকম মধ্যে মধ্যে হয়। আজ রাতে আপনাদের বাটার সামনে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ খুব বেশী কষ্ট হোল, আর চলিতে পারিলাম না। আপনাকে খুঁজিলাম—তারপর এখানে এসে বসে আছি—আমায় মাপ কর্বেন।”

“না—না। আপনি বেশ করেছেন। আমার স্ত্রীও ঐ কথা বলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমার বাটার কাছে এসে পড়েছিলেন, নইলে পথের মাঝে হয়ত আপনার বিপদ হত।”

ডাক্তার ষ্টেথস্কোপটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, “আপনার—বুকটা একবার পরীক্ষা করি।”

“নিশ্চয়! আস্থন”—এই বলিয়া সে কোট খুলিল—শার্টের বোতাম খুলিল।

ডাক্তার, নীরবে এক মিনিট দুই মিনিট পরীক্ষা করিবার পর ধীরে ধীরে ষ্ট্রেট পকেটে রাখিলেন। তারপর পশ্চাৎ দিকে নিজ হস্তদ্বয় ঘুরাইয়া রাখিয়া কক্ষের মধ্যে পাইচারী করিতে লাগিলেন।

ঘড়িটা—বড়ই একঘেষে রকমে চলিতেছিল, বিনোদ বিরক্ত হইল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কে আছেন ?”

বিনোদ অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর দিল, “কা’কে চান? বাপ মা নেই বটে—তবে খুড়ো জ্যাটা—”

“থাক, আর বলতে হবে না—বিবাহ করেছেন ?”

“আজ্ঞে না! তবে শীঘ্র করবার ইচ্ছা আছে!”

ডাক্তার চক্ষু হইতে চশমাখানি খুলিলেন—কাঁচ দুইখানি মুছিলেন—আবার চশমা চোখে লাগাইলেন।

দূরে একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। কক্ষটা বড়ই নির্জন বোধ হইতে লাগিল। ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন, “শুনুন, আমার মতে রোগীর নিকট তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা ডাক্তারের গোপন করা কর্তব্য নহে! আমার বিশ্বাস আপনার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে।”

বিনোদ শ্লেষ জড়িত স্বরে বলিল, “সেই জন্তই ডাক্তার বাবু আমি বিবাহ করে সস্ত্রীক একবার হাওয়া বদলাতে যাব স্থির করিয়াছি।”

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আপনার বিবাহ করা উচিত নহে।”

বিনোদের আর এই অভিনয় ভাল লাগিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল,
“স্পষ্ট করিয়া বলুন।”

ডাক্তার সম্মুখে বিনোদের স্বক্কে একটি হস্ত রাখিয়া বলিলেন, “শুধু
তবে, আপনার বিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। মৃত্যু আপনার শিরে
দাঁড়াইয়া আছে। আপনার ক্ষয়রোগ হইয়াছে।”

সহসা ধরনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বিবর্ণ মুখে বিনোদ বলিল, “মিথ্যা কথা—
আপনার ভ্রম হইতে পারে।” তারপর টলিতে টলিতে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

* * * *

ডাক্তার ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের আলোকটা উজ্জ্বল
করিয়া দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, উষা তখনও জাগিয়া আছে। তিনি
বলিলেন, “তোমার সেই রোগীটিকে দেখিলাম। তাহার অবস্থা”—

উষা আর থাকিতে পারিল না! সে উঠিয়া বসিল ও ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,
“তার কি তবে কোন অসুখ”—

“অসুখ? তা’তে আর সন্দেহ আছে! তার যে কত বেশী অসুখ, তাহা
বেচারিা নিজেই জানে না! অভাগার কুসুম একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে!
আর এক মাসের বেশী সে বাঁচবে কি না সন্দেহ!” উষার নয়নপ্রাস্তে এক
ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী বিদ্যালয় এম-এ, বি-এন্।]

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে শিক্ষার সুযোগ ও রচনার অবসর পাইয়াছিলেন,
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাক, তাঁহার সাহিত্যসুচীর
কোনও প্রমাণ আছে কি না। এ কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে
এক্ষণে কোচবিহারে যে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে,
তাঁহার মধ্যে অধিকাংশই হয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বা তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিত-
বর্গের লেখা, নয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আজ্ঞায় নকল করান। মহারাজ
হরেন্দ্রনারায়ণ যে নিজে রচনা করিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহার নামযুক্ত নয়

খানি গ্রন্থ (১) উপকথা (২) বৃহদ্রশ্ম পুরাণ (৩) রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড (৪) স্কন্দ-পুরাণ—ব্রহ্মোত্তর খণ্ড (৫) মহাভারত—আদিপর্ক (৬) মহাভারত—সভাপর্ক (৭) মহাভারত—শল্য-পর্ক (৮) মহাভারত—ঐষিক পর্ক ও (৯) পদ্ম পুরাণ—ক্রিয়াযোগ সার । এতদ্ব্যতীত বৃহদ্রশ্ম পুরাণের শেষে “নিদাঘ বর্ণনা” নামক তাঁহার একটি খণ্ড কবিতা ও তাঁহার রচিত কয়েকটি সঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে । তাঁহার সভাস্থিত পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থের তালিকা দীর্ঘ । কেবল গ্রন্থ ও রচয়িতা-গণের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । হরেন্দ্রনারায়ণের আজ্ঞায় ব্রজসুন্দর ‘হিতোপদেশ’ ও ‘রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড,’ মহীনাথ শর্মা ‘মহাভারত অশ্বমেধ ও মহাপ্রাস্থানিক পর্ক,’ বৈদ্যনাথ ‘মহাভারত বনপর্ক ও মোঘলপর্ক,’ মাধব বিদ্যানিধি ‘স্বর্গারোহণ-পর্ক’ রঘুরাম ‘আদি পর্ক’ ‘ভীষ্মপর্ক’ ‘অযোধ্যাকাণ্ড’ কিঙ্কিকাকাণ্ড,’ ও ‘উত্তরাকাণ্ড’ রামনন্দন ‘নৃসিংহ পুরাণ’ লক্ষ্মীরাম ‘কর্ণপর্ক,’ ‘অযোধ্যাকাণ্ড’ কীর্ত্তিচন্দ্র ‘আশ্রমিক পর্ক,’ রুদ্রদেব ‘আদিপর্ক’ ও ‘অরণ্যাকাণ্ড’ রিপুঞ্জয় ‘ব্রহ্মখণ্ড,’ সারদানন্দ ‘কাশীখণ্ড’ ও ‘উত্তরাকাণ্ড’ এবং শচীনন্দন ও রামনন্দন ‘ধর্ম্মপুরাণ’ অনুবাদ করেন । ব্রজসুন্দর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

“কবিতা কামিনী কান্ত শাস্ত শিরোমণি ।

গুণি-গণ-গণনার অগ্রে ষাক গণি ॥”

[হিতোপদেশ]

কেবল রচনার দিক দিয়া নহে, বিভিন্ন দেশ হইতে পুঁথি সংগ্রহেও হরেন্দ্রনারায়ণ সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন । আসামে প্রাপ্ত গন্ধর্কনারায়ণের বংশাবলীতে আছে—

“বিহারের অধিপতি হরেন্দ্রনারায়ণ ।

দূত পাঞ্চি নিয়ে গেল বংশাবলী খান ॥

আর এক বংশাবলী পাছত নির্মিলো ।

ছাহবক দিবে রাজা বিজয়ক দিলো ॥”

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ দূত প্রেরণ করিয়া গন্ধর্ক নারায়ণের বংশাবলী পুঁথির একখণ্ড আসাম হইতে আনাইয়া-ছিলেন । কেবল সংগ্রহে নহে, প্রাচীন পুঁথি রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার চেষ্টারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ।

নারদীয় পুরাণস্তম্ভগত গঙ্গানাহাঙ্গ্র্য নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । ইহার রচয়িতা নারায়ণ । ইনি মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময় বিদ্যমান

ছিলেন। উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা খড়্গনারায়ণের আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়।
গ্রন্থ শেষে আছে—

“জয় খড়্গ নারায়ণ নৃপতি-তনয় ।

শুণবস্ত্র সস্ত্র সাধু সজ্জন আশ্রয় ॥

ভাঁহার আদেশে তাঁর আশ্রিত ব্রাহ্মণ ।”

নিগদ্যতি মতি অনুসারে নারায়ণ ।”

এই পুঁথিখানি অতি জীর্ণ হইয়া যাওয়াতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ইহার
একখানি নকল করাইয়াছিলেন। নকলের শেষে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে
তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্বাদশ জনে মিলিয়া পুঁথিখানি নকল করেন।
তন্মধ্যে স্বয়ং মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও ছিলেন।

“ইতি ঐনাদি পুরাণের পদ যত ।

দ্বাদশ জনেতে লিখি কৈল সমাপত ॥

মল্লবংশ অবতংস ঐহরেন্দ্রভূপ ।

রমণীর মানমণি-তপস্বী স্বরূপ ॥

পুরাণ স্বরূপ বৃক্ষ ভাঁহার নিদেশে ।

জীর্ণপর্বে নব তরু হইল বিশেষে ॥”

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নকল করা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে “তাতপরে
লিখিল কতেক মহারাজ।” মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং নকলকারীদের
মধ্যে ছিলেন ইহা ভাঁহার কম গৌরবের কথা নহে। প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষায় অত্যধিক
আগ্রহ না থাকিলে একরূপ ভাবে স্বয়ং নকল করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মহারাজের
পক্ষে সম্ভব হইত না।

কেবল সাহিত্যে নহে, শিল্প, সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রতিও মহারাজ হরেন্দ্র-
নারায়ণের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কোচবিহারে এখনও যে সকল এতদেশীয়
শিল্পী পিত্তলের দেবদেবীমূর্তি গঠন করে তাহাদের মুখে শোনা যায় এই শিল্প
অন্য দেশ হইতে কোচবিহারে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণই প্রথম প্রবর্তিত করেন।
তাহারী এ কথাও বলে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ মিজের সময় সময় এই শিল্প
অভ্যাস করিতেন। জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যানে আছে—

“শিল্পকর্ম্ণ যাহা দৃষ্টি তাহা তৎকালীন শিক্ষা করেন।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৮ম
অধ্যায়) অবশ্য প্রবাদ ভিন্ন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নিজ হস্তে মূর্তি গঠনের
আঁর কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু জয়নাথ মুন্সীর বাক্যানুসারে মহারাজ হরেন্দ্র-

নারায়ণের যে শিল্প শিক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তিনি এই মূর্তি গঠন শিল্পের প্রবর্তনিতা কি না তাহা বিষয়ে অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যিক ।

চিত্রকলায় হরেন্দ্রনারায়ণের অনুরাগ সম্বন্ধে জয়নাথ লিখিয়াছেন—“ভূপতির বাল্যকাল হইতে চিত্রপটের প্রতি অতি শ্রদ্ধা । কয়েকজন চিত্রকর অতি নিকটে থাকিয়া আত্মা প্রমাণে নানা পট নানা প্রকার চিত্র করে । কখনও স্বহস্তেও চিত্র করেন ।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়) আর এক স্থলে জয়নাথ লিখিয়াছেন যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ “চিত্রেতে অদ্বিতীয়, লোক সকলের এবং পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন ।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৮ম অধ্যায়)

সঙ্গীতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অধিকারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাইয়াছি । তাঁহার বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে জয়নাথ বলিয়াছেন—“গানবাদ্য সকলই শিক্ষা করিলেন এবং তালমান ও রাগরাগিণী এমত বৃত্তিতে লাগিলেন যে, উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশক্তি হইয়া হৃদয়ে গান করেন ।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেও যে সঙ্গীত রচনা করিতেন তাঁহার কথাও জয়নাথ বলিয়াছেন—“নানা প্রকার গান সকল তালমান রাগ-রাগিণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন ।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রচিত সঙ্গীত সকলের গায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অধ্যাত্মবিষয়ক সঙ্গীত সকল এক সময়ে কোচবিহারের বহির্দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক সংকলিত “বিবিধ-ধর্মসঙ্গীত” নামক গীত সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ২৯১ ও ২৯২ পৃষ্ঠায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত দুইটী গীত উদ্ধৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটী গীত সম্পূর্ণ অপরটী অসম্পূর্ণ । সেই দুইটী গীত এইস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

প্রথম গীত ।

(বেহাগ—চিমে তেতাল)

ভুবন ভুলানে রে কার কামিনী, ঐ রমণী ।
 বামার করে করাল শোভিছে ভালে করবাল যেন দামিনী ॥
 সজল জলদ শোণিত অঙ্গে
 নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিস্তঙ্গে (রে)
 শিঙের শিশু শশী, ষোড়শী রূপনী, শশীমুখী, কাশীবাসিনী ॥
 অট্ট অট্ট হাসিছে রে
 নাশিছে মনুজ মাইভে ভামিছে রে
 শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, যদি প্রকাশিছে তব রূপে ভবজননী ॥

দ্বিতীয় গীত ।

(ষাড়া — একতারা)

তার কিশমনে ভয় না যার শ্রামা ।

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কম,

ভবে কি আছে ভয়,

• অস্তে যাবো তার ধামে বাজাইয়া দামা ॥

শেষোক্ত গীতটির দুইটি পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অন্যান্য গীত এতদেশে ও অন্ত্র মুখে মুখে প্রচলিত থাকা সম্ভব। সাহিত্য-সভার সভ্যগণ ও সভ্যতার ভদ্রমহোদয়গণ যদি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের কোনও সঙ্গীত অবগত থাকেন তাহা হইলে সেগুলি জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত এ সকল গীত গৃহীত হইবে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের পরিচিত গায়কদের নিকটও এ সম্বন্ধে সাহায্য পাইতে পারিবেন ইহাও আশা করা যায়। সকলের সম্মুখে চেষ্টায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি সঙ্গীতও বিস্মৃতি গর্ভ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কোচবিহার সাহিত্য সভার মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করি।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্যানুরাগ তাঁহার অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রথমা মহিষী পদ্মনাথ কার্যীর হুঁত “গরুড় পুরাণে”র বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। ‘গরুড় পুরাণে’র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। অসম্পূর্ণ যে একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রথমার্শের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে এ কথা জানিতে পারা যায় :—

“বিহার অমরাবতী পতি নরেশ্বর ।

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভোগে পুরন্দর ॥

তার বড় মহিষী রূপসী শিরোমণি ।

পদ্মিনী স্বরূপা পদ্মনাথের নন্দিনী ॥

সে যে রাণী আই আজ্ঞা করিল আমারে ।

অ (বগতি) জনা এহি পুঁথি লিখিবারে ॥”

এই সকল বিষয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালে কোচবিহারে সাহিত্য-চর্চা যথেষ্ট হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহে, ধ্বংসপ্রায় পুঁথি নকল করাইয়া পুনঃ রক্ষার ব্যবস্থায় নূতন নূতন গ্রন্থ-রচনায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের যুগ কোচবিহারের ইতিহাসে অরূপীয় হইয়া থাকিবে।

এই যুগপ্রবর্তক মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে সাহিত্য-রচনায় অনুপযোগী ছিলেন এ কথা বলা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার যে কাহিনী জয়নাথের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহাতে তিনি যে গ্রন্থরচনা করিতে অশক্ত ছিলেন তাহা কোন ক্রমেই বলিতে পারা যায় না। জয়নাথ ত স্পষ্টই মহারাজের গ্রন্থরচনার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে হরেন্দ্রনারায়ণের জীবনে সাহিত্য-চর্চার সুযোগ ও সুবিধা ছিল এবং তাঁহার সাহিত্যানুরাগও প্রবল ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থগুলি হইতে এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না তাহাব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সাধারণতঃ যাহারা পরের রচনা নিজের বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ রচনার মধ্যে কাহারও নাম উল্লেখ করিয়া ঋণ স্বীকারে প্রবৃত্ত হন না। কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা থাকে এইরূপ ঋণ স্বীকারে কেহ প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ফেলিবে। আরও একটা কথা, যখন আগাগোড়া গ্রন্থই অপরের লিখিত তখন আর ঋণ স্বীকার করিবারই বা প্রয়োজন কি? অতএব যদি কোন গ্রন্থে লেখককে কাহারও নিকট ঋণ স্বীকার করিতে দেখি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানাই যে অপরের রচনা এ সন্দেহ সহজে আমাদের মনে স্থান পায় না। হরেন্দ্রনারায়ণের “উপকথা” নামক গ্রন্থে আছে :—

শিববংশে জাত,	অবনী বিখ্যাত	বিদ্যাসিংহ অনুপাম ।
তাহার তনয়	অতি সুবিনয়	নরনারায়ণ নাম ॥
বাতবীর্য্যে সম্ভ	করিয়া বিক্রান্ত	আক্রমিতা বহুদেশ ।
তাহার তনয়	হৈল সে সময়	লক্ষ্মীনারায়ণ শেষ ॥
মেহি বংশে জাত	ভুবন বিখ্যাত	ধৈর্গোল্ল নাম নরেশ ।
তাহার তনয়	অতি অবিদয়	হরেন্দ্র নাম যে শেষ ॥
ভাষা বন্ধ ছন্দ	করিতে প্রবন্ধ	কেতাবের এককথা ।
সামান্ত জনায়	তাক না বুঝয়	এই হেতু যে সন্দেহ ॥
জয়নাথ নাম	গুণ অনুপাম	মুনসী কার্য্যে সেবক ।
তার প্রমুখাত	শুনিয়া পশ্চাত	আরম্ভিলাম এ কথাক ॥”

শেষোক্ত পংক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হরেন্দ্রনারায়ণ ‘উপকথা’ নামক গ্রন্থের উপাখ্যান জয়নাথ মুনসীর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া পরে ইহাকে পদ্যে রচনা করেন। এই ‘উপকথা’র উপাখ্যান ফারসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত। তাই “কেতাবের কথা” সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্ত মহারাজ হরেন্দ্র-

নারায়ণ বাঙ্গালা কবিতায় 'উপকথা' রচনা করিয়াছেন। যদি আদ্যন্ত গ্রন্থটিই অপরের রচিত হইত তাহা হইলে 'জয়নাথের নিকট গল্পটি শুনিয়া এই গ্রন্থ লিখিলাম' এ ভাবের কথা গ্রন্থে বর্তমান থাকা অসম্ভব হইত। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া খুঁটি নাটিতে পর্য্যন্ত সাবধান হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এ স্থলে ত একরূপ মিথ্যা উল্লেখের কোনও প্রয়োজনই দৃষ্ট হয় না।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ "স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মোক্তর খণ্ডের" বঙ্গানুবাদ করেন। এই গ্রন্থ রচনার সময় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের মনে কাশী গমনের অভিলাষ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ শেষ বয়সে কাশীধামে গমন করেন ও সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। এই ঐতিহাসিক সত্যের সহিত পুঁথির অধ্যায় শেষের ভণিতাগুলি আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে কাশীগমনাভিলাষ কিরূপে মহারাজের মনকে আয়ত্ত করিল তাহা ভণিতার বচনগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভণিতায় আছে :—

“আশুতোষে আরাধিলে চতুর্সর্গ কল মিলে
অতঃপর চল বারাণসী ।
কি ভ্রমে ভ্রমিছ মন মিথ্যা দারা ধন জন
কি ভাবনা ভাব দিবানিশি ॥
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণে সুনব কবিতা ভণে
ভাবি মনে ভবপদমন্ডে ।
আনন্দ কাননে মন যাত্রা কর এহিঙ্গণ
না পাইবে তবে ভালমন্ডে ॥”

আর একস্থলে আছে :—

“শ্রীহরেন্দ্ররূপে ভাবে মনে এহি আশা ।
কাশীনাথ কাশীক্ষেত্রে ধ্রুবে দিবে বাসা ॥”

অন্য একস্থলে দেখিতে পাই—

“কুস্তিবাস নিবাসে নিবাস কর মন ।
চতুর্সর্গ কলপ্রাপ্তি আশায় এখন ॥
অতঃপর হর গঙ্গাধর পদে মজি ।
অনিত্য এ তমু তালি গঙ্গাজলে মজি ।
মান' মন এহি মুক্তি, হবে মুক্তি তবে ।
হরেন্দ্রে কহিছে তবে না আসিবে তবে ॥”

আর একস্থলে আছে :—

“শিব শিব বল জীব চল শিবধাম ।

দেহান্তে পাইবা মোক্ষপদ অনুপাম ॥”

এইরূপ আরও অনেক পংক্তি আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। কেবল ইহাই নহে, এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত না হইতেই হরেক্ষনারায়ণ কাশীযাত্রা করেন। পরে আর গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার অবসর পান নাই। শেষে কীর্তিচন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে আদেশ দেন। গ্রন্থের সার্বিক সপ্তদশ অধ্যায় মহারাজের বচনা, অবশিষ্ট কীর্তিচন্দ্রের লেখা। ইহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পংক্তিগুলি কীর্তিচন্দ্রের রচিত।

“সেহি শিব অংশে শিববংশে অবদাত ।

ঐহরেন্দ্র মানবেন্দ্র দেবেন্দ্র সাক্ষাত ॥

সেহি মহীপতি কাশীগমনের আগে ।

বেহারেতে বিহরিতে অতি অনুরাগে ॥

শঙ্করপুরাণের ব্রহ্মোত্তরখণ্ড নাম ।

ত্রিনেত্রের চরিত্র পবিত্র পুণ্যধাম ॥

তার সার্বিক সপ্তদশ অধ্যায় পয়ার ।

আপনে ভূপালচন্দ্র করিতে তয়ার ॥

বারাণসীগমন ঘটিল নৌকাপথে ।

যাত্রাবধি পৈল ভূপ নানা আবাল্যেতে ॥

সেহি হেতু বৃষকেতু গুণসম্বীর্ণন ।

বিরচিত্তে না পারিলা নৃপতিরতন ॥

অকবাণ ঋষিশ্রী শাকে নিদাৰ্ঘ্যেতে ।

বৃষরাশি মাথে গ্রহরাজ প্রকাশিতে ॥

পাটনা উত্তর গঙ্গারীপ মিথিলাতে ।

গণ্ডকী সঙ্গম তথা পবিত্র ভূমিতে ॥

বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ এহি দুই মাস ।

সেহি স্থানে নরপতি করিতে নিবাস ॥

একদিন এ দিনেরে সদয় অন্তরে ।

কৃপাময় নররায় সাদরে আয়ারে ॥

ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের অপর অধ্যায়ণ ।

আজ্ঞা দিল পদ তার করিতে রচন ॥”

যিনি অপর ব্যক্তি দ্বারা গ্রন্থ লিখাইয়া নিজ নামে প্রকাশ করেন তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে কখনও এরূপ অংশ থাকিতে পারে না। সমস্তটাই যদি অপরের লেখা হয়, তাহা হইলে কতকটা নিজ নামে, বাকিটা অপরের নামে প্রকাশ করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

[ক্রমশঃ ।

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় ।

[লেখক—মোহাম্মদ কে, চাঁদ ।]

বাঁকিপুরে গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিষয়-নির্বাচন-সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন ‘কি হেতু যে মুসলমানেরা সাহিত্য-সভায় যোগদান করেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।’ তদন্তরে আমি সেই সময় বলিয়াছিলাম যে, “তাঁহাদিগের যোগদান না করিবার কারণ এই যে, হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দু-সাহিত্যিকের মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মের ছিদ্রাবেষণ করা, রাজললনাগণের উপর বৃথা কলঙ্কারোপ করা এবং ‘মুসলমান’ শব্দের পরিবর্তে ‘নেড়ে,’ ‘চাষা,’ ‘যবন,’ ‘শ্লেচ্ছ,’ ‘তেতুল নয় মিষ্টি, আর নেড়ে নয় ইষ্টি,’ প্রভৃতি নিদারুণ শেল সদৃশ বাক্যবাণ, উপহাস, নাটক ও এমন-কি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পর্য্যন্তও ব্যবহার করা, আজও পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহারা হিন্দুর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন।” অতঃপর বলিয়াছিলাম, “এইহেতু আমার ইচ্ছা এই-যে, ইহার প্রতিকার সাহিত্য-সম্মিলন সভা হইতে হওয়াই উচিত।” তদন্তরে, ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন যে “ইহা সত্য যে, হিন্দুদিগের অন্তরে বিদ্বেষ ভাব আছে। আপনি কি বলিতে চান যে এই ভাব তিরোহিত হইবে? এ ভাব আছে, ছিল এবং থাকিবে! হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে লিখিয়া থাকেন, তাহাও সত্য। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে কত লোককে শাসন করিব? আপনারা একরূপ লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন।”

ইহাই সাহিত্য-সম্মিলন সভার কর্ণধারগণের মনোগত ভাব, উদ্দেশ্য বা মস্তব্য।

হিন্দুরা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়া মুসলমানদিগের অন্তরে ব্যথা দিবে, আর মুসলমানেরা তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া সাহিত্য-আলোচনা করিবে। ইহা যুক্তিসঙ্গত কথাই বটে।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মনোগত ভাব এই যে, আমরা মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিব, অতীতিহাসিক ব্যাপার অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রকাশ করিব— ঐতিহাসিক (কাল্পনিক নহে) রাজকুমারিগণকে

উপস্থানের নান্বিকা করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিব—নাটকে প্রসিদ্ধা রাজললনাগণের করিত প্রণয়-প্রার্থীর প্রেম রহস্য অঙ্কে অঙ্কে প্রস্ফুটিত করিয়া অভিনেতা-অভিনেতৃগণের দ্বারা অভিনয়ের সাহায্যে দর্শকবৃন্দের চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিসাধন করিব ; আর তোমরা মুসলমান, তোমরা ওদিকে জ্ঞপ্ত না করিয়া, মনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে, ভাষার উন্নতিকল্পে, জাতীয় মিলনের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান দিয়া আন্দোলন সংস্কে উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে আমাদিগের সহিত মিলিত হইবে !

মুসলমানদিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে সকল প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, মজুমদার মহাশয় তাহারও প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছিলেন । প্রতিবাদ করিতে মুসলমানেরা প্রস্তুত । কিন্তু প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ হিন্দু সম্পাদক মহাশয়ের প্রকাশ করিতে সম্মত হন না । ‘সংঘের অভাব’—‘হানাভাব’ প্রভৃতি মন্তব্যের সহিত ফেরতই দিয়া থাকেন । এইরূপ কয়েকটা ঘটনা ঘটয়াছে ।

অনেকেই হয়ত বলিতে পারেন যে, এখন আর মুসলমানের উপর দোষারোপ প্রকাশক কোন কিছুই লেখা হয় না । কিন্তু, গত শ্রাবণ মাসের ‘ভারতবর্ষ’ ও ‘মানসী ও মর্মান্বী’তে এইরূপ মুসলমান-ঘৃণাব্যঞ্জক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ।

একগুণে কথা এই—ইহাই কি মিলনের রীতি ? যদি কোন পল্লিগ্রামস্থ দুইজন প্রতিবেশীর পরস্পর বিবাদ হয়, আর পরস্পর পরস্পরের যদি ক্ষততই কুৎসা, নিন্দা ও কলঙ্ক প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে কখনও কি মিলন আশা করা যায় ? কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন যদি সমস্ত ক্রোধ, হিংসা, কুৎসা ও নির্দাবাদ ছাড়িয়া অস্ত্রের মিলন-প্রত্যাশী হয়, তাহা হইলে অপরজনও মর্মান্বিতিক কথাগুলি বিশ্বস্ত হইতে পারে এবং উভয়ের মিলনও সম্ভবপর হইয়া উঠে ।

এই হেতু আমি বলিতে পারি যে, আমাদের হিন্দু-প্রতিবেশী-ভ্রাতারা বিজ্ঞ বুদ্ধিতে, ধনে-মানে সকল দিকেই মুসলমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তাঁহাদের ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি লেখকের সংখ্যাও গণনাহীন । তাঁহারা বিদ্যালাত করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন । আর আমরা মুসলমান অর্থে-সামর্থ্যে, বিজ্ঞাবুদ্ধিতে, মানসম্মত সর্বদা বিষয়েই হীনপদ হইয়া

তঁাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি । জ্ঞানের নিম্নতম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চতম সোপানে তঁাহাদের জ্ঞান-গরিমার ছায়া-দর্শন করিতেছি মাত্র । আর মধ্যে মধ্যে তঁাহাদের লেখনি-নিঃসৃত মুসলমান-অবজ্ঞাসূচক লেখার প্রতি ঘৃষ্ণিপাত করিয়া মর্শ্বাহত হইতেছি । তাই বলিতেছি ভাই হিন্দু ! যদি মুসলমানকে ছাড়িয়া ভারত উন্নতি বা সাহিত্যের উন্নতি, অসম্ভব হয়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় অবজ্ঞাসূচক লেখা পরিহার করা তোমাদের উচিত । এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন-সভায় বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত । যঁাহারা সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ণধার, যঁাহারা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ লেখক, যঁাহারা বাঙ্গালার নেতা ও যঁাহাদের কথা বিধিবদ্ধ আইনবাক্য বলিলেও চলে, তঁাহাদের উচিত এই বিষয় বিশেষ যত্ন লওয়া । তঁাহাদের উচিত বিচ্ছেদের কারণ অনুসন্ধান করা । তঁাহাদের উচিত ইহার প্রতিকার করা । আমার মতে সাহিত্য-সম্মিলন সভাই ইহার প্রতিকারের একটি প্রকৃষ্ট স্থল । কারণ এখানে বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর লেখকই সমবেত হইয়া থাকেন । এখানে রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সাহিত্যিকের হিসাবে আসিয়া সম্মিলন-কার্যে উৎসাহ দিয়া থাকেন ও সাহিত্যাহুরাগের পরিচয় দিয়া থাকেন । অতএব তঁাহারাই ইহার কর্ণধার । তঁাহারাই এরূপ মনোমালিন্য দূর করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় । এতদ্ব্যতীত যঁাহারা নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে এবং মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে মুসলমানের উপর ঘৃণার উদ্রেক করেন, অনৈতিহাসিক বা ইতিহাস প্রমাণ বিরুদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া মুসলমানের শ্রাণে আঘাত করেন, তঁাহারাও এখানে উপস্থিত থাকেন । সুতরাং মনে হয়, যদি সাহিত্য-সম্মিলন সভায় এই বিষয়ের প্রতিকারের কল্পে লেখকগণকে এরূপ জাতীয় বিদ্বেষভাবজনক প্রবন্ধাদি না লিখিতে অনুরোধ করেন, এবং সম্পাদক মহাশয়গণ প্রবন্ধাদি ছাপিবার পূর্বে মুসলমানের আপত্তিকর বা মর্শ্বাস্তিক কথাগুলি বাদ দিয়া উহা পত্রস্থ করেন, তাহা হইলে এরূপ লেখার গতি বোধ হয় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে পারে ।

কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-রথীগণের যেরূপ মনোগত ভাব তাহাতে বোধ হয় না যে তঁাহারা এরূপ কার্যে ব্রতী হইবেন—তাহাতে বোধ হয় না যে তঁাহারা এরূপ একটা গুরুতর বিষয়কে প্রাধান্য দিবেন এবং মুসলমানদিগের অনুরোধের প্রতিকারে সচেষ্ট হইবেন । কিন্তু বতদিন ইহার প্রতিকার না

হইবে, ততদিন মনে-মনে, প্রাণে-প্রাণে মিলন অসম্ভব। জাতীয় সাহিত্য-গঠন, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন, জাতীয় একতা-স্থাপন যাহা বঙ্গবাসীর সাধনা, যাহা সার্ব আন্তত্বের মুখোপাধ্যায়ের জায় বঙ্গের সুধীশ্রেষ্ঠ মহাজনগণের ইচ্ছা, তাহা কখনই পূর্ণ হইবে না, যতদিন হিন্দু মুসলমানের পূর্ণ মিলন না হইবে। জাতীয় কুৎসার, জাতীয় ঘৃণার কখনও জাতীয় মিলন হয় না! হিন্দু শিক্ষিত, উন্নত এবং জ্ঞানী। অস্ত্রের কুৎসা রটনা কি জ্ঞানীর কার্য্য? মুসলমানেরা অবনত, বিজ্ঞান পশ্চাৎপদ হইলেও হিন্দু কখনই মুসলমানকে ছাড়িয়া কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন না, যে হেতু মুসলমানেরাও বঙ্গবাসী, ভারতবাসী একুণে আর ভিন্ন দেশবাসী নহে। যদি বাঙ্গালার হিন্দুরা শিক্ষোন্নত বলিয়া মুসলমান খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা গঠন করিতে পারেন, তাহা হইলে মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে ছাড়িয়া একটি মুসলমানী বাঙ্গালা গঠন করিতে পারিবেন একুণ আশা করা যায়। কারণ বঙ্গদেশে—আধুনিক মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহা হইলে তো জাতীয় মিলন হইল না বা প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা গঠন হইল না। সম্ভবতঃ ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। জাতীয় মিলনই উদ্দেশ্য। সেইজন্য প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া আমি সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলনীর কর্ম্মকর্তাদের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অগ্নি-পরীক্ষা ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

(১)

আত্মাভিমান, আত্ম-মর্যাদা, আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কতকগুলো শব্দের মোহে, আমরা পর্যত্রিশজন কেবাণী 'বন্দে মাতরম' বলিয়া ইংরাজ সওদাগর সওয়ার কোম্পানীর দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিলাম। দেশে একটা ছলছল পড়িয়া গেল, আমাদের যশোগানে দেশীয় সংবাদপত্রগুলো ভরিয়া উঠিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য দেশের জনকয়েক নেতা ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে লইলেন। গৃহস্থ বাঙ্গালীরা যথান্নাধ্য টাকাটা শিকাটা ফেলিয়া সেই ভিক্ষার ঝুলি-পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

কিন্তু যে ভাবাত্মক শব্দগুলার' মোহে পড়িয়া আমি কষ্টের রোমা মাথায় তুলিয়া লইলাম, সেই শব্দগুলো বিশ্বত হইয়া উদরানের জন্ত স্বজাতির নিকট হাত পাতিতে পারিলাম না। কুর্শের জন্ত অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলাম, কোথাও দাসত্ব করিবার অধিকারটুকু পাইলাম না। বৃদ্ধা পিসিমা বলিলেন—“লালু, বাপ এমন কুর্শ কেন করলি, হাতের লক্ষ্মী কেন পায়ে করে ঠেললি” ? আমি কি উত্তর দিব, কি বলিব ? সাধ্বী স্ত্রী হাসিমুখে আমার অন্ত দিত, একমাস পরে শুনিলাম, সে নিজে মাত্র এক সন্ধ্যা আহার করে। বুকের পঁজর ভাঙ্গিয়া গেল, বুকের রক্ত জমিয়া গেল। হায় হায় ! কেন এমন কুর্শ করিয়াছিলাম !

সরলার ভাতারা ধনী। ধনী বলিয়া আমি তাহাদের বাটী সাধ্যমত যাইতাম না। তাহারাও আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমার সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ কাটাইয়াছিল। কিন্তু সরলা ত' তাহাদের ভগ্নী। আমার বুকের মধ্যে কি একটা ভাল পাকাইয়া উঠিতেছিল, আপনার উপর বিষম ঘৃণার উদ্বেক হইতেছিল। আমি সহধর্মিণীর হাত ধরিয়া বলিলাম—“ওগো তুমি আমায় আরও হীনবল করছ। তুমি কিছু দিনের জন্ত তোমার ভাইয়েদের কাছে যাও। আমার অবস্থা ভাল হলেই আমি তোমায় আনব।” সে হাসিয়া বলিল—“কেন, তোমার তেজ আছে আমার নেই ? আমি কেন ভাইয়ের ভাত খাব ?” আমার চক্ষে জল আসিল, বলিলাম—“কেন ? তোমার অপদার্থ স্বামী তোমায় ভাত দিতে পারে না বলে।” সে হাসিয়া বলিল—“এই মনের তেজ নিয়ে ধর্মঘট করেছ ?”

সরলা তাহার পর দুই বেলা খাইল, কিন্তু রশদ ফুরাইল। গৃহে যাহা ছিল ঠিক দুই মাস চলিল। প্রতিদিন বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। রাত্রে ঘুম হয় না। পাছে সরলা জানিতে পারে তাই চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিতাম। তখন সরলা আমার গায়ে হাত দিয়া দেখিত, আমার পঁজরার হাড়গুলো কতটা বাহির হইয়াছে, চক্ষের চারিদিকে কতটা গুঁঠ হইয়াছে। তাহার চক্ষের তপ্ত জল এক একদিন আমার গাত্রে পড়িত। কি মনে হইত, কি ভাবিতাম, কি জ্বালায় জলিতাম তাহা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই।

(২)

স্বাস্থ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কাল অনশনে থাকিতে হইবে। আমার জন্ত ভাবি নাই, ভাবিয়াছিলাম সেই দুইটা অভাগিনীর জন্ত। পিসিমা

‘মুখে আমার সাহস দিতেম, কিন্তু ঘুকের ভিতর কি জালা সহ করিতেন তাহা বুঝিতাম। আর যাহাকে ধর্মসাক্ষ্য করিয়া বিবাহ করিয়াছিলাম তাহার মুখে একমুঠা অন্ন দিতে পারিব না ? হা ভগবান !

সন্ধ্যার পর বাহির হইলাম। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল, পথ কন্দম্বর, পিচ্ছিল। ঠিক বাহির হইবার পূর্বে সরলা হাত ধরিয়া বলিল—“কোথা যাও ?”

আমি বলিলাম—একজন রাজে দেখা করতে বলেছে, একটা কর্ম হ’তে পারে।

মিথ্যা কথা! সরলা আপত্তি করিল না। আমি বারান্দার জুতা পরিতে ছিলাম। ঘরের ভিতর খুব আস্তে পিসিমা বলিলেন—ও বোঝা, খেরোতে দিলে কেন? মনের দুঃখে না বাপু একটা কিছু—

স্বী বলিল—পাগল হয়েছেন পিসিমা, আমাদের দু’জনকে কি ছেড়ে যেতে পারবেন। বেটা ছেলে চেঁচা করুন না। মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেলাম। দিমের বেলা দেখিতাম উপার্জন করা যায়, কিন্তু পোড়া আত্মমর্যাদার ভয়ে পিছাইতে হয়। আজ রাতে আর মাম-অপমানের ভয় করিব না। রাতে নিশ্চয় মোট বহিয়া উদরানের সংস্থান করিব। কেহ চিনিবে না, কেহ জানিবে না। আত্মহত্যা—অসম্ভব। সরলা ঠিক কথা বলিয়াছিল—তাহাদের দুইজনকে কাহার হস্তে সঁপিয়া যাইব ?

আর্দ্রদেহে বাজারে বাজারে ঘুরিলাম—মোট পাইলাম না। একজন ভদ্রলোক জোড়াসাঁকোর একটা দোকান হইতে অনেকগুলো কাপড় কিনিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কাছে গেলাম, মুখ ফুটিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিছুকণ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন—কি মশায় ?

আমি খুব সাহস করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম—আজ্ঞে মুটে।

তিনি রসিক, বলিলেন—বল কি ?

আমি বলিলাম—মশায় আমার ঘরে অন্ন নাই। আপনার মোট লইলে যদি দুইটা পরসো পাই কাঁচ মুড়ি—

তিনি বলিলেন—কি বাবা সখের ব্যতীর মহলা দিচ্চ। গল্যাটুলাওলা ঠিক করেছে, কিন্তু পোষাকটা ত’ যাছ, করতে পারনি।

আমি পোষাকের দিকে চাহিলাম। বাস্তবিক ভুল করিয়াছিলাম। এ বেশে মোট বহা চলে ন্য। লোকটা চলিয়া গেল, আমি তাহার দিকে হতাশ ভাবে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর জোরে জল পড়িতে লাগিল। আমি পথের ধারে একটা বারান্দার তলার আশ্রয় লইলাম। পথে জনপ্রাণী নাই, ঝমঝম করিয়া জল পড়িতেছিল। একটা কুকুর আসিয়া আমার পাশে বসিল। মুখে কাতর ভাব—আমারই মত বিপন্ন।

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম। সে সোহাগে গলিয়া গেল। আমার পদলেহন করিতে লাগিল, লেজ নাড়িতে আরম্ভ করিল।

বৃষ্টি থামিল। আমি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছু দূরে গিয়া দেখিলাম কুকুরটা অনুসরণ করিতেছে। আমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইতে গেলাম। সে শুইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল, আমি চলিলে আবার অনুসরণ করিতে লাগিল।

কি সমস্যা! আমার গৃহে উপবাস করিতে হইবে জানিলে কুকুরটা কখনই আসিত না। কিছুদূর গিয়া বড় বিরক্ত হইলাম। কুকুরটাকে পদাঘাত করিলাম, সে ভূমিতে শুইয়া লাজুল নাড়িল, বিরক্ত হইল না। কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল।

কুকুরটা অনুসরণ করিতেছিল। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমার পদপ্রান্তে নুটাইতে লাগিল। আমি তাহার উপর বিরক্ত হইলাম না। তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম—“চল, তিনজনে উপবাস করতাম না হয় চারজনে করব।”

সে বড় আশ্বস্ত হইল। এবার আর চোরের মত অনুসরণ করিল না। খুব প্রকাশ্য ভাবে একবার অগ্রে ছুটিল, একবার পিছনে ছুটিল, একবার বামে, একবার দক্ষিণে। মাঝে মাঝে চীৎকার করিল। তাহার বড় আনন্দ আমি তাহাকে সঙ্গে থাকিবার অনুমতি দান করিয়াছি।

হঠাৎ সে পথের প্রান্ত হইতে একটা পুঁটুলি মুখে করিয়া আনিল। আমার প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। এই জন্তই কি ভগবান ইহাকে আমার জীবন-পথে পাঠাইয়াছিলেন? নিশ্চয় পুঁটুলিতে অর্থ আছে।

(৩)

হ্যাঁ! অর্থ ছিল ছয়খানি দশ টাকার নোট। আমি অনিন্দে সেই নির্জন পথে হাততালি দিয়া নাচিলাম। কুকুরটাকে কোলে তুলিতে গেলাম, সে পায়ের তলায় নুটিয়া পড়িল। কি আনন্দ! কি শান্তি!

কিন্তু তখনই চমক ভাবিল। কাহার অর্থ! কাহার সম্পত্তি! নোট-গুলার সঙ্গে একখানা দলিল ছিল। গ্যাসের আলোকে মালিকের নাম পড়িলাম। ঠিকানা দেখিলাম। সেই পথে যাইবার সময় তিনি পুঁটুলিটি ফেলিয়া গিয়াছেন, একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে এ অর্থ প্রত্যর্পণ করা যায়।

আবার ভাবিলাম, ভগবান যখন বুড়ুফুর সন্মুখে অন্ন রাখিয়াছেন, তখন সে অন্ন পায়ে ঠেলা কি অধর্ম হইবে না? গৃহের অসহায় রমণী দুইজনকে স্মরণ করিলাম। এ অর্থ ফেলিয়া দিলে তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইবে। আমার কি অধিকার আছে তাহাদিগের অন্ন—

কিন্তু আত্ম-মর্যাদা! ইহার অপেক্ষা কিন্তু ভিক্ষা ভাল। কেন? এ অর্থ পাইবার জন্য তু কাহারও বশ্বতা স্বীকার করিতে হয় নাহি। আচ্ছা! যিনি এ অর্থ ফেলিয়া গিয়াছেন তিনি খুব অর্গবান। দলিল হইতে তাহা প্রমাণ হইতেছিল। আমি যদি পরে তাঁহাকে এ অর্থ প্রত্যর্পণ করি? ঘাট টাকায় আমার অন্ততঃ তিন মাস চলিবে। তাহার মধ্যে চাকুরি জোগাড় করিয়া তাঁহাকে টাকা ফেরত দিব। না না, উপস্থিত অন্ন ছাড়িব না। এ অর্থ আমি রাখিব।

বাটার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে হাতে পুঁটুলিটা ছিল যেন সে হাতটা জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিল। এত জলে ভিজিয়াছিলাম, একটু পূর্বে শীতে কাঁপিতেছিলাম, এখন যেন সর্বশরীরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। আমি কিন্তু মনকে দৃঢ় রাখিলাম। পুড়িয়া মরিতে হয় নরিব, লব্ধ-ধন ত্যাগ করিব না, দুইটা অসহায় রমণীকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না। পরে নরকে যাইতে হয়, আমি যাইব। সংসারের লোকে, আমার ধনী আত্মীয়েরা ত বলিতে পারিবে না যে আমি স্ত্রীকে ও পিতৃশ্রমকে অনশনে মারিয়াছি।

গলির মোড়ে আসিলাম। কুকুর লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছিল। বুকুর ভিতরটা টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছিল—ধমনীর রক্ত-প্রবাহ বড় কি-প্রগতিতে ছুটাছুটি করিতেছিল, হাত পা, চোখ কান খুব জলিতেছিল, জিহ্বায় আর্দ্র রস ছিল না, মাথা নিম্ননিম্ন করিতেছিল। হঠাৎ আমাদের ঘাঁটির পাহারাওয়ালার একটা মুন্ডির দোকানের ঝাঁপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—কোন হায়?

আমি গ্যাসের গুন্তে নির্ভর না করিলে ঘুরিয়া পড়িতাম। মাথা ঘুরিতে ছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া কুকুরটা আমার পায়ের তলায় বসিল—পাহার-ওয়ালার ঝাঁড়ির উদ্দেশ্যে দুইবার ষেউ ষেউ করিয়া ডাকিল। আমি তাড়াতাড়ি

পুঁটুলিটা কোটের পকেটে রাখিয়া দিলাম । ভয় হইতে লাগিল, পকেট পুঁড়াইয়া সেই অর্থগুলো ভূমিতে পড়িয়া যাইবে ।

পাহারওয়ালার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, আপু? এত রাতমে?

আমি কিছু বুদ্ধিতে পারিলাম না । একটু হাসিবার চেষ্টা করিলাম । পাহারওয়ালার বলিল—বাবু সেলাম । আপুকা বিমারী ছয়া, ঘর যাইয়ে ।

(৪)

সরলা বলিল—ওমা একি? তুমি কি পাগল হয়েছ? কাপড় ছাড়, কাপড় ছাড় ।

আমি তাহার সম্মুখে নোটগুলো ধরিলাম । হাত কাঁপিতেছিল । সরলা বলিল—এই ত । চেষ্টা করলেই ভগবান মুখে তুলে দেন । এখন কাপড় ছাড় ।

কুকুরটা এতক্ষণ পিছনে ছিল । সরলা তাহাকে দেখে নাই । সে এবার লাফাইয়া আমার গায়ে উঠিতে গেল । সরলা ভয়ে বলিল—মাগো! একি?

আমি খুব চেষ্টা করিয়া রসনা আর্দ্র করিলাম । তাহার পর একটু গদগদ কর্তে বলিলাম—সরলা, আজ থেকে এ আমাদের সংসারে থাকবে । এ আজ যেচে বন্ধুত্ব না করলে কাল আমাদের তিন জনকে অভুক্ত থাকতে হ'ত ।

সরলা বলিল—কেন?

আমি তাহাকে সকল কথা বলিলাম । তাহার মুখ দেখিয়া বলিতে সাহস হইল না যে এ টাকা আমরা একেবারে আত্মসাৎ করিব । তাহাকে বলিলাম—আমাদের অর্থ সাচ্ছল্য হলেই যার অর্থ তাঁ'কে ফেরত পাঠিয়ে দিব । আপাততঃ বাঁচাবার জন্তই ভগবান এ টাকা পাঠিয়েছেন ।

সরলা বলিল—ছিঃ! ছিঃ ।

সেই একটা কথায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল । সেই একটা কথায় দেখিলাম—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক মূর্তিময়ী দেবী আর আমি পিশাচ, নীচ, পাপী, লোভী, অস্পৃশ্য তস্কর । বুদ্ধিমান শব্দ-ব্রহ্ম । সেই সামান্য একটা শব্দে দারিদ্র্যের জ্যোতি দেখিলাম, দারিদ্র্যের মাধুরী দেখিলাম । বুদ্ধিলাম ধর্ম-পথে অনশনও পুণ্যনয় ।

আমি ফিরিলাম । স্ত্রী হাত ধরিল, বলিল—কোথা?

আমি বলিলাম—টাকা ফেরত দিতে ।

সে বলিল—কাল সকালে যেও । এখন কাপড় ছাড় ।

আমি 'বলিলাম—সরলা, জলে ম'রব,' পুড়ে ম'রব, তোমার জন্তে পাপ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি তোমাকে কাল অভুক্ত রেখে সুখী হ'ব।
সরলা, দেবী—

সে হাত ছাড়িয়া দিল। আমি ছুটিলাম।

(৫)

ছুটিলাম, পাহারওয়ালার ভয় করিলাম না—দেব, দৈত্য, ভূত, মানুষ কাহাকেও ভয় করিলাম না—অনশনকেও না। আর গা হাত পা জ্বালা করিল না। অগ্নি-পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। কুকুরও ছুটিতেছিল। এখন যেন তাহার আনন্দ বাড়িয়াছে।

মধ্যরাত্রে ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙাইতে কুষ্ঠাবোধ করিলাম না। তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন, বড় আপ্যায়িত হইলেন। টাকার জন্ত নয়—দর্শিলের জন্ত।

তাহার পর বড় ইতস্ততঃ করিয়া আমাকে চল্লিশ টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আমি সত্তার কোম্পানীর ধর্মবটের একজন। কাজকর্ম নাই, ঘরে ভাত নাই, তবু ভিক্ষা করি নাই। কাল বোধ হয়—যাক্ আমার কমা করিবেন।

তিনি অপ্রস্তুত হইলেন। কমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন—আমার পুত্রের শিক্ষক চাই, আপনি দশ টাকা আগাম নিন্ কাল থেকে পড়াকো। আর বেধি' হয় সপ্তাহেকের মধ্যে আমার অফিসে কর্ম হতে পারে।

* * * * *

সরলা বলিল—উপহার ?

আমি বলিলাম—না অগ্রিম বেতন। কাল থেকে ছেলে পড়াতে হ'বে।

এত দিন দারিদ্র্যের কষাঘাতে সে আমার সম্মুখে কাঁদে নাই। 'আজ সে কাঁদিল। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—দেখলে, ভগবানের দয়া। তুমি নিরন্ন হ'য়েও তাঁর এই জীবটাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলে ব'লে এই অবলা কুকুরের মুখে তিনি তোমার অন্ন পাঠালেন।

আমি বলিলাম—আর তোমার মত দেবী পেয়েছিলাম বলে চোর হ'তে, হ'ল না।

প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। উঃ! কি উৎকট অগ্নি-পরীক্ষা!

স্পন্দন ।

[লেখক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এল্ ।]

এই বিশ্ব এক অনাদি অনন্ত
সাগরে অনন্ত স্পন্দন কেবল ;
সেই স্পন্দনের বিচিত্র লীলায়
এই চরাচর সতত চঞ্চল ;
তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড উঠিছে নাচিয়া,
তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড কোথা নেমে যায় ;
সৃষ্টি-বীচি-শিরে, প্রলয়-গহ্বরে,
তরঙ্গের ভঙ্গে বারিরাশি ধায় ;
তরঙ্গে আলোক উঠিছে ফুটিয়া,
তরঙ্গে আবার মিলায় আঁধারে ;
কোথা নাহি বেলা, এ অপূর্ণ খেলা
অবিরাম চলে এই পারাবারে ।
স্পন্দনে অরূপে রূপের উদয়,
পরিমাণ ভেদে পরিচিত হয়,
নিঃস্বর্ণ নিখর এক(ই) সে সলিল
স্পন্দনের গুণে বহু গুণময় ;
কোথাও স্পন্দন জীবন-উত্তাপ
আনিয়া দিতেছে হিমাঙ্গ জগতে ;
কোথাও আবার আকর্ষণ রূপে
ধরিয়া রেখেছে বিশ্ব শূন্য পথে ;
কোথাও পলকে তড়িতে ছুটিয়া
স্বাগু অগুরাশি করিছে চঞ্চল ;
কোথাও নিবিড় অনাদি আঁধার
সুহসা আলোকে করিছে উজ্জল ;
কোথাও স্পন্দনে ব্যোম শব্দময়,
গ্রহ তারা হ'তে উঠে একতান ;

কোথাও স্পন্দন পরিমলময়
পরমাণু ঘ্রাঝে করে গন্ধদান ।
সেই স্পন্দনেতে সিদ্ধুবন্ধ হ'তে
অলক্ষ্যে নীরদ উঠে নীলাধরে ;
সেই স্পন্দনেতে নীলাধর হ'তে
সহস্র ধারায় স্নুধারিন্দু ঝরে ;
সেই স্পন্দনেতে অনিলে সলিলে
সঞ্জীবনী শক্তি হইছে সঞ্চার ;
সেই স্পন্দনের হইছে সুরণ
বরণে বরণে শ্রাম বসুধার ;
ফুটিছে প্রভাতে নীলিমা সরসে
রক্ত কমলের জীবন্ত ছটায় ;
ঘুমায়ে পড়িছে ঘুমন্ত সায়াহ্নে
ক্লাস্ত দিনান্তের ধূসর ছায়ায় ;
স্পন্দনে চন্দ্রিকা পরশে ধরণী,
চাহে তারাকুল কম্পিত পলকে ;
স্পন্দনে প্রফুল্ল কুসুমে কুসুমে
বসুমতী ভরি' উঠিছে পুলকে ;
সেই স্পন্দনেতে শত প্রবাহিনী
শত ধারে বহে নীর জীবনের ;
সেই স্পন্দনেতে শতমুখ স্রোতে
বক্ষে বক্ষে বহে প্রীতি মানবের ;
সেই স্পন্দনেতে নবীন শিশুর
কণ্ঠে কেঁপে ওঠে মা মা মা মা ঝব ;
জুড়াইয়া আসে জননী-পরশ
সকল ক্রন্দন করিয়া নীরব ।

স্পন্দনে তরণ ধরণী-হৃদয়	সেই বিরাতের(ই) অচিন্ত্য বাসনা .
উঠিয়া ছুটিছে শত প্রস্রবণে ;	এ হীন অণুর আশার পিপাসা ।
শত প্রস্রবণে মানস আমার	এই স্পন্দনের মহাশক্তি কোথা
উঠিয়া ছুটিছে সে ভূমার সনে ;	এ মানসমাবে এস একবার !
মানসে আমার যত ভাবওঠে,	ও চরণ হ'তে বিনিঃসৃত নীর
এই রসনায় যত ভাষা ফোটে ;	আনন্দে ঢালিব চরণে তোমার ;
সকলি ত' সেই স্পন্দনের খেলা ;	তোমার স্পন্দনে স্পন্দন আমার
সেই সিদ্ধ এই প্রণালীতে ছোটে ;	নিশিদিনমান লীন হ'য়ে থাক ;
এ ক্ষুদ্র প্রাণের যত ক্ষুদ্র কথা	মাগরসঙ্গমে গঙ্গার মতন
সেই বিরাতের(ই) আপনার ভাষা,	তোমার ভিতরে আমি মিলে যাক ।

প্রিয়তর ।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে ।]

গোলাপের চে'য়ে রূপ অধিক সুন্দর,
 অমৃতের চে'য়ে প্রিয় রসের আকর,
 কোকিলের কণ্ঠ হ'তে সুমধুর স্বর,
 চন্দনের গন্ধ হ'তে আরো মনোহর,
 মলয়ের চে'য়ে স্নিগ্ধ পরশ সুন্দর,
 প্রেয়সীর চে'য়ে বড় প্রেমিক-অস্তুর,
 যদি কিছু থাকে শ্রেয় প্রেয় প্রিয়বর,
 প্রিয়তম হ'তে মোর সেই প্রিয়তর !

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা ।—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি-এ ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ বি-এ সম্পাদিত। আমাদের বহু আশার ধন এত দিনে বাহির হইল !

সম্পাদকযুগল নিজেদের 'বি' 'এ' ডিগ্রীর মধ্যে "." (full stop) চিহ্নের ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালায় 'একটা নূতন কিছু' প্রচলনের চেষ্টা করিলেন ।

এবারকার 'সাহিত্য-পঞ্জিকা' ৮ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং ১০ম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আশা আছে, এরূপ নিঃস্বার্থ উৎসর্গের সুফল ফলিবে ।

সাহিত্য-পঞ্জিকা দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে এই বিষয়গুলি আছে—(১) ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী (২) প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম (৩) আধুনিক যুগের স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণ (৪) বাঙ্গালার বর্তমান গ্রন্থকারগণ ও তাঁহাদের পুস্তকাবলী (৫) মুসলমান লেখকগণের তালিকা (৬) সংবাদপত্র (৭) সভাসমিতি ও পুস্তকালয় (৮) মুদ্রণ বিষয়ক তথ্য ।

২য় ভাগে—(১) ১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ (২) ১৩২২ সালের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা (৩) বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রিকার তালিকা (৪) বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৫) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ ও (৬) পরিশিষ্ট ।

যে সব সাহিত্যিক বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি লিখেন, সাময়িক বা সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকতা করেন অথচ স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি নাই, তাঁহাদের নাম এই পঞ্জিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ এগুলি অনবধানতার ফল। পুস্তকের তালিকায় অনেক গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। সুধু গুরুদাসবাবুর পুস্তক-তালিকার উপর নির্ভর করিলেও এ ত্রুটিগুলি হইত না। প্রথম উদ্যম বলিয়া সমস্ত ত্রুটি উপেক্ষণীয়। আশা করি ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকায় সেগুলি সংশোধিত হইবে ।

'মানসী ও মর্দুবাণী' হইতে উদ্ধৃত '১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণের' লেখক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিন্যাস্ত্রণ। এই অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের এক মা-বাপ। ইঁহার চেলা-চামুণ্ডা যথেষ্ট এবং তাঁহাদের 'বাহবা'য় ইনি একজন মহারথী বিশেষ। ইনি সর্বশাস্ত্র ও সর্ব ভাষায় সুপণ্ডিত, উপরন্তু সমালোচক-কেশরী। বলা বাহুল্য, ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, ইনি না পড়িয়া বা গ্রন্থের নাম শুনিয়া সমালোচনা করিতে পারেন এবং স্বীয় অজ্ঞাস্ত মতগুলি (!) নির্ভীকচিত্তে জাহির করিতে পারেন। ইঁহা কম বাহাদুরীর কথা নহে ! সম্প্রতি এই বিবরণ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' একটা সুদীর্ঘ প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও সম্পাদকযুগল কি মোহাবিষ্ট হইয়া ইঁহা পুনর্মুদ্রিত করিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর ।

সাহিত্য-পঞ্জিকা বঙ্গসাহিত্যে একটা দারী জিনিস এবং ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থনের একটা প্রধান উপকরণ হইবে। সেইজন্য বাহাতে পঞ্জিকায়ানি নিভুল হর সে বিষয়ে সম্পাদকবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সাহিত্য-পঞ্জিকা স্বধু তাঁহাদের কীর্তি ঘোষণা করিবে তাহা নহে, ইহার সহিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী-সাধারণের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

প্রেমের ডালি—শ্রীরসিকলাল যে প্রণীত ও হগলী এলাটি পো: 'শ্রীঐক্যব সঙ্গিনী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০ আনা মাত্র। এই পুস্তকের 'বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেবা-ভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত'—এইরূপ বিবোধিত।

এই গ্রন্থখানি যুবক-যুবতীর ভালবাসা 'তথা-কথিত' 'প্রেমের ডালি' নহে, এ প্রেমের ডালি—শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত ;—

“প্রেমের ডালি, এনেছি হরি,

লবে কি চরণ ভলে ?” ইত্যাদি।

লেখক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও ভক্ত। গ্রন্থাস্তগত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি পাঠে আমরা সে পরিচয় পাই। এই পুস্তকের কবিতাগুলির বিশিষ্টতা এই যে, সেগুলিতে আধুনিকের হেরালী নাই। লেখকের বক্তব্য বেশ বুঝা যায়। লেখক 'রাজা পা দু'খানি'র জন্ম পাগল' সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ কবিতার 'রাজা পা দু'খানি'র উল্লেখ দেখিতে পাই।

ভক্ত লেখকের উচ্ছ্বাস ভক্ত পাঠকের ভাল লাগিবে।

কর্নুফল—১৩২০ সালের কুম্ভলীনের পুরস্কার—৩১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুম্ভলীন আফিস হইতে শ্রীযুক্ত হীতেন্দ্রনাথ বসু-কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থের 'প্রথমেই কুম্ভলীনের আবিষ্কারক স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের নানাবর্ণে মুদ্রিত প্রতিকৃতি। তাঁহার মহাশয় আনন এখনও আমাদের নরন সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। এবং তাঁহার স্মৃতির স্বরূপ এই ছবিখানি তাঁহার শোক জাগাইয়া তুলিতেছে। তাই আমাদের মনে হয়—এবারকার উপহারে শ্রীতির পরিবর্তে যেন শোক মূর্তিমান হইয়া ফুটিয়াছে ; সাহানার পরিবর্তে যেন বেহাগের করণ সুর জাগিয়া উঠিয়াছে। পিতার উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী এই দারুণ ছদ্মিণেও তাঁহার পিতৃ-কীর্তি বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার এই প্রথম প্রয়াস ও উদ্যম তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের প্রদত্ত পুরস্কার সমূহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

স্যর রবীন্দ্রনাথের 'কর্নুফল' ও শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'অদল বদল' শীর্ষক গল্প দুইটি এবং শ্রীমতী কুম্ভবালা দাসীর 'মন্দির দ্বারে' নামক কবিতা ও শ্রীমতী অনুজাহ্নবী দাসীর 'বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা' (গাথা) এবারকার উপহারের উপচার। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটিই উপভোগ্য, কোনটিই অপচার নহে।

ব্রাসলীলা

[“ওপারের কথা” লেখক ।]

একদা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সেই লীলাভূমিতে ষোলশত নিজ মূর্তি ধারণ করা সম্ভব কি না এই বিষয় আলোচ্য। জড় চিন্তায় ও কার্যে অভিভূত জীবের পক্ষে এবিধ কার্য ধারণাতীত। সাধনার উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইলে এই তত্ত্ব যৎসামান্য পরিমাণে বোধগম্য হয়। যে পরিমাণে চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হয়, সে মাত্রায় ইহার সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত জীবের সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয়। কিন্তু যখন অন্ততঃ চৌদ্দ আনা মাত্রায় জাগতিক যাবতীয় আসক্তি অপসারিত হয়, সে অবস্থায় শিক্ষা কৌশলে সেই সূক্ষ্মদেহ বিচরণক্ষম হয়। এই শক্তি জাগতিক কার্যে বা অস্ত্রের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্ত ব্যবহৃত হইলে উচ্চসাধনার ফল বিলুপ্ত হইয়া সেই সাধক-সাধিকাকে “পুনর্মূষিকো ভব” এই অবস্থায় পরিণত হইতে হয়। ইচ্ছাশক্তির হাস বৃদ্ধি অনুসারে জীবগণ স্ব স্ব কর্মে সফলকাম বা বিফল মনোরথ হইবেন। যে মাত্রায় জীব জড়ত্ব হইতে চৈতন্য-যুক্ত হইবেন অর্থাৎ আত্মায় অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবেন, সে মাত্রায় এই ইচ্ছাশক্তি বিকশিত হয়। ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত ইচ্ছাশক্তি ছিল। এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি গোপগণকে গোপমহিলাগণের কর্মে প্রতিবন্ধক হইতে দেন নাই। সুতরাং এই অসামান্য ঐশী শক্তিতে তিনি আর আর অলৌকিক কর্মের মত ষোল শত মূর্তি ধারণ করিবেন, ইহা জীবের পক্ষে ধারণাতীত হইলেও তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। যিনি নিজ ইচ্ছামত সমগ্র বৃন্দাবনকে কর্ম সাধন করাইয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রভূত, এ কথা স্বীকার্য্য নহে কি ?

গোপমহিলাগণ কি অবস্থায় উপনীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লবঙ্গস্থানে অবস্থিত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই কথা আলোচিত হউক।

বিশ্ব-বিধানের নিম্নলিখিত অনুল্লখিত প্রবাহে তাঁহার ভাসিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন;—১। শারীরিক সূক্ষ্মতা; ২। যথাসম্ভব সাংসারিক অভাব-

শূন্যতা ; ৩। যথাসম্ভব স্বাধীনতা ; ৪। যথাসম্ভব সচ্ছন্দতা ; ৫। যথাসম্ভব গৃহ-পরিচ্ছদাদির পরিচ্ছন্নতা ; ৬। আবাস স্থানের সুরম্যতা ; ৭। প্রকৃতি-প্রিয়তা ; ৮। হৃষ্ট বা আনন্দ চিন্ততা ; ৯। নিরলসতা ; ১০। সঙ্গদয়তা ; ১১। বিলাসশূন্যতা ; ১২। আধুনিক শিক্ষা বা সঙ্গদোষ-বিবর্জিততা ; ১৩। প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি সম্বৃত এক মহাপুরুষের দ্বারা চালিতা ; ১৪। সেই মহাপুরুষের চিন্তায় রততা । জিজ্ঞাসা করি, এতগুলি সদগুণের সহিত এবশ্পকার সংযোগ করজনের ভাগ্যে ঘটে ? বলিতে হইবে না কি ইহাই মনি-কাঞ্চন যোগ ?

এই বিশ্ব জ্ঞানের, প্রেমের ও শক্তির ভাণ্ডার । এই বিশ্বের নাম বিরাট প্রকৃতি । সূত্রাং বিরাট প্রকৃতিতে উক্ত সদগুণগুলি বিদ্যমান । সদগুণের আদর বা অর্চনা করিলে যিনি এবিধ কার্য সাধন, তিনিই গুণবান্ গুণবতী হইয়া পড়েন । তেমনি যিনি কুৎসা, ঈর্ষাদি কার্যে কালক্ষেপণ করেন, তিনি নিজপদে কুঠার আঘাত করেন । হৃৎ হইতে নাখন টুকুকেই উদরস্থ করিয়া জুলীর ভাগটুকু বর্জন করা বিচক্ষণদিগের বিধি নয় কি ? শৈশবাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসী-বাসিনীদিগকে কোতুকহলে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । এই জন্ত তিনি 'ননীচোরা' বলিয়া আখ্যাত । যিনি দেহাভ্যন্তরে সুকারিত থাকিয়া মনকে কর্ষণ করেন, অর্থাৎ তাঁহার দিকে টানেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ । জল ও জলের তরঙ্গ সম আত্মা ও মন জীবদেহে অবস্থিত । তরঙ্গায়িত মনকে আত্মার পরিণত বা চৈতন্যময়ী করিয়া আপনার সহিত একমুত্রে আবদ্ধ করানই আত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের কর্ম । সাধারণ জীবকে রোগ, শোক, তাপাদি নানা অভাব অশান্তি দ্বারা এই কার্য সাধন করিতেছেন । কিন্তু কথঞ্চিৎ চৈতন্যবৃত্ত জীবকে উপরোক্ত বৈরাগ্য ব্রতে ব্রতী করিয়া নিজ কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতেছেন । সাধারণ নারীর তুলনায় ব্রজ-মহিলাদিগের অনেকগুলি সদগুণ ছিল, তজ্জাচ উন্নতা করিবার জন্ত তাঁহাদিগের সংশিক্ষার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল । এই কারণে ৮কাত্যায়নীকে পূজা করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজাঙ্গনাগণ আদিষ্ট হইয়াছিলেন । ৮কাত্যায়নী বা ৮কালী বা ৮দুর্গা ধারণাগম্য বিরাট প্রকৃতির আকার মাত্র । পূজা অর্থে গুণের আদর করা । সূত্রাং পূজা করা গুণবান্ গুণবতী হইবার মুকোশল । প্রকৃত পূজা করা হইলে গুণবান্ গুণবতী হওয়া নিতান্ত সম্ভব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য । সূত্রাং ব্রহ্মের বা ব্রহ্মের বে কোন সসীম আকারের নিকট প্রার্থনা, আরাধনা বা জপ-ধ্যানাঙ্গি করিয়াও যদি চিত্তের উৎকর্ষতা সাধিত না হইল বা জীবের যাবতীয় মূলিনতা

ক্রমশঃ বিদূরিত না' হইল, ইহা হইতে বুঝা উচিত নয় কি সাধক-সাধিকার প্রার্থনা পূজাদিকর্ম ভগ্নামী বা বাহিরের আচরণ মাত্র ? এতপ্রকার কর্ম প্রকাশ্যভাবে সাধন করিয়াও বাহারা পর-সর্কনাশ সাধন চিন্তায় পূর্ণ, বাহাদের হৃদয় স্বার্থপরতা, ক্রোধ, ঈর্ষাদি নানা অশুভে আবৃত ও বাহাদের জিহ্বা পরদোষ কীর্তনে অতীব রসাল, তাহাদিগের বুঝা উচিত নহে কি সাধন ভজন কেবলমাত্র পণ্ড্রম বা তাহাদের আরাধ্য দেবতার সহিত শঠতা বা কোতুক করা ? এই প্রকার কার্যা দ্বারা কাহার ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে, এ কথা সেই সেই সাধক-সাধিকাগণ ভাবিয়া থাকেন কি ?

যতদিন জীবের দেহজ্ঞান ও মন থাকিবে, ততদিন জীবমাত্রই বিরাট প্রকৃতির অন্তর্ভূত । সুতরাং জীবমাত্রই বিরাট প্রকৃতির নিকট ঋণী । ঋণ পরিশোধ হইলেই তবৈই পাওনাদারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা । জড়-প্রধান ও চৈতন্য বিশ্বের উপাদান । জীব ইহ জগতে যাহা কিছু লইয়া এই ভবের খেলা সাধিতেছে, উহা জড়-প্রধান । বৃক্ষ ও উহার পাদদেশাঙ্কিত ফলগুলি এককালীন সংগ্রহ করা সম্ভব নহে । তদ্রূপ জড়-প্রধান যাহা কিছু লইয়া মজিয়া ডুবিয়া থাকিব, অথচ চৈতন্যের অধিকারী অধিকারিণী হইবার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র । এই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন “যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে সাধ পুষিয়া থাক; সর্বাঙ্গে কাত্যায়নীদেবীকে পূজা কর” । এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য “আমি শ্রীকৃষ্ণ, দেহী নহি অর্থাৎ আমি আত্মা ও আমার উপাদান জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি । হে ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমরাও দেহী নহ, কিন্তু তোমরা অন্ধি, মাংসাদি মগ্নিত মন । সুতরাং তোমাদের কর্তব্য তোমাদের জড় যাহা কিছু কাত্যায়নীকে প্রতর্পণ করা । তাহা হইলে কোন জননী যেমন নিজ কন্যাকে লালন পালন করিয়া থাকেন ও পরে সেই হৃহিতা যৌবনারূঢ়া হইলে তাহাকে বসন-ভূষণে বিভূষিতা করিয়া স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দেন, কাত্যায়নী-দেবীও তোমাদিগের জাগতিক আসক্তি মোচন করিয়া যথাসম্ভব জ্ঞানে ও প্রেমে ভূষিতা করিবেন ও তৎপরে তুল্যে তুল্যে সংযোগ হয় বলিয়া আত্মাকারে অবস্থিত আমার সহিত গুণপরিণয় কার্য সাধিত হইবে ।”

জলা ও শির মনের বৃত্তি । জল স্থির ধীর হইলে বা উহার মলিনতা অপসারিত হইলে, তবেই ফটক জলে পরিণত হয় । তদ্রূপ মনরূপ তরঙ্গ স্থির-ধীর হইলে বা উহার যাবতীয় মলিনতা বিদূষিত হইলে উহা আত্মাসম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

আত্মার লজ্জা ও ভয় নাই। সূতরাং আত্মার সহিত মনের সম্মিলন কার্য সাধন করিতে হইলে লজ্জা ও ভয় বর্জন করা বিধেয়। এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বঙ্গহরণ লীলা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কোতুকচ্ছলে সাধিত হইয়াছিল।

রাসলীলার পূর্বে হইতেই ষাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত মন বিশিষ্ট ছিলেন, ষাঁহার শৈশবাবস্থা হইতেই প্রকৃতির উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন, ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আত্মোৎকর্ষের বিধানগুলি সহজ ও সরল ভাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন ও ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সম জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে পূর্ণ মহাপুরুষকে ধ্যান জ্ঞান করিয়াছিলেন—আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী-ধারিণী না হইলেও তাঁহার সাধারণ জীব শ্রেণীভুক্ত। সূতরাং তোমার আমার নিকট ষাঁহা অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদিগের সম্ভবপর হইবে, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের বিধানে চলা বা শিক্ষিত হওয়া বিশেষ আবশ্যিক নয় কি ?

আত্মতত্ত্ব না বুঝিলে রাসলীলা-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া এই তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখযোগ্য। জীবদেহ প্রাণ, মন ও আত্মার পিঞ্জর মাত্র। অর্থাৎ জীবদেহ মানব মানবী বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রাণ, মন ও আত্মা জীববাচ্য হইবার মৌলিক উপাদান। ভক্ষণ, মল-মূত্র বর্জন, শয়ন, ভ্রমণ ও অঙ্গচালনাদি কর্ম সম্পন্ন করিয়া দেহের যে কার্যকারিণী শক্তি হয়, উহা 'প্রাণ' বলিয়া আখ্যাত। মনেরই জন্ম ভক্ষণ, শয়নাদি কর্ম সাধিত হয় বলিয়া মন প্রাণের ভর্তা। জীবের মন দুইটি মুখ বিশিষ্ট। উহাদের মধ্যে একটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখায় পূরিত ও অপরটি হলাহলে পূর্ণ। এই জন্ম ইহাদের নাম-করণ হইল, সুখামুখী ও গরলমুখো। সাধারণতঃ হৃদয়স্থিত মনের নিম্ন স্তরে আত্মার অবস্থিতি, কিন্তু কোন্ কোন্ স্থলে মস্তিষ্কেও আত্মার স্থিতি হয়। সুখামুখী আত্মার সংলগ্ন বলিয়া সাধারণতঃ রোগ, শোক বা জাগতিক অভাব অশান্তির জন্ম আত্মার দিকে ধাবিতা হয়। তবে গরলমুখোর সহিত সন্নিবেশিত বলিয়া ইহার সহিত এক জুটী হইয়া জাগতিক চিন্তায় ও কার্যে অভিভূতা। সূতরাং সুখামুখী গরলমুখোর দ্বিতীয় পত্নীবৎ আচরণ করে। গরলমুখো জাগতিক আসক্তির সহিত নানা অগুণে পূর্ণ। এই জন্ম ষাঁহার আত্মতত্ত্ব না বুঝিয়া পূর্বোক্ত বৈরাগ্যব্রতে ব্রতী না হইলে, তাঁহার আত্মোৎকর্ষ সাধন না করিয়া দিনের দিন হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়েন। কিন্তু ষাঁহার মানব-জীবন সার্থক করিবার জন্ম উক্ত ব্রত-উদ্দেশ্যপনে যত্নশীল হইলে, তাঁহাদের

সুধামুখী মন প্রেমের অধিক্য বশতঃ শিশু পুত্র হইতে বালিকায় পরিণত হয় ও কালক্রমে যতই সদৃশ্যে বিভূষিত হয়, সেই পরিমাণে যৌবনারুঢ় হয়। এই অবস্থায় সুধামুখী প্রকৃত জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে বিভূষিতা হয় ও তৎপরে চৈতন্যময়ী হইয়া চৈতন্যময় আত্মার সহিত পরিণীতা হয়। এই পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইলে আত্মার সহিত সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিয়া গরলমুখের দ্বারা মানব-স্বলভ বিহার কার্যে বিরতা হয়। কারণ সেই অবস্থায় আত্মার যাবতীয় সদৃশ্যে বিভূষিতা হইয়া সচ্চিদানন্দময়ী ভাবাপন্ন হয়। সুতরাং এই প্রকার সাধন দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া অনন্ত জীবনের ও অনন্ত সুখের অধিকারিণী হয়।

মনে হয়, ঐকাত্যায়নী বা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজাঙ্গনাগণ উক্ত তত্ত্বের প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তুলনায় বয়সে পুত্র সম হইলেও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ জীবের মত ব্রজাঙ্গনাগণের দেহজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে “প্রাণবল্লভ” “প্রাণেশ্বর” ইত্যাদি ভাষায় সম্বোধন না করিয়া তাঁহার সহিত জননীবৎ আচরণ করিতেন। ইহা হইতে প্রতিপাত হইতেছে যে, ব্রজাঙ্গনাগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীবের মত মনে অবস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন আত্মায় অবস্থায় অবস্থিত।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে :—

১। শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজাঙ্গনাগণের বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধার তোমার আমার মত এক মাত্র গরলমুখো মন সম্বল ছিল না।

২। তাঁহাদের বিশেষ নূতনত্ব দেখাইবার সরঞ্জামের অভাব ছিল না।

৩। শ্রীকৃষ্ণ মনের অতীত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া ও ব্রজাঙ্গনাগণের মারফৎ প্রকৃত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগৎকে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন যে কি উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

৪। ব্রজাঙ্গনাগণ জগৎকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সর্বভূতে ও সর্বস্থানে শ্রীভগবান্ আছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সেই সুদর্শন লাভের পূর্বে ও পরে জীবের কি কি অবস্থা হয়।

৫। আত্মায় ও চৈতন্যময়ী মনের বিহার যে সাধন দ্বারা সাধিত হয়, উহারই নাম রাসলীলা বা আদিরসের লীলা।

৬। জীব যে সম্ভোগ সুখের জন্ম লাভায়িত, উহাপেক্ষা বিশেষ শান্তি ও আনন্দময়ক উচ্চতম সুখ জীবের প্রাপ্যগুণ।

৭। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীব দেহী নয় এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে আত্মার ও চৈতন্যময়ী মনের সন্মিলনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য ।

৮। বাস্তবিক উন্নতা হইবার সাধ পুষ্টিতে সদগুণের আদর করা বিধেয় ।

৯। সংসার বর্জননা করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব নহে ।

১০। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সাধ পুষ্টিতে গরলমুখো মনকে ধার যাহা জাগতিক কর্ম সাধনেরও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত ধ্যাপ্ত রাখা বিধেয় ও তৎসঙ্গে চৈতন্যময়ী মনকে চৈতন্য অর্জনের জন্ত অবকাশ মত নিযুক্ত রাখা মানবোচিত কর্ম ও ধর্ম ।

১১। পুস্তক পাঠ প্রকৃত জ্ঞানলাভের বিশেষ সহায়তা করে না ।

১২। এক প্রকৃত আদর্শ পুরুষকে সম্মুখে রাখিয়া ও তাঁহার সহিত কেবল মাত্র মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার সদগুণগুলির ধারণা করিলে জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে ভূষিত হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা ।

ধর্ম-কর্ম রহস্যময় । কেবল মাত্র হিন্দুধর্ম নহে, সকল পুরাতন ধর্মই রহস্যপূর্ণ । দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি নানা আচারের জন্ত প্রত্যেক পুরাতন ধর্ম আরও রহস্যময় হইয়াছে । এবশ্রকার অবস্থার জন্ত এক ধর্ম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট বিশেষভাবে অনাদৃত । এই জন্ত এক জন অত্রের ধর্মকে প্রমাদ, কুসংস্কার, অঙ্গীলতা বা অসংযুক্ততাপূর্ণ ধারণা বহুশূল করিয়া কত শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেন বা তীব্র সমালোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই প্রকার কার্য দ্বারা মানব-সমাজের উন্নতি কি অধোগতি সাধিত হইতেছে, এ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও উন্নতমনা ব্যক্তির বিবেচ্য নহে কি ? এক ব্যক্তির চিন্তা-প্রবাহ বায়ুর বা প্রবাহিত নদীর মত সমালোচিত সমাজের প্রতি ধাবিত হয়, এ তত্ত্ব যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন যে, এবশ্রকার কার্যদ্বারা এক সম্প্রদায়ের বা জাতির সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বা জাতির বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব দিনের দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । সুতরাং মানব সমাজ হইতে সহৃদয়তা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, কমা, বিনয় প্রভৃতি যাবতীয় সদগুণ বিলুপ্ত হইতেছে । এবং সমর্থ, রাজ্য ও সমাজবিপ্লব, আত্মীয় ও গৃহবিচ্ছেদ ও যাবতীয় গণ্ডগোল এ ধরায় বিকীর্ণ হইতেছে । সুতরাং হয়-কৈ নয় ও নর-কৈ হয়-করা দলের পুষ্টি সাধন হইতেছে । সুতরাং পুলিশের ও আদালতের বিস্তৃতি হইতেছে । সুতরাং মানব-সমাজের ও প্রত্যেক নর নারীর

অভাব অশান্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। সুতরাং নানা প্রকার উদ্ভাবনার, সভ্যতার ও বিলাসিতার মধ্যেও মানব-সমাজ হতশ্রী হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক সমাজ হীন হইতে হীনতর হইয়া স্বেচ্ছাচারিত্বের হেতু হইতেছে। সুতরাং বাহ্য আচারে গণ্য মাগ্ন হইয়াও মানব অন্তঃসার বিহীন হইতেছে।

একটি ছিদ্র থাকিলে যেমন কলসীর সমস্ত জল নিঃশেষিত হয়, ব্যক্তিগত বা সমাজগত একটি অশুনের জন্তু সমগ্র মানব সমাজের কত অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ইহা কি আলোচনার বিষয় নহে? তবুও প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় বা উন্নত জাতি আপন আপন গুণানুকীর্ণনে বা উন্নতাবস্থা প্রচার করিতে কত না সচেষ্ট! ইহাই কি ধর্মজীবন লাভের বা উন্নতাবস্থার নিদর্শন? স্ব স্ব মানসিক তুল্যদণ্ড অবিকৃত না রাখিয়া কোন বিচারে বা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা শ্রম নহে কি? সংযততাই জ্ঞানালোক প্রভাসিত হইবার সুপন্থা নহে কি? উল্লিখিত বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে মানব-মন ঘোর অজ্ঞানতা-রূপ তিমিররাশি হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নহে কি?

হার জীব! তুমি চক্ষু ও কণ্ঠ সত্ত্বেও অন্ধ ও বধির, এ কথা অবগত আছ কি? যাহাদের সহিত আজীবন বস-বাস করিতেছ, তাহাদের মধ্যে কাহারও হৃদয়ভাব উদঘাটনে তুমি সক্ষম কি? ইহাই কি তোমার জ্ঞানোন্মেষ প্রতিপাদ?

মানবের অভাব অশান্তির ইয়ত্তা নাই। মনে হয়, সু-ইচ্ছা ও সু-কর্ম-সাধন শক্তি সহ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হইলে, মানব হইয়াও পরকালের যাবতীয় সাধ মিটাইতে পারেন। পুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা লোকের কথা শুনিয়া 'হাঁ' 'না' দ্বারা নিজ মতামত প্রকাশ করা জীবের স্বভাবসুলভ বিধান। কিন্তু সময়ের সদব্যবহার, চিন্তাশীলতা বা ভাবুকতা, অধাবসায় ও দৃঢ় সংকল্প "আমি একজন হবই হব বা আগার হিন্দা লবই লব" এই সদগুণগুলির জীবের বিশেষ অভাব। জীব মনে জড়তা বৃদ্ধির লক্ষণ অকর্ম বা কুকর্ম সাধন বা সেই প্রকার চিন্তা পরিপোষণ, তদ্রূপ পুরুষোক্ত বৈরাগ্য-ব্রতে ব্রতী হইয়া 'জাগতিক কর্ম সহ পারলৌকিক কর্ম সাধনে যত্নশীল হওয়াই প্রকৃত চৈতন্য বৃদ্ধির লক্ষণ। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর উপকারিতা নাই, এ কথা এ মূর্খ বলিতে অক্ষম। তবে হুঃখের বিষয় যে উপাদান জীবের প্রধান সম্বল, সেই মনের উৎকর্ষতা সাধনের পূর্বে আর্ধ্যজাতির পছাণ্ডলি এক্ষণে হতাদৃত হইয়াছে। কালোচিত বিধানে পূর্বে ও পাশ্চাত্য বিধানগুলি যথাসম্ভব এক মূর্ত্ত্রে গ্রহিত

হইলেও বাহারা এবশ্রকার কার্যে তৎপর হইবেন, তাঁহাদের কার্যকুশলতার উপর ভারতের সুদিন নির্ভর করিতেছে। • কোন্ যুগে কোন্ মহাজনের দ্বারা এবশ্রিধ কার্য সাধিত হইবে, উহার প্রতীকার না থাকিয়া আপাততঃ আমাদিগের বিধেয় নহে কি অসত্য, ঈর্ষা, কুৎসা ও আলশুকে বর্জন করিতে সচেষ্ট হওয়া? তৎসঙ্গে কর্তব্য নহে কি সুইচ্ছা ও সুকর্ম সাধন শক্তি অর্জন করিবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে বিভূষিত কোন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াও তাঁহার যাবতীয় গুণগুলি চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজে দেহে, প্রাণে ও মনে সন্নিবেশিত করা? এ অধমের বিশ্বাস তবেই সঙ্কীর্ণতার পরিবর্তে প্রশস্ততা, হটকারিতা বা দাস্তিকতার পরিবর্তে বিনয়, অসরলতার পরিবর্তে সত্যনিষ্ঠতা, সংশয় ও সন্দেহের পরিবর্তে বিশ্বাস, আসক্তির পরিবর্তে প্রকৃত ভালবাসা, পুস্তক পঠন বিজ্ঞা বুদ্ধির পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞান ও পরহিঁজানুসন্ধানের পরিবর্তে সংযম জীবনের নিজস্ব ধন হইবে। তবেই কালক্রমে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মানব রাসলীলাবৎ যাবতীয় তত্ত্বের মর্ম বুঝিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের আবশ্যক ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হউন, মুসলমান বা খ্রীষ্টান হউন, হিন্দু বা ব্রাহ্ম হউন, জৈন বা আৰ্য্য হউন, কেবল মাত্র গুণের আদর করা। তাহা হইলেই কর্ম ও ধর্মজীবন গঠিত হওয়া সম্ভব। তাহা হইলেই জাতীয় জীবনের অটল ও অচল ভিত্তি স্থাপন করা কর্তব্য মাত্র হইবে না। তাহা হইলেই প্রকৃত সমাজ সংস্কারের কর্ম সহজসাধ্য হইবে। তাহা হইলেই শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করা অলীক আশা হইবে না।

ভূদেব প্রসঙ্গ।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ।]

(২)

'অর্চনা'র গত আধিন সংখ্যায় 'ভূদেব বাবুর' অন্তরঙ্গ সর্গের চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট ভূদেববাবু সম্বন্ধে বাহা শুনিয়া ছিলাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নরেন্দ্র বাবু ইহা পাঠে বিশেষ আঁত হইয়া পড়া করিয়া ভূদেব বাবু সম্বন্ধে নূতন ছ'চার কথা আমাকে বলিয়াছেন। মজুমদার পাঠকবর্গের অবগত্যর্থে তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। ভবিষ্যতে আরও কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিবার ইচ্ছা রহিল। ভূদেব বাবুর স্মরণ আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি

বিষয় বর্তমানযুগে যতই আলোচিত হয়, ততই আমাদের তথা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের বিষয়। একরূপ খাঁটি মহাপুরুষকে আশ্রয় সম্যকভাবে বুঝিতে পারি নাই, ইহা কি আমাদের কীম হুর্ভাগ্যের কথা! কুলে শীলে মানে বিদ্যায় রূপে গুণে তাঁহার তুল্য মহাত্মা আমাদের বাঙ্গালা দেশে আবু দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না সন্দেহ। একাধারে এতগুলির সমাবেশ আর কাহারও জীবনে ঘটয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। একরূপ সংযত, শিক্ষিত, উচ্চভাবাপন্ন, নিষ্ঠাবান খাঁটি হিন্দুকে আদর্শরূপ গ্রহণ করিলে, আমাদের জাতীয় স্বাভাবিক রক্ষা করা যে অতীব সহজসাধ্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ এমনই আমাদের হুর্ভাগ্য যে আমাদের সাহিত্য পরিষদ, সভা সমিতি কেহই এই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার্থ কোনই প্রয়াস পাইয়া থাকে না। ভূদেববাবুকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, তাঁহার মৃত্যুর দিন উপলক্ষ করিয়াও আমরা বৎসরান্তে একবার সঙ্কুলে একত্র সমবেত হইয়া তাঁহার জন্ত এক কোঁটা অশ্রুবর্ষণ করি না, তাঁহার সারগর্ভ উপদেশাবলির আলোচনা করত হই না।

গত প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম যে বাঙ্গালার শাসনকর্তা মহামান্ন টেম্পল সাহেব ভূদেব বাবুকে একবার বলিয়াছিলেন,—“সময় পাইলেই আমার নিকট আসিবেন। আমি আপনার সহিত শাসন সম্বন্ধীয় কথাবার্তা কহিতে ইচ্ছা করি।” ইহার সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, উক্ত কথাগুলি বোধ হয় মহামান্ন টেম্পল সাহেবের পরিবর্তে বাঙ্গালার শাসনকর্তা ভূদেববাবুর গুণগ্রাহী স্যার এন্সলে ইডেনই বলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্যেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীই ভূদেব বাবুর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তবে আমরা পরের মুখেই চিরকাল কাল খাইয়া থাকি। বিদেশীয় লোকে দেশের লোকের প্রশংসা না করিলে, তাঁহার গুণাবলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ইহা আমাদের জাতিমাহাত্ম্য! তাই বিশ্বতপ্রায় ভূদেববাবুর স্মৃতি আমাদের দেশবাসীর প্রাণে জাগরুক করিবার অভিপ্রায়ে আমরা এ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিদেশীয়গণ ভূদেববাবু সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে উদ্ধার করিয়া দিয়াছি।

মেডলিকট সাহেব মেদিনীপুরের বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার জন নামে এক পুত্র ছিল। তিনি পুত্রকে কতকগুলি প্রশ্ন ও উত্তর মুখস্থ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই,—“John, who is my best friend?” (“জন, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু কে?”) উত্তরে বালককে এই শিখান হইয়াছিল,—“Babu Bhudeb Mukherjee (বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) বাড়িতে কেহ আসিলে, পিতা পুত্রকে উপরি উক্ত প্রশ্ন করিলেই সে উত্তরে ভূদেববাবুর নাম বলিত।

•• উচ্চপদস্থ বিদেশীয় কর্মচারী কখন কখন একসঙ্গে খানা খাইতে বলিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ ও সার্থকজন্য মনে করেন। কিন্তু গুণগ্রাহী বিদেশীয়গণ ইহাতে যে তাঁহাদের

অতি আনন্দে মত্ত হইয়া, তাহা আমাকে হস্ত বুদ্ধিতে পারেন না ! তাঁহার পদোন্নতির ও বেতনবৃদ্ধির আশায় অবলীলাক্রমে তুচ্ছ ক্রীড়াভ্রমণে স্তায় মহামূল্য জাতীয়তা নষ্ট করিয়া ফেলেন । কিন্তু ভাবিতেও হৃদয় পুলকিত হয় যে বিধানসভার ডিরোজিরোর ছাত্র, রাজনারায়ণ বাবু ও মধুসূদনের সমসাময়িক, তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহমান স্রোতের মধ্যে বর্ধিত হইয়াও, ভূদেববাবু উচ্চপদস্থ সাহেবদের সহিত একত্র ভোজনে সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াও খেচ্ছার সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন । গত প্রবন্ধে আমরা এসম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি । ভূদেব বাবু নিজেও যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, পুত্রদেরও এই পথ অবলম্বন করিবার শিক্ষা দিয়াছিলেন । এবং পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলে তাঁহাকেও একরূপ ভোজন হইতে বিরত থাকিতে বিশেষ ভাবে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সর্বদা তাহা স্মরণ রাখাইবার জন্য পুত্রের শিরোদেশে দীর্ঘ শিখা-রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন ।

* *
*

তদানীন্তন উচ্চপদস্থ বিখ্যাত রাজকর্মচারী স্যার জন এড্‌গার এক সময় বলিয়াছিলেন,—
“When I was in England, I used to think of Bhudeb Babu.” (যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, আমি প্রায়ই ভূদেববাবুর কথা ভাবিতাম) উচ্চপদস্থ বিদেশীয় রাজকর্মচারী তাঁহার গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে রাজকর্মে অবসর জইয়া সুদূর মাতৃভূমিতে বিশ্রাম-মার্থা গমন করিলেও, ভূদেববাবুর কথা ভুলিতে পারিতেন না ।

অন্য এক সময় অপর একজন রাজকর্মচারী ভূদেববাবুকে বলিয়াছিলেন,—“We consider you as one of us” (আমরা তোমাকে আমাদেরই মধ্যে একজন বলিয়া মনে করি) এই সব উক্তি চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে !

* *
*

ভূদেব বাবু অগাধ পণ্ডিত ছিলেন । তিনি যে কেবল ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা নহে, চিকিৎসা ও আইন শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল । একবার হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ উকিলকে আইনের মূল নিয়ম সম্বন্ধে তিনি গুটিকতক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উকিল মহাশয় সেগুলির যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই । ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় তাঁহার গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন । তিনি বলেন যে, এই পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে ভূদেববাবুর নিকট তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল ! বৈঠকে, সভা মজলিসে যে কোন বিষয়ের আলোচনাই হউক না কেন, ভূদেব বাবু বিজ্ঞ ব্যক্তির স্তায় সেই আলোচনায় যোগ দিয়া তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতেন । কথাবার্তার সকলকে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল ।

* *
*

ভূদেব বাবু তখন হাওড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন । শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে তাঁহার এক ছাত্র ছিল । একদিন অপর এক ছাত্র আনিয়া তাঁহার নিকট

শরতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে,—“মহাশয়, শরৎ তামাক খাইরাছে ।” ভূদেব বাবু তাহাঁ গুনিয়া শরৎকে ডাকিয়া পাঠান । শরৎ আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি তামাক খেয়েছ ?” সত্যবাদী ছাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—“আজ্ঞে হাঁ ।” “তামাক কেন খেলে ?” গুরু মুখের পানে ঋণিকের ক্রম্ব তাকাইয়া শরৎ উত্তর করিল,—“মহাশয় তামাক খান কেন ?” ভূদেব বাবু আর তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রশান্তবদনে বলিলেন,—“Sarat, you have taught me a lesson today.” (শরৎ, তোমার নিকট হইতে আজ আমি এক নূতন শিক্ষা লাভ করিলাম) অস্ত্র কোন প্রধান শিক্ষকের মুখের উপর দোষী ছাত্র একরূপ উত্তর করিলে, তাহার পৃষ্ঠদেশের কিরূপ বিকৃত অবস্থা হইত, তাহা কল্পনার সাহায্যে ভাবিবার বিষয় । এই শরচ্চন্দ্র ভূদেববাবুর সংসর্গে আসিয়া পরে একজন গণ্য বাস্তব বক্তা হইয়া উঠিয়াছিল ।

*

ভূদেব বাবু বৃদ্ধবয়সেও অনবরত তামাক সেবন করিতেন । একদিন পূর্বোক্ত স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখেন ভূদেব বাবু অর্ধঘণ্টার মধ্যে একবারও ধূমপান করিলেন না । ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া এতদিনের অভ্যাসভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভূদেব বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “তামাক খাওয়া ছেড়ে দিরাছি । দেখলাম, এ বয়সেও মনের জোর আছে কি না !”

হার ! কবে আমরা এই সংঘতচিত্ত তেজস্বী মহাপুরুষকে আদর্শ করিয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে রত হইব জানি না । মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ভগবান কবে সে শুভমূহূর্ত্তের সকার করিবেন, তিনিই জানেন । তবে প্রার্থনা যেন, সে সাহেল্ল ক্রম সময় থাকিতে ঐশ্বর্য উপস্থিত হয় । জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেলে আর রোগীর নিকট ঔষধের উপকারিতা কোথায় ?

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, বিদ্যালুষণ, এম-এ, বি-এল ।]

“সভাপর্ক” নামক একখানি পুঁথিতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম কতকগুলি ভণিতায় দেখিতে পাওয়া যায় । এ পুঁথিখানির সমগ্র অংশ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত নয় । পুঁথিখানির প্রথমাংশে যে সকল ভণিতা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায়, সে অংশ জয়দেব নামক কোনও পণ্ডিত-বিরচিত । পুঁথির ৩০ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সকল ভণিতা আছে তাহাতে

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম দৃষ্ট হয়। ১৫১ পৃষ্ঠা হইতে শেষ অবধি অংশ ব্রজসুন্দর নামক ব্রাহ্মণ রচিত। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এক গ্রন্থে কতক কতক অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন। ষাঁহার যতটুকু রচনা ততটুকুর মধ্যে যে সকল ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে নিজ নিজ নাম দিয়াছেন। এমন কি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও আশ্রিত পণ্ডিতদের সহিত কতক অংশ লিখিয়াছিলেন। কতক অংশ লিখিয়াও সমগ্র গ্রন্থ নিজ নামে চালাইতে কিছুমাত্র অভিলাষী হন নাই। যে অংশ ষাঁহার রচিত, সে অংশে তাঁহারই নাম আছে। “ক্রিয়াযোগ সার” নামক পুঁথি খানির কতকাংশ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ও অবশিষ্টাংশ রিপুঞ্জয় দাস রচনা করেন। পদ্মপুরাণ হইতে এই ক্রিয়াযোগ সার সংকলিত হইয়াছে। প্রথম আট অধ্যায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনা। নবম অধ্যায় হইতে রিপুঞ্জয় দাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুঁথি মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ স্পষ্টাক্ষরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যে পর্যন্ত হরেন্দ্রনারায়ণের লেখা তাহার পর এই মন্তব্য লেখা আছে—“এই অবধি আমার কৃত পদ, এই হ’তে শেষভাগ রিপুঞ্জয় বড় কাএতের করা। আমার ভাগের চুক ভুল লেখাতে যে হৈছে তা সারাসুহা এক প্রকার করিলাম। ঐ খণ্ড পুঁথি দেবানন্দ শর্ম্মাকে দিয়া লেখাই। তার অক্ষর ভাল শব্দবোধ আছে। চাষা নয়। ইতি।” (৮০ ক পৃষ্ঠা) পদ্যে লিখিত গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ গদ্যে মন্তব্য মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সত্যবাদিতা, গুণগ্রাহিতা ও ষাঁহার যে যশ প্রাপ্য তাহাকে সে যশ দিবার, অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। ইহার পূর্ব পৃষ্ঠার উপরেও নিম্নলিখিত পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায় “ইহার মধ্যে মাধবগুণবশার প্রস্তাবটা রিপুঞ্জয়কৃত পদ।” ইহা পাঠ করিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে নিজ রচনার মধ্যে একটা প্রস্তাব অন্তরে রচনা হইলেও পাছে কেহ তাহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বলিয়া মনে করেন সেইজন্য মহারাজ নিজে গদ্যে মন্তব্য দ্বারা সে কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ষাঁহার মন এতদূর সত্যপ্রিয়, তিনি যে অপরের রচনা নিজ নামে চালাইবেন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে যিনি নিজ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে অপরের সামান্য ঋণও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং গ্রন্থের বহুলাংশ নিজে লিখিয়া ও অল্প কয়েক পৃষ্ঠা অপরকে দিয়া রচনা করাইয়াও সমগ্র গ্রন্থ নিজ নামে চালাইবার কোন প্রয়াস পান নাই, তিনি যে অপরের

গ্রন্থ নিজ নামে প্রচার করিবেন ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। এমন কি একখানি জীর্ণ পুঁথি নকল করিয়া রক্ষার সময় কে কতখানি নকল করিলেন তাঁহা পর্য্যন্ত যখন সত্যানুরোধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং নকলকারকদের মধ্যে স্বয়ং মহারাজ একজন হইলেও যখন অত্যাণ্ড নকলকারকগণের সহিত মহারাজের নাম বহিয়াছে, তখন অপরের রচিত গ্রন্থ নিজ নামে চালাইবার অভি-প্রায়ের সম্বন্ধে সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নকল সম্বন্ধেও যখন এত সাবধানতা ও সত্যানুরাগ প্রকটিত তখন রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে মিথ্যা প্রচারে রুচি হইবে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি যে তাঁহারই রচনা এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হইতেছি। এত কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না কারণ, হরেন্দ্রনারায়ণ যখন এতদিন এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তখন তাঁহার অধিকার সম্পূর্ণরূপেই স্বীকৃত। এই অধিকার হইতে কেহ যদি তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে চান তাহা হইলে বিপক্ষকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীও অদ্যাপি কেহ আবিভূত হন নাই। তথাপি আমাদের আলোচনা একেবারে নিরর্থক নহে, কারণ এই প্রকার আলোচনায় বাস্তবিক হরেন্দ্র-নারায়ণের দাবী কতদূর সঙ্গত ও কিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি।

পূর্বেই বলিয়াছি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নয়খানি গ্রন্থ, একটি খণ্ড কবিতা ও কয়েকটি সঙ্গীত অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থগুলি মৌলিকতার দাবী বেশী করিতে পারে না। আখ্যানবস্তু সমস্তই অণ্ড গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রামায়ণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ ও বৃহদ্বৈশ্বদেয়পুরাণ প্রভৃতির অংশবিশেষের অনুবাদই হরেন্দ্রনারায়ণের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এই সকল অনুবাদ যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক ধরিয়া আক্ষরিক অনুবাদ তাহা নহে। কৃত্তিবাস বা কাশ্মীরাম দাস যেরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বিবিধ ছন্দে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থগুলিতেও সেই ভাবেরই রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। “উপকথা” নামক গল্পগ্রন্থের উপাখ্যানভাগও ফারসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

কিন্তু মৌলিকতা না থাকিলেও এবং স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ করিবার প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই সকল গ্রন্থের

একটা বিশিষ্টতা আছে। এই সকল গ্রন্থের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে বর্তমান কালের সমালোচনার মাপকাঠি লইয়া আসিলে চলিবে না, প্রাচীন সাহিত্যের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ধর্মপ্রবণ। গল্পগ্রন্থ ত অতি বিরল। যে সমস্ত ছন্দে রচিত কাব্য প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল তাহার সকল গুণিতেই ধর্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের কবিগণ রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির বিষয় অবলম্বন করিয়াই নিজ কবিত্বশক্তি প্রকট করিতে সচেষ্ট হইতেন। নিজের কল্পনা-গঠিত কাহিনী উপাদান করিয়া তাঁহারা কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। কাজেই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীও যে এই শ্রেণীর হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ হিন্দুধর্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। এখন কোচবিহার রাজ্যে যে সমস্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের স্থাপিত। কোচবিহার সহরে ঠাকুরবাড়ীতে যে আনন্দময়ী কালীমূর্তির নিত্য পূজা হয়, সাগরদিবীর তীরে যে হিরণ্যগর্ভ শিবলিঙ্গ বিদ্যমান তাহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত টাকাগাছের ও বেহারের নৃসিংহ ঠাকুর, ভবানী ঠাকুরাণী, সিদ্ধেশ্বরী, স্বর্ণেশ্বরী, বৃক্ষোদ্ভবা ঠাকুরাণী, আমবাড়ীর ক্রোটেখর ও যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর, গৌসাইগঞ্জের কালী, কৃষ্ণ বলরাম ও নৃসিংহ ঠাকুর প্রভৃতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হরেন্দ্রনারায়ণ প্রত্যহ নিজে মহাসমারোহে কালীর পূজা করিতেন। ব্রজসুন্দর শর্মা “হিতোপদেশে” এইরূপে সেই পূজার বর্ণনা করিয়াছেন—

“সিংহাসনে শিবের জদয় সরোবরে ।
অমল কমল পদতল শোভা করে ॥
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান নিতম্ব বননা ।
মুকুটেশী চতুর্ভুজা শাণিত দশনা ॥
ভারার মন্দিরে উপহার দ্রব্যগণ ।
দধি দুগ্ধ মৃত মধু কুসুম চন্দন ।

সুধারস প্রায় সব্যস্তন অন্নরাশি ।
সুবর্ণ ভাজনে কত আছেন প্রকাশি ॥
ধরাপতি তারিণীচরণ করি ধ্যান ।
নিত্য হোম করে নিত্য দেয় বলিদান ॥
নিত্য নৃত্যগীত মহোৎসব পুরঃসরে ।
বিহার নৃপতি ভগবতী পূজা করে ॥”

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ধর্মীয়রাগ জয়নাথ মুনশী লিখিত রাজ্যোপাখ্যান হইতেও জানিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ প্রাক্ত হইলেও অস্ত্রান্ত দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন না। মহাভারতের আদিপর্ব্ব নামক পুঁথিতে হরেন্দ্রনারায়ণ লিখিয়াছেন :—

‘ইতি আদিপর্বে সর্বরসে রসায়ন ।

বল হর দিগম্বর বদন ভরিয়া ।

সমাপ্ত হইল পদবন্ধ বিরচন ॥

অনায়াসে ভবপাশে বাবে নিস্তারিয়া ॥

• বোল হরি মুখ ভরি এবারে এবার ।

কালী কালী কালী বল একবার মুখে ।

এমন মানব জন্ম হবে নাকি আর ॥

অসার সংসার পার তবে হবে মুখে ॥”

শল্যপর্বের অনুবাদে আছে :—

“অবশ্যে রচিল হরেন্দ্র ভূপ ।

ভাব মন সদা শ্রীরামরূপ ॥”

সুন্দরকাণ্ডেও দেখা যায় :—

“শ্রীহরেন্দ্র ভাবে ধন লাগিল এবার ।

ত্রাণ কর হুঃখ হর রাম কৃপাধার ॥”

সুতরাং হরি, রাম, শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণের মধ্যে কাহাকেও হরেন্দ্রনারায়ণ পৃথক্ দেখেন নাই। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তাহার প্রমাণ বৃহদ্রথ পুরাণের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

“অধায়ের অবসানে সভানদজন ।

বল রামনাম সবে ভরিয়া বদন ॥

ষেহি রাম সেহি তারা সেহি আদ্যাশক্তি ।

এক ভাবে ভাবিলে মিলিবে ভক্তিমুক্তি ॥

শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ভণে সুপয়ার ।

কালী বলি তর ভাই অসার সংসার ॥”

এই দেবদেবীতে অভেদবুদ্ধি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের উদার ধর্মভাবের পরিচায়ক। প্রাচীনকালে একরূপ উদার ধর্মভাবের উদাহরণ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

একে ত প্রাচীন সাহিত্যের ধারাই ধর্মের দিকে বহিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ একনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজ রচিত ও তাঁহার আজায় রচিত গ্রন্থাবলী যে ধর্ম্মবিষয়ক হইবে তাহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলিও এই হেতুই আধ্যাত্মিক।

‘নিদাঘ-বর্গন’ নামক বৃহদ্রথপুরাণের শেষে সন্নিবিষ্ট ঋগ্বেদ কবিতাটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কালিদাসের “ঋতুসংহার” হইতে বহু উপমা ও ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্র-

নারায়ণ সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' হইতে নিদাঘবর্ণনাত্মক শ্লোকগুলির ভাব নিজ কবিতাসৌষ্ঠবের জন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর নামমাত্র এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল : সমগ্র গ্রন্থগুলির বিশদ পরিচয় প্রদান বা সমালোচনা করিবার অবসর নাই। সমগ্র গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিবার অবসরও আমি পাই নাই। সুতরাং আমার এ প্রবন্ধ আংশিক পরিচয়রূপেই গৃহীত হইবার যোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে বলিতে চাই ও একটি বিষয়ে বিশেষরূপে কোচবিহার সাহিত্য-সভার মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে চাই। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পুঁথিগুলি সভা-গৃহের একাংশে রক্ষিত হইয়াছে। সেগুলির কয়েক স্থলের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে, এখন তাহার পাঠ উদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কয়েকস্থল এরূপ জীর্ণ হইয়াছে যে তাহার পাঠোদ্ধার করার কোনও সম্ভাবনা নাই। অতি সত্বর এ পুঁথিগুলির মুদ্রণ বা অন্ততঃ নকল না করাইলে এগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। মুদ্রিত হইলে এগুলি যে বর্তমান সাহিত্য হিসাবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন কোচবিহারের এক সমৃদ্ধির সাহিত্যের অনঙ্গা ও শক্তি এগুলির দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। বিশেষতঃ কোচবিহার রাজবংশের গৌরবের কথা—একজন মহারাজের রচিত এতগুলি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান তাহা সকলের সুপরিচিত হইয়া পড়িবে। বর্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের সহিত তুলনায় এগুলি নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আশা করি কোচবিহার সাহিত্য-সভা হইতে এগুলির প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক কবিরা তাঁহার কন্দর্পবিনিন্দিত কাণ্ডির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লাবণ্যের কথা জনপ্রবাদে আজিও প্রচারিত। চিত্রের সহিত তাঁহার জীবনী ও রচনাবলীর বিস্তৃত পরিচয়-যুক্ত ভূমিকাসহ গ্রন্থাবলী একত্র মুদ্রিত হইলে বোধ হয় পাঁচশত পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। স্বীকার করি, এ কার্যে শ্রম ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তবে ইহাও আশা করি যে, কোচবিহার সাহিত্য-সভার উৎসাহ থাকিলে এ কার্য অচিরে সম্পন্ন হইতে পারিবে। স্থানীয় প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান, রক্ষা ও প্রচার এই সভার বিশেষ উদ্দেশ্য। মহারাজ নরনারায়ণের গ্রন্থের জায় বহু পুঁথি

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেগুলির নাম মাত্র শোনা গিয়া থাকে। অল্প যে কয়েকখানি পুঁথি এখনও বর্তমান আছে, তাহা প্রাচীন কোচবিহারের বিদ্যা-চর্চা ও সাহিত্য সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেগুলিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্ত প্রয়াস পাওয়া এখনই আবশ্যিক। এখনই অনেক পুঁথি জীর্ণ ও স্থলে স্থলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিলম্বে সেগুলির উদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।

সাহিত্য প্রসঙ্গ ।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র ।]

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা।—

গত চৈত্র সংখ্যা ‘অর্চনা’র আমরা সাহিত্য-পঞ্জিকা সম্বন্ধে দু’একটি অনু-যোগ করিয়াছিলাম। পঞ্জিকার অগ্রতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় তাহার একটা প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—
“বি এ ডিগ্রীর মধ্যে . ফুলষ্টপ্ দেওয়া কাহার কীর্তি জানি না, তবে proof দেখা হয় নাই সময় ছিল না। * * তবে এ কথাও বলি, আমি প্রফ দেখিলে আপনাদের গায় hyphen চিহ্ন দিতাম না, পরিষৎ পঞ্জিকার গায় বি এ তফাৎ তফাৎ রাখিতাম।” উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ‘ফুলষ্টপ্’ ‘কমা’ প্রভৃতি ইংরেজি আমদানি। তবে বাঙ্গালায় ‘কমা’ চলিয়াছে, ‘ফুলষ্টপ্’ এখনও চলে নাই। ইংরেজি ব্যাকরণের আইনে ‘ফুলষ্টপে’র ব্যবহারই উপযুক্ত। হুইটী ডিগ্রীর মধ্যেই ‘ফুলষ্টপ্’ দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম উহা ইচ্ছাকৃত এবং সেই জন্তই আমরা রহস্ত করিয়াছিলাম মাত্র। বলা বাহুল্য, ডিগ্রীর মধ্যে ‘কমা’র ব্যবহার ভুল এবং ‘হাইফেন্’ ব্যবহারের সমর্থন করা চলিতে পারে।

ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই হয়। গত চৈত্র মাসে ছাপার ভুলে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়ের ‘রায়’ বর্জিত হওয়ার সাধারণে তাঁহাকে হস্ত ‘হিন্দুস্থানী’ মনে করিতে পারেন, এই জন্ত আমরা ক্রটি স্বীকার করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিগ্গাভূষণের সমালোচনা উদ্ধৃত করা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“অমল্য বাবুর সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়াছি ইহাতে ‘সৌরভ’ও আপত্তি তুলিয়াছেন কিন্তু করি কি? আমরা এত পুস্তক দেখিতেও পাই না আর দেখিতে পাইয়াও যদি ভাল মন্দ সমালোচনা করি, তাহা হইলে যে গালাগালি খাইতে হইবে তাহা হজম করা সহজ নহে। * * ‘ভারতবর্ষে’ যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা একজনের অভিমত, আবার তাহারও যে বড় বেশী মূল্য আছে ইহাও মনে হয় না।”

বিরূপ সমালোচনা-কশাঘাতের আশঙ্কায়, সমালোচনার নিজের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মত ব্যক্ত করিতে না পারিলে সাহিত্য-পঞ্জিকা-সম্পাদন করিবার গুরুভার কিরূপে বহন করা চলিতে পারে, আমাদের তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। আমাদের মনে হয়, নিজেরা একান্ত অপারগ হইলে ২।৫ জন লক্ষপ্রতিষ্ঠ সমালোচকের হস্তে এই কার্যের ভার অর্পণ করিলে সফল ফলিতে পারে। তাহার উপর কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে নব-প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশেরই মতামত বাহির হয়, সেইগুলির সহিত নিজদের মতের একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইলেও সম্পাদকের গুরুভার অনেকটা লঘু হইতে পারে। ‘ভারতবর্ষে’র প্রতিবাদটিকে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়া রাখালরাজ বাবু বিশেষ অসঙ্গত কীর্ত্তি করিয়াছেন। কারণ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সকল পত্রেই ‘ব্যক্তিবিশেষে’রই অভিমত প্রকাশিত হয়। এবং সেই মত পাঠকের মতের সহিত মিশিয়া তাহাকেও ঐকমত্য করিয়া তুলে।

বিলাতের পার্লামেন্টের সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মিউনিসিপাল কমিশনের পর্য্যন্ত দেশের লোকের প্রতিনিধি। দেশের লোকে এই প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এবং এই প্রতিনিধিরা সাধারণের মতের প্রতিধ্বনি করে। প্রতিনিধিরা যে কখনও সাধারণের দ্বারে দ্বারে লোকমত জানিয়া বেড়াইয়াছেন, এমন কথা আমরা শুনি নাই।

* * *

সমালোচকের পক্ষেও এই কথা কতকটা খাটে। সমালোচক কোনও পত্রে সমালোচনা বা বক্তব্য পাঠাইলেন; সম্পাদক স্বীয় মতের সহিত তাহা মিলানিয়া যখন উহা প্রকাশ করিলেন, তখন তাহা আর ‘একজনের অভিমত’ রহিল না। এবং পরে যত দিন না সেই সমালোচনার কোনও প্রতিবাদ বাহির হইয়া উহার ভ্রম

প্রতিপন্ন হয়, ততদিনে যে উহার 'মূল্য' আছে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। অমূল্যবাবুর মূল্যবান সমালোচনার যে সমস্ত ভুলগুলি 'ভারতবর্ষ' চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে রাখালরাজবাবু কি বলেন? 'ভুল'কে 'ঠিক' বলিলে, 'মিথ্যা'কে সত্য ভাবিলে, রাতকে দিন জ্ঞান করিলে আমরা নিরুপায়। সুতরাং মনে হয়, 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়া রাখালরাজবাবু বিশেষ অবিচার করিয়াছেন।

• *
*

পত্রের একস্থলে রাখালরাজ বাবু লিখিয়াছেন—“যে সব সাহিত্যিক বাঙ্গালার প্রবন্ধাদি লিখেন, সাময়িক বা সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকতা করেন, অথচ স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি নাই, তাঁহাদের তালিকা দিবার আমার ইচ্ছা ছিল। লেখকের নামের পার্শ্বে সংবাদ পত্রের নাম দিতাম, কিন্তু সমস্তভাবে প্রথম বৎসরে সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। * *” আশা করি, পরের সংখ্যায় এই ক্রটি সংশোধিত হইবে।

* *
*

আমরা লিখিয়াছিলাম—“পুস্তকের তালিকায় অনেক গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। এবং শুধু গুরুদাসবাবুর ক্যাটালগের উপর নির্ভর করিলেও একটাগুলি হইত না।” ইহার উত্তরে রাখালরাজ বাবু লিখিয়াছেন—“একথা ঠিক নহে। কারণ আমরা জীবিত ও স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণের নাম পৃথক পৃথক দিয়াছি। কিন্তু গুরুদাস বাবুর ক্যাটালগে শেষ দিকে যে সকল গ্রন্থের নাম বিষয় হিসাবে বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে সেখানে গ্রন্থকারগণের নামের পূর্বে শ্রী কিম্বা ৮ কিছুই দেওয়া নাই। এইজন্য বহু নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। গুরুদাস বাবুর তালিকায় নাই এরূপ শত শত নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। আমার আর একটা সংকল্প ছিল সে কথা নিবেদনে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি তাহাও ছাপা হয় নাই। জীবিত গ্রন্থকারগণের জন্ম সন ও তারিখ এবং বাসস্থান ও ঠিকানা।”

“আমরা নাম জাহির বা অর্থলাভের জন্ত এ কার্যে অগ্রসর হই নাই * * সাহিত্যের কাজে লাগিবে এই আশায় যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছি তাহা স্বল্পদর্শী ভিন্ন কেহ বুঝিবেন না।” ‘স্বল্পদর্শী’ হিসাবেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিব যে এরূপ একটা গুরুভার বহন করিতে হইলে এবং এই সাধু উদ্দেশ্য ফলবতী করিতে হইলে নিরপেক্ষ বিচার, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুধী সাহিত্যিক-বৃন্দের সহায়তা একান্ত আবশ্যিক এবং পক্ষপাতিতা-দোষ-দৃষ্ট ও বিদ্বেষ-বিজৃষ্টিত সর্বভাষাবিদ মহাপণ্ডিতেরও সমালোচনা-আবর্জনা সর্বথা পরিত্যজ্য।

* *
*

সুবর্ণবণিক সমাচার।—

কলিকাতা 'সুবর্ণবণিক সমাজ' হইতে 'সুবর্ণবণিক সমাচার' নামক একখানি মাসিক পত্র কয়েক মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা সুবর্ণবণিকের জাতীয় পত্রিকা। সম্প্রতি আমরা এই মাসিকের চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। ইহার ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে কেবল মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় জাতীয় প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। পতনেই প্রবন্ধের দৈন্ত সুলক্ষণ নহে! জাতীয় পত্রিকায় জাতীয় প্রসঙ্গ, জাতীয় ভাব, জাতীয় অভাব প্রভৃতির আলোচনা না থাকিলে এইরূপ সাম্প্রদায়িক পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

* *
*

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কারসু প্রভৃতি জাতির অনুপাতে সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। সুবর্ণবণিকের মধ্যে এখন অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা মাতৃভাষার আলোচনার অনুরাগী, এই পত্রের কর্তৃপক্ষীয়েরা যদি এমন ২।৫ জনের মধ্যে লিখিবার বিষয় নির্বাচন করিয়া দেন, তাহা হইলে "সুবর্ণবণিক সমাচারে"র প্রবন্ধের দৈন্ত নিবারিত হইবে এবং ২।৫ জন সুলেখকও সৃষ্টি হইবে। উন্নত জাতিকে ধরিবার প্রয়াস থাকিলে 'পতিতে'র উন্নতি বিদ্যাত গতিতে হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ নিয়ম। সেইজন্য আমাদের আশা আছে, সুবর্ণবণিক জাতি শীঘ্রই শিক্ষার অন্ত্যাত্ম জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিবে।

* *
*

আলোচ্য সংখ্যায় 'জাতীয় সংবাদ' স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে যে, 'রাঢ়ীশ্রেণীর ও সপ্তগ্রামীয় দুইটা সম্ভ্রান্ত এবং ধনশালী পরিবারের মধ্যে' সম্প্রতি, 'বৈবাহিক সম্মিলন' হইয়াছে। সেই আনন্দ-সম্মিলনে লেখক মহাশয় 'বর্ণনাভীত প্রীতি-লাভ' করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে 'ইহা জাতীয় জীবনে নব জাগরণ।' এইরূপ

একটা নূতন কিছু 'জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাকরে লিখিত' থাকিতে পারে, কিন্তু এই 'নব জাগরণ' উভয় জাতীয় মঙ্গলবিধায়ক কি না, তাহা লেখক মহাশয় বুঝাইয়া বলেন নাই।

আমরা জানি, 'রাঢ়ীশ্রেণী'র সুবর্ণবণিকের বিবাহে পণ, আদান-প্রদান, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি অগ্র জাতি অপেক্ষা অল্প এবং 'সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিকে'র উহা অত্যধিক। সুতরাং মনে হয়, এই দুই শ্রেণীর সুবর্ণবণিকের মধ্যে বিবাহ-সম্মিলন সংঘটিত হইতে থাকিলে এবং পণ প্রভৃতি মাঝামাঝি দাঁড়াইলেও সপ্তগ্রামীয়েরা লাভবান হইবেন এবং রাঢ়ীশ্রেণীয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কাংস পাত্রের সহিত মৃগ্নর পাত্রের সংঘর্ষে যে ফল, শেষোক্ত রাঢ়ীশ্রেণীয়েরা সেই দশা-প্রাপ্ত হইবেন। তবে রাজকুমারের সহিত রাজনন্দিনীর বিবাহে অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। অতএব আমাদের মতে এইরূপ বিবাহে উল্লাসপ্রকাশ করিবার পূর্বে যাহাতে জাতির মধ্যে পণগ্রহণ-প্রথা একেবারে রহিত হয় সেই ব্যবস্থা করা বা সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। সপ্তগ্রামীয়েরা রাঢ়ীশ্রেণী ও অগ্র জাতি অপেক্ষা ধনশালী। অর্থের অপ্রতুলতা তাঁহাদের অনেকের নাই। তাঁহাদের উক্ত প্রয়াস শুভ ফলপ্রসূ হইলে তাঁহাদের কার্ণা-কলঙ্কদূষ্ট সমাজে অনাবিল আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইবে, সুবর্ণবণিক জাতি উপকৃত হইবে এবং অগ্র জাতির নিকট নিজেদের মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া ধন হইতে পারিবে।

“সুবর্ণবণিক সমাচারে”র শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই আমরা এত কথা বলিলাম।

'নৈষধ-চরিতে' নাস্তিকবাদের আলোচনা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

'কলির দলভুক্ত নাস্তিক বলিয়াছিল, ব্রাহ্মণদি কোনও বর্ণই বিগুহ নাই,— সকলেই সাক্ষ্যাদোষে দূষিত। এই জাতি-দোষের আশঙ্কা যে অমূলক, তাহার প্রমাণরূপে ইঙ্গ বলিলেন,—বেদে এবং সংহিতায় আছে (১), ব্রহ্মহত্যার বা

(১) “পুরুষং সোম্যোতে হস্তগৃহীতমানরন্ত্যপহাবীং শ্বেয়মকারীং পরশুম্নৈ তপতেতি স
যদি তস্য কৰ্ত্তা ভবতি তত্ৰ এবানৃতমান্নানং কুরতে সোহনৃতান্তিসকোহনৃতেনান্নানমন্তর্ধার পরশুং
উশুং প্রতিগৃহ্নতি স দহতেহথ হস্ততে

ব্রাহ্মণস্বামিক স্তব্ধস্তের অথবা ব্রাহ্মণীগমনের অপরাধ-সন্দেহে ধৃতব্যক্তি যদি বলে, 'আমি ব্রাহ্মণবধ করি নাই' বা 'আমি ব্রাহ্মণের স্তব্ধ অপহরণ করি নাই,' অথবা 'ব্রাহ্মণীগমন করি নাই.' তাহা হইলে প্রাড়বিপাক—বিচারক তাহাকে দিব্য করাইবেন। হস্তে উত্তপ্ত লৌহপ্রদান, জলে নিমজ্জন প্রভৃতি প্রকারভেদে এই দিব্যের প্রণালী নানাবিধ। বহুদিব্যের রীতি এই যে, অভিযোজ্যের অঙ্গলিবদ্ধ উভয় হস্তে সাতটি অখণ্ড পত্র রাখিয়া তাহার উপরে সাতটি পিঙ্গলপত্র, সাতটি শমীপত্র, সাতটি দুর্কা এবং দধি মিশ্রিত অক্ষত ও পুষ্প স্থাপন করিবে। তারপর এই সকল দ্রব্যের সহিত গুরুসূত্র দিয়া সাতবার হস্ত বেটন করিবে। তদন্তর একটি অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ পঞ্চাশৎপল পরিমিত উত্তপ্ত লৌহখণ্ড জলে ফেলিয়া দিবে, আবার উত্তপ্ত করিয়া আবার জলে ফেলিবে, তৃতীয়বার উত্তপ্ত সেই অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ড সাঁড়ানী দ্বারা ধরিয়া নিকটে আনিলে অভিযোজ্য "ত্বমগ্নে সর্বভূতানাং—" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে। এই সময়ে বিচারক নিজেও যথোক্ত অগ্ন্যাধান করিয়া 'অগ্নয়ে পাবকায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার হোম করিবেন। হোমের পর সেই হোমাগ্নিতে আর একবার পূর্বস্থাপিত লৌহখণ্ড উত্তপ্ত করিতে হইবে। ইহার পর বিচারকেরও "ত্বমগ্নে বেদাশ্চত্বারঃ—" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের বিধি আছে। এই মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া বিচারক অভিযোজ্যের তথা কথিত হস্তে সেই লৌহখণ্ড নিক্ষেপ করিবেন। ইহার পর অভিযোজ্য ব্যক্তি সাতটি মণ্ডল অতিক্রম পূর্বক অষ্টম মণ্ডলে আসিয়া নবম মণ্ডলে সেই

“অথ যদি ভক্তাকর্তা ভবতি তত এব সত্যান্ধানং কুরুতে স সত্যভিসন্ধঃ সত্যেনান্ধান-
মন্তর্ধার পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্নতি স ন দহতেহু মুচ্যতে ॥”—ছান্দোগ্য, ৬।১৩।১-২

‘তুলাগ্ন্যাপো বিবং কোশো দিব্যানীহ বিসুঙ্করে ।

* * *
‘তসোত্বাক্তবতো লৌহং পঞ্চাশৎপলিকং সমম্ ।

অগ্নিবর্ণং স্তসেৎ পিণ্ডং হস্তরোরুভরোরপি ।

* * *
‘মুক্তাগ্নিং মুদিতত্রীহিরণ্যকঃ শুদ্ধিমাগ্নু য়াৎ ।

* * *
‘সবকালবিবুং মুক্তমানীরাস্তো ভবী নরঃ ।

গতে ভগ্নিগ্নিমগ্নাং পশেৎকৈচ্ছুদ্ধিমাগ্নু য়াৎ ॥”—বাজবল্য-সংহিতা,

ব্যবহারাদ্যায়, দিব্য-প্রকরণ ।

তপ্তলৌহ পরিত্যাগ করিয়া দুই হাতে ব্রীহি মর্দন করিবে। এখন যদি দেখা যায়, তাহার হস্ত দৃষ্টি হয় নাই, তাহা হইলে অভিযোজ্য ব্যক্তি যে ব্রাহ্মণ বধকারী নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় এবং মুক্তিলাভ করে। আর যদি তাহার হস্ত দৃষ্টি হয়, তবে তাহাকে ষথাবিহিত দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। [প্রবন্ধ-বিস্তৃতি-ভয়ে জলাদি পরীক্ষার রীতি প্রদর্শিত হইল না।] ব্রাহ্মণাদি কৰ্ণ যে এখনও বিস্কৃত আছে, জলানল-পরীক্ষার অভিযোজ্য ব্যক্তির পরাজয়ই তৎপক্ষে প্রধান সাক্ষ্য। যদি সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হত্যা বা ব্রাহ্মণীগমন না করিয়া থাকে, তবে তাহার পরাজয় হইবে কেন ?

“ব্রাহ্মণ্যাদিপ্রসিদ্ধায়া গুপ্তা বরেন্ধতে জয়ম্।

তদ্ বিস্কৃত্বিমশেষস্য বর্ণবংশস্য শংসতি ॥”

তারপর-হে নাস্তিক, তোমরা যে দেহব্যতিরিক্ত আত্মা ও অদৃষ্ট স্বীকার কর না, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঋতুকালে ষথানিয়মে স্বামিসাহচর্য্য ঘটিলেও অনেকের গর্ভসঞ্চারণ হয় না; বংশলোপের আশঙ্কায় স্বামী যদি এ ক্ষেত্রে আবার একাধিক বিবাহ করেন, তাহা হইলেও পুত্রমুখ-সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। এইরূপ অনেকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি কার্য্য করিলেও কোনও সফল লাভ করিতে পারে না। ইহাতে কি অনুমিত হয়? এরূপ ক্ষেত্রে ইহাই কি স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় না যে অদৃষ্টরূপ অলৌকিক কারণান্তর আছে? অনবরত এই প্রকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যে তোমরা পরলোকাদি সম্বন্ধে হৃদয়ে নাস্তিক্য পোষণ করিতে পার, ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাতে তোমাদের মূর্খতাই প্রকাশ পায়।—

“সত্যেব পতিযোগাদৌ গর্ভাদেয়ব্রবোধয়াৎ।

আক্ষিপ্তং নাস্তিকাঃ কর্ণ ন কিং মর্শ্ব, ভিনন্তি বঃ ॥”

তোমরা যদি স্পষ্ট অনুভব করিয়াও বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে আর বলিবার কি আছে? নতুবা ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায় যে, পাপবশতঃ যাহাদের পিণ্ডাচ-শরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মীয় বা অর্ন্ত কাহারও উপর আবিষ্ট হইয়া বলে যে, “আমি এই প্রেতঘোণিতে বড় কষ্ট পাইতেছি, আমার উদ্ধারের জন্ত গয়্যার পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা কর।” তাহারা ইহাও প্রীকাশ করে যে, ‘অমুক জায়গায় আমার টাকা পোতা আছে, তাহা লইয়া গয়্যার ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।’ প্রেতের এই কথা অনুসারে ষথানস্থানে টাকা পড়িয়াও যায়। নানা দেশের প্রামাণিক লোকের নিকট এই সকল কথা

তিনিও যে তোমরা তীর্থাদির মাহাত্ম্য ও ধর্মাধর্মমূলক দেহান্তর প্রাপ্তির প্রামাণিকত্ব বিশ্বাস কর না, ইহাতে আর বলিবার কি আছে ?

“বাচতঃ যমরাজাঃ প্ৰেতস্যাশিষ্য ককর ।

নানাদেশজনোপজাঃ প্রত্যেবি ন কথাঃ কথম্ ॥”

বেদাদি শাস্ত্রবোধিত পরলোকের সত্তা যে অলীক নহে, সে বিষয়ে আর এক প্রমাণ এই যে, আয়ুঃকর না হইলেও নামভ্রান্তিতে যমদূত কাহারও স্থল শরীর হইতে লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলে যমরাজ বা চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূতেরা আবার তাহাকে যথাস্থানে রাখিয়া যায় । তখন সেই নিঃস্পন্দ শরীরে চৈতন্তের সঞ্চার হইলে বহুবাকবদিগের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে যমরাজ, চিত্রগুপ্ত ও নরকাদি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশ করে, ইহাতে ত স্পষ্টতঃই পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে নরকাদির যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, এই উত্তরের সহিত তাহা সম্পূর্ণ মিলিয়া যায় ।

ঋগ্বেদে প্রভৃতি চতুর্বেদে এবং স্মৃতি, পুরাণ, দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে পরলোকের প্রামাণিকত্ব স্থির করা হইয়াছে । এ ক্ষেত্রে কেবল তোমার কথায় কোন্-বুদ্ধিমান পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবে ? আর হে নাস্তিক, এই সকল বেদাদি অসংখ্য শাস্ত্র দেখিয়া তোমার নিজেরও পরলোক স্বীকার করাই উচিত । বহুলোকের সম্মতমার্গ পরিত্যাগ করিলে তাহা বিপত্তিকর হইয়া থাকে । কোনও কাশীযাত্রী, মধ্যবর্তী চতুস্পথে আসিয়া কাশীর পথ বামে না দক্ষিণে জিজ্ঞাসা করিলে পাঁচজন যদি বলে বামে, আর পঞ্চাশজন যদি বলে দক্ষিণে, তাহা হইলে ‘বহুনাং বচনং গ্রাহম্’—এই শ্রীমানুসারে উক্ত পথিক পঞ্চাশজনের কথিত পথেই গমন করে । পথভ্রান্ত হইলে তুমিও এইরূপ অধিক লোকের কথারই অনুবর্তন কর । লৌকিক গ্রাম গমনাদি কার্যে যখন এইরূপ কর, তখন পরলোক সম্বন্ধেও অন্নলোকের বৈমত্য গ্রাহ্য না করিয়া বহুলোকের অনুমোদিত মার্গই কি আশ্রয় করা উচিত নহে ?

“বেদৈশ্চদবেবিত্তিস্তম্বং স্থিরং মৃতশতৈঃ কৃতম্ ।

পরং কণ্ঠে পরং বাচা লোকং লোকায়ত ত্যজেৎ ॥

সমজ্ঞানান্নভূরিষ্ঠপান্থবৈমত্যমেত্য যম্ ।

‘লোকে প্রয়াসি পন্থানং পরলোকে ন তং কৃতঃ ॥’

[ক্রমশঃ ।]

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় ।

(প্রতিবাদ)

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ ।]

গত চৈত্র মাসের 'অর্চনা'য় মোঃ মহম্মদ কে চাঁদ মহাশয় 'সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়'র যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া আমি মনে করি । তিনি যে বলিয়াছিলেন "হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন । বিশেষতঃ হিন্দু-সাহিত্যিকের মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মের ছিদ্রাবেষণ করা, রাজললনাগণের উপর বৃথা কলঙ্কারোপ করা এবং মুসলমান শব্দের 'নেড়ে', 'চাষা', 'ঘবন,' 'ম্লেচ্ছ,' প্রভৃতি নিদারুণ শেল সদৃশ বাক্যবান, উপত্যাস, নাটক ও এমন ক্রি বিখ্যাতের পাঠ্যপুস্তকে পর্য্যন্ত ব্যবহার করা আজও পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহারা হিন্দুর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন ।" ইহাতে তাঁহার একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি ২১৪টি বা ১০১২০টি দৃষ্টান্ত হইতে কিরূপে স্থির করিলেন যে সকল হিন্দুই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করে ? সাহিত্য-সম্মিলনের শেষ দিনে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ও বলিয়াছিলেন "কলিকাতাবাসীরা বাঙ্গালদিগকে ঘৃণা করে ।" এ কথায় সকলেরই আপত্তি ছিল । কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি একজন মুসলমানের অগ্রায় ব্যবহারে সমগ্র মুসলমান জাতিকেই গালাগালি দেন তাহা হইলে তিনিও যেরূপ ভ্রমে পতিত হন, মোঃ মহম্মদ কে চাঁদ মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । ২১৪ জন সাহিত্যিক যদি এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকেন তজ্জন্ত সমস্ত সাহিত্যিকই অভিযুক্ত হইবেন কেন ?

কেহ কেহ বলেন, শ্রী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন, তজ্জন্ত কি ব্রাহ্মধর্মের কৈফিয়ত তলব করা হইবে, আর বলিতে গেলে তিনি হিন্দুধর্মও ভাবেন নাই মুসলমান ধর্মও ভাবেন নাই, তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন ধর্মনির্বিশেষে তাহা বলিয়াছেন ।

এবারকার সাহিত্য সম্মিলনের অন্ততম কর্ণধার বিজয় বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ঠিক । যে হিন্দু মুসলমানের মনঃপীড়াজনক কোনরূপ

কিছু লিখিবে সেই তাহার জন্ত দায়ী, হিন্দুসমাজ বা সাহিত্যিক সমাজ তজ্জন্ত কেন দায়ী হইবে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত উহা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থাপিত করার কোন ফল নাই। “মিথ্যা কথা কহা বড় দোষ” এইরূপ শত শত নীতি-কথা ছাপার অক্ষরে পড়িয়া ও শুনিয়া সকলেই সত্যবাদী হইয়াছেন কি ? যাহাতে কাহারও মনে অযথা কষ্ট হয় সেরূপ কার্য নিন্দনীয়, এ কথা কি নুতন করিয়া বলিতে হইবে ?

তবে এ কথাও মুসলমান ব্রাহ্মবৃন্দকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক সত্যের জন্ত যদি কোন মুসলমানের নিন্দা হয় তবে “তিনি মুসলমান ছিলেন সুতরাং তাঁহার নিন্দা হওয়ায় আমরা ক্রুদ্ধ হইব” এরূপ করিয়া মনো-বিবাদ বাড়াইলে চলিবে না। আওরঙ্গজেব ও সিরাজ-উদৌলা অত্যাচারী ছিলেন বলিলে যেমন মুসলমানের বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, তেমনি দুর্ঘোষণ পাষণ্ড ছিলেন বলিলে হিন্দুরও বিরক্ত হওয়া উচিত নহে।

হিন্দুদের মধ্যে কি দেখিতে পাই ? কায়স্থ পত্রিকায় একবার একটা ছবি বাহির হইয়াছিল—একটা শিখাধারী মস্তকের দুইটি পা, শরীর মোটেই নাই। নিম্নে লেখা ছিল রঘুনন্দন স্মার্তশিরোমণির কল্পিত বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ। ইহাতে ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে, বলিয়া কি সাহিত্য-সম্মিলনে কোনদিন কথা উঠিয়াছিল ? অন্তের কথা দূরে থাকুক, কায়স্থের উপবীত ধারণ লইয়া কায়স্থের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছে, একদল অপর দলকে ভয়ানক ঘৃণা করেন কিন্তু এই উভয় দলই অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়া থাকেন।

যেমন সাহিত্য-সম্মিলনটা একদল কায়স্থের সামগ্রী নহে, তেমনি ইহা একা হিন্দুরও নহে। ইহা সাহিত্যিকের সাধারণ সম্পত্তি, আহারের সময়ে বা ধর্ম্মাচরণের সময়ে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। সাহিত্যসম্মিলনের সময়ে আমরা সকলেই সাহিত্যিক, এই কথা মনে রাখিতে হইবে। সাহিত্যিক মুসলমান ব্রাহ্মবৃন্দ অধিক সংখ্যায় যোগদান করুন তখন দেখিবেন সাহিত্য-সম্মিলন তাঁহাদেরই—ইহা ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ব্রাহ্ম হিন্দু বৌদ্ধ কাহারও নহে, ইহা বর্গীয় সাহিত্যিকের।

গত শ্রাবণ মাসে “মানসী ও মর্ম্মবানী”র শ্রাবণ সংখ্যায় “মুসলমান ঘৃণা ব্যঙ্গক” প্রবন্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে ‘ব্রহ্মকাহিনী’তে এক স্থানে আছে “ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাগপাশের ভীষণ পেষণে জাতিভেদের অসুচিত বৈষম্যে ও

যাবনিক প্রলোভন প্ররোচনা বা প্রপীড়নে, অথবা মুসলমান হইলে 'জিজিয়া' কর হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর অসংখ্য লোকে দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।" এখানে "মুসলমান" এই কথাটির বিশেষণ "যাবনিক" করা হইয়াছে, ইহাতেই কি বকুবর মহম্মদ কে চাঁদ মহাশয় মুসলমানের প্রতি ঘৃণা দেখিতে পাইলেন? আমি ত ইহাতে লেখকের অজ্ঞতাই দেখিতেছি। কারণ 'যবন' কথাটি গ্রীকদিগের প্রতিই প্রযোজ্য (যবন = Ionian)। পুরাণে বা ইতিহাসে কোথাও 'যবন' কথা ঘৃণাব্যঞ্জকত্ব প্রকাশ করে না। 'কাফের' কথায় অ-মুসলমানের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ পায়, স্নেহ বা যবন কথায় তাহা প্রকাশ পায় না। খাদ্যাখাদ্য বিচারে অহিন্দু আচরণকারীকেই স্নেহাচারী বলে তা তিনি হিন্দুই হউন, ব্রাহ্মই হউন, আর মুসলমানই হউন। অধুনা স্নেহাচারী হিন্দুই অধিক। সুতরাং এখন স্নেহ বলিলেই মুসলমানকে বুঝায় না।

এই ব্রজকাহিনীর লেখক 'যাবনিক' কথায় মুসলমানের যত মনঃপীড়া দিয়াছেন যদি ঝগড়া করিতে হয় তবে বলিতে পারা যায় তিনি 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নাগপাশের ভীষণ পেষণের দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির এবং "জাতিভেদের অনুচিত ঝরমো"র দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী হিন্দু জাতির ততোধিক মনঃপীড়া দিয়াছেন। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন "মানসী ও মর্মবাণী"র সম্পাদকযুগল ব্রাহ্মণকে তাঁহারা ত কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আজ ব্রজকাহিনীর লেখক "মুসলমানদিগের প্রলোভন, প্ররোচনা বা প্রপীড়নে" না লিখিয়া "যাবনিক প্রলোভন" আদি লেখায় যদি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের অন্তরায় ঘটিতেছে! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় 'নারায়ণে' বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা (ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে) অধিক কঠোর কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত 'জগজ্যোতিঃ' পত্রিকায় দীর্ঘ প্রতিবাদ হয়, কিন্তু তজ্জন্ত হিন্দুদিগের সহিত মিলনের কোনরূপ বিষয় ঘটে নাই কিম্বা সাহিত্য-সম্মিলনে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার কথাও উঠে নাই।

সংসারে ভালমন্দ লোক থাকিবে, বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকও থাকিবে, ইহার মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া সাহিত্য-সম্মিলন ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, নিষ্ঠাবান স্নেহাচারী নির্বিশেষে মিলিতে হইবে। বকুবর মোঃ ডাঃ আবদুল গফুর, মহম্মদ কে চাঁদ, মোঃ মজাম্মল হক, মোঃ আবদুল নতিফ, মোঃ খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লাহ আহমদ, প্রভৃতি সাহেবান যেরূপ উদার

হৃদয় লইয়া সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন, তেমনই আরও সকলকে আহ্বান করুন। হৃদয় উদার করিলে কোথাও দোষ দেখিতে পাইবেন না, আর যদি দোষ দেখিব ইচ্ছা করেন তবে সম্মিলনের শতদোষ দেখিতে পাইবেন। আমি ছয় বৎসর ধরিয়া সম্মিলনে যোগদান করিতেছি, কত অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়াছি কিন্তু গৃহে আসিয়া সব বিশ্বৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিই, আবার সম্মিলনে যাই।

মতিমালা ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

(১)

কি জানি কোন্দিনের কোন্ দুর্ভাগ্যের মূল্য দিবার জন্ত পিতা আমার কণ্ঠে সেই “মতিমালা” পরাইয়া দিলেন। আমাকে তিনি বলিলেন—“বাবা ওসমান্ তুমি জান গনিমিঞা আমার বাল্যবন্ধু। তাঁর কাছে বহুদিন আমি প্রতিশ্রুত যে তাঁর কণ্ঠা মতিবিবি আমার পুত্রবধু হবেন। বাবা কথার নড়চড় আমাদের বংশে হয় নি।” পিতার সেই দুর্ভাগ্য মুহূর্তের প্রতিশ্রুতির জন্ত আমাকে বংশমর্যাদা রাখিতে হইয়াছিল—মতিবিবির পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের পর উভয় বন্ধুতে বলিয়াছিলেন—“বাবা তোমার গলায় মতিমালা ছলিয়ে দিলাম, খোদাতালা তোমাদের দু’জনকে সুখী করবেন।”

কিন্তু আমার উদ্দাম যৌবনের উদ্ভূত বাসনারাশি সে মতিমালায় পরিতৃপ্ত হইল না। কোথায় সেই আজন্ম-কল্পিত ছরীর মত রূপ, কোথা সেই লাবণ্যমাখা কান্ত দেহ আর কোথা বা সেই বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর ! মনে মনে যে রূপসীর কম-কণ্ঠে প্রণয়ের প্রীতিহার পরাইয়া দিয়াছিলাম, সে ‘মানস-প্রতিমার সঙ্গে মতি-মালার কোনও সৌসাদৃশ্য ছিল না। আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে মনে মনে সকলেই আদর্শ সঙ্গিনী আকিয়া রাখে, তাই যৌবনের দ্বারে আসিয়া আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। জমিদারের ছেলে, পিতা স্বয়ং আমাকে এত বিলাসে রাখিয়াছিলেন শেষে কি এই রূপহীনা মতিমালা পুরস্কার দিবার জন্ত ? পিতার বশতা স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলাম

বটে কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম না, স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিলাম না। পিতা কিছু জানিলেন না, মাতা বুঝিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না, তিনি কোন কথা বলিলেন না।

(২) .

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের দেশের ছেলেরা প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সকলে বিদ্রোপ করিত, সকলে আমোদ করিত, ভোজ চাহিত। আমি কাহাকেও মনের কথা বলি নাই অথচ প্রাণে দারুণ অভিমান, বিষম ক্ষোভ। সেই সময় রুফকাকে দেখিলাম। যিহুদীর ঘরের মেয়ে, পিতামাতা দরিদ্র কিন্তু রুফকার রূপের সীমা ছিল না। আমার কল্পনার সুন্দরীর মত সুসমা-মণ্ডিতা না হইলেও রুফকা রূপসী। রুফকাকে আশ্রয় করিয়া ঘোবন নিজেই যেন গর্ভিত। কি সূঠাম দেহ, কি সুন্দর টানা টানা চোখ, কি কমণীয় রূপ! তাহাকে দেখিলে আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিতাম, আমার মনে অদম্য বাসনা জাগিত যে সেই রূপলাবণ্য আমার নিজস্ব করি, চিরদিন সে সৌন্দর্য্য কেবল আমিই উপভোগ করি। আমি কখনও রুফকার মনের পরিচয় পাই নাই, তাহার রূপের কলসীর অভ্যন্তরে গরল আছে কি সুখা আছে কখনও সে কথা বিচার করিবার জ্ঞান তিলার্দ্র সমস্ত নষ্ট করি নাই। এই যুবতীর রূপ আমাকে যতই উন্মত্ত করিতে লাগিল মতি-বিবির উপর আমার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার মাত্রা তত অধিক পরিমাণে বাড়িতে লাগিল।

বেশীদিন প্রাণের মধ্যে অগ্নি পুষ্টিয়া রাখিতে পারিলাম না। বন্ধু বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিলাম। মুসলমানেরা বলিল—যিহুদী শয়তানের জাত, রুফকাকে নিজস্ব করিলে বংশমর্যাদা লুপ্ত হইতে পারে। হিন্দুরা বলিল—রক্তের মেশামিশি বড় ভাল না। উহাকে বিবাহ করিলে আমাদের যে সন্তান সন্ততি হইবে তাহারা দুশ্চরিত্র হইবে, পিতামাতা উভয় জাতির কেবল দোষই পাইবে, কোনও গুণ পাইবে না। আমি এ সকল জাতীয় বিদ্বেষকে চিরদিন ঘৃণা করিতাম। আমার ধর্ম উদার, আমার ধর্ম জাতি বিচার গ্রাহ্য করে না। আমি এ সকল সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিলাম না। মানুষের প্রধান উপভোগের সামগ্রী রূপ এবং গন্ধ। আমি অর্থদানে রুফকার পিতামাতাকে বস্ত্রীভূত করিলাম। তাহাকে পবিত্র কলমা পড়াইলাম! তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে কলিকাতার বাসার অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিলাম।

(৩)

আমার গুপ্ত-বিবাহের কথা কেহ জানিষ্ঠ না। কেবল কলিকাতার ছই একটি বন্ধু জানিত। দুর্গাপূজার ছুটিতে বাটী যাইতে হইল। পড়া শুনার ক্তি হইবে বলিয়া ওজর করিলাম, কলিকাতায় থাকিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পিতা কোনও আপত্তি শুনিলেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন—“আমি বুড়ামানুষ আর কতদিনই বা ছনিয়ায় থাকিব। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমার আত্মজানেরও বড় ইচ্ছা তোমায় দেখিবেন। তোমার যাহাতে পড়াশুনার বিঘ্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। কিছুতেই অনুরোধ উপেক্ষা করিও না।”

পিতা সকল কথা প্রথমে অতি নরম করিয়া বলিতেন, ‘কিন্তু কথা অমান্ত করিলে কেহই নিস্তার পাইত না। কি মনোকষ্ট লইয়া বাটী গেলাম তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। রুফকার সঙ্গে আমি বেশী কথা কহিতাম না, তাহার সহিত কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতাম না, নাটক উপস্থাসের নায়কের মত মধুর সম্ভাষণে সময়ের অপব্যবহার করিতাম না। আমি তাহার রূপের উপাসনা করিতাম, তাহার মাংসপিণ্ড, তাহার হাবভাব, চালচলনে মুগ্ধ হইতাম। তাহার নিকট হইতে নয়ন-জলে বিদায় লইলাম। সে হাসিল, বলিল—“চিরদিনত আমার দেখতে পাবেন তবে এত হা হতাশ করছেন কেন?” সেই কথা শুনা শুনিয়া একবার মাত্র সন্দেহ হইয়াছিল—তবে কি রুফকা আমার প্রণয়ের মূল্য বুঝে না? কিন্তু তখনি চমক ভাঙ্গিল। ভাবিলাম তাহাতে আসে যার কি? আমি ত বাস্তবিক উহার অন্তঃকরণ ক্রয় করি নাই বা সেদিকে চেষ্টা করি নাই। আমি উহার রূপে মুগ্ধ হইয়া উহার রূপ ক্রয় করিয়াছি, যাহাতে উহার রূপ অক্ষুণ্ণ থাকে—আমার বিধিমতে সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। মন জয় পরে হইবে।

মনকে দৃঢ় করিলাম। কিন্তু মনের উপর একেবারে আধিপত্য অসম্ভব। সে দীপ-শিখার নিকট হইতে যতই দূরে চলিলাম, মনের অন্ধকার ততই তাল পাকাইতে লাগিল। অনেক বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। গৃহে যাইতেছি, রুফকাকে ত্যাগ করিয়া, হৃদয়ের ভোগময়ী লালসাকে দমন করিয়া সেই কুরূপার সঙ্গলাভ করিতে! এ চিন্তায় বড় বেশী কষ্ট হইতে লাগিল। আবার মাঝে মাঝে আশা হইতে লাগিল। পড়া শুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া হস্ত পিতা মৃতিকে গৃহে আনিবেন না।

কিন্তু গৃহে গিয়াই সংবাদ পাইলাম আমার সম্ভাষের অন্তঃকরণে জন্মী মতিবিধিকে গৃহে আনিয়াছেন।

(৪)

• তারের সংবাদ পাইলাম—রুফকা পীড়িতা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বহুকাল বাগানে বসিয়া রহিলাম। মাথার উপর কত দোয়েল ডাকিয়া গেল, কত পাখী কাকলী করিল, কত পাখী চোখের উপর নাচিল, আমার প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। বাগানে বড় বড় গোলাপ ফুটিয়াছিল, তাহাদের কান্তরূপে, মধুর সুবাসে আজ আমার কোন আনন্দ হইল না। প্রাণ গুমরিয়া উঠিতেছিল, সর্বশরীর জ্বলিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল উড়িয়া গিয়া সুন্দরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, তাহার যত্নগার উপশম করিবার চেষ্টা করি।

এক ঘণ্টা বাদে আবার তার আসিল—“রুফকা মরিয়াছে।”

রুফকা মরিয়াছে? শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ ছুটাছুটি করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল—রুফকা মরিয়াছে। সেই সোণার স্নেহলতা প্রাণহীন, সেই সৌন্দর্য চিরদিনের জন্য ধরণীর অন্ধকার গর্ভে শয়ন করিয়া থাকিবে, আর আমার জন্য জাগিবে না, আর তাহার মাদকতার আমাকে উন্মত্ত করিবে না।

রুফকা মরিয়াছে—এ সংবাদ সকলে শুনিল। পিতা জানিলেন রুফকা কে, মাতা জানিলেন, গোলাম নফর, খানসামা বাবুর্চি সকলে জানিল, সকলে বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিতে লাগিল। আর আমি কাহারও নিকট আমার বিবাহের কথা গোপন করিলাম না। চিরদিনের জন্য সে কুসুম শুকাইয়াছিল, চিরদিনের জন্য সে হিমাকর অন্ত গিয়াছিল। কিন্তু এখনও তো সে রূপরাশি একবার দেখা যায়, এখনও সে ললিত দেহের স্পর্শমুখ অনুভব করা যায়। সমাধির পূর্বে তাহাকে একবার দেখিব—শেষ দেখা। গৃহ হইতে কলিকাতা পহুঁছিতে তিন দিন সময় লাগিবে। এ তিন দিন যেন তাহার সেই স্বর্ণবপুর সমাধি না হয়। আমি সেই মর্মে তাহা সংবাদ পাঠাইলাম।

(৫)

“কই রুফকা কোথা? আমার রুফকা কোথা? আমার সোণার রুফকা কোথা?”

তাহার স্নাননী তারস্বরে কাঁদিতেছিলেন ও শিরে করাঘাত করিতেছিলেন। তাহার পিতাও অশ্রু মোচন করিতেছিলেন—নীরবে। আমার দাস দাসী সকলেই কাঁদিতেছিল, সকলেই আঁত! সমস্তই নিরানন্দময়! আমার সেই

বিলাস-গৃহে, আমার সেই আনন্দালয়ে ! আমি বলিলাম—কান্না রাখ ! একবার দেখাও, শেষ দেখা দেখাও, রুফকা কোণা, আমার ছরী কোথা ?

তাহার জননী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। অতি সন্তর্পণে গৃহের দ্বার খুলিল—আমার বিলাস-গৃহের দ্বার, আমার সুরভিভরা কুঞ্জগৃহের দ্বার ! ছিঃ ছিঃ কি পুতিগন্ধ ! কি ভীষণ বিড়ম্বনা !

ভাগাড়ের গন্ধ এত কদর্যা নয়। তিনদিনে শব গলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। কি জঘন্য পুতিগন্ধ !

তাহার পর রুফকাকে দেখিলাম, ছিঃ ছিঃ কি প্রবঞ্চনা ! এ কখনই রুফকা হইতে পারে না। চক্ষু মুদিয়া রুফকা যখন নিদ্রা যাইত, যখন ধীরে ধীরে তালে তালে তাহার বক্ষঃস্থল উঠিত নামিত, তখন তাহার স্নকুমার দেহ কি অপরূপ শোভা ধারণ করিত ! আর আজিকার নিস্তেজ প্রাণহীন শ্বাসহীন জড়পিণ্ড যেমন দুর্গন্ধময় তেমনি কুরূপ ! রূপের মোহে রুফকাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, রূপের মোহে তাহাকে চিত্রের মত গৃহে সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে শবদেহে সে রূপের ত' কিছু অবশিষ্ট ছিল না। প্রাণে ভীষণ ঘৃণা আসিয়াছিল, নাকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, প্রতি মুহূর্তেই পলাইবার বাসনা বলবতী হইতেছিল। তবু একবার ভাবিলাম ইহাকে স্পর্শ করিব। ইহার কুসুম অঙ্গের স্পর্শে যে অনির্করণীয় সুখ উপভোগ করিতাম, তাহার আলিঙ্গনে প্রাণে যে আনন্দের যে তৃপ্তির উৎস উঠিত, সে সুখ, সে আনন্দ, সে তৃপ্তির স্মৃতিতে বাস্তব জগতের পুতিগন্ধ লোপ পাইল, বিভীষিকা মুখ লুকাইল। আমি আগ্রহে তাহার সেই চম্পক কলিকার মত আঙ্গুল গুলা ধরিলাম ! সর্বনাশ !

কি শীতল ! কি ঘৃণ্য ! পুতিগন্ধটা বহুগুণ বাড়িল, সেই লোল মাংস আরও বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। ছিঃ ছিঃ, এতদিন কি জড়ের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি ! কে আগে জানিত এত সুন্দর দেহেরও এই পরিণতি হইবে। হাত পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে মনে ভীষণ ঘৃণার উদ্বেক হইল। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। গৃহের আসবাব সরঞ্জাম নাচিতে লাগিল, প্রত্যেক দ্রব্য দ্বিগুণ হইল। শবটা দ্বিগুণ ! গলিত লোল অঙ্গ দ্বিগুণ—জঘন্য আকার ধারণ করিল। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া সেই পুতিগন্ধময় নখর দেহের পদতলে পড়িয়া গেলাম।

(৬)

মাঝে মাঝে বিকারের উপশম হইত, জ্ঞান আপিত। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া দেখিতাম—মতিবিবি। যখনই চোখ চাহিতাম তখনই তাহার সূক্ষ্ম কাতর

চক্ষু দুইটি দেখিতাম । অমনি চক্ষু মুদিতাম । আবার জ্বরের প্রকোপ বাড়িত,
সংজ্ঞাহীন হইতাম ।

দারুণ তৃষ্ণা ! একটু সংজ্ঞা হইয়াছিল । ঘরের ঘড়ি বাজিল গণিলাম—
এক দুই তিন । আমার ঘড়ি ! গৃহে দীপ জ্বলিতেছিল, চক্ষু চাহিলাম, আমার
গৃহ । কবে বাটা আসিলাম ? ললাটে ধীরে ধীরে কে পাখা বাতাস করিতে
ছিল ? বেশ আরাম হইতেছিল । চক্ষু মুদিয়া বলিলাম—জল ।

বাতাস বন্ধ হইল । কাপড়ের খসখসানির শব্দ হইল, কলসীর জল ঢালা
শব্দ হইল । কপালে বেশ শীতল কোমল স্পর্শ অনুভব করিলাম । • কাণে শব্দ
গেল—হাঁ কর । •

শীতল স্পর্শ—শীতল কিন্তু প্রাণহীন নয় । এমনি স্পর্শ তাহার ছিল—
আবার মাথায় রক্ত ছুটিল । তখনও সংজ্ঞাহীন হই নাই । নিজের মনে বলিলাম,
রূপের সেই শেষ, ক'দিনের রূপ ।

সে ধীরে ধীরে বলিল—জল খাও, আমার রূপ নেই !

চক্ষু চাহিলাম । কথাগুলো মাথায় ঘুরিতে লাগিল—রূপ নাই ! চক্ষু
চাহিলাম—না সে রকম রূপ নাই কিন্তু—জ্ঞান লোপ পাইল ।

এখন একটু একটু জ্ঞান হয় । যখনই জ্ঞান আসে তাহাকে দেখি—সে
ব্যথিতা, সতৃষ্ণা-নয়না, কাতরা !

একদিন বলিলাম—তোমার ঘুম হয় না ?

সে চোখ মুদিল । বলিল—তুমি আরাম হও । খোদা ঘুমাবার দিন দেবেন ।

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে চক্ষু সরাইল । ধীরে ধীরে আমার
গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল । আমি বলিলাম—মতিবিবি রূপ ক'দিন থাকে ?

সে বলিল—বেশী দিন না । স্থির হও । বাতাস ক'রব ?

আমি স্থির হইয়া তাহাকে দেখিলাম, তাহার ছিল রূপ—ইহার আছে গুণ ।
কিন্তু রূপ বড় উন্মাদক ।

কবিরাজ মহাশয় আসিলেন । সে সময় আমার জ্ঞান হইয়াছিল । তিনি
বলিলেন—বাবা ! এবার তুমি সেরে উঠবে । বেশী কথা—

আমি বলিলাম—সে আপনার দয়া ।

তিনি বলিলেন—নারায়ণের দয়া । আর এই আমার মা লক্ষ্মীর সেবার ।
আহা ! মা'র আমার আহার নিদ্রা নেই !

আমি চাহিলাম—তাল পাকাইয়া কাপড়ের বস্তার মত মাথার শিয়রে বসিয়া-
ছিল—মতিবিবি !

বুদ্ধ কবিরাজ ! ধর্মপ্রাণ ! তিন পুরুষ তাঁহাদের সহিত আমাদের বংশের
সম্বন্ধ । তিনি সমস্ত জানিয়াছিলেন, সমস্ত শুনিয়াছিলেন । তিনি পিতার
অন্তরঙ্গ—পিতার নিকট সাক্ষাৎ ক্রমাভিষ্কা করিবার সামর্থ্য ছিল না । ইহার
নিকট যাহা বলিব পিতা তাহা শুনিবেন ।

আমি বলিলাম—কবিরাজ মহাশয় একটা ভুল—

তিনি বলিলেন—কিছু না বাবা কিছু না । না ঠেকলে কি শেখে । এখন
বুঝ্বে রূপের চেয়ে গুণ কত বড়—রূপ দেহের সঙ্গে শ্মশানে যায়, গুণ
চিরদিন থাকে ।

বুদ্ধ আমার প্রলাপগুলা শুনিয়াছিলেন । আমি চোখ মুদিলাম ।

যখন চক্ষু চাহিলাম, শিয়রে বসিয়া একাকিনী—মতি ।

আমি বলিলাম—মতি ।

সে বলিল—জল খাবে ?

আমি তাহার হাত ধরিলাম, বলিলাম—মতি গুণ চিরদিনের । কি বল
মতিমালা ?

আমার ললাটে তাহার এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল ।

আমি বলিলাম—মতিমালা ! তুমি চিরদিন আমার কণ্ঠে দুলবে, আমার শক্তি
নাই । মতি আমায় তুমি বাঁচালে ।

আমি তাহার হস্ত চুম্বন করিলাম । বিবাহের পর এই প্রথম চুম্বন । হাত
ছাড়াইয়া মতি ঘরের বাহিরে পলাইল । বোধ হয় এই সে প্রথম রোগশয্যা
ছাড়িয়া বাহিরে গেল ।

ভাষা-বিভ্রাট ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

ভাষা-বিভ্রাটের কি একটা মীমাংসা সম্ভবপর নয় ? যাহারা দেশে “একটা
নূতন কিছু” করিবার জন্ত অভাগিনী ভাষা-জননীর মুণ্ডপাত করিতেছেন,
তাঁহাদিগকে আমরা অনেক বুঝাইয়াছি, মাতৃ-ভাষার মঙ্গলের জন্ত মাঝে মাঝে
অনেক সাময়িক ও সংবাদপত্রে তাঁহাদিগকে অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে, কিন্তু

তাহাতে কোনও ফল কলিল না। 'সবুজ-তন্ত্র' আপনার জিন্ বজায় রাখিবার জন্ত, আপনার পথে চলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক আছেন, প্রতিভাবান লোক আছেন। স্যর রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে তাঁহাদের মাল কাটিতেছে, তাঁহাদের পুস্তক বিক্রয় হইতেছে। শ্লেষ, ব্যঙ্গ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা 'সবুজ-বাঙ্গালা' চালাইতে বন্ধ-পরিষ্কার।

আমরা বলিতেছি আমাদের বাঙ্গালা বিশুদ্ধ, তাঁহারা বলিতেছেন তাঁহাদের ভাষা খাঁটি আধুনিক বাঙ্গালা। এদিকে "প্রবাসী" বুঝিতেছেন "পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে"। সুতরাং "প্রবাসী" স্বরবর্ণে আ-কার, ঙ্কার সংযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একদল যুক্ত অক্ষর উঠাইয়া দিয়াছেন। ভাল কথা! এতদিন বাঙ্গালা সখের ভাষা ছিল, কেবল নাটক নভেলের ভাষা ছিল, এরূপ বিভিন্নতায় কাহারও কোনও অনিষ্ট হইত না। আমাকে একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, 'সবুজ-ভাষা' যাহারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাঁহারা ব্রাহ্ম। এদেশে হিন্দুর বাঙ্গালা মুসলমানের বাঙ্গালা হইতে পৃথক। তাই উহারা নিজেদের সাম্প্রদায়িক ভাষার সৃষ্টি করিবার জন্ত কালাপাহাড়ি ভাষার প্রবর্তন করিয়াছেন।

অবশ্য কথাটা হাসির বটে। কিন্তু এখন হইতে এ বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি না হইলে পরে ঐ বৈষম্য বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির অন্তরায় হইবে। স্যর আশুতোষ প্রভৃতি মনীষির অনুগ্রহে এখন বাঙ্গালা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় অবধি প্রবর্তিত হইতেছে। নূতন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষার আদর হইবে। সুতরাং বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার রূপ এখন নির্দ্ধারিত না হইলে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটিবে। আমি সেদিন মাট্রিকুলেশনের বাঙ্গালা পরীক্ষকের তালিকা দেখিতেছিলাম। তাহাতে 'সবুজ-তন্ত্রের' সেবক অন্ততঃ দুই জনের নাম দেখিলাম। যে সকল পরীক্ষার্থী যুবক তাঁহাদের নূতন টপ্পের ভক্ত, তাহাদের কাগজ অপরের হস্তে পড়িলে উহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। আবার 'সবুজ-ভাষা'র লেখকদিগের ভাগে যে সকল কাগজ পড়িবে সেগুলি যদি তাঁহারা আপনাদের অভিকৃতি-অনুসারে পরীক্ষা করেন তাহা হইলে কিরূপ বিষময় ফল ফলিবে তাহা অনুমান করা সহজ।

আমার মনে হয় এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যিক। একটু চেষ্টা করিলেই ভাষার রূপ-নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এ কাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের।

এ সকল বিষয় পাশ্চাত্যে যেরূপ ভাবে নিশ্চয় হইয়া থাকে সেই প্রথা অবলম্বন করিলে সাহিত্যপরিষৎ মাতৃ-ভাষার যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন।

প্রথাটা সরল। সকল সম্প্রদায়ের মেধাবী লোক লইয়া একটি রূপ-নির্ধারণ কমিটি করিলেই এ বিষয়ের মীমাংসা হয়। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত কৰ্মবীর সভাপতি লইয়া নূতন তন্ত্র, পুরাতন তন্ত্র, পণ্ডিত সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায় প্রভৃতি হইতে প্রতিনিধি লইয়া যদি আমরা এ বিষয় একটি কমিটির হস্তে হস্ত করি তাহা হইলে যুক্তি, তর্ক এবং ভোটের দ্বারা তাঁহার ভাষার যে ব্যাকরণ গড়িয়া দিবেন, যে শব্দ-কোষ অনুমোদন করিবেন, সেই ব্যাকরণ, সেই শব্দকোষই সাধারণ-গ্রন্থ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় তাহা গ্রহণ করিবে, দেশের সকল কার্য সেই ভাষায় সম্পাদিত হইবে।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ বন্ধ করিবার জন্ত দেশের শক্তির বাহিরের কার্যে নিয়োগ করিবার প্রথা রাজনীতি ক্ষেত্রে বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্য-পরিষদের ভিতরের গোলযোগ মিটাইবার এই “স্বর্ণ-সুযোগ।” বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ একটি কমিটি গঠন করিয়া তুলিতে পারিলে পরিষৎ এক মহৎকার্য করিবেন। তাঁহার না করিলে স্বয়ং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ কার্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য।

মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণ এ বিষয় আন্দোলন করিলে সফল ফলিতে পারে।

বৌদ্ধ-নীতি-সুধা ।*

যাঁহার চন্দন কাষ্ঠের গায় পরোপকারার্থে ছেদন ঘর্ষণ ও দহন পর্য্যন্ত অক্লেশে সহ্য করিয়া থাকেন, ঐদৃশ পুণ্যশীলগণই ইহ জগতে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

জগৎসৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুত, বেহেতু মকরপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল সমুদ্রমধ্যেই (মহামূল্য) মণিমুক্তাদির উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ (দুঃখশোকাদি-সমাকুল) এই সংসারেও বিখ্যাত পুণ্যবান পুরুষরত্ন উদ্ভূত হন।

* মহাকবি কবীন্দ্র-বিরচিত বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা ৮য় শ্লোক দাস বাহাদুর কর্তৃক অনুদিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

লুক্ক জনের পক্ষে স্বজনও আত্মীয় হয়না এবং কামী ব্যক্তি ধনের অনুরোধ করে না। তদ্রূপ প্রাণিগণের হিতোদ্যত দয়ালু ব্যক্তির নিজ দেহও মেহপাত্র হয় না।

অর্থিগণ যে প্রাণের জন্ত সর্বপ্রকারে দীনভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রাণই দীন-জনের উদ্ধরণেচ্ছ মহাত্মগণের পক্ষে তৃণতুল্য বিবেচিত হয়।

স্বর্গীয় অম্পরাগণের বাহুদণ্ড দ্বারা সঞ্চালিত মনোজ্ঞ চামরকলাপ যাহার হাশুচ্ছটা বলিয়া গণ্য হয়, এরূপ অতুল সম্পদ এবং কর্পূররাশির শ্রায় উজ্জল ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজনক যশোগান ত্রিভুবনস্থ পুণ্যশীলগণেরই হইয়া থাকে। এ সকলই তাঁহাদের সামান্যমাত্র দানের স্বল্পমাত্র ফল বলিয়া জানিবে। দানই সকল সম্পদের নিদান।

সংকল্পপরম্পরা যেখানে বিকলাঙ্গবৎ লুপ্তিত হয় অর্থাৎ যেখানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাহা স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালমধ্যে কদাপি স্কুরিত হয় না, ঐদৃশ দানরূপ কল্পক্রমের অতুলনীয় ফলসম্ভূতি ভাগ্যবান্ গণের বিভবভোগের সাধন হয়।

ক্ষীরসাগর দেবগণ কর্তৃক (মন্বনের নিমিত্ত) প্রার্থিত হইলে অতিশয় বিষণ্ণ ও ক্ষুধা হইয়া বহুক্ষণ কম্পিত হইয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষগণও স্বভাবতঃ ফলদানকালে কম্পিত হইয়া থাকে। পরন্তু এতাদৃশ অনির্বচনীয় ধৈর্য্যসম্পন্নও কেহ কেহ উৎপন্ন হন যাহাঁরা শত শত বার অবিচলিত ভাবে দেহ দান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এবং তৎকালে তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন।

অহো, মহোৎসাহসম্পন্ন মহাশক্তিশালী ও সত্ত্বগুণের সাগরস্বরূপ দানোদ্যত শুদ্ধাত্মা জনগণের চরিত্র কিরূপ অচিন্তনীয়!

মহাত্মগণের সর্বাতিশায়ী ও সত্ত্বগুণসংবলিত প্রভাবের বিকাশ এইরূপ হইয়া থাকে, যে উহা বৃহদাকার মেঘরাজির্মাণ্ডিত অত্যন্নত পর্বতগণকেও গৃহসোপানবৎ জ্ঞান করিয়া অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করে, জলরাশির প্রবল তরঙ্গে উদ্ধত সাগর-গণকেও গোম্পদ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়, এবং অতি দুর্গম মহারণ্যস্থলও গৃহপ্রাঙ্গণজ্ঞানে অতিক্রম করে।

যাঁহাদের চিত্ত কুশলকার্য্যে প্রণিধান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা জন-গণকে বিমলালোকসম্পন্ন বিবেক বুঝাইয়া দেন, এবং যাঁহাদের নামোচ্চারণে লোকের ভবমোহ অপহৃত হয়, তাঁহারা এই সংসারে ধন্য।

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা কিছু শুভাশুভ কন্ম করে, তাহার ঠিক অনুরূপ পরিণত ফল ভোগ করিয়া থাকে।

নিখিল কুশলকার্য্যই যাহার মূল ও কীর্ত্তিপুষ্পেই যাহার শ্রী উজ্জ্বল, সেই মনুষ্যাগণের ধর্ম্মবল্লীই সমস্ত শুভফলের প্রসব করে । পাপ ও ক্লেশ যাহার মূল, সেই বিষলতাই ভ্রমনিপাত মোহ ও অনন্ত সন্তাপের হেতু ।

হে জনগণ, সন্তুপ্ত প্রথরমরুভূমি সদৃশ এই সংসারমার্গে তীব্রানুতাপজনক পাপ পরিত্যাগ কর ও সতত পুণ্য ঘর্কন কর । পুণ্যবান্গণের পক্ষে পবিত্র-ছায়াসম্পন্ন ও শীতল তরুতলভূমি পুণ্যায়ত দ্বারা সিক্ত হয় ।

সদাশয়গণের চিত্ত অপকারীর প্রতিও কৃপাকুল, খলের প্রতিও পল্লববৎ কোমল এবং বিদ্বেষোন্মায় প্রতপ্ত ব্যক্তির প্রতিও অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে ।

অশিব বস্তুও ধনুগণের সংস্রভাব বশতঃ শুভ হইয়া থাকে । মূর্খগণের পক্ষে মঙ্গলও অহিতে পরিণত হয় । এইরূপ নিয়মই দেখা যায় । অর্দ্ধরাত্রে গাঢ় অন্ধকার ঔষধিবনের অধিকতর কাস্তিপ্রদ হয় । সূর্য্যকিরণ আবার পেচক-গণের দৃষ্টিশক্তি নাশ করে ।

রাজা গুণবান্ হইলে সকল প্রজাগণই নিষ্পাপ হয় ; সজ্জনের উদার পরিচয় হয় ; গুণিগণের গুণ থাকে ; বংশমর্যাদার রক্ষণ হয় ; সমৃদ্ধি হয় ; চন্দ্রতুল্য শুভ্র যশ হয় ; লোকের মর্যাদানুরূপ ব্যবহার হয় এবং সকলের সম্পত্তিও নিরাপদ থাকে ।

ধনরূপ মূল হইতে সমুদ্রাত ও নির্দোষ কামরূপ কুম্ভদ্বারা উজ্জ্বল ধর্ম্মক্রম যদি কুনূপতির দুর্ব্যবহাররূপ বায়ুর আঘাতে হত না হয়, তাহা হইলে লোকে তাহার পুণ্যফল ভোগ করিতে পারে ।

যাহারা স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণহৃদয়, ও লোকের মঙ্গলের জন্য আগ্রহসহকারে সমধিক অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ প্রাণিহিতার্থে অনুকম্পাবান্ ও মহানুভাব ভব্যজনও এই ভয়াবহ ভুবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

হে সাধু, অনুরাগবশতঃ তোমার এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে । কল্যাণে অভিনিবিষ্ট জনগণের চিত্ত বিঘ্নকর্ত্তক আকৃষ্ট হয় না ।

কোথায় তুমি যোগাবলম্বন করিয়া বিষয়াভিনিবেশকে তুচ্ছত্ব জ্ঞানে ত্যাগ করিবে, তাহা না করিয়া এই নিন্দনীয় ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখাস্বাদের জন্য লালসিত হইতেছ । এই দুঃসহকারী কামমার্গ স্বভাবতই কুশলের বিনাশকারী । ইহা প্রেমানন্দের পক্ষে দুঃসহ বন্ধনরজ্জ্বরূপ ।

নন্দ, তুমি বিপ্লব করিও না । শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ না করা নিন্দনীয় । তুমি পৃথক জনের গায় নিঃস্বজনের উপদেশ অগ্রাহ করিও না ।

বিবেক দ্বারা যাহাদের দোষ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের শীলবান্ বিষজ্ঞানের বৃদ্ধি অসার সুখলাভের জন্ত অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না ।

তুমি গাঢ় অমুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক জঘন্য কার্য্যে কেন আসক্ত হইতেছ ।

যাহারা যোনি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া আবার যোনিতেই সংস্কৃত হয়, স্তনপান করিয়া আবার স্তন মর্দন করে, তাহারা কেন লজ্জিত হয় না । বড়ই আশ্চর্য্য যে তাহারা জন্মস্থানেই লয় প্রাপ্ত হয় ।

সজ্জনগণ সতত জননীর জঘনে আসক্তি বর্জন করেন । ইহা কেবল সম্মোহ-মুগ্ধ পশুদিগেরই দেখা যায় ।

তুমি রামারমণে অভিলাষ ত্যাগ কর ও বিরত হও । সংসারগর্ভে ভুজঙ্গগণই ভোগের সহিত লয় প্রাপ্ত হয় দেখা যায় ।

লোকে পর্য্যন্তকালেও যাহাতে পরাধুখ হয় না, সেই জঘন্য রতি কাহার না বিরতি সম্পাদন করে ।

তুমি গৃহজাল হইতে মুক্ত হইয়াছ, আবার কেন সেইখানেই দৌড়িয়া যাইতেছ । মৃগ জাল হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তথায় প্রবেশ করে না ।

তুমি বামাভিলাষ করিওনা । ইহা নীলীরাগের গায় তোমার হৃদয়ে সংস্কৃত হইয়াছে ; যেহেতু তুমি এখনও বিরক্ত হইতে পারিতেছ না ।

রতি প্রারম্ভকালে তৎকালে কাতর ব্যক্তিকে অন্ধ করে । পরে মুখ্যঙ্গসঙ্গম সমাপ্ত হইলে জুগুপ্সার গায় তাহাকে আলিঙ্গন করে ।

লোক বিষয়ান্বাদে আসক্তিবশতঃ পাপমিত্র ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক হুঃসহ হুঃখরূপ আবর্তময় নরকে পাতিত হয় ।

কুসঙ্গম পচা মাছ হইতে উদগত পুতিগন্ধের গায় লেশমাত্র স্পর্শদ্বারাই লোককে অধিবাসিত করে ।

কল্যাণমিত্রের সম্পর্ক সর্বপ্রকারেই মঙ্গলজনক । উহা সুগন্ধের গায় ব্যাপ্ত হইয়া মহার্হতা সম্পাদন করে ।

নন্দ, এই নিন্দনীয়াকৃতি মর্কটীকে দেখিতেছ কি ? এই মর্কটীও কোনও ব্যক্তির নিকট প্রিয়দর্শনা • কুচিপাত্র ।

ইহ জগতে ভাল বা মন্দ কিছুই নাই । অমুরাগই রমণীয় দেখে । যে যাহার প্রিয়, সেই তাহার নিকট সুন্দর । নন্দ তুমি পক্ষপাত না করিয়া সত্য কথা বল । এই মর্কটী ও তোমার সুন্দরীর লাবণ্যের প্রভেদ কি ?

আমরা প্রার্থনা না থাকায় সৌন্দর্যের কিছুই প্রভেদ দেখি না। যে বস্তু প্রার্থিত হয়, তাহাই প্রার্থীর নিকট প্রিয় ও রমণীয় হয়।

আমি ইহাতে ও সুন্দরীতে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখি না। মাংস চর্মে ও অস্থি জড়িত দেহে প্রার্থনা মাত্রই রমণীয়ত্ব।

এহু সমালোচনা।

সানুবাদ সরস্বতীতন্ত্রম্। সিন্ধুপুরুষ পূর্ণানন্দের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এবং তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ “তন্ত্রকল্পতরু” নাম দিয়া বিবিধ দুঃপ্রাপ্য তন্ত্রগ্রন্থ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম গ্রন্থ “সরস্বতী তন্ত্র” সানুবাদ বাহির হইয়াছে। আমরা ইহার একখণ্ড উপহার পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। তন্ত্র শাস্ত্র, বাঙ্গালীর এক প্রধান গৌরবের সামগ্রী। কাল যাহা যেন লোকের চিত্ত হইতে ধর্মভাব ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে। সামাজিক বন্ধনের দুঃশ্ছেদতা বশতঃই এখনও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে বৈদিক দীক্ষা—উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষাটির উপর অনেকেই খড়্গহস্ত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, বেদ পুরাতন হইলেও তন্ত্রটা আধুনিক। তাঁহারা পিতা পিতামহের চিরানুষ্ঠিত আচরণ পরিত্যাগ করিতে যে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, ইহা তাঁহাদের সাহসের পরিচয় বটে। দুইটা স্বকল্পিত লৌকিক বুদ্ধির প্রভাবে পূর্বপুরুষদিগের আচারে অশ্রদ্ধা পূর্বক আগম-নিগম সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না। একজন ধর্মবিখ্যাসী কবি বলিয়াছেন,—

“কৃত্যে পূর্বপরম্পরা প্রচলিতে অন্ধাং পরামাশ্রয়ন্
শ্রোতং তন্ত্রগতং সমাচর সমৌ বিজ্ঞায় বেদাগমৌ ।
তত্ত্বাত্ত্ব নিরূপণং জড়মতে শাস্ত্রে ন তে শোভতে
রূপং তত্র পরত্র নেতি চ সখে নাক্ষেত্র সঙ্কীর্ততে ॥”

দেশের এইরূপ দুঃসময়ে পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় তন্ত্র-গ্রন্থাবলী প্রচার আরম্ভ করিয়া দেশের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই ক্ষুদ্রকার “সরস্বতী তন্ত্র” জপযজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্মাবলম্বি নাত্রেয়ই এই পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। অনুবাদ বিশদ ও সুন্দর। মূলে বর্ণাশুদ্ধি না থাকিলেও স্থানে স্থানে বর্ণবিজ্ঞাসের অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইল। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়দ্বয় ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১/০ আনা। পোঃ ঘোড়াঘাটা, রাজসাহী—এই ঠিকানায় সম্পাদক মহাশয়-দিগের নিকট এই তান্ত্রিক গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়। ইহার পর “সানুবাদ লিঙ্গার্চন তন্ত্র” প্রকাশিত হইবে।

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

তারাদেবী।

[শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ।]

বৌদ্ধের সহিত তারাদেবীর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, হিন্দুতন্ত্রেও তারাদেবী “বুদ্ধেশ্বরী” “বুদ্ধমাতা” প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং এই দেবীর আরাধনার যাবতীর্ণ নিয়ম মহাচীন বাসী “বুদ্ধরূপী” ভগবান্ বিষ্ণু প্রচারিত করিয়াছেন, ঐ কথাও রুদ্রযামল প্রভৃতিতন্ত্রে অতিবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই কতিপয় মনীষী তারাদেবীকে মুখ্যতঃ বৌদ্ধদিগের উদ্ভাবিত দেবতা বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং হিন্দুসমাজে ইহঁার আগন্তুক প্রতিপত্তির আরোপ করিয়া থাকেন; অতএব ইহঁার সম্বন্ধে আমরা আজ একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

তারাদেবীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বত্ব স্থির করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তারা কাহার? হিন্দু বলেন, ইহঁা আমার নিজস্ব, বৌদ্ধের উক্তি কিছু জানা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসবেত্তার মতে তারা বৌদ্ধেরই নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হয়।

বৌদ্ধমত ঋগুণপরাশর ভগবৎ পাত শঙ্করাচার্যের অগাধ তারাতন্ত্রের নিদর্শনস্বরূপ তৎপ্রণীত তারাস্তোত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, তারা হিন্দুরই নিজস্ব, কারণ বৈদিকমার্গ-প্রবর্তক ভগবৎ পাদ হিন্দুর অসংখ্য দেবতা থাকিতে বৌদ্ধদেবতার স্তোত্র রচনা করিতে যাইবেন কেন? এইস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পাঠক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই হয়ত এমত ধারণা আছে যে, অদ্বৈতবাদী ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরবাদের অবলম্বন তন্ত্রশাস্ত্রে আস্থাবান্ হওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে তারাদেবীর স্তোত্র রচনা অসম্ভব। হয়ত অল্প কোনও শঙ্করাচার্য্য কৃত তারা-স্তোত্রই পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রতন্ত্রিসম্পন্ন-ব্যক্তিবিশেষ-কর্তৃক ভগবৎপাদের কৃতি বলিয়া আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি যে,

ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রসরণির একজন প্রধান পথিক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার পরম গুরু গৌড়পাদ স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্য পর্য্যন্তও সমগ্র সম্প্রদায়ই যে তন্ত্র মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা আমরা অত্র প্রতিপাদন করিব। এইস্থলে তাহার আলোচনা বাহুল্য ভয়ে উপেক্ষিত হইল।

গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য নামক এক পণ্ডিত “তারারহস্যবৃত্তিকা” নামক গ্রন্থে তারাদেবীর ভূতশুদ্ধি প্রকরণোক্ত ধ্যানের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে নিজকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনাক্রমে ভগবৎপাদ শঙ্করকৃত স্তোত্রের উপস্থাপন করিয়াছেন, এবং স্তোত্রেরও মূলীভূত শ্রুতি প্রদর্শিত করিয়াছেন। এই শ্রুতি, তান্ত্রিক বৈদিক নহে। প্রসঙ্গত ইহাও বক্তব্য যে, স্বনামধন্য কুর্কুভট্ট মনুভাষ্যানাবসরে তান্ত্রিক বৈদিকভেদে শ্রুতির যে দ্বৈবিধ্য-ঘোষণা করিয়াছেন, তারারহস্য বৃত্তিকায় তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়।

শ্রুতিস্বরগাতীত কালের প্রসিদ্ধ বচনাবলী ; সূত্রাং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তারাদেবীকে বৌদ্ধের নিজস্ব বলিবার কোনও সমীচীন কারণ প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে শ্রুতিপ্রসিদ্ধত্ব-নিবন্ধন শ্রুতিপরায়ণ হিন্দুরই নিজস্ব বলিয়া ঘোষণা করা সম্ভব।

তারাদেবীর ভূতশুদ্ধিপ্রকরণ-কথিত ধ্যেয়রূপের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইনি গর্ভাকারা, অভিনব মেঘের মত নীলবর্ণা, লম্বোদরী, ইহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আবৃত, ইহার স্তনদ্বয় স্থূল এবং উন্নত, নেত্রত্রয় গোলাকার এবং রক্তবর্ণ, জিহ্বা লম্বমান, মুখ দন্তের দ্বারা ভয়ানক, মস্তকে পিঙ্গল বর্ণ এক জটা বিজ্ঞমান, তাহার উপরিভাগে উত্তর পার্শ্বে নীলোৎপল মালা, অতি নীলবর্ণ-নাগের দ্বারা জটাজূট আর্ধক, ললাটদেশে শ্বেতবর্ণ পাঁচখণ্ড অস্থি বর্ত্তমান। ইহার কুণ্ডলরূপে জ্বাপুস্পের তুল্য রক্তবর্ণ তক্ষকনাগ, হাররূপে অতি শ্বেতবর্ণ নাগ, এবং যজ্ঞোপবীতাকারে দুর্বাদলের স্তায় শ্যামবর্ণ নাগ শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইহার হাত চারিখানা, তন্মধ্যে দক্ষিণদিকে উর্দ্ধকরে খড়্গ রহিয়াছে। ঐ খড়্গের মূলভাগ রক্তমিশ্রিত মাংসখণ্ড ভূষিত মুষ্টিনিহিত জটাজূটে সংলগ্ন। বামদিকে উর্দ্ধহস্তে রক্তবর্ণ নালযুক্ত কিঞ্চিদ্ধিকসিত নীলোৎপল রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে অধোহস্তে বীজ-শোভিত-বৃন্ত (বাট) কর্তৃকী শোভা সম্পাদন করিতেছে। বামদিকে অধোহস্তে ত্রিজগতের জাদ্য-সমন্বিত গুলকপাল (অস্থিখণ্ড) রহিয়াছে। প্রত্যেক ভূমুহই ধূম্রবর্ণ নাগ-কৃত কেয়ুর, এবং স্বর্ণবর্ণ

নাগকৃত কঙ্কণ শোভা পাইতেছে। ইনি নির্ভররূপে যন্ত্রণা দিবার (চাপ দিবার) অভিপ্রায়ে শবের হৃদয়ে দক্ষিণচরণ সঙ্কুচিত ভাবে স্থাপিত করিয়া বাম চরণ শবের পাদদ্বয়োপরি প্রসারিত করিয়াছেন। কুন্দপুষ্প সদৃশ নাগের দ্বারা ইহার কটিস্থত্র, এবং ঈষদ্রক্তবর্ণ নাগের দ্বারা নূপুর সম্পন্ন হইয়াছে।

ইহার মুণ্ডমালা শ্রীমৎপাদপঙ্কজ পর্য্যন্ত লম্বমান, মালার মধ্যে পঞ্চাশটি নর-মুণ্ড রহিয়াছে। মুণ্ডগুলি সত্ত্বঃ ছিন্ন গলিতরুধির সংপৃক্ত, এবং কেশের দ্বারা পরম্পর গ্রথিত হইয়াছে। ইনি জলস্ত চিতার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাঘ্রচর্মের দ্বারা ইহার উত্তরীয় বস্ত্রকার্য্য, সম্পন্ন হইতেছে। ইনি রমণীদিগের ধারণোপযোগী সমস্ত আভরণ পরিশোভিতা। ইহার মস্তকে অক্ষোভ্য ঋষি সর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবীর বদন ঈষদ্ হাস্তযুক্ত।

প্রদর্শিত অর্থ গোড়ীয়-শঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উক্ত গ্রন্থকার ধ্যান ব্যাখ্যান ভগবৎ পাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত স্তবেরই সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নীলতন্ত্রের যে সমস্ত বচন প্রমাণরূপে উপগৃহ্য করিয়াছেন, সেইগুলিতে শরীরের নানা স্থানে সর্পবিজ্ঞাসের কোনও উল্লেখ নাই। ভগবৎ-পাদকৃত স্তবে দেবীর শরীরস্থ সমস্ত নাগের নাম বিশেষরূপে কথিত হয় নাই। কিন্তু শ্রুতিতে প্রত্যেকের নাম কথিত হইয়াছে।

যথা—

জটাম্বনস্তঃ শ্রবণেচ তক্ষকে। মহাদি পদ্মো হৃদি হার-ভূষণঃ
তথৈব কর্কোটকৃতোপবীতিকাং স্মেমখলায়া মথদেব বাসুকিঃ ।
সশঙ্খ পালো ভূজকঙ্কনোগতঃ পদেষু পদ্মঃ কিলনূপুরাশ্রয়ম্ ।
ভূজেষুনাগঃ কুলিকোহঙ্গদোমতো ।
ভূজোর্দ্ধ মালা মনুজাস্থিভিঃ কৃত্য ॥

ইহার অর্থ হইতে বুঝা যায়, জটাতে অনন্তনাগ, কর্ণে তক্ষক, হৃদয়ে মহাপদ্মনাগ হাররূপে অবস্থিত, কর্কোটনাগ উপবীতাকারে স্থিত, কটিস্থত্রে বাসুকিনাগ, সঙ্খপালনাগ কঙ্কনস্থানে স্থিত, পদ্মনাগ চরণে নূপুরাকারে অবস্থিত, এবং কুলিকনাগ হস্তে বলয়াকারে অবস্থান করিতেছে।

ভগবৎ পাদকৃত স্তোত্রে বারটি শ্লোক আছে। ধ্যানানুকূল শ্রুতিতে সার্বদশ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রের বচন, ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ অবলম্বন করিয়া যেমন গৃহস্থত্র শ্রৌতস্থত্র স্মৃতি সংহিতা পুরাণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই

তাত্ত্বিক শ্রুতির মৌলিকত্বে দেবতার ধ্যান স্তব এবং অধুনা দৃশ্যমান তন্ত্র প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে কিছু ধার করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তারাদেবীর বিবরণ অতি বিস্তৃত, ইহার অনেক প্রকার ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলির সহিত আবার আখ্যায়িকা (গল্প) সংস্ফুট রহিয়াছে। আমরা ক্রমে সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

নীল সরস্বতী ।

তারাদেবীর যে কয়টি মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি মূর্তি নীল-সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে তারারহস্য বৃত্তিকায় উক্ত সিদ্ধ সারস্বততন্ত্রের একটি আখ্যায়িকা পাঠে জানা যায় যে, একসময়ে হয়গ্রীব ও সোমক নামক অসুরদ্বয় দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দেবতাদিগকে কিরূপে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী মন্ত্রময়ীরূপে ব্রাহ্মণদিগের মুখে অবস্থিত আছেন। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞকুণ্ডে দেবতার উদ্দেশে হবিত্যাগ করেন। দেবতাগণ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত সেই হব্য ভক্ষণে বলবন্তর হইয়া, অসুরদিগকে অনায়াসে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যদি কোন উপায়ে বাগ্‌দেবীকে দেবতাদিগের মুখ হইতে অপসারিত করা যায়, তবেই দেবগণ দুর্বল হইয়া পড়িবে। ইহা স্থির করিয়া তাহারা শব্দাকর্ষণিকা দেবীর উদ্দেশে তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। দেবী তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদানে উদ্বৃত্ত হইলে তাহারা সর্বশব্দাকর্ষণ নামক অস্ত্রপ্রার্থনা করিল। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ঐ অস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন অস্ত্রবলে বলীয়ান্ দৈত্য-দ্বয় পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া সেই সর্বশব্দাকর্ষণ অস্ত্রের দ্বারা, বাগ্‌দেবীকে আকর্ষণ করিল। দেবী নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখ পরিত্যাগ পূর্বক দৈত্যদ্বয়ের হস্তগত হইলেন। তখন অসুরদ্বয় দেবীকে ভীষণ বিষধর সর্পের দ্বারা বন্ধন করিয়া, পাতালপুরীতে হলাহল পূর্ণ কুণ্ডমধ্যে নিমগ্ন করিয়া পর্কতের দ্বারা সেই কুণ্ড আচ্ছাদিত করিল।

অল্প দিকে বাগ্‌দেবীর অন্তর্ধান নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন, মন্ত্রের অভাব বশতঃ আর যজ্ঞ করিতে পারিলেন না, ইহাতে দেবগণ হব্যভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তখন অসুরদ্বয় সুযোগ বুঝিয়া স্বর্গে উপস্থিত হইয়া দেবতা-

দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং দুর্বল দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর ভয়ে আবার সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ পূর্বক পাতালপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিল ।

মন্ত্রস্বরূপা বেদময়ী বাগ্‌দেবী বিনিষ্ট হইয়াছেন, মন্ত্রাভাবে পৃথিবী হইতে যজ্ঞও বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত খিন্ন হইয়া বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন । অশেষমায়ানিধান ভগবান বিষ্ণু দেবতাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই মায়াবী অসুরদ্বয়ের নিকট হইতে সরস্বতীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি পাঠীন (বোয়াল) মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রবল বেগে সমুদ্রগর্ভ আলোড়িত করিলেন । তাঁহার মৎস্যাকার শরীর হইতে হস্ত চতুষ্টয়ের আবির্ভাব হইল ।

চতুর্ভুজে সুদর্শনচক্র নন্দক খড়্গ শাস্ত্র ধনু ও কোমোদকী গদা ধারণ করিয়া তিনি অসুরদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা অসুরদিগের সর্বশলাকর্ষক অস্ত্র অপহরণ করিয়া চক্রের দ্বারা হয়গ্রীবের ও সোমকের শিরশ্ছেদন করিলেন ।

ভগবান বিষ্ণু অসুর মারণ কার্য সম্পন্ন করিয়া সরস্বতী দেবীর উদ্ধারার্থ বিষকুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইয়া নিঃশ্বাস পবনের দ্বারা আচ্ছাদক পর্কত বিদূরিত করিলেন । তাঁহার আদেশানুসারে গরুড় হলাহল পূর্ণকুণ্ড বিষরহিত করিল । তখন ভগবান বিষকুণ্ড মধ্যে চেষ্টাশূন্য মৃতপ্রায় সরস্বতী দেবীর চৈতন্য সম্পাদনার্থ নানাপ্রকার যত্ন ও মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সরস্বতী দেবী নিজ শরীর বিষজালায় নীলবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন যে, আমি বিষ-কুণ্ডমধ্যে নিবেশিত হইয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব যাহাতে ক্রণকালের মধ্যে এই নীলিমা বিদূরিত হয়, তুমি তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন কর । তৎপর বিষ্ণু বলিলেন,—হে বাক্ প্রসবিত্রি ! তুমি শোক করিও না, কারণ পূর্বে তুমি চন্দ্রের মত শুভ্রবর্ণ ছিলে, এখন বিষের প্রভাবে নীলবর্ণ হইয়াছ, ইহাতে আর দোষ কি ? দেখ, নীলবর্ণ দেহেই নানাবিধ আভরণ শোভা পায় । মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ, অমর চক্রবর্তী ইন্দ্রদেব নীলবর্ণ, জগতের জীবনদাতা মেঘ সকল নীলবর্ণ, সর্বজনের অবকাশ নভোমণ্ডল নীলবর্ণ, নীলবর্ণ কলঙ্কই চন্দ্রের শোভা সম্পাদন করে । আমি স্বয়ং নীলবর্ণ, অথচ সত্ব গুণের আশ্রয় ; নীলবর্ণের আর দোষ কি ? তুমি জগতে নীল সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা হইবে, এবং শীঘ্রই সাধকদিগকে বাক্যপ্রদান করিতে সমর্থ হইবে ।

এই আখ্যায়িকা হইতে সরস্বতী দেবীর নীলতার মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় ।

ইহার দুই প্রকার ধ্যান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহার বর্ণ নীল, নয়ন ০
তিনটি, পরিধানে নীলবস্ত্র, ইহার হস্তে মণিময়ী বিণা মুদ্রা এবং সুধাপূর্ণ পাত্র
যুত হইয়াছে । চতুর্মুখ দেব উদ্বৃত্ত হইয়া ইহার নিকট হইতে কবিতা প্রবাহ
ধারণ করিতেছেন । ইনি নীলবর্ণ হংসশ্রেণীর দ্বারা শোভিত বিমানে অবস্থান
করিতেছেন ।

অভেদে ।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

নীরব মন্দিরে মোর প্রতিমা স্থাপন করি,
পূজিতে বসিহু তা'র পবিত্র আসন'পরি ।
আবেশে নয়ন মুদি ভাবিতে তনয় রূপ,
অস্তরে উঠিল জাগি' অপূর্ব স্বরূপ-রূপ !
প্রতিমার কণ্ঠদেশে পরাতে কুমুমহার,
সে হার পরায়ে দিহু মোহাবেশে আপনার !
স-চন্দন বিদ্বদল শ্রীঘটে অর্পিব বলে,
সঁপিলাম যত কিছু আপনার ক্রোড়তলে !
পূজার অঞ্জলী দিতে প্রতিমার পদমূলে,
আপনার হু' চরণ ঢাকিয়া ফেলিহু ফুলে !
প্রণাম করিতে তা'র সহসা গেলাম ভুলি,
প্রণমি নিজের পদে লইহু চরণ ধূলি !
অবশেষে চেয়ে দেখি হয় নাই পূজা সারা,
প্রতিমা পূজিতে একি হইয়াছি আত্মহারা !
পূজিতে প্রতিমা সে যে পূজিয়াছি আপনার,
আপনি আপন-মাঝে লভিয়াছি প্রতিমার !

‘হার জিৎ ।

[শ্রীমুখীরচন্দ্র মজুমদার, বি এ]

(১)

সেদিন আড্ডায় গিয়া দেখি মহা তর্ক বাধিয়াছে । তর্কটা উঠিয়াছিল কলেজ স্কোয়ারে সম্ভরণ-প্রতিযোগিতার আলোচনা হইতে ।

নূপেণ বলিতেছিল—“পাঁচ মিনিটে মাইলদোড়ের বাজী জেতা এ আর এমন কি কথা ?”

রমেশ—“তুমি পার ? পাঁচ মিনিট কেন, সাড়ে পাঁচ মিনিটে পার ?”

আমরা সম্মুখ হইয়া উঠিলাম । সহজে নূপেণকে কেহ ঘাঁটাইত না—কারণ, আড্ডায় অমন তार्কিক আর দু’টি ছিল না । রমেশকে ইসারা করিলাম ; কিন্তু তখন তার ঘাড় ভূত চাপিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল “আচ্ছা বল ত আরও দু’ চার সেকেণ্ড grace দিতে পারি ।”

নূপেণ তক্তাপোষের উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—“কলেজে সাড়ে ষোল মিনিটে কতবার মাইলদোড়ের প্রাইজ নিয়েছি তা জান ? আমি পারিনে ?”

রমেশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—“তে হি নো দিবসা গতাঃ ।”

“এই ত ? আচ্ছা, বাজী ?”

“কত, বল ?”

“পঞ্চাশ টাকা ।”

“এক শ’ ।”

“বেশ ।”

“কিন্তু সর্ভটা কি ?”

“পাঁচ মিনিটে—”

“সে কি ? এই বললে সাড়ে পাঁচ ?”

“আচ্ছা, তাই ।”

“কবে ?”

“যবে তোমার সুবিধা । আজই বল আজ, কাল বল কাল ।”

নূপেণ খানিকটা ভাবিয়া বলিল—“দেখ কলেজ ছেড়ে এই বছর পাঁচেক আদৌ দম নেই । আমাকে সময় দিতে হ’বে ।”

“কোন আপত্তা নাই। কত সময় চাও—এক সপ্তাহ, এক মাস,—হু’ মাস—তিন মাস ?”

আমরা বিস্মিত হইলাম। রমেশ করে কি !

নৃপেণ হাসিয়া বলিল—“না, তিন মাস চাইনে, এক মাসই যথেষ্ট।”

“না, না, তিন মাসই কথা রইল। তা’তে আর তোমার বলবার কিছু থাকবে না। তিন মাস কেন, তিন বছর ধরেও চেষ্টা করলে ও হাড়ে আর হচ্ছে না।”

“আচ্ছা দেখা যাবে” বলিয়া নৃপেণ উঠিয়া গেল।

শরৎ বলিল—“রমেশ, তুমি কি পাগল হয়েছ, টাকা কি কামড়াচ্ছে না কি ? নৃপেণকে জান না, শুধু মরচে পড়ে আছে—মেজে ঘসে নিতে কতক্ষণ ? পাঁচ মিনিট না হয় বড় জোর সওয়া পাঁচ পর্য্যন্ত সময় দিতে পারতে ; কিন্তু সাড়ে পাঁচ—পনের সেকেণ্ড কি কম সময় ?”

“সময় বিশেষে নয় বটে ; আচ্ছা, দেখতেই পাবে। কিন্তু একথা তোমাকে বলে রাখি, সে যদি সত্যিই বাজী জিততে চায়, তা হলে তাকে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা এই তিন মাসের মধ্যে বুঝতে হবে—কিন্তু সেকথা সে বুঝবে কি ?”

(২)

রমেশের কথার মর্ম পরদিনই বুঝিতে পারিলাম।

বৈকালে নৃপেণ তার মোটরে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। দেখা হইতেই বলিল—“মাঠের দিকে চল, আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক। তোমাকে কিন্তু আমার গুরুমশাই হতে হবে।”

“আমি ? এই বিশালবপু নিয়ে দৌড়ের গুরুমশাই ? রক্ষা কর ভায়া।”

“ভয় নেই। নিন্দা খ্যাতি তোমায় কিছু অর্শাবে না। কি আমার করা উচিত না উচিত সব তোমায় শিখিয়ে দেব, তুমি শুধু সেই মত আমার হুকুম করে যাবে। বুঝেছ ?”

আমরা ততক্ষণে মাঠে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেন্টপল গির্জার পশ্চিম দিকের জায়গাটা অনেকটা নির্জন। নৃপেণ কোট জুতা ছাড়িয়া গজ ফিতা বাহির করিয়া দুইটা গ্যান-পোর্টের ব্যবধান মাগিয়া লইয়া আন্দাজে সিকি মাইল পথ হির করিয়া বলিল—“এইটে বার চারেক হলেই হ’বে। নাও, এখন ঘড়িটা খোল।”

হৃদয় ছাত্রের কবলে নিরীহ মাঠায় মশাইয়ের মত আমি ঘড়িটা খুলিয়া

কাঁটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম—নূপেণ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রথম সিকি মাইলে ৭০ সেকেণ্ডে লাগিল, দ্বিতীয়ে ৯০; কিন্তু তখনই সে হাঁফাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া আমি বলিলাম—“আজ এই যথেষ্ট, থাক্।”

তার কিন্তু তখন বোধ চাপিয়াছে—একবার আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল—সেবারে লাগিল ১২০ সেকেণ্ডে;—কিন্তু তখন তার দম একেবারে গিয়াছে, ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া সে হাঁফাইতেছিল। আমি নিকটে যাইতেই সে বলিল—“কতক্ষণ লাগল, দেখেছিলে?”

“বিলক্ষণ। তা নইলে কি ঘাস খাচ্ছিলাম? যাই হোক ভীষা যে ভাবে ক্রমশঃ চলছিল তাতে—তোমার মন-রাখা কথা বল্ছিলে—মিনিট আঠেকের কিছু কমে বোধ হয় মাইলটা পূরা করতে পারতে।”

নূপেণ দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হস্তে আমাকে শাসাইয়া উঠিল, আমি সত্যে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিলাম। এমন সময় পাশাপাশি দুইটা বড় গাছের অন্তরাল হইতে কয়েকজন লোক খিল খিল করিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দেখিলাম, রমেশ তার মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য আমরা সেদিকে আর তাকাইলাম না। সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, সোজাসুজি মোটরে আসিয়া উঠিলাম। তখন নূপেণ শাস্ত হইয়াছে। ধীরভাবে বলিল—“আচ্ছা তোমার ঘড়িটা কি ঠিক যায়?”

“ঘড়ি? না, বেশী চলে,—হ’বার সারিয়েছি—তবু ঠিক হ’ল না।”

“তাই বল। আমিও তাই ভাবছিলাম। তা, মইলে,—আট মিনিট—বল কি?”

আমি ঘড়িটা খুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম—“হাঁ, তাই বটে। রোজ প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ডে করে কমে, সে ত্রিশ সেকেণ্ডেকে যদি ২৪ দিবে ভাগ দাও তা হলে ঘণ্টায় হ’ল ১৪ সেকেণ্ডে, মিনিটে তা হলে—”

সহসা নূপেণের কনুইয়ের ধাক্কা খাইয়া আমার পরিহাস-উৎস অর্ধপথেই মিলাইয়া গেল। নূপেণ গৌঁ হইয়া, কতক্ষণ বসিয়া রহিল, আমি মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিতেছিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নূপেণ তাহার গতি লক্ষ্যে অনেক প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বলিল—“ফুর্টির বঁাক অল্প সময়ে মানুষকে এমন অপদার্থ করে তোলে আগে আমার ধারণাই ছিল না। যাই হোক, এখনও কেবল রাস্তার সীমার আছে। মনে রেখো শুধু নামে ‘গুরুশাহী’ হলে চলবে না, কাজেও গুরুগিরি করতে হবে।”

“ঐ ত ক্যাসাদ । আচ্ছা বলে দাও, কি কি করতে হবে ।”

“প্রথমতঃ, বোতলের সম্পর্কটি আমার ত্যাগ করাতে হবে ।”

“সেটা ত আগে করা উচিত । কিন্তু, পারবে কি ?”

“তুমি হুকুম কর । তামিল করা আমার হাত ।”

“আচ্ছা আমি হুকুম করছি । তার পর ?”

“দ্বিতীয়তঃ, সন্ধ্যার শোয়া, ভোরে ওঠা ।”

“আচ্ছা তাই করবে ।”

“তৃতীয়তঃ, ডায়েল বা মুগুর ভাঁজা অভ্যাস করা—তাতে দম বাড়বে ।”

“ভাল, তাই করবে । আর কি ?”

“প্রত্যেক দিন আমাকে দৌড় করাবে । যেমন যেমন দম বাড়বে—
তেমনি রোজ খানিকটা করে বেশী ছোটাবে ।”

“এই ত সবই ত তুমি নিজে জান, তবে অনর্থক আর এ বেচারাকে ধরে
টানাটানি কেন ?”

“তুমি বোক না, একটা ঠাঠ বজায় রাখতে হয়—নইলে চাড় হয় না ।
ছেলেবেলার একা একা মার্কেল খেলনি—বুড়ী সাক্ষী রেখে ? তুমিও আমার
সেই ধর্ম-বুড়ী ।”

ইহার পর হইতে নূপেণ রীতিমত কসরৎ আরম্ভ করিল । তবে সে কাজে
সমস্ত সময় দিতে পারিত না । পিতার কারবার ‘দেখে শোনে’ বলিয়া বাহিরে
একটা গুজব ছিল—সেইজন্য লোকদেখানি হিসাবে মাঝে মাঝে তাহাকে পিতার
অফিসে গিয়া বসিতে হইত । কিন্তু এখন হইতে ছপুরবেলা পেলিটিতে না গিয়া,
বাড়ী হইতে খাবার আনাইয়া অফিসে বসিয়াই টিফিনটা সারিতে লাগিল ;
এবং আড্ডার সময়টা প্রায়ই অফিসে কাটাইতে লাগিল । যেখানে দশজন
লোক খাটে, সেখানে কেহ বেকার বসিয়া থাকিতে পারে না—সুতরাং নূপেণ
ক্রমে ক্রমে অফিসের কাজও শিথিতে আরম্ভ করিল ।

(৩)

এদিকে কিন্তু ‘গুরুশাই’ হিসাবে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছিল ।
‘গুরুগিরি’ আমার ঠিক হইতেছিল না, আমিও বৃদ্ধিতেছিলাম, নূপেণও
বলিতেছিল । . লোভে পড়িয়া কোন দিন হয়ত গুরুপাক কিছু খাইয়া ফেলিল,
বা রোধের মুখে ব্যারামের মাত্রা হয়ত বাড়াইয়া ফেলিল—অমনি তখিটা পড়িল
আমার উপর । অথচ খাড়াখাড়া বা ব্যারামের উচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে

আমার আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। সে কথা বলিয়া আনি কাটিয়া পড়িবার মতলব করিলে অমনি কিন্তু সে কথিয়া আসিত—পিঠ বাঁচাইবার জন্ত আমি চুপ করিয়া যাইতাম।

কিন্তু নূপেণ দ্রুত উন্নতি করিতেছিল। এক মাস পরে হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহার গতির পরিমাণ—ছয় মিনিটে মাইল। রমেশের এক শত টাকা এক এক করিয়া খসিতেছিল।

ছই মাস পরে একদিন নূপেণ পুরা মাইল দৌড়াইবার সঙ্কল্প করিল। আমি ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম—প্রথম সিকি মাইল ৬০ সেকেন্ড, দ্বিতীয় ৭৫—নূপেণ আর দৌড়াইল না। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—“আমাকে থামালে না কেন?”

“কেন? বেশ ত চলছিলে”—

“বেশ চলছিলাম। দমটা বেশ নষ্ট করতে বসেছিলাম বল। খুব গুরুগিরি করছ যাহোক। রমেশের সঙ্গে সড় থাকলেও এর বেশী খারাপ করতে পারতে না।”

আমি রাগিয়া উঠিলাম, আরও বুঝিলাম এই আমার একমাত্র সুযোগ। ঘড়িটা বন্ধ করিয়া বলিলাম—“তাই যদি ভাব, তবে আজ থেকে এ গুরুগিরি থেকে রেহাই নিলাম।”

“নাও দেখি কেমন সাহস তোমার। তা হলে তোমার হাড় একখানি সোজা রাখব না তা মনে থাকে যেন।”

আচ্ছা খপ্পরে পড়েছিলাম যা হোক। কিন্তু নূপেণের সে ভাব দেখিয়া প্রতিবাদ করিতে সাহসে কুলাইল না।

পরদিন রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম—“ভায়া, আর কেন, ও টাকা তোমার জলে গেছে। ছেড়ে দাও, আমিও অব্যাহতি পাই।”

রমেশ হাসিয়া উঠিল। আমি নোট বহিখানা বাহির করিয়া নূপেণের ক্রমোন্নতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, সে বলিল—“ওসব স্বাজে কথা, শেখবার মুখে অমন অনেক হয়, আবার আসল দিনে সব উল্টে যায়, তাও অনেক দেখেছি।”

আমি রাগিয়া উঠিলাম। “তোমার দুর্ভিক্ষ—তুমি যে এতে হারবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।”

“তাই না কি!”

“নিশ্চয়ই, বাজী রাখতে চাও ?”

“অবশ্য। কত ধরবে ? এক শ ?—বেশ !”

এ পাগলের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ কি ? যাই হোক এ পড়ে-পাওয়া একশ টাকা—মন কি ? মনে মনে খুসী হইলাম।

তার কয়েক দিনের পর নূপেণের গতির পরিমাণ দেখিলাম—৫১০ মিনিটে মাইল। নিজের প্রাপ্য একশ টাকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম।

নূপেণ বলিল—“আগেকার দম নেই তা জানি, কিন্তু ৫১০ মিনিটে পারব সে বিশ্বাস এখন হচ্ছে। কথাটা টাকার জন্ত নয়—কিন্তু জিদ বজায় রাখতে হবে, মুখ রক্ষা করিতেই হবে।” তার পর হাসিয়া বলিল—“আজ বাবার মুখে হাসি দেখলাম—৪ বছর পর। তাঁকেও কিন্তু এক হিসাবে আমার এ বিষয়ের গুরুমশাই বলতে হবে।”

“কিসে ?”

“আমার অফিসের টেবিলে প্রতিদিন স্তুপাকার করে কাজ চাপিয়ে। অফিসে যখন বসতেই হয়, তখন চুপচাপ বসে থাকা বড় কষ্টকর। বিশেষতঃ, কাজ নিয়ে একটা একাগ্রতা আসে—সেটা আমার এই ব্যায়ামচর্চায় কম সাহায্য করে নি।”

ধার্য্য দিনের সপ্তাহ পূর্বে দেখিলাম—নূপেণের দম আট মিনিট হইতে পাঁচ মিনিটে নামিয়াছে। আর সন্দেহ ছিল না—কিন্তু রমেশ তবু দমিবার পাত্র নয়। তাহার মুখে এক কথা—“আমার গ্রায় হতেই পারে না।” কেহ তর্ক করিতে আসিলে—তাহার সহিত নূতন করিয়া বাজী ধরিতে লাগিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—“বেজায় টাকা কামড়াচ্ছে যে হে ! কিছু গুপ্তধন টন পেয়েছ না কি ?”

“সে কথায় তোমার দরকার কি ? আমি বলছি—আমি হারতেই পারি না। আরও একশ’ ধরতে চাও ?”

“নিশ্চয়ই।”

ছ’ ছ’শ টাকা—বিনা চেষ্টায় ! আমি গম্ভীরভাবে গৌফ জোড়াটায় একবার মোচড় দিয়া লইলাম।

(৪)

ধার্য্য দিনে প্রাতঃকালে ঘোড়দৌড়ের মাঠে সকলে উপস্থিত হইলাম। নূপেণ গেঞ্জি ও পাজামা পরিয়া লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল। তা’র পূর্ব চেহারা

ফিরিয়া আসিয়াছিল । তিন মাসের সংঘর্ষে ও ব্যায়ামচর্চার তাহার দেহেনুতন করিয়া যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল । রমেশ প্রশংসমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া, পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—“বাঃ, সুন্দর চেহারাখানি করে তুলেছ ত ?”

“নিশ্চয়ই ।”

“এখন মনে হচ্ছে, চেষ্টা করলে সাড়ে পাঁচ কেন, পাঁচ মিনিটেই পারতে পার ।”

“আশা ত করি ।”

“আচ্ছা, তোমার কথাই আমি ধরে নিলাম ! এই নাও তোমার বাজীর টাকা—” বলিয়া পকেট হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া নূপেণের হাতে দিল ।

বিস্ময়ের প্রথম কয়েক মুহূর্ত কাটিলে আমাদের মুখে কথা ফুটিল—সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—

“তা হলে তুমি হার মানছ ?”

“আমি যতদূর শুনেছি তাতে সে সাড়ে পাঁচ মিনিটে ত নিশ্চয়ই পারবে—যদি অসাবধানে পড়ে না যায় বা পা না মচকায় । এ টাকা ওর গ্রাফ্য পাওনা ।”

“তা হ’লে আমাদের বাজীর টাকাগুলোও দাও ।”

“কেন ?”

“সে কি হে ? আমাদের সঙ্গে তুমি বাজী রাখনি ?”

“তা ত আমি অস্বীকার করছিনে । কিন্তু সর্বটুকু কি ছিল ?”

“যে তুমি এতে হারবে না ।”

“ঠিক । আমি ত এতে হারিনি । বরং জিতই আছে ।”

“কি রকম ?”

“তবে শোন । নূপেণের বাবা মাসকতক আগে কথায় কথায় বলেছিলেন যে নূপেণের বদ খেলাগুলো নষ্ট করে অন্ততঃ তিন মাসও যদি তাকে সংযত ভাবে সহজ জীবনপথে চালান যায়—ব্যবসায় পাঁচ শ’ টাকা লাভের চেয়ে তা’তে তাঁর বেশী লাভ হবে । আজ সকালে সেই পাঁচ শ’ টাকা পেয়েছি—তার মধ্যে নূপেণের হাতে ওই এক শ’ টাকা, আর বাকী চার শ’ এই শর্মারামের পকেটে । তবে আমার হার কিসে ?”

নূপেণ বলিল—“এ এক শ’ টাকার জিত ত সামান্য কথা । স্বাস্থ্যে উৎসাহে আমি যা লাভ করেছি—এক লাখ টাকাতোও তার সামান্য নয় না ।”

যাই হোক, টাকাটা আমি অমনি নেবো না—অন্ততঃ ব্যাঙ্গামের হিসাবেও দৌড়টা দিয়ে আসি ।”

আমি ঘড়ি খুলিয়া রহিলাম—সেবার ঠিক ৪ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে লাগিল ।

সে এক শ' টাকার নোটখানা আমরা অবশ্য নূপেণের পকেটস্থ হইতে দিলাম না ।

পরের রবিবার আড্ডায় একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন হইল । আহাৰ্যের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল—নূপেণ-গৃহিণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন ।

কালিয় দমন ।

[“ও-পারের কথা”র লেখক ।]

গল্পটা এই :—বৃন্দাবন-প্রবাহিত যমুনার এক আবর্তে কালিয় নামে এক বৃহদাকার ও ভীষণ বিষধর সপরিবারে বাস করিত । কালিয়ের তিনটা ফণা ও কতকগুলি পত্নী ছিল । উক্ত আবর্তে হলাহলে এমন কলুষিত ছিল যে উহার বারি সেবন করা দূরের কথা, কোন প্রাণী ঐ স্থান দিয়া যাইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইত । জীবের কল্যাণে ব্রতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচরণকালে একদিন সেই আবর্তে বক্ষুপ্রদান করেন । কালিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ কিপ্রতাসহকারে সেই বিষধরের মস্তক উখিত হইয়া বংশী নিনাদ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন । সেই নৃত্যে সর্পরাজ এমন হীনবল হইল যে, কৃধির বমন করিয়া করিয়া মুমূর্ষু হইল । তদর্শনে কালিয়ের বনিতাগণ কতকটা মানবী আকারে করযোড়করতঃ মনুষ্যভাষায় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিল । অনন্তর কালিয়ও মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার মানসে সেই স্তবগানে যোগদান করিল । তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিবারসহ যমুনা ত্যাগ করিয়া সমুদ্র বাস করিতে আদেশ করিলেন । কালিয় এই প্রস্তাবে সন্মত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আবর্ত হইতে উখিত হইয়া গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইলেন । গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের জয়-ঘোষণা করিল ও কালিয় সপরিবারে সেই আবর্ত হইতে অন্তর্হিত হইল । কথ্যতঃ সমগ্র বৃন্দাবনবাসী এক ভয়ঙ্কর শক্রর হস্ত হইতে নিস্তার পাইল ।

উক্ত ঘটনা 'আবাচে গল্প' শ্রেণীভুক্ত না বলিলেও অবশ্য স্বীকার্য যে লেখক সত্য ঘটনাকে 'অলঙ্কারে' পরিশোভিত করিয়াছেন। সকল দেশের পুরাতন সাহিত্যের গবেষণায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রচনা-কৌশল পরবর্তী সময়ের রচনার সহিত অনেকাংশে ভিন্নতর। মনে হয়, যে কালে ত্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ লিখিত হইয়াছিল, তখন ভাষায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য থাকিলেই সেই লেখক উচ্চশ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আরও মনে হয়, এই প্রকার রচনার ভঙ্গিতে হিন্দুদিগের যাবতীয় দেব দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব হুঙ্কর হইয়াছে। ইহার সহিত দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রীআচার প্রভৃতি যাবতীয় আচারগুলি সন্নিবেশিত হইয়া হিন্দুদিগের পূজা, আরাধনাদি কৰ্ম্ম সকল কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সম্মান রক্ষার্থ যাজক-শ্রেণীর সহিত শিক্ষিত হিন্দুসমাজের এই সম্বন্ধে যথাসম্ভব প্রকৃত তত্ত্ব নিরাকরণে যত্নশীল হওয়া বিধেয়।

এক্ষণে 'কালিয় দমন' লীলার মৌলিক তত্ত্ব কি হওয়া সম্ভব, সেই কথা বলা যাউক। যে জলাশয়ে পদদ্বয় দিবা মাত্র উহার গভীর জলে নিমজ্জিত হইতে হয় বা যাহার ঘূর্ণায়মান জলে প্রাণ হারাইতে হয়, উহাই আবর্তবাচ্য। কাম-কাঞ্চনাদির বা মায়া-মোহের জগৎ এই ভবসংসার এক বিশাল আবর্তবৎ অবস্থিত। সুতরাং ইহার অন্তঃস্থিত প্রত্যেক সংসারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত। অধিকন্তু সুরাপানের জগৎ কত সংসার উচ্ছন্ন গিয়াছে ও যাইতেছে ও কত শত জীবের অকালমৃত্যু হইয়াছে ও হইতেছে! এই হেতু সুরা গরলবাচ্য ও শৌণ্ডিকের স্পৃষ্টজল অসেব্য ও তাহার দান গ্রহণীয় নহে। যে স্থলে 'খোলা ভাঁটি' বিদ্যমান তত্রস্থ মত্তপায়ীদিগের বিকট চীৎকারে, উচ্চহাস্তে, অশ্রাব্য গীতে, কলহে এবং দ্বন্দ্ব নরকরাজ্যের জলন্ত চিত্র উদ্ভাসিত থাকে। এতদ্ব্যতীত যে স্থলে সুরার উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়া মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহার সন্নিকটস্থ বায়ু পুতিগন্ধে দারুণ কলুষিত হইয়া যাবতীয় প্রাণীর দেহপাতের কারণ হয়। শৌণ্ডিকের কৰ্ম্মস্থল 'ভীষণ আবর্ত' বলিয়া জাখ্যাত হইলে উহা প্রমাদোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইবার কথা নয়।

সাধারণতঃ জীবগণ জাগতিক প্রতিপত্তি লাভের আশায় অসত্য, কুৎসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, দস্ত প্রভৃতি অশুণের উপাসক উপাসিকা হইয়া স্ব স্ব হৃদয়কে হলাহলে প্রায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু দারুণ অর্থ লালসায় মানব হৃদয় পরিপূর্ণিত না হইলে কোন প্রাণী শৌণ্ডিকের কৰ্ম্মে নিয়োজিত থাকিতে পারে

না। যদি কোন জীব অত্যধিক লালস প্রযুক্ত উপরি উক্ত সঙ্গদোষে দূষিত থাকে, সে ব্যক্তি কালে পাষণবৎ নিশ্চয় হইবে বা পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত থাকিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ সেই জীব থাকে, কার্যে ও চিন্তায় অর্থাৎ ত্রিফলার হলাহল নির্গত করিবে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অমূলক নহে! সুতরাং সেই জীব মানবদেহধারী হইলেও সর্পসদৃশ ভীষণ ও ত্রিফলা যুক্ত। ইহা ব্যতীত তাহার কন্দুভূমি কুকর্মের বা হলাহলের আবর্ত স্বরূপ জনসমাজে অবস্থিতি করে।

কালিয়-ধমন 'নাগ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহার পরিবারবর্গ নাগ ব্যতীত অন্য প্রাণী বলিয়া আখ্যাত হইলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইত। কিন্তু এই গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালিয়-বনিতাগণ কতকটা মানবী আকার ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করিয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কালিয় বা তাহার পরিবারবর্গ কেহই বাস্তবিক 'নাগ' শ্রেণীভুক্ত ছিল না। ভবে হইতে পারে তাহারা অনার্য্য 'নাগ' জাতিভুক্ত মানব-মানবীই ছিল।

বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শৌভিকগণ 'কালান' বলিয়া আখ্যাত। সুতরাং 'কালান' হইতে 'কালিয়' কথা উদ্ভূত হওয়া বিচিত্র নহে।

কালিয় ও তাহার পত্নীগণ যদি বাস্তবিক সুললিত সংস্কৃত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 'অনার্য্য' শ্রেণীভুক্ত করা কতকটা অযথাচার।

এ দেশে অর্থশালীদিগের মধ্যে বহু বিবাহ চিরপ্রচলিত প্রথা। সুতরাং শৌভিক কালিয়ের বহু পত্নী থাকা অসম্ভব নহে।

ব্রজবাসী-বাসিনীদিগকে জাগতিক স্কুল আমোদ-প্রমোদ হইতে স্কন্দ অর্থাৎ প্রকৃত আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত করা ও তাহাদিগের প্রকৃত মানবজীবন গঠন করা বৃন্দাবন অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহার যাবতীয় কর্ম ক্রীড়া বা কোতুকচ্ছলে সাধিত হইয়াছিল। এই কথা "রাসলীলা" প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে ও অবকাশমত "দোললীলা" প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। এই 'কালিয় দমন' লীলা সেই উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তবে সমাজসংস্কারই তাহার প্রধান লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, ব্রজবাসীগণ মগ্ন সেবন করিয়া কণিক উন্ন্যাসের প্রত্যাশায় চির-আনন্দ লাভের পথ হইতে দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে ও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণে সুকুমারমতি গোপবালকগণও কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত এই মগ্ন সেবার জন্য ব্রজবাসীদিগের

সংসারে অকালমৃত্যু ও আনুসঙ্গিক অভাব-অশান্তি আসন পাতিতে পারে। এই সকল কারণে তিনি কালিয় শৌণ্ডিককে নল্লয়ুধে পরাজিত করিয়া তাহাকে বৃন্দাবন হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। শৌণ্ডিকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার “খোলাভাঁটি” বা আবর্ত বৃন্দাবন হইতে অন্তর্হিত হইল। সুতরাং কালিয়রূপ দারুণ কালিমাণকে বৃন্দাবন হইতে ধোত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমাজের অতীব কল্যাণ-প্রদ কর্ম সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কেবল মাত্র বালক হইয়াও যিনি এইরূপ প্রতিভার ও সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার গুণের জন্ত তিনি পূজার্ত নহেন কি ? হায় ভারত ! কবে তুমি অন্তের গুণের আদর ও আপনার যাবতীয় গলদ আলোচনা করিয়া বাস্তবিক মনুষ্যবাচ্য হইবে ? তবেই তোমার জাত্যভিমানের বা উচ্চশিক্ষার আফালনের বা ধর্মযাজক বা সাধক-সাধিকাচ্য হইবার সাধটুকু পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

সাহিত্য প্রসঙ্গ ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

‘সাহিত্য’ (প্রতিবাদ)

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মুখভারতী আছেন ; ইঁহারা “democracy” প্রচার করেন, মুখে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী, সাম্যতাবের পরিপোষক, কিন্তু কার্যতঃ কেহ ইঁহাদের মতের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলে ইঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়েন, রোষে আত্মহারা হইয়া সহজ জ্ঞানটুকু অবধি জলাঞ্জলি দেন। ইঁহারা ব্যক্তিগত রেষারিষি, ঘেঁষ, হিংসা দ্বারা মাতৃ-মন্দির কলুষিত করেন, ইঁহাদের অত্যাচার ও উপদ্রবে দেশের লোক, সাহিত্যস্নেহী-সম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়, সাহিত্যিকগণের সম্মম যায়।

বাঁকুপুুরের সাহিত্য-সম্মেলনে সভার বিধি-লঙ্ঘন করিয়া “সাহিত্য”-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয় নানা প্রকার অবাস্তব কথার অদ্যতারণা করিয়া বক্তৃতা ও কর্মবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সভাপতি মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ধমক দিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রত্যাভর্তন

করিয়াই সমাজপতি মহাশয় অভিমানভরে বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কাঁদিলেন। তিনি 'নায়কে'র সহকারী সম্পাদক। নায়কের স্তম্ভে নিখল তর্জন-গর্জন, লক্ষ-বাম্প-আফালন করিয়া সার আশুতোষের উদ্দেশে গালি পাড়িতে লাগিলেন, কষ্টী ছিঁড়িলেন। সার আশুতোষের প্রতিভা মলিন হইল না, নিন্দুকই হাশ্বাস্পদ হইলেন মাত্র। সার আশুতোষের উপর ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঝাল ঝাড়িবার জন্ত মাতৃ-মন্দির কলুষিত করিবার অধিকার কাহারও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ব্যক্তিগত কোনদের জন্ত সুবিধা পাইলেই তিনি 'বঙ্গবাসী'র রায় সাহেব বিহারীলালকে গালি দিয়া থাকেন। তাঁহার দর্পে আঘাত করিয়া শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সাহিত্যসেবীকে কুকথা শুনিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ও এখন সাহিত্য-সম্পাদকের ঝোষের পাত্র। হায়রে অর্থ!

* *
*

এ আত্ম-প্রবঞ্চনা কেন? মুখে সাম্য-ভাব প্রচার করিয়া লোকে যদি আপনাকে উচ্চ জ্ঞান করে তাহার পক্ষে হাশ্বাস্পদ হওয়া অনিবার্য। দান্তিক লোকের সাম্যবাদ বিড়ম্বনা। ইহাদের যুক্তিতর্ক খুব সরল। "আমি বিদ্যাদিগ্গজ, আমার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা অসহনীয়; আমি যদি ভুল করি, মত পরিবর্তন করি, এক দল ছাড়িয়া অপর দলে মিশি, তুমি বলিবার কে? আমার হস্তে কলম আছে কাগজ আছে, তোমাকে গালি দিব, সাধারণের নিকট তোমাকে হেয় করিব। সাধারণে না শুনে অন্ততঃ দংষ্ট্রাকরালের দ্বারা তোমাকে ভয় দেখাইব"। হাঃ ব্রাহ্ম! কখনও খোঁজ লইয়াছ কি যে তোমার কলমের খোঁচায় কি ফল হয়, তোমার 'দাঁত-খিঁচুনি' লোকে কতটুকু গ্রাহ্য করে?

* *
*

সাহিত্য-সম্পাদক ব্যক্তিগত ঝগড়া লইয়া সাহিত্য-মন্দির কলুষিত করেন ইহার আর একটি উদাহরণ আমরা এস্থলে দিতেছি। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া তাঁহার সহিত আমার মতানৈক্য হইয়াছে। সেদিন রামমোহন লাইব্রেরীতে আমি তাঁহাকে "inconsistent" বলিয়া ভৎসনা করিয়া ছিলাম। আর রক্ষা আছে? তিনি আমার মুণ্ডপাত করিবার জন্ত আদর্শল খাইয়াছেন। সাহিত্যের সমালোচনা-স্তম্ভে আমাকে ইতর ভাষায় গালি

দিয়াছেন, নিজের অন্তরের রুদ্ধ বিদ্বেষ-বহ্নিতে নিজেই ঝলসিয়াছেন । ভবিষ্যতে আরও অনেক গালাগালি দিবেন, এখন হইতে পায়তারা করিতেছেন ।

শুধু ইতর ভাষায় গালি দিলে সমাজপতি মহাশয় হয়ত দুই একজন পাঠকের মনে ধাঁধা দিতে পারিতেন । কিন্তু আমার ভাষা উদ্ধৃত করিয়া তিনি জ্বল হইয়াছেন । সোভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশে এমন পাঠক নাই যে, তাঁহার উদ্ধৃত ভাষা ও তাঁহার টিপ্পনী পড়িয়া তাঁহার অস্বাভাবিক প্রাণের পরিচয় পাইবেন না । মুনীনাথ মতিভ্রমঃ—ক্রোধাক্ত সমালোচক কি ছার ! ভবিষ্যতে তিনি কেবল সাধারণ ভাষায় গালি দিলে একটু ফল ফলিতে পারে ।

* *

*

সমালোচনার সনাতন-প্রথা অনুসারে তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবে কতকটা বক্তৃতা দিয়াছেন । তাহার পর বিশ্লেষণ । যথা—“যে বড় মানুষের ছেলে বেঞ্জার পায়ের কাছে একখানা বাড়ীর দানপত্র রাখিয়া দিতে পারে, সে তাহার পরদিনই তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর কানের হীরার টপ্ চুরি করিয়া আনিয়া বেঞ্জার কানে পরাইয়া দিল কেন তাহার কোনও স্বাভাবিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।” কেশববাবুর ‘সাইকলজী’ও অত্যন্ত অদ্ভুত ।” নিঃসন্দেহ ! কিন্তু বিদ্বেষের মুখোমুখি সরাইয়া সাধারণ দৃষ্টিতে লাইন কয়টা পড়িলে বন্ধুবর জরেশচন্দ্র “স্বাভাবিক কারণ” খুঁজিয়া পাইতেন না কি ? তিনি যে পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আছে যে, নাগিকার পায়ের কাছে দানপত্র রাখিয়া বড় মানুষের ছেলে বলিয়াছিল—“সুশীলা এখন বুঝলে আমার ভালবাসা কত গভীর ।” স্বাভাবিক বৃত্তির বশে সুশীলা তাহাকে মূর্থ বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিল । কিন্তু তাহার জননীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত সে তখনই শুধরাইয়া বলিয়াছিল—“ভাই ঠাট্টা করছিলাম । আমি তোমা বই কাকেও জানি না ।” “হতভাগ্য একেবারে স্বর্গ হাতে পাইল । তাহার পরদিন”—ইত্যাদি । সুতরাং অর্থাভাবে বড় মানুষের ছেলে স্ত্রীর কানের টপ্ চুরি করিয়া আনে নাই । সে মূর্থ ; সে ঐরূপে প্রেম জানাইতে চাহিয়াছিল; নিজের স্ত্রী অপেক্ষা গণিকাকে ভালবাসে তাহা ঐরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু সমাজপতি মহাশয় কি বাস্তব-জগতে এরূপ মোহগ্রস্ত লম্পট দেখেন নাই ?

* *

*

* একস্থলে গল্পের নাগিকা বলিয়াছে—“লম্পট বহু নারীর ভজনা করে গেলি ।”

একনিষ্ঠার সম্পূর্ণ সুখটুকু ভোগ করিবার জ্ঞ। সেটুকু পায় না বলিয়াই সে একের পর অনেক গণিকার দ্বারস্থ হয়।” সমালোচক-প্রভু এই উক্তি লইয়া খুব দশনবিকাশ করিয়াছেন, তুড়ি-লাফ্ খাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞের মত বলিয়াছেন, আমার সিদ্ধান্তগুলি সাজ্বাতিক। কারণ আমি “কামটাকে নির্বাসিত করিয়া”, “মজ্জমান লম্পটকে একনিষ্ঠার তৃণ ধরিয়া পরিভ্রাণ পাইবার সহুপায়” করিয়া দিয়াছি। সিদ্ধান্তগুলি গল্পের নায়িকার, আমার নহে। কুৎসিত সংসারে থাকিয়াও সে নিজে প্রাণে প্রাণে একনিষ্ঠার জ্ঞ লালায়িত। সে লম্পটকে বিচার করিবার সময় তাহার ভিতর প্রচ্ছন্ন একনিষ্ঠার বাসনা দেখিয়াছে। সুরেশবাবু লম্পটের “কামটা” দেখিয়াছেন। সে সেটুকু দেখে নাই, কারণ তাহার নিজের সে বৃত্তি প্রবল নহে। “আত্মবন্মত্তে জগৎ”। গল্পের নায়িকাটি অবধি এই সাম্যবাদী সমালোচকের ভিন্ন মতাবলম্বিনী হইলে তাহার নিস্তার নাই, অন্তে পরে কা কথা! একনিষ্ঠার জ্ঞ লালায়িত, এমন গণিকা বা লম্পট নাই, এ সংবাদ সুরেশবাবু পাইলেন কোথা? সেদিন এই সহরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আত্মীয় একটি হিন্দু বেণ্ডাকে কলমা পড়াইয়া নিকা করিয়াছেন। হিন্দু বেণ্ডাকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ করিয়াছে, নিজেরা গৃহস্থ হইয়াছে এমন অনেকগুলি মুসলমান যুবককে আমি জানি। তাহাদের স্ত্রীর পালয়িত্রীরা রুষ্ঠ হইয়া তাহাদের উপর মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল। সুরেশবাবু কি বলিতে চাহেন যে তাঁহার আদর্শের মাপকাটি লইয়া চরিত্র-সৃষ্টি করিতে না পারিলে রচনা ব্যর্থ হইবে? আমার বিশ্বাস এ মত তাঁহার চিরদিনের নহে!

* *
*

গল্পের স্ত্রীলোকে মাল্জাজী নায়ডু বিবাহ করিয়াছিল। স্ত্রীলার সহিত তাহার পরিচয় হয় এক উকীলের মারফৎ। সমাজপতি মহাশয় কি আর উকীল জাতিকে গালাগালি দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন? বিশেষ যখন রামমোহন লাইব্রেরীর সেই “কেশববাবু উকীল”। শুনিয়াছি অনেক সম্পাদক-সমালোচকও ঐ সকল কুস্থানে নিশিাপন করেন। তাঁহারাও বন্ধুবান্ধবদের ঐ সকল স্থলে কুৎসিত আমোদের জ্ঞ লইয়া যান এ সংবাদ আমরা রাখি। সুতরাং ঐরূপ জঘন্য রসিকতায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বুঝা উচিত ছিল যে ঐরূপ রসিকতা আমাদের সম্পাদক-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও হইতে পারে। ক্ষটিক গৃহে বাস

করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা সাজঘাতিক । আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে সুরেশ বাবু
রসিকতা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ কুৎসিত রসে যে কেবল
“পুতিগন্ধ ভিন্ন কিছু থাকে না ।”



নায়ডুর বিবাহ প্রস্তাবে স্মীলা সুখী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে পরীক্ষা
করিবার জন্ত বলিয়াছিল—“আমি যে বেগা ! আমাকে প্রকাশ্যে বার করতে
পারবে ? মা বোনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে ? আমার অতীত ভুলতে
পারবে ?” ইহার পূর্বে স্মীলা বলিয়াছে—“একটা কথা বড় মনে বাজিত ।...
প্রকাশ্যে কেহ আমাকে স্বীকার করিত না ।...যাহারা আমার মুখের একটা
কথা শুনিলে আপনাদের ধন্য মনে করিত, তাহারা প্রকাশ্যে আমার বন্ধুত্ব
স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত ।” ইহার পর একটি দুঃস্থ স্ত্রীলোক, বেগা
জানিয়া, তাহাদিগের চাকুরী করিতে চাহে নাই । “আমি সেই পরিচারিকার
চক্ষে সেই স্বর্গীয় দীপ্তি দেখিলাম । যে দেশের পরিচারিকা এমন হইতে
পারে, সে দেশের সীতা দময়ন্তী কি ছিলেন ?” সেই দিন হইতে “দাসীটা
একৈবারে প্রাণে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল ।...একদিন কালীঘাটে গেলাম । ছোট
ছোট বধু দেখিলাম, প্রোঢ়া বৃদ্ধা গৃহিণী দেখিলাম, সকল বয়সের বিধবা
দেখিলাম । সবারই অবস্থা মন্দ, সবাই দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতায় জর্জরিত, কিন্তু
গৃহস্থের মেয়ে সবারই মুখে একটা পবিত্র ভাব ।” যে স্ত্রীলোকে
এই রকম মতিগতি, সে নায়ডুকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল—ইহাতে অস্বাভাবিকতা
কোথায় ? নায়ডু হিন্দুর ছেলে, উদার, অথচ, প্রেমোন্মত্ত, সে এক টিলে দুই
পাখী মারিল, মনকে আঁখি ঠারিল, অথচ নারিকাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া
বলিল—“কোনও লজ্জা নাই, তোমার ভিতর ধর্ম আছে । যাদের আমরা
বিবাহ করি, পূর্বজন্মে তারা কি ছিল কে জানে !...ধর আজ তুমি জন্মালে,
অতীতটা ও জন্মের কথা ।” সুরেশবাবুর মতে এ অভিমতটা “ভদ্র-সন্তান
কেশববাবুর খেলো উদারতা ।” এটুকু নায়ডুর উদারতা, কেশববাবুর নহে, এ
সামান্য বুদ্ধিটুকুও বন্ধুর সুরেশচন্দ্রের ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি বটে নাই, একথা আমি
বিশ্বাস করি না । বিদ্রোষের ঠুলি বাঁধিলে আগুনের ভাঁটার মত চক্ষুও নিশ্চিত
হয় । পূর্বেই বলিয়াছি সে একথাটা বলিয়াছিল, আপনার দুঃসাহসের জবাব-
দৌহির জন্ত, স্মীলার সম্মতি পাইবার জন্ত ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের নাট্যকারী বলিয়াছিল—“বিদ্যাসাগর যদি পণ্ডিত ত’ মূর্থ কে” ? কি বে-আদবী ! এ মত নিশ্চয়ই লেখকদের নিজস্ব ! প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মহাশয়ের দৌহিত্রের পক্ষে এখন দেশ-পূজ্য রমেশচন্দ্রের ও বঙ্কিম-চন্দ্রের ওয়ারিসগণের নামে মানহানির হরমুতের নালিস করা কর্তব্য । মহামতি দীনবন্ধুর ত’ ছুর্নীতির সীমা নাই । নিমাইদত্ত প্রভৃতি যে যাহা বলিয়াছে, সমস্ত নাট্যকারের অভিমত ও খেলো উদারতা । মিল্টনের কোমাস পড়িয়া অতঃপর স্থির করিতে হইবে যে মিল্টন ঘোর লম্পট ও পাষণ্ড ছিলেন !

এই প্রসঙ্গে গত মাঘ মাসের ‘গৃহস্থ’ হইতে কয়েক ছত্র এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

“মৃচ্ছকটিকের নাটিকা ‘বসন্ত সেনা’ গণনাগণের উজ্জল চিত্র । সম্রাট ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ইহাকে বিবাহ করিয়াও সমাজে বা রাজদ্বারে কোনরূপ দোষী হন নাই । বসন্ত সেনার পরিচারিকা অপরা বেণী মদনিকাকেও অপর এক ব্রাহ্মণ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।”

সুহৃদ্বর সমাজপতি মহাশয় এখন কি বলেন ? ‘মৃচ্ছকটিক’-প্রণেতার টিকি না কাটিয়া এবং সমাজের পতিত্ব ছাড়িয়া তিনি বা তাঁহার গ্রাম সমালোচককেশরী বোধ হয় তখন কচু-বনে তপস্যা করিতেছিলেন ! নহিলে, এ শ্রেণীর জঘন্য ও কুরুচিপূর্ণ নাটক (?) হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যের আর্জনা বাড়াইত না !

* *
*

নায়ডু বলিয়াছিল—“মাদ্রাজে চলে যাব, সেখানে নূতন জীবন নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা । তুমি সাধবী হ’তে পার, একনিষ্ঠ হ’তে পার, আমি স্বর্গ হাতে পাব ।” সমালোচক-প্রবর ইহাতে টিপ্পনি করিয়াছেন যে কেশববাবু “মাদ্রাজের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার” অবিচার করিয়াছেন । যাহা কিছু বিচার অবিচার করিয়াছেন, নায়ডু—কেশববাবু নয় । নায়ডু তাহার কারণ দেখাইয়াছে । সেখানে, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সেখানে নূতন অবস্থার মধ্যে সুশীলার “অতীত” ভুলিয়া যাওয়া সহজ । সত্যই সমালোচনার বালাই লইয়া মরিঠে ইচ্ছা করে । একটি গণিকা “গৃহস্থের বউ” হইয়া মাদ্রাজে গেলে যে “বিশাল মাদ্রাজ” কলুষিত হয় এ ধারণা কাহারও নাই । কলিকাতার কোনও প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতের গুণধর নাতি বাড়ীর এক অংশে একটি বেণী আনিয়া রাখিয়াছিলেন । তাহাতে কি দেশের লোক পণ্ডিত মহাশয়ের সমস্ত বংশের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা অবিচার

করিয়াছিল? বৃহৎ সমাজে বৃহৎ কুলঙ্গারই জন্মিবে। মাদ্রাজ সমাজ বা বাঙ্গালার সমাজে লোকে গোপনে গণিকাদের বিবাহ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত প্রদেশটা অপবিত্র হইবে, এ নীতিজ্ঞান অদ্ভুত। হিন্দুসমাজে স্থান পাইবে না বলিয়াই তাহারা খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল—একেবারে নূতন পথের পথিক হইয়াছিল।

* *
*

এই রকম কথা লইয়া সুরেশবাবু গাত্রদাহের উপশম করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একস্থলে নায়িকার পুলক হইয়াছে বলিয়া তিনি স্বয়ং আঁকিয়া উঠিয়াছেন! নায়িকার পুলক! সর্কনাশ! আমরা বলি—নায়িকা সুরাদেবীর আরাধনায় স্নায়ুগুলি বিকল করেন নাই বলিয়াই পুলকটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। নায়ক নায়িকার পক্ষে রোমাঞ্চিত হওয়া নূতন নহে। বিষ্ণু-সাগর মহাশয়ের এক স্বৈরিণী নায়িকার বিষয় নায়ক রাজকুমার বলিয়াছিলেন—
“এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে আমার রোমাঞ্চ হয়।”

* *
*

আমি ষোল বৎসর গল্প লিখিতেছি। বলা বাহুল্য, সমালোচকেরা আমার অনেক গল্পের নিন্দা করিয়াছেন, অনেক গল্পের প্রশংসা করিয়াছেন। আমি কখনও তাঁহাদের সমালোচনার প্রতিবাদ করি নাই। সুরেশ বাবু আমার বন্ধু, তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। সামান্য মতদ্বৈধ হইয়াছে বলিয়া তিনি জোর করিয়া আমাকে কুকথা বলিয়াছেন বলিয়া আমি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি মুখে democracy প্রচার করেন অথচ তাঁহার মতের বিরোধী মত প্রকাশ করিলে লোকে কিরূপ নিগৃহীত হয় তাহা দেখাইলাম। যাঁহাদের দস্ত ও আত্মস্তরিতা এত অধিক, তাঁহারা আবার দেশের কাজে, দেশের কাজে কোমর বাঁধেন! ছিঃ!

* *
*

‘সংস্কৃত নাটকে বিদুষকের চিত্র’ সম্বন্ধে সুরেশবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের প্রতিবাদপত্রখানিও এই স্থানে প্রকাশ করিলাম :—

“এই ‘অন্তর্দৃষ্টি’ সম্পন্ন সমালোচক মহাশয় কেবলমাত্র শেখ প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া সমস্ত প্রবন্ধের উপরে মন্তব্য লিখিয়া ফেলিয়াছেন ইহা তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়কই বটে। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন “কেবল বৈচিত্র্য বিধানের জগ্গই সংস্কৃত নাটকে বিদুষকের সৃষ্টি অতএব সংস্কৃত নাটকের পঞ্জরস্বরূপ এই বিদুষক সম্বন্ধে লেখকের এই নির্দেশ যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ নহে।” কিন্তু সমালোচক মহাশয় আমার উক্তির মধ্যে “কেবল” শব্দটি পাইলেন কোথায়? নিশ্চয়ই উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। “ঘটনার বিকাশ ও চরিত্রের পুষ্টি” নাটকীয় সকল ব্যক্তিরই করিয়া থাকে, সে কথা আমিও অস্বীকার করি না। আমিও ত দেখাইয়াছি যে বিদুষক হস্তপরিহাস ব্যতীত নারকের প্রণয় ব্যাপারেও সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে গেলে নাটকে বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়া monotony দূর করাই বিদুষকের প্রধান কার্য বলিয়া মনে হয় না কি? ঘটনার বিকাশ ও চরিত্র পুষ্টি বিদুষকের নিজের সম্পত্তি নহে, সে ত সকলেই করিয়া থাকে। চরিত্রপুষ্টি ও ঘটনার বিকাশ শকুন্তলার ধীরগও করিয়াছে। বিদুষকের তাহাতে প্রাধান্ত কোথায়? সে কথা বলিবারও বোধ হয় আবশ্যক করে না। সমালোচক মহাশয়ের সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে বোধ হয় বিশেষ পরিচয় নাই, নতুবা তিনি এমন একটা বা হয় বলিয়া ফেলিতেন না। তিনি যে আমার প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়েন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি কেমন করিয়া বুঝিলেন প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয় নাই? আশা করি এক্সপ কাওজানহীন সমালোচকের ‘অর্চনা’য় স্থান নাই। ইতি—

পুনশ্চ—গালি দেওয়ারই কি সমালোচক মহাশয়ের স্বভাব, তিনি ত কাহাকেও বাদ দেউন নাই দেখিলাম।

বিনীত—শ্রীবিষ্ণুপদ দেবশর্মা।

* *
*

ভারতবর্ষ বৈশাখ ১৩২৪

সহযোগী “ভারতবর্ষ” বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রচারে মনোযোগী হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। “বংশানুক্রম ও সৃষ্টিজনন বিজ্ঞা” উপাদেয় প্রবন্ধ। অধ্যাপক পুরকায়স্থ মহাশয়ের “চড়াদরের কড়া কথা”—অর্থনীতি বিজ্ঞানের তথ্যে পূর্ণ। কথাগুলো পুরাতন হইলেও এ প্রবন্ধ মূল্যবান। “প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্বন্ধবিচার” প্রবন্ধটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। এই সকল প্রবন্ধে লোক-শিক্ষা হয়, বিজ্ঞানের প্রসার হয় এবং মাসিকের মূল্য বাড়ে। “মধু-স্মৃতি” বেশ ভালই চলিতেছে। এবার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর অনুরোধে কবিরের যে স্মৃতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিরের বন্ধু লিখিয়াছেন—“বুদ্ধি, বিজ্ঞা এবং উচ্চশিক্ষার অধিতীয় দৃষ্টান্ত পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর সহিত মাইকেল সম্বন্ধে যতবার আন্দোলন হইয়াছে, ততবারই তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—“আমাকে তোমরা বুদ্ধিমান বল,

... ..কিন্তু মাইকেলের তুলনায় আমি অতিশয় হীন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, ঐতিভার ও মেধার সমকক্ষ আমি অত্য়পি দেখি নাই।” এই কথায় আমাদের দেশের গৌরব—তুইটি মহাত্মারই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় ।

* * *

*

ভারতবর্ষে এত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উপদ্রব কেন ? সীমান্ত, ইন্দোর ও উজ্জয়িনী বরং সহ হয় কিন্তু স্বয়ং দীনেন্দ্রবাবু “মেদিনীপুরে তিন রাত্রি” লইয়া পাঠক-দিগের সমক্ষে হাজির হইলেন কেন ? এবার রায়সাহেব হারাণচন্দ্র “লিলুয়ায় বণ্টাখানেক” লিখিয়া জলধর বাবুকে পাঠাইতে ভুলিবেন না । এ বাজারে কাগজের যেরূপ দর তাহাতে ও সকল রচনাগুলি যুদ্ধের পর ছাপাইলে ভাল হয় না ?

* *

*

সাহিত্য-পঞ্জিকা ।

গত চৈত্র মাসের অর্চনায় ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’র সমালোচনায় আমরা অনুযোগ করিয়াছিলাম—“যে সব সাহিত্যিক বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি লিখেন, সাময়িক বা সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকতা করেন অথচ স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি নাই, তাঁহাদের নাম এই পঞ্জিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে । সম্ভবতঃ এগুলি অনবধানতার ফল । পুস্তকের তালিকায় অনেক গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে * * প্রথম উত্তম বলিয়া সমস্ত ক্রটি উপেক্ষণীয় । আশা করি ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকায় সেগুলি সংশোধিত হইবে ।” সুখের বিষয়, সম্পাদকযুগলের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে । আমাদের মন্তব্য অনুযায়ী তাঁহারা একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালার সম্পাদকবৃন্দকে প্রেরণ করিতেছেন । আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম ।

“আগামী বর্ষের ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’য় আমরা একটি অতিরিক্ত অধ্যায় যোগ করিতে চাই । যে সকল সাহিত্যিক কোন গ্রন্থ লেখেন নাই অথচ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও যে যে পত্রে লিখিয়া থাকেন, সেগুলির নাম এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইবে । সাহিত্যিকগণ আমাদের এই সকল সংবাদপ্রদানে বাধিত করিবেন ।

গতবর্ষের পঞ্জিকায় অনেক গ্রন্থকারের জন্মের তারিখ, ঠিকানা বা নিবাস অজ্ঞতা প্রযুক্ত দেওয়া হয় নাই । তাহাতে এই অভাব এইবার আমরা দূরীভূত করিতে পারি, উজ্জ্বল সকল গ্রন্থকারের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি । যে সকল গ্রন্থকারের নাম বাদ পড়িয়াছে, দয়া করিয়া তাঁহারা নিজ ২ নাম ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইবেন ।

গ্রন্থকারগণ অমুগ্রহ প্রকাশে নিজ ২ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবা মাত্র আমাদের পক্ষে পঞ্জিকা সংকলনে ও সম্পূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। নিবেদন ইতি।”

‘অর্চনা’র লেখকবৃন্দ পত্রানুযায়ী বিবরণ অর্চনা-কার্যালয়ে পাঠাইলে আমরা সাদরে তাহা ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’ কার্যালয়ে পাঠাইব। ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’র জন্ম ‘সমসাময়িক ভারত’ কার্যালয়, মোরাদপুর (পাটনা) এই ঠিকানায় সকলেই পত্রাদি ও বিবরণ পাঠাইতে পারেন।

* * *

কণ্ঠহার—সচিত্র সামাজিক নাটক।

আমাদের পরম অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায়-প্রণীত ‘কণ্ঠহার’ নাটক ২য় সংস্করণে ‘সচিত্র’ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

দেড় বৎসর হইল এই নাটকখানি একটানে সুখ্যাতির সহিত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে এবং ইহা শত শত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতেছে। নাটকখানি করুণ রসে প্লাবিত এবং মধ্য মধ্য হাসির উৎসে পরিপ্লুত। এমন হৃদয়গ্রাহী, শিক্ষাপ্রদ, নাটকীয় গুণাবলি-সম্বিত নাটকের সংখ্যা বাঙ্গালা ভাষায় অল্প। গিরিশচন্দ্রের ও ক্ষীরোদচন্দ্রের নাটক ও গীতিনাট্যগুলির মত ‘এই নাটকখানিও বঙ্গদেশের সর্বত্র সখের থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। সাধারণ্যে ইহার বিশেষ প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই দুর্ন্যূনের দিনেও নাটককার ২য় সংস্করণে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। কাগজ, ছবি, ছাপা, ত্রিবর্ণে রঞ্জিত আবরণী প্রভৃতিতে গ্রন্থখানি প্রিয়জনকে উপহার দিবার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। নাটকে এমন পারিপাট্য এই নূতন। ইহা কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে ১।।০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

স্থিতি পরিবৃতি (Metathesis.)

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ]

বরকৃষ্ণ প্রাকৃত প্রকাশ ব্যাকরণে দুটি স্থত্র আছে, “করেথাং রণোঃ স্থিতি পরিবৃতিঃ” ও “আলানে লনোঃ” অর্থাৎ “করেণু” শব্দের “রঙণ” এর এবং

“আলান” শব্দের “লওন” এর স্থিতি পরিবৃদ্ধি হয় । তাহাতে “করেণু” শব্দের ‘র’ স্থানে ‘ণ’ ও ‘ণ’ স্থানে ‘র’ হয় এবং “আলান” শব্দের ‘ল’ স্থানে ‘ন’ ও ‘ন’ স্থানে ‘ল’ হইয়া “করেণু” “কণেরু” হয় এবং “আলান” “আণাল” হইয়া যায় । প্রাকৃত জন ঋষি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া এই কাণ্ড করিত, ইহা এতই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহার জন্ত ব্যাকরণের সূত্র রচনা করিতে হইয়াছিল ।

আমরা এখনও বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দেখিতে পাই জনসাধারণ “বাতাস” “বাতাসা” “বাসক” “বাস্ক” “ডেস্ক” বলিতে যথাক্রমে “বাসাত” “বাসাতা” “বাকল” “বাস্ক” ও “ডেস্ক” বলিয়া ফেলে । দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোথাও সাধারণ লোকে “দাঁড়িয়ে” বলিতে, “দাঁইড়ে” বলে । একজন বাঙ্গালা শিক্ষিত লোক একবার “৫ ফুট ৪ ইঞ্চি” বলিতে, “৫ ফুচ্ ৪ ইঞ্চি” বলিয়াছিলেন । ইহার কারণ কি ? লোকে ষেক্ষপ শুনে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে । তবে উচ্চারণের এরূপ অসামর্থ্যের কারণ কি ? যে “আণাল” উচ্চারণ করিতে পারে সে “আলান” উচ্চারণ করিতে পারে না কেন ? হিন্দীভাষীদের মধ্যেও কেহ কেহ “আদমি” না বলিয়া “আমদি” বলে কেন ?

আমাদের সংস্কৃত বর্ণমালার পাঁচটি উচ্চারণ স্থান যথা জিহ্বামূল বাস্কর্ষ, তালু মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ অর্থাৎ জিহ্বার সাহায্যে বায়ু এই সকল স্থানে আহত হইলে বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ হয় । এই পাঁচ বর্ণের বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি লইয়া স্বরযোগে যে শব্দ হয় তাহা ধীরে ধীরে সকলেই উচ্চারণ করিতে পারে কিন্তু শব্দটি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে গেলে যে কস্মরতের প্রয়োজন, অনেকের জিহ্বা তাহাতে অভ্যস্ত থাকে না কাজেই তাহারা একটু গোলমাল করিয়া ফেলে । কোন দেশে যে বর্ণের যে ধ্বনি প্রচলিত তাহা হইতে একটু পৃথক্ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে গেলে সে দেশের লোকের অনেকেই বাল্যাবধি অনভ্যাস নিবন্ধন তাহাতে অসমর্থ হয় । যথা—দন্ত্য ‘স’ স্থানে ‘ছ’ এবং দন্ত্য ‘জ’ (ইংরাজী Z) স্থানে তালব্য ‘জ’ উচ্চারণ করে । আবার কয়েকবিধ উচ্চারণ সকলের পক্ষেই কঠিন, যথা ইংরাজী আস্কড্ (asked) ও পাস্‌ড্ (passed) স্থলে অঘোষ-বর্ণ ক্ ও স্ এর পরে ঘোষবর্ধণ ‘ড’ উচ্চারণ করা প্রায় অসম্ভব, কারণ জিহ্বার এরূপ কস্মরত সকলের পক্ষেই কঠিন, সেইজন্য ইংরাজীতে আস্কট্ ও পাস্‌ট্ হয় । সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়মে, ঘোষবর্ধণের অনুনাসিক ব্যতীত বর্ণ অর্থাৎ

বর্ণের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে বর্ণের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। কোন কোন হিন্দুস্থানী শিক্ষার্থী জোর করিয়া asked কথার 'ড'এর উচ্চারণ রাখিতে গিয়া 'আস্‌গড্' করিয়া ফেলিয়াছে; ইহা ঠিক সংস্কৃত সূত্রানুযায়ী।

আবার দুইটি মহাপ্রাণ বর্ণ উপর্যুপরি উচ্চারণ করা কিম্বা পদের অন্তে মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যথা "হঠাৎ" বা "হঠকারিতা" স্থানে আমরা বলি 'হটাৎ' ও 'হটকারিতা'। আবার "গর্দভ" কথাটা উচ্চারণ করিতে গেলে শেষে 'ভ্' উচ্চারণ কঠিন বলিয়া আমরা 'ভ্' স্থানে 'ব্' বলি অথচ 'ভ্'এর মহাপ্রাণত্ব ছাড়িতে না পারিয়া 'র্দ'এর স্বক্কে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে 'র্দ্ব' করিয়া ফেলি অর্থাৎ 'গর্দভ্' না বলিয়া আমরা বলি 'গর্দব্'।

ইহা ঠিক স্থিতি পরিবর্তির উদাহরণ নহে। স্থিতিপরিবর্তিতে ৩টি বর্ণের উচ্চারণ হয়। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণ তৃতীয় স্থানে এবং তৃতীয় বর্ণ দ্বিতীয় স্থানে আইসে। ইহা দুই কারণে সম্ভব। প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিবার পরে তাড়াতাড়িতে ধ্বনি দুটি শেষ করিবার জন্য দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বনি হইবার পূর্বেই তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণ করিয়া ফেলি, কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারেই বুদ্ধিতে পারি যে, একটা বর্ণের ধ্বনি বাদ পড়িল তাই সেটিকে শেষে উচ্চারণ করি। কিম্বা ইহাও সম্ভব যে, প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিবার পরে আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া অবশিষ্ট দুইটি বর্ণই উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করি তখন দুইটির মধ্যে যেটি সহজ সেটির উচ্চারণ অগ্রে হয়, কঠিন উচ্চারণটি পরে হয়। 'আদ্‌মি'র 'দ' অপেক্ষা 'ম'এর, 'আলানে'র 'ল' অপেক্ষা 'ন'এর এবং 'করেণু'র 'র' অপেক্ষা 'ণ'এর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত সহজ।

কিন্তু যেখানে "৫ ফুট ৪ ইঞ্চি" না বলিয়া "৫ ফুট্ ৪ ইন্টি" বলে কিম্বা "ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস না খাইয়া" লোকে "ঘাস ডিঙ্গিয়ে ঘোড়া খায়" সেখানে প্রথম মতই প্রযোজ্য বলিয়া বোধ হয়। যেক্ষেপেই হউক, উচ্চারণের এই পরস্পর স্থান পরিবর্তন উচ্চারণকারীর অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে।

ছিন্ন-হস্ত ।*

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

(১)

বিচারক বারমিষ্টারের চতুর্দিকে সকলেই আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। তিনি 'সেন্ট ক্লাউডে'র ভীতিপ্রদ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ করিতেছিলেন। কয়েক মাস অবধি এই রহস্যপূর্ণ ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সমস্ত প্যারিস সহরকে এক মহা জটিল সমস্যায় ঘেরিয়া রাখিয়াছিল! পুলীশের যথাসাধ্য প্রয়াস সত্ত্বেও ঘটনাটির কোন মূলমন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রজ্বলিত অগ্নিপাত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বিচারক বারমিষ্টার দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি একে একে ঘটনা সম্পর্কীয় বিষয়গুলি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি যে অনেক মার্খা ঘামাইয়াও ঘটনাটি সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না তাহা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে হইল। সেখানে অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাব-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রত্যেক বাক্যটি শুনিবার জন্ত তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। তাহারা স্ত্রীস্বলভ অতৃপ্ত কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্ত সমস্ত বিষয়টা আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল।

বিচারক এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইলে একজন স্ত্রীলোক বলিল “কি ভয়ানক! এই প্রকার অতি অস্বাভাবিক ভৌতিক ব্যাপার মনুষ্যের ধারণায়ও আসিতে পারে না!”

বিচারক তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“আপনি যেরূপ ধারণা করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা সত্য। ইহা অনেকেরই বোধগম্য নহে। তবে আপনি যে ‘ভৌতিক’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় ইহা তাহা নহে, কিন্তু এই প্রকার একটি সুকল্মিত ভয়ঙ্কর ব্যাপার যাহা বাস্তবিকই এতটা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটন করা নিতান্তই সহজসাধ্য

* গি. দে সোপাসার করাসী গল্প হইতে।

নহে বলিয়া মনে হয়। তবে সত্য সত্যই আমাকে একবার এক ভীষণ ব্যাপারে পড়িতে হইয়াছিল, যাহাকে বাস্তবিকই ‘ভৌতিকের’ কাছাকাছি বলা চলে। তাহাও আমরা এই প্রকারই একটি অভেদ সমস্তা ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।”

অনেকগুলি মহিলা তাহাকে সে বিষয়টি বলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, বারমিষ্টার স্মিতবদনে বলিলেন—“আমি আপনাদিগকে যে ঘটনাটি বলিব তাহা যে আমি কখনও ভৌতিক বলিয়া দিকান্ত করিয়াছি তাহা আপনারা এক মুহূর্তের জন্যও মনে করিবেন না।” আমি একজন বাস্তববাদী—এবং একেবারে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত এমন কোনও বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। আমার বিশ্বাস, যাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম তাহাকে ‘ভৌতিক’ না বলিয়া তাহার স্থলে সোজাসুজি “বোধাতীত” শব্দটি ব্যবহার করিয়া লইতে পারি এবং আমি অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিতে পারি যাহাতে ঐ শেষোক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা চলিতে পারে। আমি এখন আপনাদিগকে যে বিষয়টি বলিব তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাহাকেও এই প্রকার একটি জটিল সমস্তা বলিয়াই মনে হইবে। যাহা হউক, আমি আপনাদিগকে প্রকৃত ঘটনাটি বলিতেছি, আপনারা নিজেদের মধ্যেই তাহার বিচার করিয়া লইবেন।”

“আমি তখন সেই ষ্ঠেতপুত্র জলাশয় বেষ্টিত কর্শিকাদ্বীপের ক্ষুদ্র অজাসিও সহরটিতে বিচারক ছিলাম। সেই সুন্দর জলাশয়ের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া একটি বিশাল পর্বত প্রহরীর মত দণ্ডায়মান থাকিয়া গম্ভীর নেত্রে এই মনোহর দ্বীপটির প্রতি চাহিয়া থাকিত।

আমার আফিস সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্যে আমাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইত তাহাদের অধিকাংশ গুলিতেই কেবল ‘ভেঙেটাদের’ অতিশয় শোচনীয় এবং ভীষণ লোমহর্ষণ বিরোগান্তমূলক কাহিনীর অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু যদিও এই ‘ভেঙেটাদের’ কার্যগুলি সচরাচর অত্যন্ত ঘৃণিত এবং হিংস্র-জনোচিত বলিয়া মনে হইত, তবুও সময়ে সময়ে তাহাদের দুই একটি কাহিনী এতই মধুর নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ থাকিত যে তাহা ভাবিতে গেলেও অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। এমন কি, এই সমস্ত বিভীষিকাময় তাণ্ডবলীলার অন্তরালেও কখনও কখনও দুই একটি অতি মনোহর বীরত্বপূর্ণ এবং প্রেম-রসোদ্দীপক চিত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে।

এই 'ভেণ্ডেটা' শব্দে একজনের কল্পনায় যতগুলি প্রতিশোধ বাসনা জাগিতে পারিত কেবল তাহাই চরিতার্থ করা বোঝায়। পিতার পর পুত্র এই প্রকার বংশপরম্পরায় ভেণ্ডেটাদের প্রতিশোধের ধারা বহিয়া যায় এবং আততায়ীগণ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী হইতে নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি থাকে না। এমন কি বহুপূর্বে মৃত কোন পূর্বপুরুষের সঞ্চিত প্রতিশোধও কোন দুরাগত বংশাবতংশ কর্তৃক সাধিত হইতে দেখা গিয়াছে।

ক্রমাগত দুই বৎসরাবধি আমি এই সকল রক্তপিপাসু তরফুদিগের কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাই নাই।

(২)

একদিন আমি শুনিলাম যে, একজন ইংরেজ এখানে আসিয়াছেন। তিনি দুই বৎসরের জন্ত জলাশয়ের সম্মুখস্থ একটি সুন্দর লোকালয় ভাড়া করিয়া তাহাতেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত কেবলমাত্র একটি ফরাসী ভৃত্য ছিল। শুনিতে পাইলাম তিনি তাহাকে মার্সেলেসের পথে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

অল্পকালের মধ্যেই এই ভদ্রলোকটি সকলের আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সর্বদাই একাকী থাকিতেন। বাহিরে এক শিকার করা এবং মাছ ধরা ভিন্ন তাঁহার অপর কোন কার্য ছিল না। তিনি কাহারও সহিত কথাবার্তা করিতেন না কিম্বা কোন দিন সহরের কোন হোটেলে কেহ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি প্রত্যহই কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত কোন একটি লক্ষ্যের উপর বন্দুক চালনার অভ্যাস করিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শোনা যাইত। কেহ কেহ বলিত এই নির্বাসিত ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী, কিম্বা কোন গুরুতর অপরাধী, অভিযুক্ত হইবার ভয়ে দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া শাসনের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্ত এই স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

যাহা হউক, বিচারকের পদে সমাসীন থাকিয়া এই নবাগত ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্ত আমারও ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহাকে রাওয়েল নামে পরিচয় দিতেন। ম্যার জন্ রাওয়েল তাঁহার সম্পূর্ণ নাম এবং উপাধি ছিল। প্রথমতঃ তাঁহার সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে নিজেই একপ্রকার নজরবন্দী অবস্থায় রাখিয়া, সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, আমি কখনও তাঁহার সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহজনক কিছু জানিতে পারি নাই।

ক্রমশঃ তাঁহার সম্বন্ধে জনরব আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, যাহাতে তাঁহার সহিত শীঘ্রই আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, তাহার একটা উপায়-উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া সেই অবধি আমি তাঁহার বাসস্থানের চারিপার্শ্বে রীতিমত শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

আমি যে সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলাম, অশ্রুতঃ তাহার জন্ত আমাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে একদিন আমি আমার এই ইংরেজটির বাসস্থানের অতি সন্নিকটে একটি পায়রা শিকার করিলে আপনা হইতেই সে সুযোগটি আসিয়া মিলিল। আমার কুকুরটি পক্ষীটিকে ধরিয়াছিল। আমি পায়রাটিকে আমার কুকুরের নিকট হইতে লইয়া স্যর জনকে প্রদান করিতে গেলাম এবং তাঁহার বাসস্থানের এত নিকটে শিকার করিয়া তাঁহার শাস্তিভঙ্গ করার জন্ত ক্ষমা-ভিক্ষা করিলাম।

তিনি অত্যন্ত লম্বকায় পুরুষ এবং তাঁহার দেহের আয়তনও সেই পরিমাণে মানানসই ছিল। তাঁহাকে দেখিতে একটি প্রকাণ্ড ‘হার্কিউলিসের’ মত এবং দেহের কুত্রাপিও একটু কুৎসিত কিম্বা অস্বাভাবিকত্ব ছিল না।

তিনি আমার এই বর্তমান সঙ্কোচ ভাবটি বেশ উপলব্ধি করিলেন এবং আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(৩)

প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমাদের পরস্পরের আলাপ-পরিচয় আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বাস্তবিকই শেষটায় আমরা উভয়ে উভয়ের অভিন্ন-হৃদয় সূহৃদ হইলাম।

একদিন বৈকালে আমি তাঁহার দ্বারদেশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম স্যর জন্ ইংরেজি কায়দায় বাগানের একটি চেয়ারে বসিয়া পাইপে ধূমপান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি আমাকে তাঁহার সহিত এক গ্লাস এল্ (মস্ত) পান করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে আর পুনরুক্তি করিতে হইল না। তিনি আমাকে ইংরেজি পদ্ধতি অনুসারে শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

প্রদক্ষক্রমে আমি তাঁহাকে অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিলাম। তিনি অনুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া তাহাদের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার সেই অদ্ভুত

ফরাসী ভাষায় আমাকে তাঁহার আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা পর্যটনের নানাবিধ বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি অনুমান করিলাম তাঁহার জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটনার অদ্ভুত সমাবেশ আছে।

একত্র দুই বন্ধু বসিলে ষেরূপ হয়, আমিও সেইমত একথা সেকথার পর নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক এবং শিকারের কথা পাড়িলাম। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি হাতী, বাঘ কিম্বা বনমানুষ এমন কিছুই নাই যাহা শিকার করেন নাই। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমি বলিলাম—“স্যর জন্ ! এই সমস্ত জন্তু কি অত্যন্ত ভয়ানক নহে ?”

তিনি উত্তর করিলেন—“ওঃ না ! মানুষাই সর্কাপেক্ষা ভয়ঙ্কর প্রাণী। সত্য কথা বলিতে কি, আমি সময়ে সময়ে মানুষও শিকার করিয়াছি।”

তারপর তিনি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের কথা আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র দেখাইবার জন্য অস্ত্রাগারে লইয়া গেলেন।

আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই দেখিলাম তাঁহার বৈঠক-খানাটির দেওয়ালের চারিদিক এক প্রকার অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং মূল্যবান পশমে আবৃত রহিয়াছে। এই কাপড়ের মধ্যে মধ্যে সোনালী কারুকার্যের পুস্পালঙ্কার পরিশোভিত ছিল। পুস্পগুলি মেঘনিদিত আকাশের তিমিরাবৃত অন্তরালে থাকিয়া সূর্যের ক্ষীণরশ্মির মত চতুর্দিক হইতে আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল।

স্যর জন্ নিজেই বলিলেন—“এই ফ্যাসানটি জাপানী। ইহা নিশ্চয়ই আপনার নিকট অদ্ভুত ঠেকিবে কিন্তু আমার পক্ষে বড়ই দৃষ্টি-সুখকর।”

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, অমনি সহসা কক্ষ মধ্যস্থিত একটি বস্তু আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিল। আমি দেখিলাম এক খণ্ড কাল চতুষ্কোণ মখমলের সহিত একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ঝোলান রহিয়াছে।

অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একখানি ছিন্ন নরহস্ত !—কোন জীর্ণ কঙ্কালের হস্ত নহে—বেশ পরিষ্কৃত ভাবে ইহা সংরক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি ইহাতে তখনও কালো কালো মাংসখণ্ড গুলি সংলগ্ন ছিল এবং স্থলে স্থলে শুষ্ক রক্তের দাগ অতি সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান ছিল। অতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে হস্তখানিকে ঠিক এক কোণেই মণিবন্ধ এবং কনুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। সেই কর্তৃত্বস্থলের হাড়গুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। হস্তখণ্ড বিচ্ছিন্ন করিতে যে কি ভয়ানক শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল—কেবল হস্ত-খানিই তাহার মাক্যপ্রদান করিতেছিল ! বাহটির মণিবন্ধের চতুর্দিকে মোটা

লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটি হস্তীর বন্ধনোপযুক্ত কড়ার সহিত দেওয়ালে ঝোলাইয়া রাখা হইয়াছিল !

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—“এটা কি ?”

স্মার জন্ ধীরভাবে উত্তর করিলেন “একখানি ছিন্নহস্ত । ইহার মালীক আমার ঘোরতম শত্রু । এই ব্যক্তি মধ্য-আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল । এই হস্তটিকে একটি প্রশস্ত ফলকযুক্ত তীক্ষ্ণধার তরবারীর সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল এবং সপ্তাহকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আতপদগ্ন করিয়া ইহাকে বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষিত করা হইয়াছে । এই বলিতে বলিতে তাঁহার স্মৃতিপথে সেই ভীতিপ্রদ পূর্বকাহিনী জাগিয়া উঠিল এবং তিনি অর্ধফুটবরে বলিলেন “এই হস্তখানিকে বিচ্ছিন্ন করা আমার পক্ষে নিতান্তই মঙ্গল হইয়াছে ।”

আমি আরও মিকটে আসিয়া হস্তটি স্পর্শ করিলাম । ইহা যে একটি ভীষণ দানবাকার ‘হার্কেউলিসের’ মত নরদেহের অংশ তদ্বিষয়ে আমার আর কোন সংশয় রহিল না । প্রত্যেক অঙ্গুলি সুদীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে সুবৃহৎ অস্থিগ্রন্থি এবং দৃঢ়তম শিরাগুলি দেখা যাইতেছিল ।

আমি ভীতভাবে আমার সহচরকে বলিলাম—“ইহার মালীক নিশ্চয়ই আপনার একজন ভীষণ শত্রু ছিল ?”

তিনি বলিলেন—“হঁা ছিল । কিন্তু আমি আরও অধিক বলবান ছিলাম এবং এই শৃঙ্খলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলাম ।” তিনি বাস্তবিক উন্মাদ কিম্বা তামাসা করিতেছেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না !

আমি বলিলাম—“কিন্তু এই হাতখানিকে এই প্রকার রক্ষা করার অভিপ্রায়টা কি ? ইহা ত আর এখন পলাইতে পারে না !”

ঐকান্তিক আগ্রহ এবং গান্ধীর্ঘ্য সহকারে স্মার জন্ উত্তর করিলেন—“ইহার কারণ ছিল এবং আছে । ইহা সর্বদাই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিত এবং এখনও করে । কাজেই এই শৃঙ্খলের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে ।”

আমি লোকটার মুখের দিকে চাহিলাম । বাস্তবিকই এ লোকটা উন্মাদ না আমাকে তামাসা করিতেছে ? কিন্তু তাঁহার মুখে সেই একপ্রকার প্রশান্ত ভাব, নয়নে সেই স্থিরদৃষ্টি এবং কথায় সেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি । যাহা হউক উপস্থিত আমি আর এ বিষয় লইয়া বিশেষ তোলাপাড়ু করিলাম না । তাঁহার নিকট অল্প প্রশ্নের অবতারণা করিলাম ।

আমরা পরস্পরেই বন্দুকগুলি দেখিতে লাগিলাম । এবারও আমি একটি

আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাইলাম। তাঁহার টেবিলের উপর তিন তিনটি টোটাভরা পিস্তল দেখিয়া মনে হইল যেন প্রতিমুহূর্ত্তেই কি এক আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার বিষয় তিনি কিছুই বলিলেন না। আমিও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম না, শুধু তাহাদের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়াই আমি বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। এই সাগরতীরস্থ নির্জন লোকালয়বাসী ইংরেজটিকে দেখিয়া আমার মনে হইল প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার ক্লগ্নহায়ী জীবনটি কি ভয়ানক বিপজ্জনক! প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে মৃত্যুর জগ্ৰ কিরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে! রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছিল। আমিও এই কুহেলিকা-উদ্বীটনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

(৪)

আমি মধ্য মধ্য স্যর জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। আমি সর্বদাই তাঁহাকে বিনয়ী এবং শিষ্টাচারী বক্রূপে দেখিয়াছি। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু দিনের জগ্ৰ আফিস সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আমি আর তাঁহার সহিত কিছুদিন দেখা করিতে পারি নাই।

সহসা একদিন প্রাতঃকালে আমার ভৃত্যটি আমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সংবাদ দিল যে পূর্ব্বরাত্রে স্যর জনকে কে হত্যা করিয়াছে!

আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্থানীয় কমিশনার এবং সামরিক কাপ্তেন সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, তাঁহার ভৃত্যটি দ্বারদেশে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ভৃত্যটি এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। ভৃত্যটি আমার মতই নির্দোষ। যাহা হউক আমরা প্রকৃত দোষীকে কেহই বাহির করিতে পারিলাম না।

এই বলিয়া বারমিষ্টার কিছুক্ষণের জগ্ৰ নিস্তক হইলেন। রূপসী শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার আরও কাছে বেসিয়া দাঁড়াইল। নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার গল্প শেষ হয় নাই!

বিচারক পুনরায় আরম্ভ করিলেন “আমরা তাঁহার সেই ক্লগ্নপশমাবৃত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম তাঁহার দেহটি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের মনে হইল যেন মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আততায়ীর সহিত তাঁহার কি এক ভীষণ মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল! তাঁহার পোষাকের উপরিভাগ ছিড়িয়া গিয়া ভিতরকার অঙ্গরাখাটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

এবং শিকারী কোটের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার একটি সুঠাম উন্মুক্ত বাহু একেবারে মোচ্ড়াইয়া বহির্গত হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহাকে দম বন্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। তাঁহার মুখখানি অত্যন্ত ক্ষীত এবং ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ভাব প্রকাশ করিতেছে !

দেহখানির বাহ্যিক পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখিলাম তাঁহার গলদেশে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত রহিয়াছে। মনে হইল কোন তীক্ষ্ণধার লৌহফলাকার মত অস্ত্রের সাহায্যে এই গর্তগুলি হইয়া থাকিবে।

আমি আরও একটি আশ্চর্যজনক জিনিস দেখিতে পাইলাম।—দেখিলাম, বৃত্তদেহের কবার্টবদ্ধ দণ্ডশ্রেণীর মধ্যে একটি মনুষ্যাঙ্গুলী কর্তিত রহিয়াছে ! অঙ্গুলীটি প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থির মধ্যস্থলে কর্তিত হইয়াছিল !

ডাক্তার আসিলেন। তিনি ক্রমে দেহ এবং কর্তিত ক্ষতস্থানে অঙ্গুলীর দাগ ও ক্ষতচিহ্নগুলি সমস্তই সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বসিলেন—“আমার বিশ্বাস এই ব্যক্তি কোন একটি কঙ্কাল কর্তৃক খাসরুদ্ধ হইয়াছেন !”

আমার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে এক ভীতিপ্রদ প্রবাহ শিহরিয়া উঠিল। আমি স্বভাবজতি বুদ্ধিবলে একবার সেই দেওয়ালের দিকে—যেখানে ঐ ছিন্নহস্তটি ঝোলান ছিল সেই দিকে—চাহিলাম।

ছিন্ন হস্তটি সেখানে নাই !

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এই সমস্তার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলাম না। গৃহের জানালা, কবার্ট এবং সমস্ত জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য হইল না ! স্যর জনের দুইটি ঘূহদাকার প্রহরী-কুকুরের মুখেও সেদিন কোনও শব্দ শুনিতে পাই নাই।

স্যর জনের ভৃত্য এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল যে সে তাহার প্রভুকে কি এক বিষয়ে সর্বদাই অত্যন্ত চিন্তিত থাকিতে দেখিত। তিনি ইদানীং অনেকগুলি পত্র পাইয়াছিলেন। তিনি পড়িয়াই সেগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তিনি কখনও না অত্যন্ত ক্রোধভরে উন্নতের স্থায় প্রকাণ্ড বেত্রধারণ পূর্বক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া ঐ শুষ্ক ছিন্নহস্তে ক্রমাগত প্রহার করিতেন। তিনি অধিক রাত্রি অবধি জাগিয়া থাকিতেন এবং শয়নকক্ষ উত্তমরূপে অর্গলাবদ্ধ করিয়া

নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার আরও একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি নিমেষে ব্যবহারোপযুক্ত কতকগুলি টোটাভরা আঘেয়ান্ন সর্বদাই নিজের কাছে রাখিতেন। ঐ তালাবদ্ধ শয়নকক্ষ হইতে প্রায়ই রাত্রে কোলাহল শোনা যাইত। তাহার মনিব যেন ক্রোধাক্ত হইয়া কাহারও সহিত বাক্বিতণ্ডা করিতেন। কিন্তু যে ভাষায় এই সমস্ত কথাবার্তা হইত সে তাহা বুঝিত না। যাহা হউক যে রাত্রে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল সে রাত্রে সে কোনও শব্দ শুনিতে পায় নাই। কেবল প্রাতঃকালে কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সে তাহার প্রভুকে এরূপ মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল।

পুনরায় বারমিষ্টার বলিতে লাগিলেন—“আমি কমিশনার ও উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে বলিলাম, যে আমি এই মৃত ব্যক্তিকে জানিতাম। আমরা সকলেই হত্যাকারীর যথাসাধ্য সন্ধান করিতে লাগিলাম কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। ঘটনাটি চিরকালই অনাবিস্কৃত থাকিয়া গেল।

(৫)

এই হত্যাকাণ্ডের প্রায় তিন মাস পরে একদিন রাত্রে আমি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম আমায় যেন ‘বোবায়’ ধরিয়াছিল। আমি যেন সেই ভীতিপ্রদ ছিন্নহস্তটি দেখিতে পাইলাম! যেন তাহার মনিব হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাহিয়া মাকড়সার মত আমার মশারী এবং শয্যাকক্ষের দেওয়ালের চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছিল। আমি তিন তিনবার জাগিয়া উঠিলাম এবং তিন তিনবার হিংস্র এবং বৃগ্জস্কর খাবার মত সেই বিকট লম্বা লম্বা অঙ্গুলীগুলি দেখিতে পাইলাম! আপনারা যেমন আমার চতুর্দিকে ঘেরিয়া আছেন দেখিতে পাইতেছি, সেইরূপ সেই বিকটাকার হস্তটির ভীষণ অঙ্গুলী নির্দেশ যেন এখনও দেখিতেছি!

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, পরের দিন লোকেরা আমার নিকট সেই ছিন্নহস্তটি লইয়া আসিল। হস্তটিকে তাহারা সার জনের কবরের উপর হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে স্থানীয় গোরস্থানে কবর দিয়াছিলাম।

ছিন্ন হস্তটির একটি অঙ্গুলী হারাইয়া গিয়াছিল। আমার বিশ্বাস আমি তাহার ঠিক কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

অতঃপর বারমিষ্টার বলিলেন—“মহিলাবৃন্দ! আমার ‘ভৌতিক’ উপাখ্যানটি শেষ হইল।”

উৎসুক রূপসীবৃন্দ সমন্বরে বলিয়া উঠিলেন—“কিন্তু হত্যাকাণ্ডের কি আজও

পর্যন্ত কোন নিস্পত্তি হয় নাই? তাহার জন্ত কি' পরে কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় নাই? আপনি যদি সমস্ত 'না' বলেন তবে আমাদের শাস্তি হইবে না।”

বিচারক বারমিষ্টার স্মিতবদনে বলিলেন—“আমার বিশ্বাস ইহার প্রকৃত কৈফিয়ৎ দিতে হইলে আমার গল্লাট নষ্ট হইয়া যাইবে। আমার মনে হয় ঐ ছিন্ন হস্তের অধিকারী তখনও জীবিত ছিল। সেই রাতে সে শুধু তাহার প্রোপ্যটুকু আদায় করিতে আসিয়াছিল।”

তাঁহার কথা শুনিয়া রূপসীবৃন্দ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন বারমিষ্টার সহাস্তবদনে বলিলেন—“আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আমার কৈফিয়তে আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন না।”

‘নৈষধচরিতে’ নাস্তিকবাদের আলোচনা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

নিজের কণ্ঠকে নিজে বিবাহ না করিয়া বা পুত্রের সহিত বিবাহ না দিয়া সকলেই তৃতীয় ব্যক্তিকে কণ্ঠ দান করিয়া থাকে। ইহাতে ত শ্রুতির স্মৃতির প্রামাণ্য ও পরলোকের প্রামাণিকত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। শাস্ত্রানুমোদিত পারলৌকিক অনিষ্টের আশঙ্কাতেই কেহ নিজের কণ্ঠকে নিজে বিবাহ করে না। যদি পরলোকের ভয় না থাকিত, তবে কি কেহ নিজের কণ্ঠকে একজন অপরের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? শ্রুতিস্মৃতি কর্তৃক ব্যবস্থাপিত এই কণ্ঠাদান-পদ্ধতি, তোমাদের মতন নাস্তিকদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত অনুহৃত হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিয়া লও, বৈদিক বিধি-নিষেধ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লোক-সমাজে কতদূর প্রসারলাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। হে নাস্তিক, সর্ব-সাধারণের এই কণ্ঠাদান-পদ্ধতি দেখিয়াও ত পরলোকে বিশ্বাস করা তোমাদের সর্বথা উচিত।

“স্বকণ্ঠামস্তসাৎকর্তুং বিশ্বানুমতিদূষনঃ ।

লোকে পরত্র লোকস্ত কস্ত ন স্তাদ্ভূঃ মনঃ ॥”

তুমি সিদ্ধান্ত করিয়াছ, শাস্ত্রসমূহে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ কথার অবতারণা আছে, তখন সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা। তাহা হইলে হে নাস্তিক, তোমাদের নিজের

শাস্ত্র স্বীকার কর কেন ? তোমাদের শাস্ত্রের সহিত ত কোনও শাস্ত্রেরই মিল নাই। কাজেই পরম্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তোমাদের শাস্ত্রও অসত্য প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং তোমাদের শাস্ত্র, বৈদিক বিধি-নিষেধের সহস্র দোষ উদ্ভাবন করিলেও তাহা কেহ গ্রাহ্য করিবে না। অসত্য শাস্ত্রের কথার আবার প্রামাণ্য কি ? ফলে বৈদিক পক্ষ যে নির্দোষ, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল। বেদের আংশিক বিধি-নিষেধ মানিয়া তোমরা যখন কণ্ঠা-দান কর, মাতৃগমন হইতে বিরত হও, তখন বৈদিক অণ্ঠাণ্ঠ অংশ মিথ্যা, এ কথা বলা তোমাদের শোভা পায় না। যে সকল আচারের লৌকিক কোনও যুক্তি নাই, বেদে আদিষ্ট এইরূপ বিবিধ বিধি-নিষেধ তোমরা যখন লঙ্ঘন কর না—নত মস্তকে তাহা মানিয়া চল, তখন সেই বেদেই উপদিষ্ট যাগাদির উপরে তোমরা যে কেন খড়াহস্ত, ইহা বুঝিতে পারি না। তারপর তোমরা ঈশ্বর স্বীকার কর না—ইহাও কি যুক্তিসিদ্ধ ? কর্তা ব্যতিরেকে কোনও পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহা বোধ হয় তোমরাও স্বীকার কর। সকলেই জানে, ঘট যে উৎপন্ন হইল, কুস্তকার তাহার নির্মাণ না করিলে ঘট কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। উৎপাদনশীল বস্তুর একজন কর্তা আছে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং বিপুল পৃথিবী অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর যখন উৎপন্ন বস্তু, তখন নিশ্চয়ই তাহার একজন কর্তা থাকিবে। কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ মানুষ, ইহার কর্তা হইতে পারে না। বিবিধ চিহ্নশোভিত শালগ্রামশিলার বিষয় লক্ষ্য করিলেই মানুষকে বিশ্বিত হইতে হয়। এই সকল বিশ্বয়কর বস্তু-সত্তার যাঁহার নির্মিত, তিনিই ঈশ্বর। হে নাস্তিক, মানবের অনির্মেয় এইরূপ বিবিধ বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াও তোমরা যে সেশ্বরমার্গ হইতে ভ্রষ্ট—ঈশ্বরের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস রাখ না—ইহা আশ্চর্যের কথা বটে।

“মানবান্ধকানির্মাণা কুর্মাণ্ডকবিলা শিলা।

ন শ্রদ্ধাপন্নতে মুক্তাস্তীধিকাধ্বনি নঃ কথন ॥”

এই সকল কথা শুনিয়া কলিদাসের সেই নাস্তিক, কৃতাজ্জলি হইয়া দেব-গণকে বলিল,—

“নাপরাধী পরাধীনো জনোহয়ং নাকনারকাঃ।

কালস্তাহং কালবন্দী তচ্চাট্টচট্টলাননঃ ॥”

হে দেবগণ, আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না—যেহেতু আমি পরাধীন। আমি কলিরাজের স্তুতিপাঠক, সুতরাং তাঁহার চাটুকারণিতা না করিলে আমার উপায় নাই। আমি পেটের জগুই আপনাদের কাছে বেদাদির শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছি—আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন।

• আজকালও অনেকে পেটের জগু হিন্দুধর্মের নিন্দা ঘোষণা করিয়া থাকেন।

হিতপরাবলী ।

[হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মেঘ ।

ঘন ঘোর ঘনঘট জলধর গরজন ।
ঘন মোর রণছট রহি রহি নিরজন ॥
ছুখ মোর বিলসিত ক্রভঙ্গি ইঙ্গিত ।
পশুপতি সুখ আঁখি মেঘে উজলিত ॥
জলচর চিরদিন মেঘে উছলিত ॥
জলধর চমকে নরন্তন হিতকো ।
কলকল সাগর নিনাদ নিতকো ॥

সুখফল নিফল পার
পিরিতী জগত আধার ।
নয়ন মণিক মে
পিরিতী বুঝয়ে যে
নিকুঞ্জ হয়রে জগত তহার ॥
বয়ন ফটিক সে
পিরিতী খুঁজয়ে যে
তহার
ভরঙ্গ হয়রে ছন্দবিহার
পিরিতী হিতকো নিত্য আহার ॥

কঁহগল জীবনসার ?

সখি কব তুহঁ কহিবি

কঁহ গল জীবন সার ।

পিরিতী পিরিতী
পিকিতী কি সহিবি
রহিবি যদি সহি
কহিবি তব—কহি

পিরিতী নিগূঢ় সার ॥

প্রেম ।

পেম চন্দ্রমা জলদ মাঝ হস ।
হিদয় অঙ্গমে পুলক সাধ রস ॥
কুসুম অঙ্গমে সুরভি মাল যশ ।
সিকু সঙ্গমে নিঝরি রূপ বশ ।
পেম কারণে হিত অনলস ॥

গ্রন্থ সমালোচনা ।

বর্ণচিত্রণ । শ্রীমদ্রনাথ চক্রবর্তী কলাবিদ্যার্ণব প্রণীত । মদ্রাধ বাবু ইতিহাস
আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ । তিনি "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক এবং অনেকগুলি গ্রন্থ-
প্রণেতা । কলাবিদ্যার জন্ত মদ্রাধবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন । এই গ্রন্থে কিরূপে
চবি আঁকিতে হয় মদ্রাধবাবু তাহা শিখাইয়াছেন । পুস্তকখানি তাঁহার অভিজ্ঞতার, সুকল ।
বিশেষজ্ঞেরা এই শ্রেণীর পুস্তক-প্রণয়নে যত্নশীল হইলে দেশের কল্যাণ হইবে । আমরা
মদ্রাধবাবুর বর্ণচিত্রণ পাঠে সুখী হইরাছি । বাহাদের কলা-বিদ্যায় আস্থা আছে তাঁহাদিগকে
এ পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়।

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম্ এ]

হিতোপদেশ বলিয়াছেন,

সংসারবিষবৃক্ষস্ত দ্বে এব মধুরে ফলে ;

কাব্যামৃতরসান্নাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটী মাত্র মধুর ফল আছে, কাব্যরূপ অমৃত রসের আনন্দন এবং সাধু ব্যক্তির সহিত সঙ্গম। যাহারা সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিবেন তাঁহারা কাব্যামৃতরসে বঞ্চিত হইবেন না। কাব্য এবং অকাব্যের মধ্যে কি পার্থক্য তাহাও কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহাকে তাঁহারা কাব্য বলিয়া অনুভব করিবেন, তাহার কাব্যত্ব কোথায়—এই কথা যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বোধ করি অনেকেই নীরব হইয়া থাকিবেন, কারণ ‘কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়’?—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মানুষ কোনও বিষয়েই একমত হইতে পারে না। বিশেষ, তর্কের দ্বারা, যাহার প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক তাহাতে মতের বিভিন্নতা অবশ্যস্বাভাবী। এই জন্তই বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে পথিক দিগ্ভ্রাস্ত হইয়া পথ খুঁজিয়া পায় না। তবে নিঃসংশয়ে এইটুকু বলা যাইতে পারে, যে কাব্যপদার্থটী বুঝিবার এবং বুঝাইবার জন্ত প্রাচীন ভারতে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা আমাদের মনে বিশ্বয় উৎপাদন করে। আজ এইরূপ কয়েকটী মতের পরিচয় প্রদান করিব।

• “রীতিরাত্মা কাব্যস্য” (কাব্যালঙ্কার সূত্র, ২।৬) রীতিই কাব্যের আত্মা—
ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিক বামনের মত। কাব্যের শরীর—গুণ এবং অলঙ্কারের

বামনের মত।

দ্বারা সংস্কৃত শব্দ ও অর্থ। সূত্রাং গুণযুক্ত এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট

শব্দ ও অর্থই কাব্য এবং রীতিই তাহার আত্মা। রীতি শব্দে

“গুণবিশিষ্ট পদরচনা” বুঝায়। বামনের কাব্যলক্ষণের বিশ্লেষণ করিলে আমরা

দেখিতে পাই যে তিনি রসের উল্লেখই করেন নাই। যদি তুমি এমন ভাবে কতকগুলি সুল্লিষ্ট শব্দের সন্নিবেশ কর যাহাতে অর্থপ্রতীতি হয় এবং অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত গুণ ও অলঙ্কারের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, বামন তাহাকেই কাব্য বলিতে প্রস্তুত, তিনি আর কিছু চাহেন না। গুণ ও অলঙ্কার তাঁহার মতে কাব্যের শোভার জনক। গুণ রসের ধর্ম ইহা পরবর্তী কালের কথা। শব্দের বিশদত্ব, অর্থের স্ফুটন—বামনের মতে ইহাতেই কাব্যের কাব্যত্ব।

দণ্ডী কাব্যের শরীর মাত্র নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন আত্মার কথা বলেন নাই। “শরীরং তাবদ্ ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী”। মনোহর অর্থ বিশিষ্ট পদ-সমূহই কাব্যের শরীর। কিন্তু কাব্যের শরীর সম্বন্ধে ত

দণ্ডীচাৰ্যের মত। মতদ্বৈধ নাই, যত গোল আত্মা লইয়া। কাজেই দণ্ডী বুদ্ধিমানের মত আত্মার কথাটা একেবারে ‘ধামা চাপা’ দিয়াছেন। তবে আমরা দণ্ডীর মত কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তিনি “পদাবলী” বা পদসমূহকেই কাব্যের শরীর বলিয়াছেন। সেই শরীর কিরূপ এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তিনি বলিয়াছেন “ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না,” অলৌকিক আনন্দের জনক যে অর্থ এইরূপ অর্থের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন। সুতরাং তাঁহার মতে অলৌকিক আনন্দের বিধায়ক অর্থকে আত্মা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে জগন্নাথ পণ্ডিতও এই মতেরই পক্ষপাতী।

“কাব্যাত্মা ধ্বনিঃ” কাব্যের আত্মা ধ্বনি। ইহাই ধ্বন্যালোকপ্রণেতা আনন্দবর্দ্ধনের মত। কাব্যের শরীর শব্দ ও অর্থ তাহা তিনি অস্বীকার করেন না। শব্দ ও অর্থ (বাচ্যার্থ) ব্যতীত ধ্বনি নামে অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কেহ কেহ এই ধ্বনির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহান। তাঁহারা বলেন “এই ধ্বনি আবার কি? যদি বল শব্দ ও অর্থের চাক্ষুসী ধ্বনি, তাহা হইলে গুণ ও অলঙ্কার ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। কারণ গুণ ও অলঙ্কারই কাব্যের শোভা বিধান করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে “সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্” গুণজ্ঞের হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার করিতে পারে এরূপ শব্দ ও অর্থ যাহাতে আছে তাহাই কাব্য। তাঁহারা ধ্বনিবাদিগণকে এইরূপে গালি দিয়াছেন।

“ধ্বনিরস্তি ন বস্ত কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালঙ্কতি।

ব্যুৎপন্নৈরচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্তোক্তিশৃঙ্খং চ যৎ ॥

কাব্যং তদধ্বনিনা সমন্বিতমহো প্রীত্যা প্রশংসন্ জড়ো।

নো বিদ্যোহভিধাতি কিং সমতিনা পৃষ্টে: স্বরূপং ধ্বনেঃ।”

যাহাতে অলঙ্কার বিশিষ্ট মনোহর কোনও বস্তু নাই, যাহা বিদগ্ধবচনের দ্বারা ভূষিত নহে, যাহাতে বক্রোক্তির নামমাত্র নাই—তাহাকেও যাহারা কেবল মাত্র ধ্বনিযুক্ত বলিয়া কাব্য নাম প্রদান করে, জানি না, যদি কোনও বুদ্ধিমান তাহা-দিগকে ধ্বনির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে সেই সকল মুর্থ কি উত্তর প্রদান করিবে ?

ইহার উত্তরে অভিনব গুপ্ত বলিতেছেন—

“শকার্শরীরং কাব্যমিতি যদুক্তং তত্র শরীরগ্রহণাদ্ এব কেনচিদান্মনা অনুপ্রাণকেন ভাব্য-
মেব । তত্র শব্দস্তাবচ্ছরীরভাগ এব সংনিবিষ্টতে । সৰ্ব্বজনসংবেদ্যধর্ম্যহাৎ শূলকৃশাদিবৎ ।
আচার্য্য অভিনব অর্থঃ পুনঃ সকলজনসংবেদ্যো ন ভবতি । ন হ্যর্থম্নাত্রেণ কাব্যব্যপদেশঃ ।
গুপ্তের মত । লৌকিকবৈদিকবাক্যে তদভাবাৎ । স এক এবার্থো দ্বিশাখতয়
বিবেকিভিঃ বিভাগবুদ্ধ্যাভিযুক্ত্যতে । তথাহি তুল্যে অর্থরূপত্বে কিমিতি কশ্চৈচিৎ সহৃদয়ঃ
প্লাঘতে । তদভবিতব্যং কেনচিদ্ বিশেষেণ । যো বিশেষঃ স প্রতীয়মানভাগঃ । স এব
বিবেকিভিঃ বিশেষহেতুভ্যং আশ্বেতি ব্যাখ্যাপ্যতে । বাচ্যসংকলনাবিমোহিতহৃদয়েনস্ত তৎপৃথগ্-
ভাবো বিপ্রতিপদ্যতে, চার্কাকৈরিবাস্ত্বপৃথগ্ ভাবঃ” ।

শব্দ এবং অর্থকেই কাব্যের শরীর বলা হইয়াছে । শরীর থাকিলেই তাহাকে অনুপ্রাণিত করে একরূপ আত্মা নিশ্চয়ই আছে । সেই আত্মা কি ? শব্দকে শরীর ভাগেই সন্নিবিষ্ট করা হয় । কারণ শরীরের ধর্ম্য শূলকৃশ প্রভৃতি যেমন সকলেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ শব্দের ধর্ম্য কঠোরত্ব, মৃদুত্ব প্রভৃতি সকলেই বুঝিতে পারে । অর্থ কিন্তু সকলে বুঝিতে পারে না । আবার অর্থ থাকিলেই যে কাব্য হইল তাহা নহে । লৌকিক বাক্য এবং বৈদিকবাক্যেরও ত অর্থ আছে কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা কাব্য নাম পায় ? অর্থ যদিও এক, তথাপি বিবেকিগণ ইহার দুই শাখা স্বীকার করিয়া থাকেন । কারণ সকল অর্থই যদি একরূপই হয় তাহা হইলে গুণগ্রাহিগণ কিজন্ত কোনও কোনও অর্থকেই ভাল বলিয়া থাকেন ? অতএব নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু আছে । এই বিশেষই অর্থের প্রতীয়মান অংশ । এই প্রতীয়মান অংশই কাব্যের আত্মা । যে সকল ব্যক্তি বাচ্য অর্থের গ্রহণেই মোহিত হইয়া যান, তাহারা প্রতীয়মান অংশ বুঝিতে পারেন না । চার্কাকমতাবলম্বিগণ যেমন দ্বেহ হইতে আত্মার পৃথগ্ ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ইহারাও সেইরূপ । ধ্বনিবাদিগণ অর্থের এই প্রতীয়মান অংশকেই ধ্বনি বলিয়া থাকেন ।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকটী দেখুন—

পশু নিশ্চলনিষ্পন্দা বিসিনীপত্রে রাজতে বলাকা,

মরকতভাজনোপরিহিতা শব্দভুক্তিরিব ।

দেখ, পদ্মপত্রের উপরে নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া একটি বক শোভা পাইতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একটি মরকতমণিনির্মিত পাত্রে উপরে একটি শব্দ অবস্থিত রহিয়াছে । কোনও নায়িকা তাহার উপপতিকে এই কথা বলিতেছে । ইহার বাচ্য অর্থ উপরে লিখিত হইয়াছে । কেহ কেহ এই বাচ্য অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন । কিন্তু ধ্বনিবাদিগণ বলেন বাচ্য অর্থে এই শ্লোকের কাব্যত্ব নহে, ইহার কাব্যত্ব প্রতীয়মান অর্থে । সে অর্থ এই—বকটী যখন নিশ্চল এবং নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ উদ্বেজিত করে নাই । অতএব এই স্থানটী নির্জন, এইরূপ স্থলেই উপপতির সহিত মিলন বাঞ্ছনীয় । অথবা—এইস্থানে পূর্বেই নায়কের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু যেন্দ্রপ নিশ্চিন্ত-চিত্তে বকটী বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে নায়িকা অনুমান করিয়া লইল, যে নায়ক সেখানে আসে নাই । এই কথাই প্রকারান্তরে জানান হইতেছে ।

কাব্য প্রকাশকার মন্ত্যের মতে “তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলকৃতিঃ পুনঃ কাপি ।” দোষবর্জিত, গুণযুক্ত, অলঙ্কারযুক্ত শব্দ এবং অর্থই কাব্য ।

মন্ত্যের কাব্যলক্ষণ । কোথায়ও কোথায়ও অলঙ্কার না থাকিলেও কৃতি নাই ।

মন্ত্যটও রসের বা ধ্বনির উল্লেখ লক্ষণের মধ্যে করেন নাই । কিন্তু তিনি যে ধ্বনির সঙ্গ কাব্যের প্রাধান্য হিসাবে আবশ্যিক এ কথা স্বীকার করিয়াছেন । যে কাব্যে প্রতীয়মান অর্থই প্রধান, তিনি তাহাকেই উত্তম কাব্য বলেন * । গোবিন্দঠাকুর মন্ত্যের লক্ষণের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নির্দোষত্বাদি বিশেষণ বিশিষ্টৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্ ইতি ব্যবহর্তব্যৌ । * * * * যৎ সর্বত্র

গোবিন্দঠাকুরের ব্যাখ্যা । সালঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্, কচিৎ ক্ষুটালঙ্কারবিরহেহপি ন কাব্যত্বহানিঃ । নঞোহল্লার্থকত্বাৎ । অল্পদস্ত চাত্র অক্ষুটত্ব এব বিশ্রামাৎ । নীরসেহপি অক্ষুটালঙ্কার কাব্যত্বমিষ্টমেব ইতি ঋজুঃ পস্তাঃ । বয়ং তু পশ্চামঃ ।

নীরসে ক্ষুটালঙ্কারবিরহিণি ন কাব্যত্বম্ । যতো রসাদিরলঙ্কারশ্চ দ্বয়ং চমৎকার হেতুঃ । তথা চ ন যত্র রসাদীনামস্থানং তত্র ক্ষুটালঙ্কারাপেক্ষা । অতএব ধ্বনিকারেণোক্তম্—অতএব রসানু-গুণার্থ বিশেষ নিবন্ধনম্ অলঙ্কারবিরহেহপি ছায়াতিশয়ং পুঙ্খাতি ।”

নির্দোষত্ব প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট শব্দ ও অর্থই কাব্য । * * * .

‘যাহাই অলঙ্কার বিশিষ্ট তাহাই কাব্য, কোনও কোনও স্থলে অলঙ্কার পরিস্ফুট

* “ইদমুত্তমমতিশায়িনি ব্যাস্যে বাচ্যাদ্ধ্বনিবুধৈঃ কথিতঃ ।”

না থাকিলেও কাব্যের হানি হয় না। কারণ ‘অনলক্ষণী’ এই শব্দে নঞ-
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনলক্ষণের অর্থ এখানে অক্ষুণ্ণ, স্তূতরাং যাহা নীরস
তাহাতেও অলঙ্কার পরিস্ফুট না হইলেও তাহা কাব্য’—এই মত সরল বটে, কিন্তু
আমরা এ মতের সমর্থন করি না। আমাদের মতে, যাহা নীরস এবং যাহাতে
অলঙ্কার পরিস্ফুট নহে তাহা কাব্য নহে, যেহেতু, রসাদি ও অলঙ্কার এই দুইটাই
চমৎকারের হেতু। স্তূতরাং যেখানে রসাদি আছে, সেখানে স্ফুটালঙ্কার না
থাকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যেখানে রসাদি নাই, সেখানে অলঙ্কার পরিস্ফুট
হওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই ধ্বনিকার বলিয়াছেন “অলঙ্কার না থাকিলেও,
যদি অর্থ রসের পক্ষে অনুকূল হয় তাহা হইলেই উহা কাব্যের শোভাবৃদ্ধি করিয়া
থাকে। গোবিন্দঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুসারে ধরিতে গেলে, মন্মটের মতে ছই
প্রকার কাব্য হইতে পারে। এক, যেখানে রসের প্রাচুর্য আছে এবং
দ্বিতীয়তঃ যেখানে রস নাই কিন্তু অলঙ্কার আছে। রস থাকিলে, অলঙ্কার
পরিস্ফুট থাকুক বা না থাকুক তাহাতে আসে যায় না। আর অলঙ্কার পরিস্ফুট
থাকিলে রসের আবশ্যিকতা নাই। তবে যেখানে রস আছে তাহাই উত্তম, রস-
বিহীন অলঙ্কারযুক্ত কাব্য কাব্য হইলেও, উত্তম নহে।

• চন্দ্রালোককার জয়দেবের মতে, মন্মটের লক্ষণ উপাদেয় নহে। তিনি

জয়দেবের মত । স্ফুটালঙ্কারের পক্ষপাতী, তিনি বুঝিতে পারেন ন, অলঙ্কার

না থাকিলেও কাব্য হইতে পারে। তাই তিনি বলেন—

“অঙ্গীকরোতি যঃ কাব্যম্ শব্দার্থাবনলক্ষণী ।

অসৌ ন মন্ততে কশ্যদনুক্ষমনলং কৃতী ॥”

(চন্দ্রালোক ১৮)

যিনি অলঙ্কারবিহীন শব্দার্থকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, তিনি কেন
উত্তাপবিহীন অগ্নির কল্পনা করিতে পারেন না? তাহার নিজের কাব্যলক্ষণে
তিনি কিছুই বাদ দেন নাই।

নির্দোষা লক্ষণবতী স্রীতিগুণভূষিতা ।

সালঙ্কারসানেকবৃত্তির্বা ক কাব্যনামভাক ॥

দোষবর্জিত, উৎকর্ষযুক্ত, রীতিসম্বিত, গুণভূষিত অলঙ্কার রস, ও বহুবিধ
বৃত্তিবিশিষ্ট যে বাক্য তাহার নাম কাব্য।

ইহার কাব্যলক্ষণ দেখিলে মনে হয় যে ইনি কাহাকেও অসম্বষ্ট করিতে চাহেন
না, ইনি একাধারে সকল বস্তুই লক্ষণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু
ইহার ফল হইয়াছে এই যে ইহার মতে অনেক কাব্য অকাব্যে পরিণত হয়।

একাবলীকার বিজ্ঞাধর মন্মটপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া ধ্বনিকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । “শকার্থে বপুস্তত্র বিবুধৈরাভ্যাত্মাভ্যায়ি ধ্বনিঃ”

শব্দ এবং অর্থই কাব্যের শরীর এবং পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বিজ্ঞাধরের মত ।

ধ্বনিই তাহার আত্মা । অভিনব গুপ্তের মত তিনিও বলেন “শকার্থবপুস্তাবৎ কাব্যম্ । বপুষি চ কেনাপি আত্মনা ভবিতব্যম্ । আত্মা চ ধ্বনিরেব” কাব্যের শরীর শব্দ ও অর্থ । দেহ থাকিলেই একটা আত্মা থাকিতে হইবে । ধ্বনিই আত্মা ।”

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উপরে লিখিত অনেক লক্ষণেরই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি বলেন—একজন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন

বিশ্বনাথের মত । “তদদোষৌ শকার্থে সগুণাবনলংকৃতীপুনঃ কাপি” । এই লক্ষণ বিচারসহ নহে । কারণ যদি দোষবর্জিতই কাব্য হয়, তাহা হইলে—

স্তকারো হয়মেব মে বদরয়স্ত্রাপ্যসৌ তাপসঃ ।

সোংপাট্রেব নিহস্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো স্বাবণঃ ॥

ধিক্ ধিক্ শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুস্তকর্ণেন বা ।

শ্বর্গগ্রামটিকাবিনুষ্ঠনবৃথোচ্ছ নৈঃ কিমেতিভূ জৈঃ ॥

এই শ্লোকটী বিধেয়াবিমর্শ দোষে দৃষ্ট বলিয়া কি কাব্য সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে না ? প্রত্যুত, ধ্বনিযুক্ত বলিয়া এই শ্লোককে উত্তম কাব্য বলিয়া মন্মটও স্বীকার করেন । সুতরাং মন্মটের কাব্যলক্ষণ অব্যাপ্তিদোষদৃষ্ট । যদি বলা হয় এই শ্লোকটীর একটা অংশ মাত্র দৃষ্ট, সমস্তটা তাহার দৃষ্ট নহে—ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে অংশে দোষ তাহা অকাব্যত্বের হেতু, এবং যে অংশ নির্দোষ তাহা কাব্যত্বের কারণ—এইরূপ দুই টানের মধ্যে পড়িয়া এই শ্লোক কাব্য বা অকাব্য কিছুই হইবে না । আর শ্রুতিদৃষ্ট প্রভৃতি দোষগুলি সমস্ত কাব্যকেই দূষিত করে, কোনও অংশ বিশেষকে নহে । তাহারা কাব্যের আত্মস্বরূপ রসের অপকর্ষসাধন করে বলিয়াই তাহারা দোষ ।

আর তা ছাড়া, দোষবর্জিতকেই যদি কাব্য বলা হয়, তাহা হইলে জগতে কাব্য বলিয়া পদার্থ খুব কমই মিলিবে, হয়ত একেবারেই মিলিবে না । কারণ একেবারে নির্দোষবস্তু পাওয়া যায় না ।

যদি বলা যায় ‘অদোষ’ শব্দের অর্থ ‘ঈষদ্দোষবিশিষ্ট’ অর্থাৎ নঞের প্রয়োগ ত পাওয়া যায় । ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন “তাহা হইলে অল্পদোষবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থ তোমার মতে কাব্য, যাহা একেবারে দোষবর্জিত”

তাহা কাব্য নহে” । যদি বল ‘দোষ যদি একান্তই থাকে, তাহা হইলে সে দোষ অল্প হওয়া চাই’ তাহা হইলে কাব্যের লক্ষণে কি সে কথার উল্লেখ উচিত ? রত্নের লক্ষণে কীটবিদ্ধ বলাও যেমন অপ্রাসঙ্গিক, এখানেও সেইরূপ । কীটবিদ্ধতা যেমন রত্নের রত্নত্বকে নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ক্ষতিহুঁষ্ট প্রভৃতি দোষগুলিও কাব্যের কাব্যত্ব হানি করিতে পারে না ।

তারপর কাব্যলক্ষণে ‘সগুণ’ এই বিশেষণটীও ঠিক নহে । ‘গুণ শুধু রসের ধর্ম’ একথা মন্যটও স্বীকার করেন, কারণ তিনি গুণের লক্ষণে বলিয়াছেন যে “রসশ্রাঙ্গিনো ধর্ম্যাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ” । আত্মার যেমন ধর্ম শৌর্য্য প্রভৃতি সেইরূপ যেগুলি কাব্যাত্মস্বরূপ রসের ধর্ম তাহাই গুণ । রসের অভিব্যঞ্জক বলিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে এখানে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিলেও ‘সগুণ’ এই বিশেষণের কোনও মূল্য নাই । তোমরা যাহাকে কাব্য বল তাহাতে রস আছে কি না ? যদি বল নাই, তাহা হইলে গুণও নাই, কারণ গুণ রসেরই ধর্ম । যদি বল আছে, তাহা হইলে ‘সগুণো’ না বলিয়া “রসবন্তো” বল না কেন ? “প্রাণিমান্ দেশঃ”, এই কথা না বলিয়া কি তোমরা “শৌর্যাদিমান্ দেশঃ” বলিয়া থাক ? তাহা যদি না বল, তাহা হইলে সরসৌ না বলিয়া সগুণো বল কেন ? এইরূপে “অনলংকৃতা” বিশেষণটীও অনর্থক । কারণ অলঙ্কার কাব্যত্বের হেতু নহে, কাব্যের উৎকর্ষমাত্রের বিধান করিয়া থাকে ।

বক্রোক্তিজীবিতকার যে ‘বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্’ ‘বক্রোক্তিই কাব্যের জীবন’ এই কথা বলিয়াছেন, তাহাও উপরে যাহা উক্ত হইল বক্রোক্তিজীবিতকারের মতের খণ্ডন । তাহার দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে কারণ বক্রোক্তি একটা অলঙ্কার মাত্র ।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণকার ভোজরাজ কাব্যের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—

ভোজরাজের মত ও
তাহার খণ্ডন ।

“অদোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্ ।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্ত্তিঃপ্রীতিকং বিন্দতি” ॥

দোষবর্জিত, গুণযুক্ত, অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং রসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়া কবি কীর্ত্তি এবং আনন্দ লাভ করেন । উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা এই মতও খণ্ডিত হইয়াছে ।

ধ্বনিকার যে বলিয়াছেন “কাব্যশ্রাঙ্গাধ্বনিঃ” কাব্যের আত্মা ধ্বনি, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি এবং রসাদিধ্বনি এই ত্রিবিধ ধ্বনিই কি

ধর্মিকারের মত
খণ্ডন ।

কাব্যের আত্মা না কেবল মাত্র রসাদিধ্বনি ? প্রথমটী হইতে পারে না, কারণ প্রহেলিকা (হেঁয়ালী) ও তাহা হইলে কাব্য হইয়া যায়, সুতরাং এই মত অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট । দ্বিতীয়টীই যদি অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমারও আপত্তি নাই ।

অতএব “বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্”, রসাত্মক বাক্যই কাব্য । বেদাদিশাস্ত্রে বিমুখ রাজপুত্র প্রভৃতিকে সুস্বাদু করিয়া উপদেশ দেওয়াই কাব্যের উদ্দেশ্য প্রাচীনেরাও একথা স্বীকার করেন । আশ্বেয় পুরাণও বিননাথের মত ও তাহার সমর্থন । বলেন, “বাগ্বেদশাস্ত্রপ্রধানেনপি রস এবাত্র জীবিতম্” বাক্য-

বৈচিত্র্যপ্রধান কাব্যের রসই জীবন । ব্যক্তিবিবেককার মহিমভট্টও বলিয়াছেন “কাব্যশাস্ত্রানি সঙ্গিনি রসাদিরূপে ন কশ্চিদ্ধিমতিঃ ।” অবশ্য স্থায়ী রস প্রভৃতিই যে কাব্যের আত্মা সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই । রসযুক্ত প্রবন্ধের মধ্যবর্তী নীরস পদগুলিকেও প্রবন্ধরসের খাতিরেই সরস বলা হয় । সুতরাং যাহাতে রসের সঙ্গ নাই তাহার কাব্য নাম গৌণ ।

“রীতিরাত্মা কাব্যশ্চ” রীতিই কাব্যের আত্মা বামনের এই কাব্যলক্ষণ ঠিক নহে, কারণ রীতি বর্ণ সন্নিবেশের কোশল ব্যতীত আর কিছুই নহে । সুতরাং রীতি কাব্যের শারীরিক ব্যাপার, আত্মসম্বন্ধীয় নহে, কারণ বামনের মত খণ্ডন ।

আত্মা ও শরীর এক নহে ।”

কিন্তু “পণ্ডিরাঙ্গ জগন্নাথ বিশ্বনাথের উক্ত লক্ষণকেও ছুঁই বলিয়াছেন । তাহার নিজের কাব্যলক্ষণ এই “রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্” । যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক তাহাই কাব্য । ‘রমণীয়তা’ শব্দের পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মত । অর্থ “লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা” অর্থাৎ যে অর্থের

জ্ঞান হইলে মনে অলৌকিক আনন্দের উদয় হয় তাহাই রমণীয় অর্থ । যে শব্দসমষ্টি এইরূপ অর্থের বোধ জন্মায় তাহাই কাব্য । ‘অলৌকিক’ আনন্দ বলা হইতেছে তাহার কারণ “তোমার পুত্র হইয়াছে”, “তোমাকে টাকা দিব”, এই সমস্ত শব্দের অর্থ বুঝিবামাত্রই মনে আনন্দের উদয় হয় বটে, কিন্তু সে আনন্দ লৌকিক, অলৌকিক নহে । সুতরাং এ শব্দগুলি কাব্য নহে ।

প্রাচীনেরা যে বলেন “অদোষো সগুণো সালঙ্কারো শব্দার্থো কাব্যম্” তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিতে হইবে, শব্দ ও অর্থ উভয়ই কাব্যশব্দ বাচ্য হইতে পারে না । প্রমাণ নাই । “উচ্চৈঃশ্বরে কাব্য পাঠ করা হইতেছে” “কাব্যের অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে” “কাব্য তুলিলাম বটে কিন্তু অর্থবোধ হইল না”—সকলেই ত এইরূপ

জগন্নাথকর্তৃক মন্তব্যের
মত খণ্ডন ।

বলিয়া থাকেন। এই সকল স্থলে ‘কাব্য’ শব্দের দ্বারা শব্দবিশেষই ত বুঝায়। যদি বল সে সকলস্থলে ‘কাব্য’ শব্দের ব্যবহার গৌণ, অবশ্য তাহা মানিতে পারিতাম যদি শব্দ এবং অর্থ উভয়ে মিলিয়া কাব্য হয়, এ সম্বন্ধে কোনও দৃঢ়তর প্রমাণ থাকিত। কিন্তু তাহা ত নাই। বিপক্ষের মত শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। সূতরাং শব্দ ও অর্থ উভয়ই বুঝাইবার শক্তি ‘কাব্য’ শব্দের আছে; এ সম্বন্ধে যখন প্রমাণ নাই, তখন আমি যে লৌকিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি “উচ্চৈঃস্বরে কাব্য পাঠ করা হইতেছে” ইত্যাদি, তাহার বলে “কাব্য” বলিতে শুধু শব্দই বুঝায় ইহা সিদ্ধ হইতেছে, কে ইহা নিবারণ করিতে পারে? সূতরাং শব্দই যখন শুধু কাব্য নাম পায় তখন সেইরূপ লক্ষণই করা উচিত। ‘কোন্ শব্দকে কাব্য বুলিব?’ এই প্রশ্ন হইলে, তখন বলিতে হইবে “যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক তাহাই কাব্য।”

সাহিত্যদর্পণে যে নির্ণীত হইয়াছে “রসযুক্ত বাক্যই কাব্য”, তাহা ঠিক নহে। বস্তুপ্রধান ও অলঙ্কারপ্রধান কাব্যগুলি তাহা হইলে অকাব্য হইয়া যায়। যদি

বল আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, তাহা হইলে মহা-
বিখনাথের মতখণ্ডন।

কবিসম্প্রদায়ের মুণ্ডপাত করা হয়। তাঁহারা জলপ্রবাহ, নিপতন, উৎপতন, শিশুক্রীড়া, বানরের ক্রীড়া এই সকল বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন—সেগুলি অকাব্যে পরিণত হয়। যদি বল এ বর্ণনা গুলিতেও কোনরূপ রসস্পর্শ আছে, সেরূপ রসস্পর্শ ‘গোকু যাইতেছে’, ‘হরিণ ছুটিতেছে’ এই সকল বাক্যেও আছে। সেরূপ রসস্পর্শ কাব্যত্বের প্রয়োজক হইতে পারে না।

কিন্তু এত মতখণ্ডন করিয়াও কি জগন্নাথ প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন? কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়—তাহা কি তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন?

তিনি বলেন যে শব্দের অর্থ বুঝিবামাত্র মনে অলৌকিক
জগন্নাথের মতখণ্ডন।

আনন্দের উদয় হয় তাহাই কাব্য। কাব্য পড়িয়া যে মনে অলৌকিক আনন্দের উদয় হয় তাহা সকলেই বলিতে পারে, কিন্তু সে আনন্দটা কাব্যের কোন্ বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ত জগন্নাথ বলিলেন না। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন কই?

উপর্যুক্ত সকল মতের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিখনাথের লক্ষণই শ্রেষ্ঠ। রস না থাকিলে কাব্য হয় না, এ অতি উত্তম কথা। জগন্নাথ পণ্ডিত

এ লক্ষণের উপরে অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। “গোকু
যাইতেছে” “হরিণ ছুটিতেছে”—এই সকল বাক্যে রসের
সম্পর্কও নাই। কিন্তু মহাকবিগণের হস্তে পড়িলে এই
উৎকর্ষ।

বাক্যগুলি এরূপ ভাবে রূপান্তরিত হইবে, যে তাহাকে সরস বলিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রথম অঙ্কে কুম্ভসারের পলায়ন বিরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখুন—

“গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্তম্ভনে দত্তদৃষ্টিঃ ।

পশ্চাৎকেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়মা পূর্বকায়ম্ ॥

দর্ভৈরন্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখত্রংশিভিঃ কীর্ণবস্মা ।।

পশ্চোদগ্রমু তত্বাঘ্রিয়তি বহতরং স্তোকমূর্ক্যাং প্রযাতি ॥”

এরূপ বর্ণনায় রসের অভাব আছে, একথা জগন্নাথ পণ্ডিত বলিলেও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। মস্মটভট্ট এই শ্লোকটাই ভয়ানক রসের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কিন্তু এ প্রবন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা অভিপ্রেত নয়। আমি কতকগুলি মতের উল্লেখ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করিবেন।

ভিন্ন ফুলের রেণু ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

ফুলের ভিতর লুতাতস্তুর মত কেশর থাকে ; যে কোন ফুল ছিড়িলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কেশর দুই প্রকার তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। কতকগুলির উপরের স্থল অংশে হাত দিলে চট্চটে আঠার মত পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। আর কতকগুলি কেশর স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে ধুলার মত রেণু লাগে। শেষোক্ত কেশরগুলি পুংকেশর। আর চট্চটে আঠা সংযুক্ত কেশর গুলি স্ত্রীকেশর। পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরের চট্চটে রেণু-ধারণকে (stigma) লাগিলে বীজ উৎপন্ন হয়।

অনেক ফুলের মধ্যে উভয়বিধ কেশর থাকে। মাঝের স্ত্রীকেশরটিকে ঘিরিয়া চারিদিকে চারি পাঁচটি বা ততোধিক পুংকেশর থাকে—সকলেরই দেহ সূক্ষ্ম মাথার উপর একটি পুঁটুলির ভিতর রেণু। আবার এক এক ফুলে কেবল স্ত্রীকেশর থাকে, এক এক ফুলে কেবল পুংকেশর থাকে। কুমড়া লতায় স্ত্রী ও পুংকেশর ভিন্ন ভিন্ন ফুলে। যেগুলি স্ত্রীপুষ্প, তাহাদের ঠিক পুষ্পদলের

নিম্নেই একটু গোল স্ফীতি থাকে। রেণু সংযুক্ত হইলে সেই স্ফীত অংশই কুম্ভাণ্ড-ফলে পরিণত হয়। কুম্ভাণ্ডার পুরুষপুষ্প গুলা আমরা ভাজিয়া খাই। আবার এক জাতীয় বৃক্ষ আছে যাহাদের এক গাছে কেবল পুরুষ-পুষ্প জন্মে আর একেবারে ভিন্নগাছে স্ত্রীপুষ্প উৎপন্ন হয়। সুতরাং

(ক) এক শ্রেণীর গাছে একই ফুলে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর উৎপন্ন হয়

(খ) এক শ্রেণীর একই গাছে বিভিন্ন পুষ্পে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর দেখিতে পাই। এবং

(গ) এক শ্রেণীর বৃক্ষে বিভিন্ন গাছে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর জন্মে ।

উদ্ভিদবিজ্ঞান নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, যে, একই ফুলের পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরের রেণু-ধারকে পড়িয়া ফুলের গর্ভ-সঞ্চারণ হইলে ফল ভাল হয় না। ভিন্ন ফুলের রেণু পড়িলে তবে ফল উৎকৃষ্ট হয়। মানুষ এ নিয়ম আবিষ্কার করিবার বহু পূর্বে প্রকৃতি এইরূপ ভিন্ন ফুলের পরাগের দ্বারা বৃক্ষের ফল উৎপাদন করিবার নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি এ প্রবন্ধে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলিব।

এই ভিন্ন ফুলের রেণুর দ্বারা কুম্ভাণ্ডের গর্ভাধানের ব্যবস্থা প্রকৃতি দুই প্রকারে করিয়াছেন। প্রথমতঃ ফুলের শারীরিক (physiology) কার্যের দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ ফুলের অঙ্গ-গঠনের (structure) দ্বারা।

প্রথম শ্রেণীর ফুলের এমন কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষত্ব নাই। ইহাদের রেণু-ধারকের আঠার উপর সেই পুষ্পের পুংকেশরের রেণু পড়িতে পারে বটে কিন্তু ইহাদের স্ত্রীকেশরের এমন একটা নির্বাচন-শক্তি আছে যে তাহাদের ক্ষেত্রে নিজের ফুলের রেণু পড়িলে তাহা ব্যর্থ হয়। এই সকল গর্ভকেশরে সেই ফুলের রেণুর সহিত ভিন্ন ফুলের রেণু পড়িলে ইহাদের এই শক্তির দ্বারা কেবল ভিন্ন ফুলের রেণুর দ্বারাই ইহাদের গর্ভাধান হয়। ইংরাজ উদ্ভিদবিজ্ঞান এই শক্তিকে prepotency বলে। বলা বাহুল্য, স্ত্রীপুষ্পের এই শক্তি বড়ই অদ্ভুত।

কতকগুলি ফুলের self-sterility বা “আত্ম-বন্ধ্যা” দোষ বা গুণ আছে। ইহাদের উপর নিজের ফুলের রেণু পড়িলে কিছুতেই ইহাদের ফল ফলে না। আবার, এই শ্রেণীর কতকগুলি ফুলের পক্ষে নিজের পরাগ একেবারে বিষ। একই ফুলের রেণু পড়িলে ইহাদের গর্ভ-কেশর একেবারে জলিয়া যায়। এই ত গেল দেহের শক্তির দ্বারা ভিন্ন ফুলের রেণুকর্তৃক গর্ভাধানের নিয়ম।

দেহের গঠনের দ্বারাও প্রকৃতি বিভিন্ন ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ কেশরের

সংযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের প্রথম নিয়মের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কোন কোন বৃক্ষে স্ত্রীজাতীয় কেশর এক ফুলে জন্মিয়া থাকে, পুরুষ কেশর ভিন্ন ফুলে দেখা যায়।

দ্বিতীয় নিয়মটি বড় সুন্দর। যে বৃক্ষে স্ত্রী ও পুংকেশর একই ফুলে জন্মিয়া থাকে, সে সকল ফুলে ঐ দুই প্রকার কেশরের পরিণতি বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে। কুম্বুমের এই আকৃতির বিশেষত্বকে dichogamy বলে। যৌবনকাল উপস্থিত না হইলে উৎপাদন-শক্তি জন্মে না, এ বিধি জীব-জগতে সাধারণ। এই শ্রেণীর পুষ্পে কোন স্থলে পুরুষ-কেশর গুলি যখন যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের রেণুর যখন গর্ভসঞ্চারণ করিবার শক্তি জন্মে, তখন সেই ফুলেরই কেশরস্ত্রী কিশোরী মাত্র। সুতরাং সে রেণু তাহার গাত্রস্পর্শ করিলেও সাড়া পায় না, নষ্ট হইয়া যায়। সেই সময় অল্প ফুলের স্ত্রীকেশর যৌবনত্ব লাভ করে। তাহাদের চট্চটে রেণু-ধারক (stigma) ফুলের রেণু ধরিয়া লয়, তাহাদের ফল ফলে। তাহার পর এই পুরুষকেশরের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, ইহাদের রেণুকোষ নিঃশেষ হইলে, তবে স্ত্রীকেশরের পরিণতি হয়। তখন অপর ফুলের রেণু আসিয়া তাহার গর্ভে ফল উৎপাদন করে। পুংকেশরের পূর্বে যৌবনলাভের ব্যবস্থাকে ইংরাজি বিজ্ঞান protandry বা “পূর্বসামীপ্য” বলে। কোন কোন ফুলে আবার স্ত্রীকেশরের যৌবন-লাভ পূর্বে ঘটে। অপর ফুলের রেণু লইয়া ইহাদের গর্ভ কেশরে ফলের ভ্রূণ জন্মিলে তবে ইহাদের নিজের কেশরের রেণু-কোষের পরিণতি হয়। স্ত্রীকেশরের প্রথম যৌবনলাভের ইংরাজি নাম proterogyny.

একই ফুলের রেণুর দ্বারা গর্ভাধান নিবারণ করিবার জন্ত প্রকৃতি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা জবা প্রভৃতি পুষ্পে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ফুলের চুম্বির ভিতর স্ত্রীকেশর ও পুংকেশর এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট যে রেণু স্ত্রীকেশরের আঠার উপর পড়িতে পারে না। জবাবুলের সকল কেশর মিলিয়া একটি নলের আকার ধারণ করিয়াছে। নলের উপরের ক্ষীত অংশে স্পর্শ করিলে সেগুলিতে আঠা আছে বৃদ্ধিতে পারা যায়। মোমাছি অপর ফুলের রেণু আনিয়া অগ্রে এই গুলিকে ছুঁইয়া তবে নীচের স্তরের রেণুকোষে পহুঁছিতে পারে। তখন ইহার নিজের রেণু লইয়া আনিলে আর তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে না।

কাঠগোলাপ (primrose) প্রভৃতি ফুলে বিভিন্ন ফুলের রেণু পাইবার এক বিশিষ্ট উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর গাছে দুই প্রকার ফুল ফোটে। এই শ্রেণীর ফুলে পাঁচটি করিয়া পুংকেশর থাকে। ইহাদের এক

একটি ফুলের স্ত্রীকেশর লম্বা পুংকেশর পাঁচটি খর্ব একেবারে ফুলের ভিতর সংগ্ৰস্ত। আর এক একটি ফুলের পুংকেশর পাঁচটি লম্বা, স্ত্রীকেশর ছোট, পুষ্পচুম্বির ভিতর অবস্থিত। বলা বাহুল্য, ইহাদের আকৃতির এই বিশেষত্ব সহজেই অনুমেয়। অলি খর্ব পুংকেশর যুক্ত ফুলের ভিতর মধু আহরণ করিবার সময় অঙ্গে ফুলের রেণু মাখে তাহার পর লম্বা স্ত্রী-কেশর যুক্ত ফুলে ভ্রমণ করিবার সময় অগ্রে সেই রেণু স্ত্রীকেশরে লাগাইয়া তবে ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

অনেক পরগাছায় (orchids) রেণুকোষের এক প্রকার বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহাদের পুষ্পের যে অংশে অলি আসিয়া বসে সে অংশটি চট্চটে স্ত্রী-কেশর। ইহার উপরে মুণ্ডরের মত উচ্চ অংশের ভিতর পুঁটুলি বাধা রেণু থাকে। ফুলের স্ত্রীকেশরের উপর অলি বসিয়া ঐ মুণ্ডরের মত অংশের নীচে মধু খুঁজিবার সময় সেই পুঁটুলি ফাটিয়া যায় এবং ষট্পদের শিরে রেণু লাগিয়া যায়। সেই ফুলের উপর আর রেণু পড়িতে পারে না। পরে যখন সেই অলি অগ্র ফুলে যায় তখন সেই রেণুগুলা তাহার ললাট হইতে সেই ফুলের রেণু-ধারকে লাগিয়া যায় এবং সেই কুম্বের গর্ভ হয়।

অবশ্য অনেক ফুলে নিজের রেণুর দ্বারা ফল উৎপাদিত হয়। কিন্তু সে শ্রেণীর পুষ্প অল্প।

চিত্রকর ।

[শ্রীঅবনীকুমার দেব ।]

(১)

শুদ্ধ সওদাগর মলহর রাওয়ের পালিত পুত্র চিত্রগোপাল শৈশব হইতেই চিত্রাঙ্কনে মন দিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই ছয় ঋতু, গিরিপথ, কৌমুদী-দীপ্ত নিরঞ্জনী, শম্পুসমাচ্ছন্ন উপত্যকা প্রভৃতির নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ক্রমেই সে দক্ষতালাভ করিতেছিল। সে মধ্যে মধ্যে ছই একটি মনুষ্য-মূর্তিও তুলিকায় প্রতিফলিত করিয়াছে। তাহার নিবিড় চিত্রশালাটি কেবল তাহারই অঙ্কিত আলেখ্যে পূর্ণ।

রাজ্যের অধিপতি মহারাজ বিজয়সিংহও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার বিখ্যাত চিত্রাগারটি যথার্থই তাঁহার অপারিসীম শিল্পানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। তদ্ব্যতীত চিত্রবিদ্যায় সম্যক্ অনুশীলনের জন্ত তিনি সেই বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী অজিতবর্মা'কে তাঁহার পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্ত প্রাসাদতুল্য বাসভবন দিয়াছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী বৃদ্ধ অজিতবর্মা'কে স্বয়ং মহারাজা এবং রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিত। মহারাজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-নিদর্শনে মনবৃত্তিকে অধিকতর পরিষ্কৃত করিবার জন্ত প্রায়ই এই বৃদ্ধ শিল্পীর সহিত একত্র অশ্বপৃষ্ঠে রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন।

(২)

দ্বিপ্রহরের পর আপনার চিত্রশালায় বসিয়া চিত্রগোপাল অতি ধীরে ধীরে একখণ্ড খড়িমাটির সাহায্যে সম্মুখস্থ একটা বিরাট মন্ডল প্রস্তরখণ্ডের উপরে নির্জ্বল বালুকাতটে একটি পত্রবিহীন শুষ্ক তরু অঙ্কিত করিতেছিল। তাহার সমস্ত চিন্তা ও একাগ্রতা ঐ শুষ্ক তরুটির প্রতি অভিনিবিষ্ট।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। স্নিগ্ধ মলয়ানীল বসন্তের স্নগন্ধ পশরা লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করিতেছে। এক একবার চিত্রগোপালের শিল্পশালায় খোলা জানালা দিয়া চোঁরের মত আনাগোনা করিতেছিল। দূরে পশ্চিমাকাশ হইতে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা শুষ্ক তরুর পাদদেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সহসা উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে অশ্বপদ শব্দ শুনিয়া চিত্র ফিরিয়া চাহিল।

বৃদ্ধ অশ্বারোহী বলিলেন “বালক ! তুমি ছবি আঁকিতে পার ?” তাঁহার দৃষ্টি ঐ অঙ্কিত শুষ্ক তরুটির প্রতি সংরুদ্ধ।

চিত্র কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না,—শুধু ওঁ আপনার স্কন্ধদেশে কণ্ঠ যন করিতে লাগিল।

অশ্বারোহী পুনরায় বলিলেন “বালক ! তুমি রাজপ্রাসাদে যাইও। অজিত-বর্মা স্বয়ং তোমাকে শিল্পশিক্ষা দিবেন। তাঁহার একজন শিষ্যের প্রয়োজন আছে।” এই বলিয়া অপরিচিত অশ্বারোহী অশ্বব্রজা ধারণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। “ ”

(৩)

চতুর্দশবর্ষীয়া ছবি মলহর রাওয়ের একমাত্র কন্যা। ছবি, চিত্রের বাগদত্তা পত্নী। যুবক শিল্পী মলহর রাওয়ের একমাত্র কন্যা। ছবি, চিত্রের বাগদত্তা পত্নী। যুবক শিল্পী মলহর রাওয়ের একমাত্র কন্যা। ছবি, চিত্রের বাগদত্তা পত্নী।

তখন তাহার পার্শ্বে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে। যুবক তুলিকা-ধারণপূর্বক অতি সন্তুর্পণে রঙ্গের উপর রঙ্গ ফলাইয়া যায় আর তরুণী সতৃষ্ণ নয়নে ঐ করাঙ্গুলির প্রতি চাহিয়া থাকে।

অশ্বারোহী চলিয়া যাইবার পর চিত্র আপন মনে ভাবিতে লাগিল। সে একটা ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া শুষ্ক তরুটি আঁকিতেছিল, এমন সময় সহসা অপরিচিত অশ্বারোহী আসিয়া তাহার কানে কানে কি সম্মোহন-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—তাহার শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হইয়া উঠিল! চিত্র ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিল!

ছবি আসিয়া চিত্রের পার্শ্বে উপবেশন করিল। চিত্র, ছবির নিকট কোন কথা গোপন করে না,—অশ্বারোহীর সকল কথা তাহার নিকট বলিল।

তিন মাস পরে তাহাদের বিবাহ হইবার কথা, কিন্তু ছবি ভাবিল, চিত্র রাজ-প্রাসাদের বিখ্যাত শিল্পী অজিতবর্মার নিকট শিল্প-শিক্ষা করিতে যাইবে, এ কত বড় কথা! কত উচ্চ সম্মান! কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! চিত্রের উচ্চমর্যাদা—এ যে তাহার! সে যে তাহারই!

ছবি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল “তবে তুমি নিশ্চয়ই একজন খুব বড় শিল্পী হইবে—না?”

চিত্র বলিল “হঁা—যদি অপরিচিত অশ্বারোহীর কথা সত্য হয়। কিন্তু—”

“আবার কিন্তু কি?”

কম্পিত কণ্ঠে চিত্র বলিল “ছবি! যদি আমরা উভয়েই যাইতে পারিতাম!”

তখন চক্রবাল নিয়ে শেষ সূর্য্যরেখা মিলাইয়া যাইতেছিল, শুধু একটি মাত্র অক্ষুট কিরণ-রেখা চিত্রের বাষ্পাকুললোচনে আসিয়া প্রতিফলিত হইল। ছবি, চিত্রের হস্ত ছুটি আপন করতলে আনিয়া তাহার উভয় চক্ষুর উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া উত্তর করিল “কেন?—সামান্য কয়েকটা বৎসর বই ত নয়? আমি তোমার প্রত্যাবর্তনে আশায় বসিয়া থাকিব আর প্রতিদিন একমনে পরমেশ্বরের নিকট তোমারই মঙ্গল-প্রার্থনা করিব। আমার প্রার্থনায় নিশ্চয়ই তুমি সফল হ'বে।”

(৪)

প্রাসাদতল প্রকাণ্ড ভবনের এক নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রসিদ্ধ শিল্পী অজিতবর্মা বসিয়া আছেন। গৃহের চতুর্পার্শ্ব হইতে কেবল নানাবিধ শিল্পসরঞ্জাম তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া আছে। কোণে একদান অক্ষয়-শিল্প-কলা-প্রতিষ্ঠান একটি

অসম্পূর্ণ নগ্ন রমণীমূর্তি, কোথায়ও বা শুধু একখণ্ড চিত্রপট, বিবিধ শিল্পপ্রস্তুত, নানা প্রকার ধাতুপদার্থ সম্বন্ধে রক্ষিত। গৃহের চারিদিকে শুধু রং আর তুলিকা।

কতকগুলি চিত্র-হস্তে একটি বালক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি একে একে তাহার অঙ্কিত চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন “হাঁ, চিত্রগুলি বালকেরই উপযুক্ত বটে। তবে তুমি খুব চেষ্টা করে শিখলে ভবিষ্যতে ভাল রং ফলাতে পারবে।” এই বলিয়া তিনি চিত্রগুলি উপেক্ষার সহিত মেজের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিত্র তাঁহার এই অবজ্ঞায় অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথিত হইল।

তৎপরে শিল্পী নিকটস্থ একটি প্রস্তরখণ্ডকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন—“যাও, উহার উপর একটি মানুষের হাত এঁকে নিয়ে এস।”

একখণ্ড সূক্ষ্মাগ্রভাগ খড়িমাটি হাতে লইয়া চিত্র হস্তাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল। বৃদ্ধের ব্যবহারে সে মনে মনে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল।

শিল্পী একমনে বসিয়া আছেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে বালকের প্রতি মূঢ়হাস্য বর্ষণ করিতেছেন। চিত্রের নিকট তাহা বিক্রপাঙ্ক বোধ হইতেছিল। সে কেবলই বৃদ্ধের মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল। কার্যের প্রতি মন ও দৃষ্টি কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে কিছুক্ষণ পরে হস্তখানি অঙ্কিত করিয়া শিল্পীর সন্মুখে ধারণ করিল।

শিল্পী দেখিলেন হস্তখানির বহির্দৃশ্য মোটামুটি নিভুল কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাতে যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়।

অতঃপর গম্ভীর স্বরে শিল্পী বলিলেন “আমি তোমাকে একটি নরহস্ত অঙ্কিত করিতে বলিয়াছি। আমি তোমাকে বনমানুষ কিম্বা কুম্বীরের থাবা আঁকিতে বলি নাই।”

চিত্র বৃদ্ধের মর্মান্তিক শ্লেষে অধোবদনে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অজিতবর্ণা পুনরায় বলিলেন “যাও !—তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও এবং যে প্রকার ছোট ছোট ছবি আঁকিতে ছিলে তাই আঁকিতে থাক। যদি কখনও কোনদিন একটি হাত আঁকিতে পার, তবে পুনরায় আমার নিকট আসিও।”

বৃদ্ধের কথায় চিত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। অকৃত গর্য্য হইয়া সে কিরূপে গৃহে ফিরিয়া যাইবে? সে কি বলিয়া ছবির নিকট ও পনার অপযশ কলঙ্কিত মুখ দেখাইবে? ছবি বলিয়াছিল “তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে।”

তবে কি সে কৃতকার্য হইতে পারে? তাহা কখনও হইতে পারে

না—সে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে । হৃদয়ে শেষ আশার সঞ্চার করিয়া নির্ভীকচিত্তে চিত্র বলিল : “মহাশয় ! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একটীবার মাত্র চেষ্টা করিতে দিন ।”

অজিতবর্মা বলিলেন “আচ্ছা ! তাই হউক ।”

(৫)

চিত্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিল । কি প্রকার হস্ত অঙ্কিত করিবে মনে মনে কেবল তাহারই একটা ধারণা করিয়া লইতে লাগিল । সহসা তাহার ছবির কথা মনে উদ্ভিত হইল । হঠাৎ বিদায় দিনের ছবির সেই সুন্দর সুকোমল হস্ত তাহার মনে পড়িল । যেদিন চিত্রশালায় সেই শুষ্ক তরুটির নিম্নে বসিয়া তাহার হস্তখানি আপনার হস্তমধ্যে টানিয়া লইয়া সে বলিয়াছিল “তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে ।” কি মনোরম—কি কোমল—কি সুগঠিত সে হস্তখানি ! আপনা হইতেই সে ধীরে ধীরে আঁকিতে আরম্ভ করিল । তাহার হস্তের উপর ছবির হস্তটি যেরূপ ছিল সে স্মৃতি হইতে তাহা চিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিল । একটির পর একটি করিয়া অতি ধীরে ধীরে অতি সস্তর্পণে প্রত্যেক অঙ্গুলি শিরা-উপশিরা আঁকিতে আরম্ভ করিল । অতি নিবিষ্ট চিত্তে প্রতি রেখা রেখায় তাহার সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল । স্বচ্ছ নখের কোণে রক্তের গোলাপী আভাটুকু পরিষ্কৃত করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থির কোমল ভঙ্গিটুকু অবধি উৎসাহে দাগিয়াছিল । এবার আনন্দে অজিতবর্মার মুখশ্রী দীপ্তগরিমায় বিকশিত হইয়া উঠিল ! তিনি ঘাড় নীচু করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন । অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চিত্তে বালকের প্রত্যেক অঙ্গুলি-সঞ্চালন একাগ্রচিত্তে দেখিতে লাগিলেন । অবশেষে হস্তটি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইলে তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন “এই হস্তের অধিকারীকে অশেষ ধন্যবাদ !”

চিত্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ।

অজিতবর্মা পুনরায় বলিলেন “বালক আজ হইতে আমি তোমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম । কিন্তু মনে রাখিও যশের পথ অত্যন্ত কষ্টকাকীর্ণ । আমি তোমাকে যাহা বলিব তোমাকে চুপ করিয়া তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে । তারপর তোমার কার্য সম্পূর্ণ হইলে ঐ হস্তখানিকে গ্রহণ করিও—আমি তাহাতে কোনও আপত্তি করিব না । কেমন—বুঝিতে পারিয়াছ ?”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিত্র ধীরে ধীরে উত্তর করিল “আজ্ঞে হাঁ ।”

“না—শুধু ‘হাঁ’ বলিবেই যথেষ্ট ।”

পরিষ্কৃত করিতে হইলে বহুদর্শিতা লাভ করা চাই। কিন্তু তাহা একদিনে হয় না। তাহার জন্ম একটা যুগের একাগ্র সাধনার আবশ্যিক। সকল সময়ে সে সাধনা হয় না। জীবনের একটা শুভলগ্ন আছে। সে লগ্ন একবার আসে। লগ্ন অতীত হইয়া গেলে শুধু জীবনটা পড়িয়া থাকে মাত্র। কিন্তু তুমি কি সেই কঠোর সাধনায় দীক্ষিত হইতে পারিবে ?”

চিত্র, তুলিকা ও বর্ণপাত্র তাঁহার চরণনিম্নে স্থাপন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিল “গুরুদেবের আশীর্বাদ।” গম্ভীর ভাবে অজিতবর্ণা উত্তর করিলেন “কল্যা হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত তোমার কার্যকাল। তার পর ছুটি।”

(৬)

প্রথম প্রথম চিত্র ছবির কথা অত্যন্ত ভাবিত। কিছুতেই তা'র দীর্ঘ দিন গুলা অতিবাহিত হইতে চাহিত না। অবশেষে অনেক কষ্টে এক বৎসর অতীত হইল। এতদিন চিত্র শুধু আঁকিয়াছে, এবার রঙ্গের পালা। এখন তাহাকে তুলিকা-সম্পাতে বর্ণসৌষ্ঠব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

অজিতবর্ণা মনে মনে বলিলেন “এবার চিত্র একটি স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইবে। সে স্বপ্নরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই হস্তাধিকারিণী! জীবনের বাকিটুকু তাহাকে তাহারই নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে।” বৃদ্ধ শুধু শিল্পী নহেন—মহাকবি!

ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। চিত্র, এবার মায়ামূর্তি বর্ণে প্রতিফলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে প্রায়ই ছবির পত্র পাইয়া থাকে। সেই পত্রের প্রতি ছত্রে কত আশা, কত উদ্দীপনা, কত ভবিষ্য সুখস্বপ্নের সম্মোহন-চিন্তা তাহার কৈশোর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে!

আর মাত্র তিন মাস বাকি।

সেদিন অজিতবর্ণা একমনে কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি মর্ম্মর-প্রতিমা। তিনি এই দুই বৎসর যাবৎ অত্যন্ত অভিজ্ঞবেশ-সহকারে এই প্রতিমাটি স্বহস্তে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। একটি অক্লিত হস্ত হইতে তাঁহাকে এই মর্ম্মর-প্রতিমার সমস্ত অবশিষ্ট অবয়ব শুধু কল্পনাবলে ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। তিনি শুধু একটি হস্ত পাইয়াছিলেন, বাকিটুকু তাঁহাকে তাঁহার অসামান্য স্মরণ-দর্শিতা ও কবিত্বের বিচার-শক্তির মধ্য দিয়া বিকাশ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি

~~সেই পত্রের প্রতি ছত্রে কত আশা, কত উদ্দীপনা, কত ভবিষ্য সুখস্বপ্নের সম্মোহন-চিন্তা তাহার কৈশোর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে!~~

যায়ী দেহের কুত্রাপি এতটুকুও বিসদৃশ ভাব যে কোনও কৃতকর্ম্মা শিল্পীর পক্ষে
স্বাবিকার করা অসম্ভব !

সহসা তিনি চিত্রকে ডাকিলেন ।

চিত্র আসিল । তিনি তাহাকে বলিলেন “এই তিনমাস অতিক্রম হইবার
পূর্বে তুমি ইহাকে বর্ণে প্রতিফলিত কর । কিন্তু চক্ষু দু’টি অম্নি রাখিয়া দিবে ।”

চিত্র মর্ম্মর-প্রতিমাটি দেখিবামাত্র বিস্ময়চকিতনেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া
চাহিয়া রহিল !

(৭)

তিন মাসের মধ্যেই প্রতিমাটিকে বর্ণে প্রতিফলিত করিতে হইবে । চিত্র
দিবারাত্র অত্যন্ত পরিশ্রম-সহকারে প্রতিমাটিকে অবধারিত সময়ের কিছুদিন
পূর্বেই বর্ণে প্রতিফলিত করিয়া সম্পূর্ণ করিল । এত শীঘ্র সমাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া
অজিতবর্মা প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন । চিত্র ভাবিল, তবে বুঝি
সে কৃতকার্য্য হয় নাই । কিন্তু যখন অজিতবর্মা প্রতিমাটি দেখিবামাত্র আনন্দে
স্বীয় আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাহার বিস্ময়ের
অবধি রহিল না !

কিছুক্ষণ পরে অজিতবর্মা বলিলেন “বৎস ! তোমার কার্য্য সমাপ্ত
হইয়াছে ।”

সবিস্ময়ে চিত্র গুরুদেবের মুখপানে চাহিল !

অজিতবর্মা স্মিতমুখে বলিলেন—“এখন তুমি তোমার সেই হস্তাধিকারিণীর
নিকট ঘাইতে পার ।”

চিত্র ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল “কিন্তু গুরুদেব ! আমার কার্য্যকাল ত এখনও
সম্পূর্ণ হয় নাই ।”

চতুর গুরুদেব শিষ্যের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরস্বরে আজ্ঞা
দিলেন—“আচ্ছা ! তবে চক্ষু দু’টিও অঙ্কিত কর । তোমাকে বিজয়গর্বে
প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া সে যে প্রকার আনন্দে অভ্যর্থনা করিবে, চক্ষু
দুইটীতে সেইরূপ ভাব ফুটাইতে হইবে ।”

গুরুজ্ঞানায় প্রতিশয় সন্তুর্ণণে একাগ্রচিত্তে চিত্র চক্ষু দু’টি অঙ্কিত করিতে
আরম্ভ করিল । যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দু’টি তা’র প্রাণের ভিতর থাকিয়া এককাল
উকি-বু’কি করিতেছিল—সে আনন্দ তাহাই পরিস্ফুট করিবে । অন্তরের সমস্ত
বদ্বাকুলতা আজ তাহাকে এই চক্ষু দু’টির উপর নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছে

নির্জন কক্ষ। সে একাকী বসিয়া বসিয়া অতি সন্তর্পণে আপনার শেষ কার্যটি সমাপন করিতেছে। কক্ষের সমস্ত দ্বার-গবাক্সাদি চারিদিক হইতে বন্ধ। অনাহারে অনিদ্রায় সপ্তাহকাল পরিশ্রম করিয়া চিত্র চক্ষু দু'টি অন্ধিত করিল।

প্রীতিবিক্ষারিত নেত্রে চক্ষু দু'টি দেখিয়া বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী বলিলেন—“বৎস! তুমি চিরজীবী হও। তুলিকাধারণ করিবার জন্ত আমিও কোথায় একরূপ হস্ত-কিন্দা চক্ষু দু'টি খুঁজিয়া পাই নাই!”

চিত্র তাঁহার আন্তরিক কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না।

(৮)

অগ্নি শিল্প প্রদর্শনী। মহারাজা বিজয়সিংহ, মহারানী এবং রাজ্যের নিমন্ত্রিত যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাবর্গ সমভিব্যাহারে প্রদর্শনী দেখিতে আসিবেন। বৃদ্ধ সওদাগর মলহর রাও-ও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আজ চিত্রের গুণপনার বিচার। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী বসিয়াছে। রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার জন্ত আজ রাজপ্রাসাদ অব্যবহৃত। অজিতবর্মা আজ স্নায়ং মহারাজাকে শিষ্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। অগ্নি তিনি কিছুই প্রদর্শন করিবেন না— শুধু একটি মূল্যবান মখমলাবৃত প্রতিমূর্তির আবরণ-উন্মোচন করিবেন।

যথাসময়ে মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দে অধীর হইয়া বৃদ্ধ শিল্পী ‘অজিতবর্মা’ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ষত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া একপাশে একত্র হইলেন। মহিলা অগ্নিদিকে সমবেত হইয়া বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর শিষ্যের কৃতিত্ব দেখিবার জন্ত উদগ্রীব। চারিদিকে বিপুল জনসমষ্টি।

সমস্ত নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে কাষ্ঠনির্মিত সোণানাবলী অতিক্রম করিয়া অজিতবর্মা উচ্চমঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী মঞ্চের দিকে সতৃষ্ণনয়নে ঝুঁকিয়া পড়িল। মহিলারা একপাশ হইতে অবগুষ্ঠন-উন্মোচন পূর্বক আশ্চর্যবিস্মৃত হইয়া পলকহীননেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অজিতবর্মা ধীরে ধীরে মখমলের আবরণটি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। চিত্র তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হৃদয়টি প্রত্যেক পলে পলে এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল! প্রত্যেক মুহূর্তটি অগ্নি তাহার নিকট নিতান্ত অপরিমিত বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল! একরূপ অধীরতার মধ্যে ক্রমে সমস্ত আবরণটি উন্মুক্ত হইয়া যাত্র বিপুল জনসমষ্টির বিস্ময় ও উন্মাদে রাজপ্রাসাদ মুখ্যরূপে হইয়া উঠিল।

মহারাজা আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া চিত্রকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। মহারানী স্বর্ণপাত্রস্থিত 'ধানদূর্বা' দিয়া চিত্রের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। কিন্তু সহসা একি।—সবিস্ময়ে চিত্র দেখিল যেন পাষণ-প্রতিমাখানি সোপাননিয়মে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

সে ছুটিয়া গিয়া প্রতিমাটি তুলিতে গেলে—পাষণপ্রতিমা জীবন্ত হইয়া তাহার বক্ষপাশে আবদ্ধ হইল!

খাঁটি বাঙ্গালা কথার বিশেষত্ব।

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ]

ইংরাজী ভাষাতত্ত্বে একটা কথা আছে ফোনেটিক ডিকে (Phonetic Decay) অর্থাৎ সকল দীর্ঘ শব্দ কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া হ্রস্ব হয়। কিন্তু শব্দ সাধারণতঃ প্রথমে দীর্ঘ থাকে পরে হ্রস্ব হয়, না প্রথমে হ্রস্ব থাকে পরে দীর্ঘ হয়? মানব সমাজের জ্ঞান ও শব্দসম্পদের ক্রমোন্নতির ইতিহাস একজন মানবের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। শিশু যেমন প্রথমে এক অক্ষরের ভাষা ব্যবহার করে যথা 'মা' 'দা' 'কু', মানবসমাজও আদিম অবস্থায় সেইরূপ করিত। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় দীর্ঘ শব্দই অধিক এবং এই সকল প্রাচীন ভাষাজাত ইংরাজী হিন্দী বাঙ্গালায় হ্রস্ব শব্দই অধিক। তবে যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা ল্যাটিন জাত সেগুলি দীর্ঘ। যথা হউক, আমরা কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে খাঁটি বাঙ্গালায় এক স্বর ও দুই স্বর বিশিষ্ট শব্দই অধিক। খাঁটি বাঙ্গালা উচ্চারণে সংবৃত্তধ্বনিই অধিক, হিন্দীতে মুক্তধ্বনিই অধিক। বাঙ্গালায় যেখানে সংস্কৃত "দ্বার" স্থানে "দোর", হিন্দীতে তথায় 'দুয়ার'।

যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার নিতান্তই আবশ্যিক, যাহা নহিলে চলে না, সেই সকল দ্রব্যের নাম প্রায়ই এক বা দুই স্বর বিশিষ্ট যথা (১ স্বর) চাল, ঘর, দোর, চা'ল, ডাল, মুন, তেল, ঘি, দুধ, জল, গাং, ইট, কাঠ, গাই, মোষ, মান, গুড়, শাক, পাত, মূল, গাছ, আম, আম, তাল, বেলা, পাণ, চূণ; (২ স্বর) কপা, চোকাট, কাপড়, কাপড়, কাপড়, জামা, ঘটি, বাটি, বাঁটা, চাবি, ধনে,

জীরে, লক্ষা, হলুদ, মরিচ, আলু, বেগুন, পটোল, কচু, তেঁতুল, কাঁটাল, কলা, নারকেল, গোবর, ঘুঁটে, গোকর, বাছুর, বলদ, চিনি, মধু, মাখন, মিছরি, ছুরি, কাঁচি, স্নতো, জুতো, ছাতা, হকো, কল্কি, তামাক, টাকে, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, আফিম, কাগজ, কালি, দোয়াত (সংক্ষেপে দোত), ইত্যাদি ।

বাঙ্গালী শিশু নিকটস্থ আত্মীয়ের নাম করিবার সময়ে বলে ‘মা’ কিম্বা বাবা, কাকা, মামা, দাদা, দিদি । এগুলি এক বর্ণেরই দ্বিরুক্তি কিন্তু পিসী, মাসী এ নিয়মের বহিভূত । তবে পিসীকে পিতৃগৃহে যত অধিক দেখা যায় মাসীকে তত অধিক দেখা যায় না, তাই হিন্দুস্থানী পিসীকে বলে “ফুফু”, তাহার মাতামহকে বলে “নানা” । বাঙ্গালীর “আজা” বা “জ্যেঠা” কেমন যেন অস্বাভাবিক, শিশুর উচ্চারণের উপযুক্ত নহে ।

যাহা হউক, মোটামুটি দেখিতে পাইতেছি বাঙ্গালার কথিত ভাষার গতি ফোনেটিক ডিকের দিকে অত্যন্ত বেশী ঝুঁকিয়াছে । তাই ‘বিবাহ’ অণ্ড স্থানে ‘বিয়ে’ কিন্তু কলিকাতায় ‘বে’ । ‘খাইয়া’, ‘খাইয়চ’ ত্রি-স্বর হইতে দ্বি-স্বর ‘খেয়ে’ ‘গিয়ে’ হইয়াছে কিন্তু তাহাও একরূপ দ্রুত উচ্চারিত হয় যে, মনে হয় যেন একস্বর শব্দই উচ্চারিত হইতেছে । এইরূপ ‘দেওয়া’ কলিকাতায় ‘দোআ’, ইহার ‘ও’কার ও ‘আ’কার একত্রে মিশ্র স্বর মনে করিলে এইরূপ ক্রিয়াগুলিও একস্বর বিশিষ্ট হইতেছে ।

বীরভূম জেলার নলহাটি নামক গ্রামের সন্নিকটে কোন লোক একবার একাকারী ভাষায় কথা বলিতেছিল “ ‘ক’ কিন্তে ‘খ’ হলোনা, ‘ঘ’ হলোত ‘খ’ হলোনা, ‘খ’ হলো ত ‘শ’ হলো না । ” অর্থাৎ “কোআ কিন্তে যাওয়া হলোনা, যাওয়া হলো ত খাওয়া হলোনা” ইত্যাদি । সুতরাং দেখা যাতেছে শুধু কলিকাতা বলিয়া নহে, বাঙ্গালার সর্বত্রই, আর বাঙ্গালাই বা বলি কন, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ অল্পধ্বনিত বা অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে চাহে । পরিশ্রমের লাঘব সকলেরই বাঞ্ছনীয়, তাই দীর্ঘ শব্দ ক্রমেই হ্রাস হয় ।

খাঁটি বাঙ্গালার কবিতা হইল ছড়া । ইহাতে প্রতি পদে (foot) দুই স্বর থাকে । যথা,—

বিষ্টি পড়ে । টাপুর । টুপুর । নদী । এলো । বাগ

তাই ছড়া শিশুর এত মনোযোগ আকর্ষণ করে । শিশু ও অশিক্ষিত নারী

এই এত সহজে ছড়া আয়ত্ত করিতে পারে । কারণ বাঙ্গালীর খাঁটি শব্দের

অধিকাংশই দুই বা দুইস্বর বিশিষ্ট ।

যে সকল বিদেশী শব্দ এইরূপ ক্ষুদ্র (যথা স্কুল, কলেজ, বেঞ্চ, চেয়ার, জজ, মুন্সেফ) সেগুলি যত সহজে ভাষার মধ্যে খাপ খাইয়াছে দীর্ঘ শব্দগুলি (যথা যুনিভার্সিটি, আমেরিকা, মার্জিষ্ট্রেট) তত সহজে ভাষায় খাপ খায় নাই। তাই 'আমেরিকান' আমাদের ভাষায় 'মার্কিন' এবং 'ইয়ুরোপ' আমাদের ভাষায় 'বিলাত' এবং 'মরিশস' আমাদের ভাষায় 'মারীচ' মূলুক।

মহাযুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ]

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউরোপে যখন এই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ভেরী প্রথমে বাজিয়া উঠে, তখন আমাদের অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে আমাদের রাজ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিলেও ভারতবাসীর কোন লাভ-লোকসান হইবে না। কেহ বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে যখন আন্তর্জাতিক নিয়মভঙ্গ্যায়ী ভারতবাসী যোগদান করিতে পারিবে না, তখন ভারতবর্ষের সহিত এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক হইবে না। কেহ ভাবিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং এই 'সর্বশেষ' যুদ্ধে ভারতবাসীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই সকল মতামত যে কয়েক বৎসরের যুদ্ধের ফলে বহু পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আর অবিদিত নাই। যুদ্ধের জ্ঞান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল দিকেই বেশ একটা 'হেস্ত নেস্ত' হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছেও। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বিলাতে মন্ত্রণাদিতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন, বাঙ্গালী যুবকগণ রণক্ষেত্রে রাজার জ্ঞান রক্তপাত করিয়াছেন—উভয়ই আমাদের গৌরবের বিষয়।

অবশ্য কেবল কৃষির দিক হইতে পর্যালোচনা করিলে ভারতবাসীর বেশী লাভলোকসান হয় নাই। শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও শস্ত্রোৎপাদনের ব্যাঘাত হইতেছে না। কেবল এই ক্ষেত্রের দিকে চাহিলে মনে হয় যে, যুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক নাই, ভারতবর্ষে যুদ্ধমান জাতিগণের অন্তর্ভুক্ত নহে—যেন নিরলিপ্ত জাতি।

কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখিলে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধের সম্পর্ক হইবে।

ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজত্বের অংশভূত বলিয়া তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্ত সে বৈদেশিক জাতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে বাধ্য ; তাহার দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্ত সে পরমুখাপেক্ষী । সুতরাং সমুদ্র হইয়া দূর দেশান্তর হইতে এই সকল সম্ভার পৌঁছাইবার পক্ষে এই যুদ্ধ অন্তরায় হইয়াছে । অবশ্য, ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের মালিক ; কিন্তু, সমুদ্রপথে আর এই সকল কাঁচা মাল বিদেশে সহজে পৌঁছিতে পারে না—এগুলি আর সে বিক্রয় করিবার সুবিধা পায় না । পক্ষান্তরে, বিদেশাগত নিত্য ব্যবহার্য পণ্য তাহাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছে । ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে বিক্রয় করিতে হইতেছে কম মূল্যে, অথচ কিনিতে হইতেছে বেশী মূল্যে । ভারতবর্ষের মাল পাঠাইবার আপনার জাহাজ নাই—তাহার রপ্তানী যোগ্য মাল (২১১টী বাদে—যেমন চটের থলে) আর বিদেশে যাইতে পারিতেছে না ।

ফলে যুদ্ধের প্রারম্ভেই এই ফল দাঁড়ায়—

(১) শত্রুর দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইল । আমাদের রপ্তানীর শতকরা চতুর্দাংশ পণ্য বিদেশে যাইত—এই পণ্য দেশ থাকিতে লাগিল—অবিক্রীত থাকিল ।

(২) বৈদেশিক আমদানী বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল । জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সকল যৌথের দেশেই শিল্পজাত দ্রব্য কম পরিমাণে উৎপাদিত হইতে লাগিল । এই সকল দেশ যুদ্ধের জন্ত আবশ্যিক গোলাগুলি, প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ত লোক ও কারখানা প্রয়োগ করিতে লাগিল । ফলে ফলোৎপাদিকা * পরি-
শ্রমের পরিবর্তে অফলোৎপাদিকা পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল ।

(৩) পণ্যবহনকারী জাহাজে যুদ্ধের মালমসলা, সৈন্যসামন্ত লইয়া যাইবার জন্ত জাহাজের সংখ্যা কম পাইল । প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের শতকরা ৭০ খানি জাহাজ এই কার্যে ব্রতী হইল । ইংরাজের প্রতাপে জার্মান বাণিজ্যবহর কিয়েলখালে একবারে রুদ্ধ হইল । অপিচ, মধ্যে মধ্যে 'এডেন' নামক শত্রুর জাহাজের উৎপাতে জাহাজ থাকিলেও বন্দর হইতে সহসা অত্র সর হইতে সাহসী হইত না । যুদ্ধের প্রারম্ভে, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাট-চালানীর সময় হইলেও কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর পরিত্যাগ করে নাই ; ফলে পাটের রাজার দশ টাকা স্থলে তিন টাকায় হারানিয়া যায় ।

(৪) বৈদেশিক মূলধন ভারতবর্ষ হইতে অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় ।

(৫) অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া লয়, নোটের পরিবর্তে টাকা লইয়া ঘরে আটক করে, সতেরিণ কিনিয়া ঘরে সঞ্চয় করে । ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অসুবিধা দাঁড়ায় । অবশ্য এই দফা ফল বহুদিনব্যাপী হয় নাই । সাধারণতঃ, অস্ত্র ব্যক্তিগণ ও মাদোয়াড়ীরাই এরূপ করিয়াছিল ।

এই হইল যুদ্ধের প্রারম্ভিক অর্থনৈতিক ফল ।

কিন্তু যুদ্ধ থামিল না—শীঘ্র খামিবার সম্ভাবনাও রহিল না । যখন এই অবস্থা হইল তখন অর্থনৈতিক অবস্থা দাঁড়াইল এইরূপ :—

(ক) আমদানী, রপ্তানী, ক্রয় বিক্রয়, উৎপাদন সম্বন্ধে আর হিসাবমত চলিল না—রাজ্যের সুবিধা অসুবিধানুযায়ী চলিতে লাগিল ।

(খ) পণ্যবহনকারী জাহাজ এত কম হইল যে, কতকগুলি দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইল ।

(গ) যুদ্ধের জন্ত নদীগামী ষ্টীমার হ্রাস হওয়াতে ও রেলপথ বৃদ্ধি ও সুসংস্কৃত করিবার দ্রব্যাদির অভাবে দেশের মালেরও যথাযথভাবে চলাচল বন্ধ হইল ।

(ঘ) অনেকগুলি শিল্প বিনষ্ট হইল ; অনেকগুলি উপযুক্ত দ্রব্যাদির স্বল্পতায় খর্ব হইল ।

(ঙ) কয়েকটি দ্রব্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল—যুদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় চটের থলে, চামড়ার দ্রব্য, গরম কাপড় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ।

(চ) ভারতবর্ষে যে কয়েকটি শিল্প পূর্বে হইতেই প্রস্তুত ছিল তাহাদের অত্যধিক লাভ হইতে লাগিল । কানপুরের উলেন্ মিল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

(ছ) জাপানী দ্রব্যে দেশ ছাইয়া পড়িল । *

যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের উৎপন্নকারীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষজাত অনেক কাঁচা মাল যাহা পূর্বে ইউরোপে রপ্তানী হইত, তাহা আর তথায় যায় না । যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ১৭০ কোটি টাকার মাল ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে রপ্তানী হইত । এখন অনেক কম পড়িয়াছে । ১৯১৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে পূর্বে বৎসরের

* * * চামড়া প্রভৃতি আহাৰ্য্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসও একটা ফল বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

১৬৬ কোটির স্থলে ২৫ কোটি দাঁড়ায়। আমদানীও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। শুধু ইহাই নহে—কেবল যে রপ্তানী কম হইয়াছে তাহা নহে। যুদ্ধের জন্ত রপ্তানীর মালের মূল্যও কম পড়িয়াছে। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে পাটের দাম ছিল মণকরা ১৬, ১৯১৪ সালে উহার দাম দাঁড়ায় ৩, কি ৪ টাকা। ফলে পাট আর কৃষকে 'বুনিতে' চাহে না—কারণ ঐ মূল্যে আর তাহাদের পেট ভরে না।

আমদানী অনেক জিনিষের যে কেবল কম হইয়াছে তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে তাহা অত্যন্ত চড়া মূল্যে আসিয়াছে। ১৯১৫ সালে ৬৪৭,৭০০ টন চিনি আসিয়াছিল—মূল্য পড়িয়াছিল ১৬৬২ কোটি টাকা। যুদ্ধ না হইলে আমাদের দিতে হইত ১০ কোটি টাকা।

অনেক জিনিষেই এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে।

অবশ্য লাভও কিছু কিছু হইয়াছে। আমি এখন রাজনৈতিক লাভ বা শ্রম সত্যোক্তনাথের পদোন্নতির কথা উল্লেখ করিতেছি না—টাকার হিসাবে লাভের কথা বলিতেছি। যুদ্ধের জন্ত গম, চা, নীল, পশু, বস্ত্র, চট, তামাক—এ সব দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য গম-রপ্তানী এখন গবর্ণমেন্ট সীমাবদ্ধ করিতে খুব বেশী লাভ হইতেছে না। চা'রও যে রূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল, বিলাতে চায়ের উপর শুষ্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় লড়াই হ্রাস পাইয়াছে। জর্জানীর নীল আর এদেশে আসে না—ফলে ইউরোপে আমাদের নীলের একচেটীয়া হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছে চটের খলিয়ায়। ফরাসী, রুস, ইংরাজ সকল যৌথের জাতিরই চটের খলিয়ার ইয়োজন। অবশ্য, এ লাভের প্রায় সর্বাংশই পকেটস্থ হইতেছে ইউরোপীয় হালের। যাহা হউক, ১৯১৩ সালে পাট রপ্তানী হইয়াছিল ২৮ কোটি টাকার, ১৯১৫ সালে হইয়াছে ৩৮ কোটি। এদিকে দেশে কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রও প্রচুর হইতেছে বেশী। শিল্পোন্নতির চেষ্টায় সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাপানের শিল্প প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ জাপানে প্রেরিত হইতেছেন। লর্ড কারমাইকেল যে যশোহরের চিকুণী প্রস্তুতের কারখানায় পাখুলি দিয়াছেন তাহাও এই যুদ্ধের সুফল।

আবার 'কারও সর্বনাশ কারও পোষমাস'ও হইয়াছে। কলকাতার

উদ্যোগী কর্মী ফল সংরক্ষণকার শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এম্ এ মহাশয়
Fruit Pie

যুদ্ধের ফলে সুপ্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে জ্যাম্ ও জেলী সরবরাহ করিয়া তিনি অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের কয়েকজন ব্যবসায়ী 'হালুয়া' রপ্তানী করিয়া ধনী হইতেছেন। কলিকাতার এক মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী ১৯১৫ সালে পাটের কারবারে কিছু "চাল খেলিয়া" পাঁচ কোটি রজতখণ্ড পকেটস্থ করিয়াছিলেন।

অনেক দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের আয়ের ক্ষতি ও তাহারই ফলে করবৃদ্ধি হইয়াছে। নিত্যব্যবহার্য্য লবণ, কয়লা, কেরোসিন তৈলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। জার্মান ঔষধ আমদানী হয় না—ঔষধ অগ্নিমূল্য হইয়াছে, তা'ই কবিরাজী ঔষধের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এই বৎসরের মার্চ মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডকে দেড় শত কোটি টাকা সাহায্য করিবেন—ইহাও এই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের অগ্রতম ফল। অর্থাৎ গড়ে মানুষ প্রতি ৬ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য "ওয়ার-লোনে" টাকা দিলে লাভ ব্যতীত লোকসান কিছুই নাই বরং যদি এই ১৫০ শত কোটি টাকা আমরা ভারতবাসীরা না দিতে পারি, তবে আমাদের ঘোরতর কলঙ্কের কথা হইবে। *

কবি ও সমালোচক ।

[শ্রী নীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল্]

ইংরাজীতে একা সারগর্ভ প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, "A failed poet is a good critic", অর্থাৎ যিনি কাব্যরচনায় সফলকাম হইতে পারেন না তিনি একজন ভাল সমালোচক। ইহা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না, তবে এই ভাবটি আরও একজন বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ওয়ালটর স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডার তাঁহার প্রসিদ্ধ "Imaginary Conversations" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,— "Those who have failed as painters, turn picture-cleaners, those who have failed as writers turn reviewers. Orator

* এই প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনাথ সরকার মহাশয়ের স্থলিখিত ইংরাজী "Economic History of British India" নামক গ্রন্থের উল্লিখিত।

Henley taught in the last century that the readiest-made shoes are boots cut down; there are those who abundantly teach us now, that the "readiest-made critics are cut-down poets." এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমি যে সমালোচকের কার্যকে নিন্দনীয় বলিতেছি, তাহা কেহ মনে না করেন। পক্ষান্তরে গ্রায়সঙ্গত সমালোচনার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। তবে কবি ও সমালোচক এই দুই শ্রেণীর লেখকের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কবিতা ও সমালোচনা যে সম্পূর্ণ বিপরীত উপাদানে রচিত তাহাতে বোধ হয় কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ কাহার কল্পনাশক্তি নাই, তিনি কখন কবি হইবার ছরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ভাল সমালোচক হইতে গেলে, প্রথমে বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বিবেকশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। কাহার ভাবের প্রসার, বাসনার আশিষ্য (passions) এবং ভাব ও ভাষার সরলতা যত বেশী, তিনি তত উচ্চদরের কবি। আদর্শ সমালোচকের রচনা গ্রায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সংযত। কবিতার মত কবিহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্বতঃই প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কাব্যে বিরহ প্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রবল আবেগভরে হৃদয়ের দুইকূল ছাপাইয়া ভাষার আকর্ষণে বাহির হইয়া পড়ে। কবিকে কবিতা লিখিতেই হইবে। যতক্ষণ না প্রাণের সুকুমার কোমল ভাব-প্রসূনগুলি কবিতার ছলে প্রস্ফুট হইয়া উঠে, ততক্ষণ কবির নিষ্কৃতি নাই। ভূতগ্রস্ত লোকের গ্রায় তাঁহার মনে তিলমাত্র শান্তি থাকে না। কেহ জোর করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন না। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ প্রভৃতির কঠোর নির্দিষ্ট নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া কবিতা-রচনা করিতে গেলে তাহা ছন্দোবিশিষ্ট গদ্য হইয়া দাঁড়ায়। সজল জলদনিচয়ের মধ্যে সুশীতল বারিধারার গ্রায়, সুধাকরে রজতধবল জ্যোৎস্নার গ্রায়, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের মূললিত স্বরলহরীর গ্রায় কবিতাও কবির স্বভাবজাত। ইংরাজীতে এক কথা কাব্যকে "inevitable" বলিয়া থাকে। কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"I do but sing because I must

"And pipe but as the linnets sing." (টেনিসন)

কবির যথার্থই ঐশ্বরিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। তাঁহাদের রচনাও মৃদনকাননের পারিজাতের গ্রায় শুভ্র, নিশ্চল ও পবিত্র। "কবিতা অমৃত, আর কবি অমর।"

ইংরাজ কাব্যের ইতিহাসে লিখিত আছে,— "The language of the poet is the language of the heart."

নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তিও একজন প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর স্বভাব-কবি হইতে পারেন। কিন্তু সমালোচকের রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন, তাঁহার প্রথর বুদ্ধি ও শ্রাস্তসম্বন্ধ যুক্তিতর্ক করিবার ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। তাঁহাকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশ্রম করিয়া লিখিতে হয়। এক কথায়,—“The poet is a genius, the critic is a scholar.”

এক এক সময় সাহিত্যের এক এক যুগ আসে। কোনও সময় কবিতা, কোনও সময় গল্পরচনা বা সমালোচনা সম্যক্ ফল্গুলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যুগে বেশী গল্পলেখক বা প্রসিদ্ধ সমালোচক আবির্ভূত হইয়াছেন, যে যুগে গল্পরচনা ও সমালোচনার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে যুগে উচ্চদরের কবির আবির্ভাব হয় না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে গল্পরচনারই প্রাচুর্য ও প্রাধান্য। এইজন্ত ইংরাজিতে এই যুগকে “a century of prose” বলিয়া থাকে। এই সময় জনসন, বার্ক, গিবন, ফিল্ডিং, ডিকো, হিউম প্রভৃতি বড় বড় গল্পলেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ সময়ের কবিদের কাব্যও গল্পময়তায় পূর্ণ। সেই জন্তই ইংরাজ কবি পোপ ও ড্রাইডেনের কবিতাকে ইংরাজিতে “versified prose” অর্থাৎ ছন্দোবিশিষ্ট গল্পমাত্র বলিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে কাব্যের যুগে আমরা গল্পসাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতিলাভ লক্ষ্য করিয়া থাকি। এবং তৎকালীন গল্পরচনা যথার্থই “poetic prose” হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে আমরা শ্রেষ্ঠ কবি, সরস গল্পলেখক ও সমালোচকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট, ক্যাম্বেল, মুর, বাইরন, শেলী, কীটস্, ল্যাঙ্গ, ডিকোয়েন্সি, অষ্টেন, টেনিসন, আর্ল্ড, ব্রাউনিং, কারলাইল, রসকিন, মেকলে, জর্জ ইলিয়ট, ডিকেন্স, থেরারে প্রভৃতি উচ্চদরের কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিকগণ সাহিত্যগগনে উজ্জল তারকাপুঞ্জের স্তায় উদ্ভিত হইয়াছিলেন।

বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যেও কাব্যের যুগ চলিয়াছে বোধ হয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের কাল ও বঙ্কিমযুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, তেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এত ভাল ভাল কবির আবির্ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অতি বিরল। তাই বর্তমান শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকগণেরও রচনা পদ্যময় বলিয়া ধারণা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কালীচন্দ্র, রামেন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, কালীচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির

নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই সব সম্যক্ ভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গদ্যরচনা ও সমালোচনার যুগ কাব্যকুম্ভকলিকা-নিচয়কে নীরস ও শুষ্ক করিয়া দেয়; কিন্তু কাব্যযুগে গদ্য ও পদ্য দুইশ্রেণীর রচনাই সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

কবিরা একটু চেষ্টা করিলেই বেশ ভাল সমালোচক হইতে পারেন। তাই বাঙ্গালাসাহিত্যে আমরা রবীন্দ্রনাথ, ৩দ্বিজেন্দ্রলাল, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচকগণের নাম দেখিতে পাই। ইংরাজী সাহিত্য হইতেও দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পোপ, ড্রাইডেন, কোলরিজ, স্কট, ওয়াডসওয়ার্থ, ল্যাঞ্চ, ম্যাথু আর্নল্ড, শেলী, সুইনবার্ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারি। ড্রাইডেনই বলিয়া গিয়াছেন, "poets themselves are the most proper, though I conclude, not the only critics." অনেক গদ্যলেখক এই উক্তির অসারতা প্রমাণ করিবার জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ল্যাঞ্চের জীবনীলেখক বলিয়া গিয়াছেন,—"That Lamb was a poet, is at the root of his greatness as a critic" (English Men of Letters—Lamb). সাধারণ ধ্বংসকারী (destructive) সমালোচক অপেক্ষা সৃষ্টিকারী (creative) কবি-সমালোচকদিগেরই সমালোচনা অধিক যুক্তিসঙ্গত, মৌলিক এবং সারগর্ভ বলিয়াই বিশ্বাস হয়। অধিকন্তু কবি বলিতে যদি আমরা কেবল ছন্দোবিশিষ্ট কাব্যরচয়িতা না বুঝিয়া, যাহাদের প্রাণের ভিতর ভাবের লহরী খেলা করিয়া বেড়ায়, যাহাদের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রবল, যাহাদের রচনার মধ্যে আমরা লেখকের অনুভূতি, আন্তরিকতা, ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতা দেখিতে পাই, তাঁহাদেরও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি, তাহা হইলে কেবল বাঙ্গালা কেন, পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য হইতে আমরা একরূপ বহু-সংখ্যক প্রসিদ্ধ সমালোচকের নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালা সাহিত্যেও আমাদের ৩বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রামেন্দ্রশুন্দর, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রয়োজ্য। তাঁহারা গদ্য লিখিলেও "কবি" আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য; আর তাঁহাদের রচনাও গদ্যাকারে পদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কবিতার সমালোচনা কবিদিগেরই করা বাঞ্ছনীয়। কবিতা, কবির প্রাণের স্রষ্টা। কবিতা প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হয়। উহার সমালোচনা করিতে গেলে, কল্পনাশক্তির প্রয়োজন এবং সাধারণ গদ্য-লেখক অপেক্ষা কবিদেরই ভাবের দোহা, উহারই বাস্তবজনন, উহারই কল্পনা, উহারই বিচরণ

করিতে পারে, তাহাতে কসহারও বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই। তাই কবিগণেরই কবিতার সমালোচনা এত হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী এবং স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ইংরাজ কবি বাটলার নিজেই এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

The poet must be tried by his peers,
And not by pedants and philosophers.

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, কবিরা মধ্যে মধ্যে ছন্দে তাঁহাদের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রসিদ্ধ বড়ালকবির “ঈশানচন্দ্র” শীর্ষক সনেটটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাটিয়া সূধা, অমরা-বিভব ।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব ;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কোস্তভ হর্ষভ ;
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী—করুণ-লোচন,
রাম নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ ।
তুমি মস্থনের শেষে আসিলে, যোগেশ,
উজ্জ্বল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল !
কাঁকট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ,
স্বপ্ন নর যক্ষ রক্ষঃ আতঙ্কে বিহ্বল !
প্রজাপতি যুক্তকর—রক্ষ’ বিশ্ব-প্রাণ,
মর্ত্তমান প্রেম-মন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান !

এক একটি নির্ঝাচিত প্রাণস্পর্শী উপমায় এক একজন কবির রচনার এরূপ যুক্তিযুক্ত সমালোচনা, সাধারণ সমালোচকের স্বপ্নেরও অগোচর !

ইংরাজ কবি শেলীও কবিত্রাতা কোলরিজ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

“You will see Coleridge ; he who sits obscure
In the exceeding lustre and the pure
Intense irradiation of a mind,
Which, with its own internal lightning blind,

Wearily the darkness and the desert

A cloud, encircled meteor of the air,

A hooded eagle among blinking owls.”

এই কয়ছত্র কোলরিজ সঙ্কে যে কেবল মাত্র যথার্থই প্রযোজ্য তাহা নহে, অপর কোন সমালোচক তাঁহার বিষয়ে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী, বা ইহা অপেক্ষা সুন্দর ভাবে কিছু বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোলরিজের *Biographia Literaria*, ল্যাঙ্কের *Essays on Dramatic poets*, বায়রন, শেলী, কীটস, ল্যাঙ্ক, কাউপার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ ও পত্রাদি (*Essays and letters*) পাঠ করিলে আমরা কবি-সমালোচকদিগের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা সম্যক্ জ্ঞাত হই। এই সব মন্তব্যের অধিকাংশ ভাগই অচিন্তিতপূর্ব ও আকস্মিক, কিন্তু অপর লোকের যত্নলিখিত ও নিয়মবদ্ধ টিপ্সনী অপেক্ষা বেশী মৌলিকতাপূর্ণ এবং তাহাদের সারভাগ কোন মিথ্যা ঘটনার সহিত মিশ্রিত নহে।

পক্ষান্তরে সমালোচকগণ সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহা কবি হইতে পারিবেন না। তাঁহাদের রচিত কাব্য ইংরাজ সাহিত্যিক ড্রাইডেন ও পোপের ত্রায় ছন্দোবিশিষ্ট গদ্য হইয়া দাঁড়াইবে। একজন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক (Bandelaire) যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—“It would be a wholly new event in the history of the arts, if a critic were to turn himself into a poet, a reversal of every psychic law, a monstrosity; on the other hand, all great poets become naturally, inevitably critics, * * * It would be impossible for a critic to become a poet and it is impossible for a poet not to contain a critic.” যে কাব্যের রহস্যোদ্বেদ ও লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবার জগৎলেখকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন না, সেই যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যান, কবিরা একটি সুন্দর কথায় তাহা অক্লেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও জটিল সমস্তার সন্তোষজনক নিরাকরণ করেন। ইহা হইলেও আমরা কবির প্রতিভা ও সাধারণ সমালোচকের পাণ্ডিত্যের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি।

জাতীয় সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতির জন্ত কবি ও সমালোচক উভয়েরই আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। সমালোচকগণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের টিপ্সনী করিয়া তাহাদের মূল্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করিবার আশা রাখা

সহায়। অপাঠ্য গ্রন্থের ভাব ও ভাষার তীব্র সমালোচনা না করিলে, সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশঃই আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ ও রক্ষাকর্তা; কিন্তু কবিদের কার্য আরও মহত্তর ও গুরুতর। তাঁহারা মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপ আগাছা উপড়াইয়া তাহাতে সুনীতিপূর্ণ বীজসমূহ বপন করিয়া দেন। তাঁহারা সংসার-তাপক্লিষ্ট, শোকাকুল, ব্যথিতচিত্ত নরনারীর মনে সাহসনা দিয়া তাহাদিগকে ভগবৎপ্রেম ও নির্মল আনন্দের অধিকারযোগ্য করিয়া তুলেন। জন্মজন্মান্তর কঠোর তপশ্চা করিলে, তবে ভাল কবি হইতে পারা যায়।

আজকাল অনেকেই সমালোচকের বেশ ধারণ করিয়া কবিতা সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাঁহারা কবিতার মূলগত অর্থ কিছুই না বুঝিয়া কেবল তাহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া থাকেন। অথবা সমালোচনায় দেশের তথাগত সাহিত্যের কিরূপ সমূহ ক্ষতি হইতে পারে, তাহা যাহারা ইংরাজ কবি কীটসের মৃত্যুর কারণ অবগত আছেন ও তৎসম্বন্ধীয় শেলীর শোকগীতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সচক্ৰ জ্ঞাত আছেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। কেবল “Adonais” কবিতার ভূমিকায় সমালোচকের উদ্দেশ্যে কবি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা একটু উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

“Miserable men, you, one of the meanest, have wantonly defaced one of the noblest specimens of the workmanship of God. Nor shall it be your excuse, that murderer as you are, you have spoken daggers but used none.” তাই বাইরণও যথার্থই মুরকে বলিয়াছেন, যে সমালোচকগণের নাম লোপ পাইলেও, তোমার বীণার মধুর তান কখন নীরব হইবে না।

“The soothing days may still be read,

When Persecution's arm is dead.

And critics are forgot.”

পুত্রহারা !

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

(১)

“ভদ্রলোক ডাকাত ! ধার্মিক পাষণ্ড ! সাধু চোর ! সচ্চরিত্র মাতাল”—

“আহা ! রাখুন না মশায় তালিকা । কথাটাই শুনুন না ।”

“ঐ একটা ধুয়ো উঠেছে ! ভদ্রলোক ডাকাত ! যদি ভদ্রলোক তো আবার ডাকাত কি ? আর যদি ডাকাত তো সে আবার ভদ্রলোক কিসে ? মশায় ও সোণার পাথর বাটি !”

সি আই ডি ইনস্পেক্টর বলিলেন—আজ্ঞে তাই হ'ল । ডাকাত ! চোরের দাদা ডাকাত ।

আমি আশ্বস্ত হইলাম । কথাটায় আমার সর্বশরীর জন্মিয়া উঠে । ভদ্র ঘরে জন্মিয়া যদি লোকে নিজের বংশের কলঙ্ক হয়, তাহাকেও কি ভদ্রলোক বলিয়া মানিতে হইবে ? নিরস্ত্রকে গুলি মারিয়া, তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া কেহ ভদ্রলোক থাকিতে পারে না । সি আই ডি বাবুকে মগত্যা একথা স্বীকার করিতে হইল ।

এক দল ডাকাত আমার এলাকার ভিতর ধনেশ্বরী পোদ্দারের বাড়ি লুট করিতে আসিবে—সি আই ডি সে সন্ধান পাইয়াছিল । সন্ধ্যার ট্রেণে তাঁহাদের সাহেব আসিবেন, আমাদের জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব আসিবেন, আরও অনেক বড় বড় রথী মহারথী বীর আসিয়া কৃপণ ধনেশ্বরের সম্পত্তি-রক্ষা করিবেন । আমার এলাকা বলিয়া আমার লোকজনকে সাহায্য করিতে হইবে । আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহিত ডাকাত ধরিতে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম ।

রাত্রে আমার সাহেব বলিলেন—ঘোষ, তোমার খুব সাহস আছে । যদি একটাও ডাকাত ধরতে পার ভাল হয় । সি আই ডির লোকেরা ষোল আনা বাহাদুরী নিতে পারবে না ।

(২)

কি ঐক্যকার রাত্রি ! পার্শ্বের মানুষ চিনিবার উপায় ছিল না । ধনেশ্বরের বাড়ি হইতে না ~~উঠিয়া~~ ~~হইতে~~ ~~গিয়াছিল~~, ~~সহস্র~~ ~~পথে~~ ~~কে~~ ~~...~~

না। আমি সাতজন হিন্দুস্থানী সিপাহী লইয়া উত্তরের পথে নদীর ধারে লুকায়িত ছিলাম। চক্ষু অন্ধ, কেবল কর্ণে শুনিতেছিলাম—গাছের পাতার উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ আর খরস্রোতা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি। বটগাছের তলায় স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছিল। সামান্য তন্দ্রাও আসিয়াছিল।

হঠাৎ বাঁশী বাজিল। তাহার পর দুই তিন মিনিট একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল। আবার অল্পক্ষণ পরে দক্ষিণ দিকে নদীর উপর হইতে বন্দুকের শব্দ হইল। তীরের উপর মশাল জলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম— একখানা নৌকা তীরবেগে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, আর পাড়ের উপর আমাদের লোকজন যথাসাধ্য সেই দিকে ছুটিতেছে।

বুঝিলাম ব্যাপারটা কি। সংবাদপত্রে এরূপ ঘটনার কথা অনেক পড়িয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি সে আই ডির বাবু আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—আপনাদের সাহেবের তাড়াতাড়িতে সব মাটি হ'য়েছে। ডাকাতদের বাড়ি হুকতে দেখেই তিনি বাঁশী বাজিয়েছেন। ডাকাতেরা তাড়াতাড়ি নুকানো নৌকায় চড়ে পালাচ্ছে। আমরা গুলি মেরেছিলাম, তারাও উত্তর দিয়েছে, কিন্তু কোন পক্ষের কোন জখম হয়নি।

আমি বলিলাম—বুঝেন কি ? তবে চলুন সবাই মিলে নৌকাখানার অনুসরণ করা যাক।

তিনি বলিলেন—নৌকা অনুসরণ করবার অনেক লোক আছে। বোধ হয় তা'দের একটা লোকও উঠতে পারেনি। চারিদিকের রাস্তা বন্ধ। এই দিকেই আসবে। আপনি ধরবার চেষ্টা করবেন না। বুঝলেন ? বাঁশী বাজাবেন। আমরা এসে পড়ব। বেড়া জাল—বুঝলেন ? বাঁশী ! বেড়া জাল ! বুঝলেন ?

লোকটা অন্ধকারে মিশিয়া গেল। আমার মনের মধ্যে তুমুল ঝড় উঠিল। তাহার মধ্যে ভয় ছিল না, সে কথা বলিতে পারি না। সশস্ত্র শত্রু ! অন্ধকার রজনী ! আর “মরি মরি সিং” “দুর্জয়সিং” “হৌচোট্ খাওয়া” তেওয়ারির দল সাথী।

বেশীক্ষণ ক্রমশঃ করিতে হইল না। একটা লোক ছুটিয়া আসিতেছিল। পিছনে অনেকগুলি পায়ের শব্দ। পুলিশ তাহার অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ বিস্ময় হানিল, লোকটা সেই অবসরে ফিরিয়া পুলিশের উপর লক্ষ্য করিয়া তাহার পিছনে ছিলাম। সেই আমাকে দেখে .

নাই, আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

কড় কড় শব্দে বজ্রনিলাদ হইল। আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বাল্যাবধি মুগ্ধর ভাঁজি, কুস্তি লড়ি, একটা বড় মাছ একেলা খাই। ডাকাত আমাকে শিশুর মত ভুলিয়া লইয়া জলে পড়িল। তাহাকে অগত্যা ছাড়িয়া দিলাম, আবার চিকুর হানিল। দেখিলাম সে আমার পাঁচ হাত আগে স্রোতে গা ভাসাইয়া তীরের মত ছুটতেছে। আমিও গা ভাসাইলাম, বহুদূরে—তীরের উপর মসালের আলোগুলা দেখা যাইতেছিল। মাথার উপর মুসলধারে জল পড়িতেছিল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেবল অনুমানে বুঝিতেছিলাম, ডাকাত আমার নিকটে।

(৩)

কতক্ষণ ভাসিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। বোধ হয় অল্পক্ষণ। কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল যুগ-যুগান্তর ভাসিতেছিলাম। তীরের উপর হইতে নদীর মধ্যস্থল দেখিয়াছি, পর-পার দেখিয়াছি, নদীর একটানা স্রোত দেখিয়াছি। কিন্তু সেই কাল-রাত্রিতে দামিনীর ক্ষণিক আলোকে নদীর পারে ভাসিতে ভাসিতে হৃদকের কুল-কিনারা দেখিয়াছিলাম, স্রোতের বেগ দেখিয়াছিলাম, চেউগুলার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়াছিলাম। উভয় দৃশ্যে অনেক ভেদ। নদী এত প্রশস্ত, তাহার তরঙ্গগুলা এত প্রবল, তাহার বেগ এত ক্ষপ্র, এ সন্দেহ পূর্বে কোন দিন মনোমধ্যে স্থান পায় নাই।

তাহার পর শরীর অবশ হইল। মাথা বিম্ব বিম্ব করিতে লাগিল। সমস্ত জীবনের ইতিহাসটা দামিনীর ক্ষণিক বিকাশের মত মনের মধ্যে বিকসিত হইল। কত আশা, কত নিরাশা, কত পাপ, কত সুখ—তাহার পর প্রিয়জন—স্নেহময়ী জননী, অভাগিনী স্ত্রীর বিধবার বেশ, স্নেহের ভ্রাতা—আর বাকি নাই—এত দিনের পৃথিবী—

অকস্মাৎ আবার চপলার মুহূর্তের হাসি। শত্রু একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি ধরিয়াছিল। জীবনের আশা ছিল। পাঁচ হাত জোরে সাঁতার কাটিতে পারিলে গুঁড়িটা ধরিতে পারি। হাতে পায়ে অস্ত্রের বল আসিল, আবার পৃথিবীর লুপ্ত গরিমা ফিরিয়া আসিতেছিল। জননীকে স্মরণ করিলাম, সহ-ধর্মিণীর মলিন মুখ, আশার কেন্দ্রস্থল, অনুজের হাসিমুখ ভ্রাতার জোরে হাত পা ছুঁড়িলাম। অয় জগদীশ্বর! কাঠ ধরিয়া

(৪)

উভয়েই প্রাণপণে কাঠ ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলাম। ভবিষ্যতের ভাবনা কাহারও মনে ছিল না—বৈরীভাব তিরোহিত হইয়াছিল। উভয়ের প্রবল শত্রু যমরাজার করাল ক্রকুটিতে আমাদের তুচ্ছ মনোবাদ ভাসিয়া গিয়াছিল। তখন উভয়েরই বোধ হয় এক ইচ্ছা—আপাততঃ কিরূপে রক্ষা পাইব। তাহার এমন শক্তি ছিল না যে, আমাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়—আমারও এমন শক্তি ছিল না যে তাহাকে চুবাইয়া মারি। চোখ বুজিয়া ভাসিতেছিলাম, উপরে জল পড়িতেছিল—জলের ভিতর দিয়া ছুটিতেছিলাম। উভয়েই পরিশ্রান্ত—উভয়েই প্রাণভয়ে ভীত।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি তাহার নিখাসের শব্দ পাইতেছিলাম। একবার তাহাকে দেখিবার সাধ হইল। যখন এত সহ করিয়াছি, তাহাকে ছাড়িব না—কোন মতেই না।

চপলা হাসিল। আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল। বুঝিলাম মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। কাণ ভোঁ-ভোঁ করিতেছিল, আবার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। হাত পায়ের শক্তি লোপ পাইল। আবার বিহ্ব্যত চমকিল। নিঃশব্দ—কান্তি !

“কান্তি !”

“দাদা !”

উপরে জল, নীচে জল, তাহার উপর চোখে জল-আসিল। নিজে পুলিশের কাজ করিতেছিলাম, আশা ছিল কান্তি পাশ করিয়া বড় উকীল হইবে কিম্বা প্রোফেসার হইবে, দেশের কাছে মান পাইবে, বংশের মর্যাদা রাখিবে। সেই কান্তি আমার আশা, ভরসা, বল, বুদ্ধি—সেই অনুজ আমার, ডাকাত—ভদ্রলোক ডাকাত। আমার এলাকায় ধনেশ্বরের সংবাদ কান্তির নিকটই ডাকাতে দল পাইয়াছে। উঃ ! ভাই আমার ডাকাতে গুপ্তচর ! ধিক্ ! নরক-কুণ্ড কলিকাতা ! ধিক্ ! কুচক্রীর কুপরাইর্শ। আবার আলোক ! কান্তি স্থিরনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল।

আমি বলিলাম—কান্তি ! ভাই ! তর্ক আর কি করব ! আমি যার নেমক খাই তার কাজ করেছি, তুই যে কাপুরুষের দলের পরামর্শ পেয়েছিস, সেই পরামর্শ কাজ করেছিস। উভয়ের জীবনের পথ ভিন্ন। আমি ডাকাত হতে পারব না, তুইও ডাকাত হতে পারবি না। ঘরে বিধবা মা রইলেন,

তোর বিধবা বউঠাকরুণ রইলেন, তোদের ধর্মে বলে তেঁা তাদের দেখিস। আজ থেকে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হ'লেম। হা ভগবন্! ভাই শেষে ডাকাত হ'ল!

কাঠ ছাড়িলাম। জননী'র চরণ ভাবিতে ভাবিতে ডুবিলাম। কাস্তি, আমার টানিয়া তুলিল। আমি বলিলাম—কি ভাই পুলিশকে গুলি মেরে নাম নিবি? তাই মার। পিস্তলটা কোথা?

চিকুরের হাসিতে তাহার মুখ দেখিলাম। ভাবটার অর্থ বুঝিলাম না। সে বলিল—দাদা, আমি বংশের কলঙ্ক! আমি যাই!

“কি সর্বনাশ! কাস্তি! কাস্তি! করিস কি? ভাইরে! তুই যে মার বড় আদরের ধন, তুই যে আমার বুকের পাঁজরা! তুই চুরি কর, ডাকাতি কর, নরহত্যা কর। বেঁচে থাক, ভাই আমার!”

ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল—দাদা যেতে দাও। আমি বংশের কলঙ্ক।

সে জোরে হাত ছাড়াইল। আমি তারস্বরে চীৎকার করিলাম—বাঁচাও! বাঁচাও! ভাই! ভাই! কাস্তি!

তীর হইতে শব্দ হইল—কে দারোগা বাবু!

তাহার পর কতকগুলো মশাল জ্বলিয়া উঠিল। কোন সন্ধান পাইলাম না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আবার ডাকিলাম—ভাই! ভাই!

হা ভগবন্! সে শিশু। সে ডুবিল; আমি কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড ছাড়িতে পারিলাম না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্ত আমার পুলিশের দুই তিনটা লোক জলে পড়িল। আর স্মরণ নাই।

যখন জ্ঞান হইল মাথার শিয়রে বসিয়াছিল স্ত্রী, পার্শ্বে ছিলেন জননী। আমি কাঁদিয়া বলিলাম—মা, মা সে ডুবেছে, মা তোমার কাস্তি—

মাতা কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিলেন। সহধর্মিণী বুঝিল। সে কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর জননী যে তিন দিন জীবিতা ছিলেন কাঁদেন নাই, হা হতাশ করেন নাই, আহার করেন নাই, জলস্পর্শ করেন নাই—স্ববিরা মা আমার, কেবল স্থির দৃষ্টিতে ঘরের কোণে কাস্তির ফটোগ্রাফের দিকে চাহিয়াছিলেন।



সাহিত্য সমাচার ।

মানসী ও মর্ষবাণী, বৈশাখ ১৩২৪ ।

‘রামের স্মৃতি’ গল্পটি প্রতিভাধান লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা । গত পৌষ মাসের ‘ভারতবর্ষে’ ‘শরৎ-প্রতিভা’ শীর্ষক প্রবন্ধে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন গল্পটী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“রামের স্মৃতি গল্পটির মত সর্বাঙ্গসুন্দর মনোহর গল্প আমি বাঙ্গালা সাহিত্যে পড়ি নাই । * * নারায়ণী যেদিন স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়া রামের জন্ত রোধিতে বসিল, সেদিন তাহার মূর্তি রাফেলের অমর তুলিকায় আঁকা ম্যাডোনা-মূর্তির স্থায় আদর্শ মাতৃমূর্তি । * * সকল দিক্ দিয়া দেখিলে, “রামের স্মৃতি” গল্পটিই বোধ হয় লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প । এই গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে এত ঘটনার বাহুল্য আছে যে, ইহার প্রত্যেক চিত্র একটি মহাকাব্যের অধ্যায়ের মত ।”

‘রামের স্মৃতি’ সম্বন্ধে দীনেশবাবুর মতের সহিত আমরাও সম্পূর্ণ একমত । সকলকেই আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।

সর্ববিষয়েই আমাদের দেশে অনুকরণপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, ছুই একজু সাহিত্যিকও এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতেছেন না । গত বৈশাখ মাসের ‘মানসী ও মর্ষবাণী’র ‘দাদা’ শীর্ষক গল্প পাঠ করিলেই পাঠক আমাদের উক্তির প্রমাণ হাতে হাতে পাইবেন । গল্পটীর নায়ক নদেরচাঁদ “রামের স্মৃতির” রামের ছায়ায় পরিকল্পিত । নদেরচাঁদের চরিত্রটী সামান্য মনোহর পরিষ্কৃত হইলেও পারিপার্শ্বিক কোনও চরিত্র এমন কি নদেরচাঁদের জননীও আদৌ ফুটে নাই । কিন্তু শরৎবাবুর ‘নারায়ণী’ রামের বৈমাত্র অগ্রজের পত্নী হইলেও তাঁহার চরিত্র আদর্শ মাতৃমূর্তি হইয়া ফুটিয়াছে । ‘দাদা’ গল্পের অক্ষম অনুকরণপ্রিয় লেখকের সৃষ্ট ‘নদেরচাঁদ’র জননী ‘নারায়ণী’র সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহে । এই দুইটী গল্পের তুলনায় সমালোচনা করিবার বাতুলতা আমাদের নাই, তবে নিতান্ত আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিতে হইল । পাছে সাধারণে ‘দাদা’কে সন্দেহের নেত্রে দেখেন সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় লেখক গল্পটিকে বিয়োগান্ত করিয়াছেন । এইরূপ অক্ষম অনুকরণের ব্যর্থ রচনা মাসিকের পৃষ্ঠা ভরাইতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণের উপভোগ্য হয় না ! শ্রেষ্ঠ ‘ছোট গল্প’-লেখক বলিয়া ‘মানসী ও মর্ষবাণী’র অগ্রতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুনাম আছে । তাঁহার গায় বিশেষজ্ঞের সম্পাদকতায় ইহা বাহির হইল কেন তাহা বঝিয়া উঠা যায় না ।

গ্রন্থ সমালোচনা ।

লিখন—গল্পপুস্তক, মূল্য ১০. শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ট্রুডেন্টস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ।

এই গ্রন্থে নয়টি ছোট গল্প আছে। তন্মধ্যে 'করণা' গল্পটি শ্রেষ্ঠ রচনা। 'নতুন মা' সমাজের হুবহু চিত্র। 'অস্তিত্বে' ও 'মিলন' গল্প দুইটি বৈদেশিক, তন্মধ্যে প্রথমটি আমাদের সমাজের উপযুক্ত নহে, দ্বিতীয়টি নির্দোষ এবং ইহা 'ইংরাজী হইতে অনূদিত' হইলেও আমাদের সমাজের সহিত বেশ 'খাপ' খায়। 'পতিতা' গল্পটির উপসংহার-অংশে বিনা কারণে সমাজ-পরিভ্রান্তা নারীদের জন্ত একটি সংগঠন নির্দেশ করা হইয়াছে।

'অর্চনা'য় এই গল্পলেখকের গল্প মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি কিরূপ মিষ্ট, কিরূপ পাকা হাতের প্রাঞ্জল ভাষায় সরস রচনা তাহা নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। সামান্ত ২৪ পৃষ্ঠায় ছোট গল্পের মধ্যে এক একটি চরিত্র ফুটাইয়া তুলি, অনাবশ্যক কথোপকথন ও স্বভাব-বর্ণনা বর্জন করা প্রভৃতি ছোট গল্প-রচনার যে উপাদান সেদিকে লেখকের বেশ দৃষ্টি আছে। আমরা সকলকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পুত্র—শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত প্রণীত [মূল্য ১০. কলিকাতা ১০০ নং গড়পার রোড হইতে মেসার্স 'ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত] এই পুস্তকখানি চারখানি ছবি আছে, এবং ইহার কাগজ, ছাপা প্রভৃতি পরিপাটি। মহাভারত ও রামায়ণ হইতে 'দেবত্রয়ের ইন্দ্রিয় সংযম', 'পুরুষ কুঠ', 'রামের বনবাস' এই তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লেখক মহাশয় পুস্তকের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছেন। "পিতা যে প্রবৃত্তি দমনে অক্ষম, পুত্র সেই প্রবৃত্তি দমন করিয়াছেন; পিতা যে ব্যাধিবহনে অপারগ, পুত্র সেই ব্যাধি বহন করিয়াছেন"; পিতা সত্যের জন্ত পুত্রকে বনে পাঠাইতে প্রাণত্যাগ করিলেন, পুত্র বিধাশূন্য হৃদয়ে বনে চলিলেন।"

উপসংহারে লেখক 'শেষ কথা'য় এই চরিত্রত্রয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করায় গ্রন্থখানির মূল্য আরও বাড়িয়াছে। ভাষা একটু সরল হইলে পুস্তকখানি শিশুপাঠ্য হইতে পারিত, কিন্তু ইহা যে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

উপাধি ।

এ বৎসর সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার, সুকবি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'রায় বাহাদুর' উপাধি-মণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি অর্চনার লেখক। আজকাল গবর্ণমেন্ট উপাধিদানে মুক্তহস্ত। তাই উপাধির উপর লোকের শ্রদ্ধা কমিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে বর্ষিত হইলে লোকে গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দেন না একথা আমরা বলিতে পারি না। মিত্র মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধিতে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দিত এবং প্রত্যেক সাহিত্যসেবী গর্বিত। আমরা রায় বাহাদুরের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দুইখানি সংস্কৃত কাব্য।

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

১। ভূদেব-চরিতম্।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, “নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা। কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা ॥” বিদ্যৎ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি কবিত্বশক্তি-লাভে সমৃদ্ধ, তাঁহার সৌভাগ্য বড় অল্প নহে। একদিন এই কবিতার প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ অভিভূত ছিল। যশঃ ও অর্থ উভয়ই কবির সমর্ভাবে প্রাপ্য। “ভোজপ্রবন্ধ”, “প্রবন্ধচিন্তামণি” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, কবিত্বামোদী নৃপতিবৃন্দ, একটীমাত্র কবিতা শুনিয়াও রচয়িতাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কালের পরিবর্তনে এখন সেরূপ কবি বা তাদৃশ দানশীল নৃপতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের এইরূপ দুঃসময়ে কোনও সংস্কৃত কাব্য রচিত ও প্রচারিত হইতে দেখিলে অস্তঃকরণ একটা অনির্বচনীয় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বঙ্গভাষার অঙ্গ অপূর্ক অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দিলেন, সেই শুরুর মুহূর্ত্তে ঐহার অনগ্রমনাঃ হইয়া সুরসরস্বতীর সেবার ব্যাপৃত ছিলেন, পণ্ডিতমোষ্ঠ স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, তাঁহাদের অন্যতম। ইহার “কাব্যপেটিকা” প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ, কি ভাবে, কি ভাষায় প্রাচীন কাব্য হইতে যে কোনও অংশেই নূন নহে, ইহা অসঙ্কোচে নির্দেশ করা যায়। সেই মহাকবি মহেশচন্দ্র, এই “ভূদেব-চরিত” কাব্যের রচয়িতা।

যে মহাপুরুষ স্বোপার্জিত সর্বস্ব, সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রক্ষার জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নত স্তরে আকৃষ্ট হইয়াও যিনি চরিত্রগত পবিত্রতার জন্ত জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন, সেই স্বনামধন্য স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুকরণীয় চরিত্র, এই সংস্কৃত কাব্যে অতি নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই “ভূদেব-চরিত” কাব্য ২৪ সর্গে সম্পূর্ণ। ২২ সূর্গ পর্যন্ত রচনা করিয়া মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় লোকান্তরিত হইলে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ মহাশয় অবশিষ্ট ২ সূর্গ প্রণয়ন করিয়া, গ্রন্থের সমাপ্তি করিলেন। ভাষার প্রসাদগুণের জন্ত এই “ভূদেব-চরিত” কাব্য

সহস্রাবধির অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে । ভূদেবের ছাত্র-জীবনের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

“কৃতোষ্যাহোহপি ভূদেবো বর্ণীব বরবর্ণিনীম্ ।
বধুং হৃদ্যপি নাযুক্তং যশুরাগারবাসিনীম্ ॥
অবিলুপ্তব্রহ্মচর্যো যৌবনেহপি সমাহিতঃ ।
বিদ্যামেব তপস্তপে স যুক্তশয়নাশনঃ ॥
ষোড়শগ্রাসমাত্রং স হবিষ্যং বুভুজে দিবা ।
সাপোশশ্চক যৎকিঞ্চিদ্ যামিনীং দুগ্ধসংস্কৃতম্ ॥”

ভূদেব ছাত্র-জীবনে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছেন । পরিণীত হইয়াও বরবর্ণিনী, বধুকে একবার স্মরণ-পথেও আসিতে দেন নাই । তিনি একাগ্রচিত্তে কেবল বিদ্যারূপ তপস্তাতেই সমাসক্ত ছিলেন । পান ভোজনেও তাঁহার অত্যন্ত সংযম ছিল । ভূদেব দিবাভাগে ১৬ গ্রাসমাত্র হবিষ্যন্ন ভোজন ও রাত্ৰিকালে কিঞ্চিৎ দুগ্ধসাবু মাত্র পান করিতেন ।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ দেখিয়া ভূদেবেরও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি জন্মিয়াছিল । কিন্তু তাঁহার ঋষিকল্প পিতৃদেব বিশ্বনাথ ‘তর্কভূষণ মহাশয়ের যথাশাস্ত্র হিতোপদেশে অচিরেই ভূদেবের হৃদয় হইতে সেই অসদিচ্ছা তিরোহিত হয় । “ভূদেব-চরিত”কার লিখিয়াছেন,—

“ইখং দ্বিত্বৈরেব মাসৈভু দেবঃ প্রকৃতিং যযৌ ।
ন তিষ্ঠতি চিরং বারিগুণ্মা স্বাভাবিকৈতরঃ ॥
যো মিনুনরীগিরাহকারি নীচয়া নীচদর্শনঃ ।
পিতুর্গিরা স ভূদেবোভূয়োহুভুচ্ছদর্শনঃ ॥”

এই ভাবে দুই মাসেই ভূদেব আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন । জলে কখনও অস্বাভাবিক উষ্ণতা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না । যে ভূদেব মিসনারীদিগের কুহকবাক্যে নীচদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিই পুনর্বার পিতার সহপদ্যে ব্রাহ্মণোচিত মহনীয় জ্ঞান লাভ করিলেন ।

ভূদেবের ছাত্রজীবনের পর তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ঋষিজীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত এই ‘ভূদেব-চরিত’ কাব্যে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে । বেদান্ত বিদ্যার প্রতি অনুরাগের কথা, বালরাম স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা, তারপর সেই অসামান্য দানের কথা—ভূদেবের এই সমস্ত চরিত্রই কবি প্রস্ফুটরূপে বর্ণন করিয়াছেন । কবি সত্যই লিখিয়াছেন—

“রাজানো রাজবদ্বা কতি কতি ধনিঃ সস্তি দেশে বিদেশে ।

তেথাং মধো কিয়ন্তো দম্বতি ধনমিয়দেবভাবোদয়ার্থে ॥

ভূদেবো ভূমিদেবো ন তু ধরণিপতির্নাপি বা তস্ত ভুলো ॥

যাবৎ স মূললক্ষ্যো ব্যতরদিহ ধনঃ ষাঙ্কিতঃ পুণ্যকর্মা ॥”

দেশ-বিদেশে রাজা বা রাজতুল্য কত শত শত ধনবান্, বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃত বিচার অভ্যুদয়ের জন্ত কে এত প্রভূত সম্পত্তি দান করে? ভূদেব, রাজাও নহেন, রাজতুল্যও নহেন,—তিনি একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ মাত্র। পরন্তু এই পুণ্যকর্মা মহাত্মা, নিজের উপার্জিত সমস্ত অর্থ, শাস্ত্ররক্ষক ছাত্র ও অধ্যাপক-বৃন্দের পরিপোষণের জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন।

কবি শেষে বলিয়াছেন,—

“হস্ত গঙ্গাজলে পঙ্কঃ কলকচন্দ্রমণ্ডলে ।

ছিদ্রং মুক্তাফলে কাঙ্ক্ষি ভূদেবশশসম্বলা ॥”

গঙ্গাজলে পঙ্ক, চন্দ্রমণ্ডলে কলক ও মুক্তাফলে ছিদ্র বিদ্যমান, সুতরাং কোন্ বস্তুর সহিত ভূদেবের অনাবিল যশের তুলনা করিব?

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

২। পাণ্ডববিজয়ম্ ।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় কবিভূষণ এম এ, অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত কাব্য রচনার জন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্বে “পরশুরামচারিত”, “কুল্লিণীহরণ”, “সুভদ্রাহরণ” প্রভৃতি মহাকাব্য প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া পণ্ডিতসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল ইহার রচিত “পাণ্ডববিজয়” নামক মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া কবির রচনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের আংশিক ইতিবৃত্ত, অতি নিপুণতার সহিত সংক্ষেপে এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য পাঠ করিবার সময়ে মহাকবি ভারবির রচনাশৈলী স্বতিপথে আকৃষ্ট হয়, ইহা নবীন কবির সামান্য কৃতিত্বের পরিচয় নহে। দ্বিতীয় সর্গে দ্রৌপদীর উক্তি—

“ক্রপদস্ত মহীপতেঃ স্ত্রী মহিষী পাণ্ডবনাম বিব্রতম্ ।

তব কৃষ্ণ সখী পট্টরহং প্রসভং হস্ত সভামনামিষি ॥”

“অবমানমজাতশক্রণা নিখিলং সোঢ়বতা বিমূঢ়বৎ ।

সতি চ প্রতিকারপাটেবে তুলিতং নাস্কুলিমাত্রমপ্যাহে ॥”

“ব্যথতে হৃদয়ং স্মরামি চেন্নহু দাসীরমিতি স্ময়েন মাম্ ।

দিরতঃ প্রভূচিত্তরঙ্গনে যদসৌ স্ততস্ততোহপূাপাহসৎ ॥”

ইত্যাদি হুঃখব্যঞ্জক তেজোবিজ্জ্বিত শ্লোকাবলী দেখিলে “ভারবির” প্রথম সর্গের দ্রৌপদীর উক্তি মনে পড়িয়া যায় ।

শব্দ-সৌষ্ঠবে ও অর্থ-সম্পদে এই “পাণ্ডববিজয়” কাব্য, সহৃদয়গণের চিত্ত, সত্যই আকৃষ্ট করিয়া তুলে ।

“অচ্ছমশু যুবতীঃ সর্থাধরা

যত্র কৃত্রিমসরস্তলজ্জয়ৎ ।

সাম্বরেণু গজমজ্জনাকুলং

তজ্জলং ভজতি কজ্জলশ্রিয়ম্ ॥”

বর্তমান সময়ে কোনও নবীন কবি যে সংস্কৃত ভাষায় এমন প্রসন্ন গম্ভীর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণার বিষয়ই ছিল না । দেশে ‘কাব্যতীর্থে’র হুর্ভিক্ষ নাই,—বর্ষে বর্ষে শত শত ব্যক্তি ‘তীর্থ’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । কিন্তু কবিতা রচনার প্রথা দেশ হইতে নির্বাসিত হইতে চলিল । সেকালে সভায় যেমন শাস্ত্রীয় বিচার হইত, তেমন সমগ্রাপূরণ প্রভৃতি উপায়ে সভাক্ষেত্রে কবিতা রচনা করিবারও পদ্ধতি ছিল । গুণানুসারে কবিগণ বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন । তখন বঙ্গদেশে কবিতার এই সমাদর ছিল যে, মহারাষ্ট্র-মহিলা রমাবাই, এই বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া বহু টাকা গইয়া গিয়াছিলেন । কালের প্রভাব দেশের সমস্ত পূর্ব-গৌরবই লোপ পাইতে বসিয়াছে । নবীন কবি হেমচন্দ্র, যেরূপ উৎসাহের সহিত বিবিধ সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে আমরা সত্যই আশান্বিত হইয়াছি । বর্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে হেমচন্দ্রের গ্রাম সংস্কৃত কবিতা, আর কেহই লিখিতে পারেন না—ইহা বিন্দুমাত্রও অত্যাুক্তি নহে । এই নবীন কবি হেমচন্দ্র যেরূপ সমাদর পাইবার যোগ্য, দেশে এখনও তিনি ততদূর সমাদর পান নাই । একজন প্রাচীন কবি সত্যই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

“গুণিমো বহবঃ সস্তি গুণগ্রাহী তু হুল্লভঃ ।”

বাঙ্গালার ধনবানের অভাব নাই । আমরা অচিরে কি এই প্রতিভাশালী কবির যথোচিত সমাদর দেখিতে পাইব না ? কলিকাতার সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতি, যদি এই “পাণ্ডববিজয়” কাব্য, ‘কাব্যতীর্থ’ পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করেন, তাহা হইলে এই উদীয়মান কবি যথেষ্ট উৎসাহ পাইবেন এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন সুন্দর সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া গীর্বাণ-বাণীর সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন । আশীর্বাদ করি, এই নবীন কবি, দীর্ঘজীবন লাভ করুন ।

“ব্রহ্মমালা”-পরীক্ষা ।

[শ্রীহারানচন্দ্র বিহারত্ন ।]

কিছুদিন পূর্বে ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় “দ্বৈতোক্তি-
ব্রহ্মমালা” নামে একখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন ।
এই পুস্তকে তিনি ভুবনবিখ্যাত শিবাবতার আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কয়েকদিন পূর্বে এই পুস্তকের একখণ্ড আমাদের
হস্তগত হইয়াছে । এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি । পুস্তকের
প্রথম হইতেই তর্করত্ন মহাশয় অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু পুস্তকখানি
পাঠ করিলে গর্বের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না ।

তর্করত্ন মহাশয় এই পুস্তকে আচার্য্য শঙ্করের মতের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির
অবতারণা করিয়াছেন, এবং উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সকল
যুক্তি ও ব্যাখ্যার মধ্যে একটীও নির্দোষ নহে, ধরিতে গেলে বলিতে হয়, এই
পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠা অশুদ্ধিদোষে কলঙ্কিত ; এই সকল অশুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে
দেখাইতে গেলে “দ্বৈতোক্তিব্রহ্মমালা”র চতুর্গুণ একখানি পুস্তক লিখিতে হয় ।
এরূপ বৃথাশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনেক সময় ব্যর্থ নষ্ট করিবার জন্ত প্রস্তুত
হওয়া আবশ্যিক । কাজেই আমরা সমস্ত দোষগুলি না দেখাইয়া এই পুস্তকের
কতিপয় স্থানের অশুদ্ধি প্রদর্শন করিতেছি । এই খণ্ডন যে কিছুই হয় নাই এবং
খণ্ডনকার যে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত মতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা এই প্রবন্ধের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন ।

তর্করত্ন মহাশয় অহঙ্কার করিয়াছেন যে, তিনি আচার্য্যশঙ্কর কৃত বৈশেষিক
মতের খণ্ডনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন । আমরা কোতূহলপরবশ হইয়া প্রথমে
সেই অংশ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি ।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম নিখিল প্রপঞ্চের উপাদান কারণ । ইহার উপর
অর্কিকেরা দোষ দিয়াছেন যে, সমবায়ি-কারণের গুণ কার্য্যে স্বসজাতীয় গুণ
আরম্ভ করিয়া থাকে ; চেতন ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে
সমস্ত জগৎও চেতন হওয়া উচিত । ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, সমবায়ি-
কারণের গুণ কার্য্যে স্বসজাতীয় গুণ উৎপন্ন করে, এরূপ অব্যভিচারী নিয়ম নাই ।
অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক উৎপন্ন হইয়া থাকে । পুরুষের জীবচ্ছরীর
হইতে তাহা অপেক্ষা বিলক্ষণ কেশ লোমাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে (১) । মুণ্ডকোপ-

নিষদেও এ বিষয় স্পষ্ট; উল্লিখিত হইয়াছে (১)। সমবায়িকারণের গুণ কার্যে স্বসজাতীয় গুণ উৎপন্ন করিয়া থাকে—এই নিয়ম বৈশেষিক মতে স্বীকৃত প্রক্রিয়া দ্বারাই ব্যাভিচারগ্রস্ত হইয়াছে। দ্ব্যণুকত্রয় হইতে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয় ; দ্ব্যণুক অণু-পরিমাণ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন ত্রসরেণু মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যদি পূর্বোক্ত নিয়ম অব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে অণুপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুকত্রয় হইতে কখনও মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণু উৎপন্ন হইতে পারিত না। “মহদীর্ঘবদ্বা ব্রহ্মপরিমণ্ডলাভ্যাম্” (২) এই সূত্রে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শব্দ-রূত ধ্বনি পরিহার করিতে যাইয়া তর্করত্ন মহাশয় প্রথমেই এই বিষয়ে লিখিতেছেন :—

“কার্যাকারণয়োরাস্তি সাজাত্যং শ্রুতিসম্মতম্ ।

ফলেন তত্ত্ব নির্ণয়ং প্রতিবন্ধিনিবর্তকম্ ॥ (৩)

“একেন মৃগ্ময়েন সর্বং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইত্যাদি। ‘শ্রুতিদ্বারা কার্য-কারণের সাজাত্য উপদর্শিত হইয়াছে।’ হরিবোল হরি ! গোড়াতেই গলদ ! এখানে উপক্রম পরিত্যাগ করিয়া ও শব্দের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই তর্করত্ন মহাশয় স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে লিখিত আছে ;—

শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গুরুগৃহ হইতে পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা তাঁহাকে অভিমানী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “উত তমাদেশ মপ্রাক্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুৎ ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি”—তুমি নিজের গুরুর নিকট কি সেই বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত শ্রুত হয়, যাহা বিচারিত হইলে অমত (অবিচারিত) মত (বিচারিত) হয়, যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। এই কথা শুনিয়া অগ্র বস্তুর শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান হইতে অগ্র বস্তুর শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান অসম্ভব মনে করিয়া শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন “কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি” হে ভগবন্ যে বস্তুর শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা অশ্রুত অমত ও অবিজ্ঞাত বস্তু শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত হয়, সে বস্তু কি প্রকার ? ইহার উত্তরে পিতা বলিয়াছেন, যথা “সোম্যৈকেন মৃগ্ময়েন সর্বং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধাচারভুগং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব

(১) প্রথম মুণ্ডক, ৭ম মন্ত্র ।

(২) ব্রহ্মসূত্র—২ অ ২ প।।

(৩) বৈভোক্তি রত্নমালা ।

সত্যম্ ।” ইত্যাদি ; ইহীর তাৎপর্য এই যে একের জ্ঞানের দ্বারা অত্র বস্তুর জ্ঞান একেবারে অসম্ভব নহে, যদিও ঘটের জ্ঞানের দ্বারা পট জ্ঞাত হয় না, তথাপি উপাদান কারণ জানিলে সমস্ত কার্য্য দ্রব্যের জ্ঞান হয় । যেমন একটা মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত মৃগ্নয়ের জ্ঞান হয় । তাহার কারণ এই যে, বিকার বাচারম্বুগ্ন মাত্র অর্থাৎ বিকারের আলম্বন বাগিক্রিয়—বিচার নামে মাত্র, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য ।

এই স্থলে “যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃগ্নয়ং বিজ্ঞাতং শ্রাৎ” এই অংশ দৃষ্টান্ত, “বাচারম্বুগ্নং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ।” এই অংশ দৃষ্টান্ত-হেতু—ইহা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে । এখানে শ্রুতিতে কার্য্যকারণের সাজাত্য বোধক কোন্ শব্দ আছে, তাহা তর্করত্ন মহাশয় ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলেই হইত । “সাজাত্যমুপদর্শিতম্” বলিয়া কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞা করিলেই সাজাত্য প্রতিপাদকত্ব সিদ্ধ হয় না । তাহার হেতুও নির্দেশ করা উচিত । উপক্রম যে তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় শঙ্কা করিয়া অদ্বৈতবাদি-মত এক কথায় খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এখানে ঐক্য প্রদর্শিত হয় নাই, কেন না, সাজাত্য না থাকিলে নানা বস্তুর ঐক্যের সম্ভাবনাও হইতে পারে না । (১) তর্করত্ন মহাশয়ের চতুঃসূত্রীর ভামতীও দেখা নাই, এ কথা আমরা এই অংশ পাঠ করার পূর্বে কখনও মনে ভাবিতে পারি নাই । ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে “তদ্বু সমন্বয়াৎ” এই চতুর্থ সূত্রের “তত্রকিঞ্চিং পরিণামি নিত্যং” এই ভাষ্যপ্রতীক গ্রহণ করিয়া ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তর্করত্ন মহাশয় আর এরূপ অসার কথা লিখিতে সাহস করিতেন না । কার্য্য-রূপে নানাভেদ ও কারণ-রূপে অভেদ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং (২) অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত । এই কথা বিস্তৃতভাবে ভামতীতে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা হইল না । তর্করত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্তস্থল পাঠ করিয়া দেখিবেন । পরের সিদ্ধান্ত সম্যক্রূপে না জানিয়া খণ্ডন করা কখনই উচিত নয় । [ক্রমশঃ ।

(১) নচ ন তেষাং সাজাত্যং কিস্বৈক্যমিতি যুক্তম্ সাজাত্যবিরহে নানাবস্তুনাটমেকান্ত সম্ভাবয়িতুমযোগ্যত্বাৎ ।

(২)

কার্য্যরূপেণ নানাভেদঃ কারণায়না ।

হেমাঙ্গনা যথাভেদঃ কুণ্ডলাস্তায়না ভিদা ॥

‘য’এর কথা ।

[শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ]

বাঙ্গালায় “য” ও “জ” এই উভয় বর্ণের একরূপ উচ্চারণ করিয়া একটিকে বলি অস্তঃস্থ অপরটিকে বলি বর্গীয় “জ” । বাঙ্গালায় “য”এর চিরকালই বর্তমানের অনুরূপ উচ্চারণ ছিল একথা মনে হয় না, কারণ বাল্যকালে (অর্থাৎ ৪৩ বৎসর পূর্বে) কিম্ব, শিখ পাঠশালার পড়ুয়াদের পড়িতে শুনিয়াছি । স্কুলের ছাত্ররূপে আমরা পড়িতাম ‘বা’ক’ অর্থাৎ ‘বা’এর পরে ঈষৎ ইকারের টান, কিন্তু পাঠশালায় পড়ান হইত “বাকিয়” । হিন্দুস্থানীরাও এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহারা “কন্না” শব্দটিকে উচ্চারণ করে “কনিয়া” (ইয়া বড় তাড়াতাড়ি), পশ্চিম বঙ্গবাসী বলে ক’না (না-এর পূর্বে ঈষৎ ইকার) আর পূর্ববঙ্গবাসী বলে “কঁনা” ।

“য” এর যে এইরূপ উচ্চারণ সে কথার প্রমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের (এবং পূর্বের তথা কথিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের) স্বরসন্ধিতে আছে, যথা ই+অ=য । দুটি স্বরের তাড়াতাড়ি পর পর উচ্চারণই স্বরসন্ধি, সূত্রাং নি+আস=শাস, এই উভয় স্থানেই উচ্চারণ একরূপ হইবে, তবে প্রথমটির দ্রুত উচ্চারণেই দ্বিতীয়টির জন্ম ।

৩ লোহারাম শিরোরাত্র মহাশয়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণের পাদটীকায় পড়িয়া-ছিলাম য, ড ও ঢ শব্দের আদিতে থাকিলে য, ড ও ঢ বলিয়া উচ্চারিত হয় অন্ত্র য, ড ও ঢ বলিয়া উচ্চারিত হয় । সূত্রটি অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের । কিছুদিন পরে কয়েকটি কথা পাই সেখানে ‘য’ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় নিয়মটির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, যথা অযোধ্যা, সরযু, যুযুৎসু, যুযুধান । বলা বাহুল্য, এগুলি সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত বানান । হিন্দীভাষার বানান অজোধ্যা, সরজু । সেতুবন্ধ নামেখরের জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি “অযোধ্যা” কথাটির যেরূপ উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন তাহা আধুনিক বাঙ্গালার বানানে দাঁড়ায় “অয়োদিয়া” । অবশ্য ‘ধ’ বর্ণটি তিনি কিছু কোমল ভাবেই উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আর তিনি বি এন্ ডব্লিউ রেলের সেওয়ান ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া টিকিট চাহিয়াছিলেন তাই বুঝিয়াছিলাম “অযোধ্যা” যাইতে চাহেন, নতুবা উচ্চারণ শুনিয়া আমার বুঝিবার সামর্থ্য হইত ।

না । যে কয়টি নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল পূর্বে দেখাইয়াছি “কায়” আবার তাহার সংখ্যা বাড়াইতে উত্তত হইয়াছে ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে হিন্দীভাষীদের মধ্যে “য”এর প্রকৃত উচ্চারণ এখনও আছে, তাহারা লেখে “জব্”, “জো”, “জৈসা” “অজোধ্যা”, “সরজু” প্রভৃতি আর যে বাঙ্গালা ভাষায় “য” এর প্রকৃত উচ্চারণ জানা নাই সেই বাঙ্গালায় লেখা যায় “যখন”, “যে”, “যেমন”, “অযোধ্যা”, “সরযু” প্রভৃতি । আবার যখন পূর্বে “বাক্য” কথাটির উচ্চারণ “বা’ক্” না হইয়া “বাকিয়” ছিল, তখন এবং তাহার পূর্বের হাতের লেখা পুথিতে “জখন”, “জে” প্রভৃতি দেখা যাইত ।

কিরূপে এই হাতের লেখার “জে” “যে”তে পরিবর্তিত হইল তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল কুন্তিবাসী রামায়ণের আধুনিক সংস্করণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এই বানান পরিবর্তনের জন্ত দায়ী । তাঁহারা স্থির করিলেন যখন “জে” শব্দটি সংস্কৃতের “যদ্” শব্দজাত, তখন ইহাকে “যে” না করিলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটবে । প্রথম প্রথম যে সকল বাঙ্গালা পুথি ছাপা হইত, সম্পাদকেরা সে সকল ক্ষেত্রেও এই পণ্ডিতের দলের পস্থা অনুসরণ করিতেন । এই সম্পাদকগণ স্বয়ং ভ্রান্ত অথচ তাঁহারা মনে করিতেন “গ্রন্থকার হয়ত ঠিক লিখিয়াছিলেন কিন্তু লেখক অনুলিপি করিবার সময়ে বর্ণাশুদ্ধি ঘটাইয়াছে ।” পুথি সম্পাদনের অন্তরূপ একটি ভ্রমের কথা আজ মনে পড়িয়া গেল । বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে যে ঘনরাম চক্রবর্তীর “ধর্ম্মমঙ্গল” মুদ্রিত হয়, তাহার ব্যাখ্যায় “করতার” শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছিল “তাঁর কর” অর্থাৎ “তাঁর কিরণ” । অথচ ধর্ম্মমঙ্গলের বহি যিনি পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে, এই “করতার” ও “কত্তার” শব্দ ধর্ম্মের একটি নাম ।

সংস্কৃত শব্দের “য” কিরূপে “জ”এ পরিণত হইয়াছিল এখন সেই সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিব । এখন সকলেই জানেন সংস্কৃতের “কার্য্য”, “অন্ত” প্রাকৃতে “কজ্জ”, “অজ্জ”, তাহা হইতে বাঙ্গালার “কাজ” ও “আজ” হইয়াছে । প্রাকৃতজনের উচ্চারণে অসামর্থ্য নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিয়াছে । “য”এর প্রকৃত উচ্চারণের সময় (অর্থাৎ দ্রুত ই য় উচ্চারণ) জিহ্বা তালুর সহিত কোনস্থানেই সংলগ্ন হইবে না, তখন ইহার উচ্চারণ অনেকটা অস্পষ্ট বা অর্দ্ধোচ্চারিত “জ্” এর স্থায় মনে হয় । জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর কিঞ্চিৎ অধিক নিকটস্থ হইলেই উচ্চারণের কাছাকাছি হয় আর তালুতে স্পর্শ করিলেই “জ্” হইয়া

দাঁড়ায় । জিহ্বার জড়তা হেতুই এরূপ ঘটিয়া থাকে । সুতরাং যে জড়তার জগ্ন
“কার্য্য” স্থানে “কজ্জ” হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই “যদি” স্থানে “জদি”, বা
“যদ্” শব্দজাত “যাহার” না হইয়া পুরাতন বাঙ্গালায় “জাহার” হইয়াছিল ।

যাহারা “কার্য্য” হইতে “কাজ্জ” বলিয়া “কাষ” লেখেন, তাঁহারা হই “পর্ণ”
হইতে জাত “পান” না লিখিয়া “পাণ” ও “পুরাতন” জাত “পুরা (অ)ন”
না লিখিয়া “পুরাণ” লিখিতেছেন । সংস্কৃতের গণ্ডবিধানের নিয়ম বিকৃত ।
সংস্কৃতে শব্দে খাটান উচিত কি না ইহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যিক । আর যদি,
যখন, যাহার প্রভৃতি শব্দে ‘য’এর পরিবর্তে ‘জ’ লিখিলে বাঙ্গলা ভাষার
কতি কি ?

গোবর্দ্ধন-ধারণ ।

[“ওপারের কথা”র লেখক]

গল্পটা এই :—বর্ষার শেষে বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীগণ মিলিত হইয়া একটা
যজ্ঞ করিতেন । উহার নাম ইন্দ্রযজ্ঞ । এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ইন্দ্রের পূজা করা ;
কারণ তৎপ্রদত্ত বৃষ্টিতে শস্য জন্মাইলে ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা জীবনধারণ করেন
ও গাভীগণ দুগ্ধবতী হয় । এই যজ্ঞের আয়োজন হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,
“আমরা ত কৃষি নহি, বরং গাভীগণই আমাদের অবলম্বন ; সুতরাং আমাদের
কর্তব্য, উক্ত দিবসে গাভীসমূহকে উত্তমরূপে ভোজন করান ও উহারা গোবর্দ্ধন-
গিরির আশ্রিত বলিয়া উক্ত গিরির পূজা কর্তব্য ; আরও বিধেয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্ত-
গণকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা ।” শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অনেক
ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্ত ভোজন করিলেন ও উপযুক্ত গো-সেবা হইল । গোবর্দ্ধনও
মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন । কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণই মূর্ত্তিমান্
গিরি সাজিয়া অন্নব্যঞ্জনের সমাদর করেন ।

পূজা পাইলেন না বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন ও মেঘদলকে
আহ্বান করিয়া বৃষ্টি দ্বারা বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিতে আদেশ করিলেন । মেঘগুলি
প্রভুর আদেশ-পালনে বদ্ধপরিকর হইল । সুতরাং বৃন্দাবনবাসীদের সহিত
গোপগণের হুঃখের পরিসীমা রহিল না । তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি

সাত দিবস উহা একটী মাত্র অঙ্গুলির উপর ধরিলেন । এই উপায়ে বৃন্দাবন রক্ষা পাইল ও ইন্দ্র হার মানিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন ।

যজ্ঞ পঞ্চ প্রকার যথা, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ । প্রত্যেক যজ্ঞের দুইটী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বাহ্যিক ও মুখ্য । ঋষিযজ্ঞের গৌণ উদ্দেশ্য পবিত্র গ্রন্থপাঠ করিয়া জ্ঞান-অর্জন করা ও মুখ্য উদ্দেশ্য অজ্ঞানীকে জ্ঞান-দান করা । দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম কার্য্য । ইহার একটী উদ্দেশ্য দেবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান ও অপর উদ্দেশ্য হুম্মাবস্থায় অবস্থিত উপরি জগৎস্থ লোক-সমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন । পিতৃযজ্ঞের প্রথম উদ্দেশ্য, পূর্বপুরুষগণের কৃত উপকারের জন্ত তর্পণাদি কৰ্ম্মদ্বারা কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করা ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাঁহাদের আত্মার ও মনের কল্যাণে কৰ্ম্মসাধন । নৃযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ও দুঃখিতের দুঃখমোচন ; গৌণ উদ্দেশ্য স্বার্থপরতাকে বলিদান দেওয়া । ভূতযজ্ঞের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য আহারের পূর্বে ভূতলোকের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নত্যাগ ও আহারান্তে প্রাণীগণের জন্ত অবশিষ্টাংশ উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করা ; অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্য সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা । সূতরাং ইহা হইতে বোধগম্য যে চিত্তের উৎকর্ষতাসাধন যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য ।

ইন্দ্রযজ্ঞ দেবযজ্ঞভুক্ত ও গিরিযজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন কৰ্ম্মহেতু নৃযজ্ঞ ভুক্ত । কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য উন্মুক্ত প্রকৃতির পূজা, একত্র প্রীতিভোজন ও গোসেবা । যাবতীয় সৎগুণসম্পন্ন মহোদয়গণ সেকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন । রজঃ ও তমোগুণের পরিবর্তে তাঁহারা অধিক মাত্রায় সত্ত্বগুণে পূরিত হইতেন বলিয়া জাগতিক যাহা কিছুতে তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন । কাহারও প্রীতিবর্ধন করিলে বিশেষতঃ সত্ত্বগুণসম্পন্ন জীবের ও আর্তগণের সেই প্রকার কৰ্ম্মদ্বারা কৰ্ম্মকর্তার বা কর্তার মন-প্রাণে সত্ত্বগুণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চিত হয় । বৈদিক যুগে বিরাট প্রকৃতির সৌষ্ঠব সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, পবন ইত্যাদি পূজিত হইত । সেকালের মহোদয়গণ সম্যক্রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন যে, মানব-মনকে যাবতীয় অশুণ হইতে কেবলমাত্র সৎগুণ দ্বারা পূরিত করিতে হইলে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ ও উহার নিশ্চলতার, বিশুদ্ধতার ও চিরনূতনত্বের পূজা অর্থাৎ আদর করা জীবের পক্ষে ঐক্য সুফলপ্রদ । শ্রীকৃষ্ণও প্রকৃতি সেবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । এইজন্ত তাঁহার যাবতীয় লীলা উন্মুক্তস্থানে সাধিত হইয়াছিল । প্রকৃতির বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুণগুণ প্রকৃতি-সেবক ছাত্র-ছাত্রী এক মুখে নয় সহস্রকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াও নিজ

নিজ সার্থ্যকে বা বাক্চাতুর্য্যতাকে ধিকার দিয়া থাকেন। মনে হয়, প্রকৃত প্রকৃতিসেবকই মানব-হৃদয়ের ও চিত্তের উৎকর্ষতা কতটুকু সাধিত হইতে পারে, ইহা জগৎকে প্রতীয়মান করাইয়াছেন।

কেবল মাত্র এক ঈশ্বর এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও ত্রাতা হইলেও দেবতা ও উপদেবতাগণ বিশ্বের কর্মচারিস্বরূপ অবস্থিত। মনের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতানুসারে এই নখর দেহপাতেকুঁ ধর জীব মন ও আত্মা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম দেহে বিশ্বপতির বিরাট আলয়ে কেহ পুত্র, কন্যা বা প্রণয়িনী ভাবে, কেহ দেবতা বা উপদেবতা আকারে ও কর্মচারী-চারিণী ভাবে ও কেহ প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়াও নিকৃষ্ট কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব কর্মসাধন করেন। ইন্দ্র শ্রীভগবানের বারিবর্ষণকারী কর্মচারী মাত্র। কর্তার আরাধনায় না থাকিয়া কেবল মাত্র কর্মচারীর আরাধনায় কালাতিপাত করিলে জীবের পক্ষে উত্তরোত্তর উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অলীক আশা মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক যুগের অর্চনাদি কর্মের সহিত তৎকালীন ধর্মকর্ম একত্রীভূত করিয়া গিরিযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের প্রবর্তক হইয়াছিলেন।

গৃহ বা সমাজ-সংস্কারের বা জাতীয় জীবন-গঠনের সুসিদ্ধ সোপান একতা। কিন্তু সংস্কারকের সততার, কার্যকুশলতার ও মানবের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমের উপর এই সোপানের ভিত্তি স্থাপিত হইলে সংস্কারাদি কর্ম সুসিদ্ধ হয়। পুরাতন ধারা হইতে নূতন ধারায় প্রবর্তিত করিতে হইলে প্রবর্তকের উদ্ভাবনা-শক্তির আবশ্যক। সেই উদ্ভাবনায় এমন উপকরণ থাকা অত্যাবশ্যক, যাহা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া পরে সেই কার্য বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয়। গিরিসন্মিলন, গিরিপূজা, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন ও গঙ্গা-সেবা কর্মদ্বারা নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ব্রজবাসী-বাসিনীগণ এক একটা কর্মে যোগদান করিবেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল। ফলে তাহাই হইল ও সমগ্র বৃন্দাবনবাসী বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। সেই প্রীতির বা উৎফুল্লতার কারণ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিন্তার ভোজ্য সেব্য সামগ্রী হইলেন। ফলতঃ প্রত্যেক বৃন্দাবনবাসিনী মর্মে মর্মে বুঝিলেন যে, "আমি শ্রীকৃষ্ণের"। এ চিন্তা প্রবল হইলেই আত্মহার্য্য অবস্থার উপনীত হয়। তৎপরে তাঁহারা আহার করিতে গিলেন। আত্মহার্য্য অবস্থার আপনারা আহার করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকেও খাওয়ারিলেন। কিন্তু এমনি তদগতচিত্ত হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের আহার-কর্ম বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই অন্নব্যঞ্জনাদির সমাদর করিতেছেন এই

কথা হৃদয়ে জাগরুক রহিল। মনে হয়, লেখক এই ঘটনাকে নিজ কল্পনাবলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ গিরি সাজিয়া উদর পূর্ণ করেন।

নিজ নিজ মনকে আয়ত্ত্ব বা আত্মাভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইলে মানুষের সুখ-শান্তির তৃষ্ণার নিবৃত্তি সম্ভব। জীবদেহস্থিত আত্মা, পরমাত্মার অণুর অণু। সুতরাং জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ইত্যাদি আত্মার উপাদান। একমাত্র মনের দ্বারা চালিত হইয়া জীব অভাব ও অশান্তির দ্বারা নিষ্পেষিত। কিন্তু ক্রমশঃ মনকে সদৃশ দ্বারা পরিপূরিত করিতে সক্ষম হইলে সেই মনে দিনের দিন আত্মার যাবতীয় সদৃশ মুকুলিত হয়। মন হইতে নিস্তার পাইবার উপায় বৈরাগ্য বা যোগ। রাসলীলায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈর্ষ্যা, কুৎসা, ক্রোধ, লোভ, দম্ব, অসত্যাদি হইতে বিরত হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য বাচ্য। তদ্রূপ উক্ত যাবতীয় অশুভাদি হইতে মনকে উদ্ধার করাই প্রকৃত যোগবাচ্য। বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলে বা উক্ত উপায়ে যোগমুক্ত হইলে জীবের বুঝা সহজসাধ্য যে, তিনি মানব হইয়াও 'সেই তিনি' অর্থাৎ সোহং বা 'আমি তোমার'। জীবদেহের ভরণকর্ত্তা মন, সুতরাং এই দেহভার বহন করিয়া মন হইতে পূর্ণমাত্রায় অব্যাহতি পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ মনকে সম্বল করিয়া বা মনের অস্তিত্ব অন্ততঃ চোদ্দ-আনা পরিমাণে না লোপ করিয়া যে কোন জীব 'স্বামী' বা 'সোহং' উপাধি গ্রহণে প্রয়াসী এবম্প্রকার কার্য্য তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ নহে কি? সাধারণ জীবের পক্ষে এই অবস্থাপন্ন হওয়া সুকঠিন বলিয়া "আমি তোমার" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া বিশেষ সুফলপ্রদ। 'আমি তোমার' অর্থে আমার দেহ, প্রাণ, মন ও সংসার বিশ্বপতির বা বিশ্বজননীর্ যিনি আমার প্রকৃত পিতা, বা মাতা বা স্বামী। "আমি তোমার" কথার পরিবর্ত্তে "আমি তাঁহার" কথা ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানময় পিতা, প্রেমময়ী জননী ও সর্ব্বগুণাকর স্বামী যখন 'আত্মা' ভাবে প্রধানতঃ আমার এই দেহে ও মনের নিয়ন্ত্রণ পাটে অবস্থিত, তখন আমি সুধাপূর্ণ বা সুধামুখী মন—কারণ পরম সুধাময়ের প্রতি ধাবিত—এত সন্নিকটস্থ প্রিয়তমের সহিত ঘনিষ্ঠতর "আমি তাঁর" কথার পরিবর্ত্তে "আমি তোমার" এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব না কেন? "আমি তোমার" সম্বন্ধ স্থাপনে লাভ; ১। ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব—কারণ যাহা কিছু এতদিন "আমার" বলিয়া পরিগণিত ছিল, উহার স্বামী প্রকৃত মালিকের হস্তে গুপ্ত হইল; ২। ধর্ম্মজীবন লাভের মূলমন্ত্র 'বৈরাগ্য' ব্রত উদ্যাপনে ও ৩। যোগাভ্যাসে যত্নশীল-কারণ মনকে দেহ-

স্থিত আত্মার সহিত পিতা বা মাতা বা স্বামী সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত করিতে সচেষ্ট ; ৪ । ক্রমশঃ মনের অতীতাবস্থায় উপনীত হওয়া—কারণ ‘আমি’ অর্থাৎ ‘মন’ কর্মকর্তা না হইয়া অল্পে অল্পে এই দেহ ও সংসার আত্মার লীলাভূমি হইয়া পড়ে ; ৫ । ক্রমশঃ জাগতিক অভাব ও অশান্তি হইতে নিস্তার পাইবার আয়োজন—কারণ মনের পরিবর্তে আত্মা কর্তা সাজিলে সর্বকর্ম্মে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর ; ৬ । ক্রমশঃ চৈতন্যে বা আত্মায় অধিষ্ঠিত হইয়া “মহা-ভাব” বা “সমাধি” অবস্থা পাইবার ইহাই বিপুল আয়োজন ।

বীজের প্রসার ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

উদ্ভিদ জগতের ব্যাপকতা স্বরণ করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয় । একটু জল ও রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলেই মাটিতে অসংখ্য গাছ গজাইয়া উঠে । এই দারুণ গ্রীষ্মে ছাদের উপর দুইটা ফুল গাছের পাত রাখিলে তাহাতে রাশি রাশি আগাছা জন্মে । তাহার পর ভগ্ন অট্টালিকায়, গৃহের কোণে, অলিতে গলিতেও ঘাস আর আগাছার উপদ্রব । মনে হয় যেন মাটির তিতর এমন একটা শক্তি আছে যাহার বলে তাহার নিজের ধূলিকণা গুলা বৃক্ষ প্রাপ্ত হয় । যেমন “স্বরণ্ স্বরণ্ স্বগৃহ-চরিতম্ দারুভূতো মুরারিঃ” তেমনি অপার-আনন্দে ধূলিকণার নয়নরঞ্জন দারুত্রক্ষে পরিণতি হয় বলিয়া মনে হয় । প্রবালের দেহ-কঙ্কাল জমিয়া প্রসাস্তসাগরে দ্বীপের উৎপত্তি হইলেই তাহার উপর নারিকেল গাছের আবির্ভাব হয় ।

পূর্বে একদল দার্শনিক ছিলেন যাহারা বলিতেন অশরীরি হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় । আধুনিক বিজ্ঞান ওসব বাজে কথায় কাণ দেয় না । ভগ্ন মন্দিরের প্রাচীর ফুঁড়িয়া বটগাছ গজায়—সেও বটগাছের বীজের পরিণতি, আর প্রবাল দ্বীপে নারিকেল গাছের জন্মও নারিকেল হইতে । উদ্ভিদের বীজের মধ্যে জীবনীশক্তি বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারে এবং বীজগুলি নানারকম উপায়ে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে পারে ।

বটগাছ ভাল উর্বরক্ষেত্রে বহু চেষ্টা করিলেও জন্মে না অথচ গৃহস্থের অবনতির সময় তাহার ভাঙ্গা প্রাচীরে শিকড় নামাইয়া শীঘ্র তাহাকে গৃহহীন করিতে সহায়তা

করে । যে জলা জমিতে ধান জন্মে সে জলাজমিতে কৃষ্ণচূড়া বা রসাল জন্মে না । মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন তরুর ক্ষেত্র বিভিন্ন । তাই বাহাতে ঠিক নিজ নিজ অনুকূলক্ষেত্রে গিয়া শিকড় গাড়িতে পারে সেই উপায় করিয়া দিবার জন্ত বিধাতা বীজগুলিকে চারিদিকে ছড়াইবার শক্তি দিয়াছেন ।

দোপাটী গাছের বীজ দেখিলে মনে হয় প্রকৃতিকে সাজাইবার জন্ত ভগবান কত প্রকার বিচিত্র উপায় অবলম্বন করেন । দোপাটী ফুলের বীজের ভিতর চারটি স্প্রিংএর মত শুষ্ক ডাঁটা থাকে । তাহার চারিদিকে বীজ থাকে । বীজের আধারটি ছর্কাসা মুনির মত যেন কোঁধে ফাটিবার জন্ত সর্বদাই ব্যস্ত । একটু জোরে বাতাস বহিলে বা কোন পশুপক্ষীর বা বৃক্ষশাখার সামান্য স্পর্শ পাইলে বীজাধার একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া যায় আর ভিতরের স্প্রিংগুলার ঠেলা পাইয়া বীজগুলো চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । বাল্যকালে আমরা সকলেই বোম্ব হর পাকা দোপাটীর বীজ লইয়া এই খেলা খেলিয়াছি ।

একরকম ঘাসের বীজ আছে তাহাদের গায়ে খুব সরু স্ত্রয়ো দেখিতে পাওয়া যায় । সেগুলো এমন ভাবে সংগুস্ত যে বায়ুর তাড়নায় সেগুলো একদিকেই ঘুরিতে ঘুরিতে যায় । শেষে যেখানে মাটি ভিজা সেইখানে লাগিয়া গিয়া ঘাস উৎপাদন করে ।

জলের সাহায্যে জীবজন্তু যেমন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছের বীজগুলিও তেমনি ধরিত্রীর সর্বান্তে উপনিবেশস্থাপন করিবার জন্ত জলের সাহায্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । অনেক জলজ বৃক্ষের বীজ ভাসিয়া একস্থল হইতে অপর স্থলে চলিয়া যায় এবং অনুকূল ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠে । পদ্ম প্রভৃতির বীজের ভিতর একটু বায়ু আবদ্ধ থাকে বাহাতে তাহারা ভাসিতে পারে । নারিকেল সমান পরিমাণের জলের অপেক্ষা লঘু তাই উহারা বহুদিন সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া প্রবাল দ্বীপগুলিকে সজীব করে । বরষার বারিধারায় কত বীজ এক ভূমি হইতে অত্র ভূমিতে গিয়া বৃক্ষে পরিণত হয় তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন । বারির চলৎশক্তির আনুকূল্যে উদ্ভিজ্জগত আত্ম-প্রসার করে ।

তাহার পর বায়ু । বলা বাহুল্য, ক্ষুদ্র বীজগুলি বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া সর্বত্র উপনিবেশ-স্থাপন করে । কত বীজ যে বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সাদা চোখে আমরা বুঝিতে পারি না । এই সকল ক্ষুদ্র বীজাণুর কথা ছাড়িয়া দিলে অনেক বড় গাছের বড় বীজ বায়ুর সাহায্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা আমরা প্রত্যেকেই দেখিতে পাই । আমরা তুলার বীজগুলো পরিত্যাগ

করিয়া তুলা লইয়া শয্যা প্রস্তুত করি । কিন্তু বিধাতা তুলার সৃষ্টি করিয়াছেন
ঐ বীজগুলাকে লইয়া বায়ুবক্ষে অনুকূল ভূমির অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিবার জন্ত ।
অনেক বীজে স্ত্রয়ো আছে । এমন কি আফিমের বীজে সরু সরু তাঁতের মত
কাঁটা আছে বলিয়া অহিফেন গাছ ছড়াইয়া পড়ে । চ্যাড়সের বীজেও ঐ রকম
স্ত্রয়ো দেখিতে পাওয়া যায় ।

পশুপক্ষীর দ্বারাও উদ্ভিদ-জগতের প্রসার হয় । অনেক কণ্টকময় বীজ
পশুপক্ষীর লোমে ও পক্ষে সংবদ্ধ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে । আমাদের দেশে এক
রকম বন্যবৃক্ষ আছে তাহার ছোট ছোট বীজগুলো জোকের মত কাপড়ে
চোপড়ে আটকাইয়া যায় । বাল্যকালে আমরা সেগুলো পরম্পরের মাথার উপর
লাগাইয়া দিতাম । সেগুলো অবশ্য এই শ্রেণীর বীজ, এই রকমের বীজ ঘাসের
চোরকাঁটা । পক্ষীর অনেক ফল মুখে করিয়া অপর স্থলে লইয়া যায় । সেই
সকল ফলের বীজ পরে পাদপে পরিণত হয় । অনেক বীজ আবার পক্ষীদের
পূরীষের সঙ্গে বাহির হইয়া অনুকূল ক্ষেত্রে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয় । শুনিয়াছি ভগ্ন
প্রাচীরে বটবৃক্ষের আবির্ভাব এইরূপে হইয়া থাকে ।

প্রেমের স্বর ।

[শ্রীমন্নথনাথ ঘোষ, এম এ]

(কাপ্তেন ডি এল্ রিচার্ডসন রচিত ইংরাজী কবিতা হইতে)

শুয়ঙ্কর এই মরুভূমি মাঝে, দীর্ঘ-পথ-শ্রান্তি করিতে হরণ
অবসাদ মাঝে দিতে প্রফুল্লতা, থাকে হেথা যদি মায়ামন্ত্র কোন,
তবে সে প্রেমের মধুময় স্বর, হৃদয়ে যাহার উঠে প্রতিধ্বনি,
জ্যোৎস্না প্লাবিত হৃদের মাঝারে, অনিল-তরঙ্গে, সঙ্গীত যেমনি ।

হৃর্গম এ পথ হ'ত কি ভীষণ, পথিকের হৃদে হ'ত কি ক্লেশ
স্বরগের এই মিলন-গানের, না থাকিত যদি জীবনে রেশ,
সেই অজানিত দেশের লাগিয়া, কাঁদিত নিঃসঙ্গ কতই এ প্রাণ,
'পাপীরা যেথায় ভুলিয়াছে পাপ, শাস্তরা যথায় লভিছে নির্মাণ !'

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় ।

(লেখক মোহাম্মদ কে, চাঁদ কর্তৃক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের
প্রতিবাদের প্রতিবাদ ।)

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় ভাবিয়াছেন যে, আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বিরোধী হইয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়াছি । এই হেতু তিনি প্রতিবাদ করিতে গিয়া একটা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমার বোধ হয় । কি হেতু মুসলমানেরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সভায় যোগদান করেন না, তাহাই প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য । কারণ আমি অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের মনোভাব জানি । যখন বাঁকিপুরে বিষয়-নির্বাচন সভায় এ বিষয়ে কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন আমি তাঁহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম মাত্র । আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বিরোধী নহি, বরং আমি হিন্দু-মুসলমান-মিলন প্রত্যাশী ।

অনেকেই জানেন, আজকাল বাঙ্গালা দেশে বহুসংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে । যদি তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া সাহিত্য সম্মিলনরূপ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দিরে আসিয়া মিলিত না হন, তাহা হইলে মুষ্টিমের মুসলমান সাহিত্যিকের যোগদানেই বা কি ফল হইবে ? সভাস্থলে মুসলমান-সাহিত্যিকের সংখ্যার অল্পতাহেতু তাঁহারা কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না অথবা হস্তক্ষেপ করিলেও কৃতকার্য হইতে পারেন না । এইজন্ত আমি যোগদান না করিবার কারণ কি, তাহাই সাহিত্য-সমাজে জানাইবার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ।

সভাস্থলেই হউক, আর মাসিক পত্রিকাতেই হউক, যদি মুসলমানেরা তাঁহাদের ওরূপ লেখার উপর মন্তব্য-প্রকাশ করেন বা মিলনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করেন, অমনি হিন্দুরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কোন-না-কোন রকমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন । রাখালরাজ বাবু কি অস্বীকার করেন যে মুসলমানবিরুদ্ধ কথা তাঁহারা মাসিক পত্রিকায়, ইতিহাসে, উপন্যাসে, নাটক বা কাব্যে লিখেন না বা লিখেন নাই ? যদি বলেন যে লেখার গতিরোধ করা সাহিত্য-সম্মিলনের কার্যও নহে বা সাধ্যও নহে, তবে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য বা সাধ্য কি ? ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল বৎসরান্তে একবার করিয়া

সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে পরস্পর দেখাদেখি করা ? তাও দেখি, কেবল দেখা-দেখি মাত্র । কোনও সাহিত্যিকই কোনও সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসাও করেন না যে আপনি কে, এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন । এরূপ আলাপন করিলেও বৃত্তিতাম সে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল । সে যাহাই হউক তাহা আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই । তবে যাহা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা পরিত্যাগ করা হিন্দুদিগের উচিত । দেশের অনিষ্টজনক কার্যের গতিরোধ করিবার জন্ত দেশস্থ সকল গণ্যমান্য লোক যেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, অক্ষম হইলে রাজপুরুষগণের সাহায্য চাহিয়া থাকেন, তেমনই সেই সকল গণ্যমান্য লোকের দ্বারা যে ইহার প্রতিকার হইতে পারে না তাহাই বা কিরূপ কথা । আমরা তো Defence of India Actএর ন্যায় Act পাশ করিতে বলিতেছি না যে, “ব্যক্তিগত ভাবে কত লোককে শাসন করিব ।” শাসনের আবশ্যক কি ? আমি তো বলিয়াছি যে সাহিত্যিকের হিসাবে “এখানে রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিয়া সম্মিলন-কার্যে উৎসাহ দিয়া থাকেন... । অতএব তাঁহারা ইহার কর্ণধার.....এতদ্ব্যতীত যাহারা নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে ও মাসিকপত্রিকার প্রবন্ধে মুসলমানের উপর ঘৃণার উদ্রেক করেন, অনৈতিহাসিক বী ইতিহাস প্রমাণবিরুদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া মুসলমানের প্রাণে আঘাত করেন, তাঁহারাও এখানে উপস্থিত থাকেন ।” অতএব তাঁহাদিগকে বর্ষে বর্ষে একবার করিয়া এরূপ অনুরোধ করা যাইতে পারে যে, যে সকল লেখায় মুসলমানেরা হুঃখিত বা মর্মান্বিত হন সেই সকল লেখা লিখিতে নিবৃত্ত হওয়া প্রত্যেক সাহিত্যিক বন্ধুর উচিত । যেহেতু দেশের উন্নতির দিন আসিয়াছে । হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ-সাগরে ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া আসিতেছে । যাহাতে ঘৃণা, ঘেব প্রভৃতির দ্বারা এই অল্পকাল স্থায়ী চড়া দ্বীপ হইয়া অপসারিত না হয় এবং যাহাতে উক্ত সাগর একেবারে চড়া পড়িয়া গিয়া মিলনরূপ সমতলভূমির সহিত সমতল হইয়া যায় সে বিষয়ে প্রত্যেক সাহিত্যিকের চেষ্টা করা উচিত । যতদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন যে-কোন উন্নতির কল্পনা কার্যে পরিণত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না । স্বভাষার উন্নতি করিতে গেলে মুসলমানদিগকে আবশ্যক । দেশের রাজনৈতিক উন্নতি করিতে গেলে মুসলমান ব্যতীত সে উন্নতির চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না । (জাতীয় একতা ব্যতিরেকে দেশের উন্নতির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র ।

রাখালরাজ বাবু প্রতিবাদস্থলে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রমাণানুযায়ী আওরঙ্গজেব ও সিরাজ-উদৌলা অত্যাচারী ছিলেন বলিলে মুসলমানেরা বিরক্ত হইবেন কেন? তবে যদি ৩নবীনচন্দ্র সেনের গ্রায় স্বপ্নকল্পিত অত্যাচারকে বাস্তব ধরিয়া তাঁহাকে অত্যাচারী বলা হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরা বিরক্ত না হইবেন কেন? যাহা প্রকৃত ইতিহাসে নাই, তাহা যদি অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে রাখালরাজ বাবুও কি রাগ করেন না? যদি সিরাজ-উদৌলার প্রকৃত ইতিহাস অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বহু পরিশ্রম সহকারে গবেষণা করিয়া শিক্ষিতসমাজে প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে সিরাজ-উদৌলার উপর যে সকল অযথা কল্পিত কলঙ্কের বোঝা চাপান হইয়াছিল, তাহা হইতে কি সিরাজ মুক্ত হইতে পারিতেন? আজও পর্য্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে অঙ্কিত কলঙ্কের চিত্র অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মন হইতে দূরীভূত হয় নাই। আওরঙ্গজেবের গ্রায় অত্যাচারী অনেক হিন্দুরাজাও ছিলেন, তাই বলিয়া তাঁহার সেই অত্যাচার-কাহিনীর অতিরঞ্জিত বর্ণনাকেও কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ও সেই সকল কাহিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া উক্ত সম্রাটকে নিষ্ঠুর, পাষণ্ড, মুসলমানকুলকলঙ্ক প্রভৃতি বলিলে কি মুসলমানেরা দুঃখিত হইবেন না?

আওরঙ্গজেব রাজ্যলোভে পিতাকে কয়েদ রাখিয়াছিলেন এবং রাজ্য কণ্টক-শূন্য করিবার জন্ত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসপ্রমাণ সাপেক্ষ হইলেও হিন্দুদিগের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার কি অভাব আছে? যদি রাখালরাজ বাবু অস্বীকার করেন তো আমি তাঁহাকে শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত “মধ্যযুগে ভারতে সামাজিক অবস্থা” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলি। প্রবন্ধটি ‘সাহিত্যসংহিতা’য় প্রকাশিত হইয়াছিল। রাখালরাজ বাবু ‘কায়স্থ পত্রিকা’য় প্রকাশিত ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞার কথা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কায়স্থের ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করাতে জাতীয় রেঘারেঘী প্রকাশ পায় না। ইহা সামাজিক রেঘারেঘী মাত্র। কারণ কায়স্থ কায়স্থই এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই। কায়স্থ মুসলমানও নন বা ব্রাহ্মণ মুসলমানও নন। উভয়ই হিন্দু, তবে সে রেঘারেঘী সামাজিক ভিন্ন কি হইতে পারে? কখনও কায়স্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিতে ভুলিবেন না বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক আহূত হইলে ভক্তিসহকারে তাঁহার বাটীতে আহার করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। তখন সেরূপ মনোমালিণ্ড মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না। এবং এরূপ মনোমালিণ্ডকে জাতীয় বিদ্বেষ বলা যাইতে পারে না। ইহা সামাজিক মতবৈধতা। কিন্তু হিন্দুর নিকট মুসলমান যে শূণ্য, কুঁচুর অপেক্ষাও

ঘণ্য তাহা কি রাখালরাজ বাবু অস্বীকার করেন? যেরূপ কায়স্থে কায়স্থে মনোমালিন্তের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সে অবস্থায় একজন কায়স্থ অপর একজন কায়স্থকে স্পর্শ করিলে কি তাঁহার জাতি যাইবে, না যায়? কিন্তু রাখালরাজ বাবু জানেন, যদি কোন মুসলমান কোন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের বাটীর যে অংশে আহাৰ্য্য দ্রব্য থাকে, তাহার নিকটবর্তী হয়, তাহা হইলে তিনি সেই সকল দ্রব্য ফেলিয়া দিয়া তথায় গোময়-লেপন করিয়া থাকেন। কিন্তু সেস্থলে শৃগাল কুকুর গেলে ওরূপ করেন না। পূর্বে মুসলমানদিগকে হিন্দুরা 'পারিয়া' 'চণ্ডাল' প্রভৃতি জাতির স্থায় অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতেন এবং এক্ষণে পল্লিগ্রামে এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরও ঐরূপ ঘৃণা করিয়া থাকেন। আমি জানি একবার একজন বিশিষ্ট তদ্রলোক তাঁহার দালান-গৃহ পূজার দালান বলিয়া তন্মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। রাখাল-রাজ বাবু মনে রাখিবেন যে, এই দালান সে সময় পূজার দালান ছিল না। বহু পূর্বে পূজার দালানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া তিনি তন্মধ্যে মুসলমানকে যাইতে দিয়া অপবিত্র করিতে দেন নাই। আমাকে যে সময় যাইতে দেন নাই সে সময় দালান গানবাজনার দালান হইয়াছিল। কায়স্থের মধ্যে বা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে রাখালরাজ বাবু কর্তৃক উক্ত দলাদলি বা রেবারেবী থাকিলে তিনি কি কখন কায়স্থকে বা ব্রাহ্মণকে ঐরূপ ঘৃণা করিয়া দালান মধ্যে যাইতে নিষেধ করিতেন? কখনও না। তবে এক্ষণে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতটা ঘৃণার ভাব নাই। নানা কারণে অনেক ভ্রাস হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দুরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, মুসলমান ছাড়িয়া কোন কাজই সমাধা হইতে পারে না। তাই হিন্দু-মুসলমানের সহিত মেশামেশির দিকে প্রধাবিত হইয়াছেন। রাখাল-রাজ বাবু 'মানসী ও মর্শ্ববাণী'র শ্রাবণ সংখ্যায় মুসলমান-ঘৃণাব্যঞ্জক প্রবন্ধ দেখিতে পান নাই। তিনি বিশেষ ভাবে দেখেন নাই বলিয়া দেখিতে পান নাই। রাখালরাজ বাবু জানেন যে, ইংরাজ লেখকেরা "মোহাম্মদের পর্বতসকাশে-গমন" একটি অনৈতিহাসিক ব্যঙ্গোক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ইতিহাস-প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। ইহা তাহাদের ব্যঙ্গোক্তি মাত্র। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার বেকন তাঁহার "নির্ভীকতা (Boldness) শীর্ষক প্রবন্ধে, লজ্জাহীনতা যে নির্ভীকতা নহে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উদাহরণটির উল্লেখ করিয়াছেন;—

"Mahomet made the people believe that he would call

an hill to him, ... The people assembled; Mahomet called the hill to come to him again and again; and when the hill stood still, he was never a whit abashed, but said, 'If the hill will not come to Mahomet, Mahomet will go to the hill.' So these men, when they have promised great matters and failed most shamefully, yet (if they have the perfection of boldness) they will but slight it over, and make a turn and no more ado."

গত শ্রাবণ মাসের 'মানসী ও মর্মবাণী'র ৬৫৭ পৃঃ ২১৩-২১৪ পংক্তিতে লিখিত "প্রয়োজন হয় তিনি আমাদের নিকট আসিতে পারেন। পর্বত মোহাম্মদ নিকট কিহেতু যাইবে?"—বেকনকল্পিত এই মিথ্যা কথার পুনরুল্লেখ করাতে কি রসিকতা করা ও মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেওয়া হয় নাই? রাখালরাজ বাবু জানেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলামধর্ম-প্রবর্তক এবং ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া মুসলমানদিগের পরম পূজনীয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমানই তাঁহাকে 'নবী', 'রসূল' প্রেরিত পুরুষ বলিয়া সম্মান ও ভক্তি ও প্রেম করিয়া থাকেন। তাঁহার নামের অপবাদ যে কিরূপ মর্মপীড়ক ও অসহনীয়, তাহা কথার প্রকাশ করা যায় না। 'ভারতবর্ষে' খলিফা ওমরের আদেশে আমর কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার ভুবন-বিখ্যাত প্রাচীন লাইব্রেরী ধ্বংসের অনৈতিহাসিক অপবাদের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। রাখালরাজ বাবু একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক গবেষণাকারী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। তিনি নিশ্চিতই জানেন যে, মিশর মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার বহু পূর্বে উপরোক্ত রাজকীয় পাঠাগার রোমকসম্রাট থিওডোসিয়সের আমলেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব ঘোর ইসলামবিদ্বেষী খ্রীষ্টান মিশনারী লেখকগণ কল্পিত কথার উপর নির্ভর করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করাও কি মুসলমান-বিদ্বেষের চিহ্ন নহে? ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমানেরা ঘোর মূর্খ জাতি। তাঁহারা কোরান ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই তাঁহাদের পাঠোপযোগী বোধ করেন নাই বলিয়া তাই খলিফার আদেশে এমন বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারে সঞ্চিত অমূল্য রত্নস্বরূপ গ্রন্থ সকল ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে", ২২০ পৃঃ ১৩-১৬ পংক্তিতে আর একটি নূতন কথা পাওয়া গেল। বইগুলি নাকি আলেকজান্দ্রিয়া হইতে

আরবে লইয়া গিয়া তথায় রক্ষন-কার্যের জালানির স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা রটনা মধ্যযুগে খ্রীষ্টানেরা যে কতই করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। সেই সকল মিথ্যা অপবাদের পুনরুল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগের প্রাণে ব্যথা দেওয়া আজকাল এরূপ বিচোন্নত ব্যক্তিগণের উচিত নহে।

যদি সত্য বলিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানেরাও কি এরূপ করে নাই? যখন স্পেনদেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করা হয়, তখন খলিফা ২য় হাকামের বিরাট রাজকীয় পাঠাগারে সঞ্চিত ৬ ছয় লক্ষ পুস্তক অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। সেই পাঠাগারে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, প্রভৃতি বিচার বাবতীয় মূল্যবান গ্রন্থ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টান বিজ্ঞেতারা পাঠাগারের প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে কক্ষটি কেবল কোরান-বিষয়ক গ্রন্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, ঐ গ্রন্থগুলি কি? তত্বতরে বলিল—‘All Korans’ (‘সবই কোরান’)। শ্রবণ মাত্রেই আদেশ দিল ‘বিধর্মীর ধর্মগ্রন্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল।’ অতএব এই আদেশানুযায়ী পূর্বোক্ত ৬ লক্ষ গ্রন্থের সবই বিনষ্ট করা হইল। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অতএব একটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। রাখালরাজ বাবু বলিয়াছেন, ‘যবন’ বলিলে ঘণা প্রকাশ হয় না। ‘যবন’ Ionian হইলে, মহাভারতের যে ‘যবন’ যতুগৃহ দগ্ধ কার্যে সহায়তা করিয়াছিল, রঘুনন্দনের প্রারশ্চিত্ত তত্ত্বে যে যবনের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা কাহারো? রাখালরাজ বাবু যদি প্রাণ খুলিয়া সত্য বলেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না যে, ‘যবন’ বলিলে ঘণা প্রকাশ হয় না। আমি সাহিত্যিক-কুলতিলক ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠ পুরম ভক্তিভাজন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ হইতে একটি মাত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিনি মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ঘণা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন :—

“ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—‘আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূরীরের খোঁড়াড় আগুনে পুড়াইয়া মাতা বসুমতী আবার পবিত্র করিব।.....চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নি-সংস্কৃত করিয়া খড়কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই।’.....”

১৮শ পরিচ্ছেদে/১১২ পৃঃ ২খণ্ড।

রাখালরাজ বাবু আর কি বলিতে চান। এই গ্রন্থখানি আবার নাটশালার রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করে ও তৎসঙ্গে তাহাদের অন্তরে যে ঘৃণার ভাব আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান ঘৃণার কথা আছে কি না, তাহা রাখালরাজ বাবুকে অধিক বলিতে হইবে না। বঙ্কিম বাবুর মতাবলম্বী দুইজন কবির গ্রন্থই ইহার দৃষ্টান্ত। রাখালরাজ বাবু জানেন 'পলাশীর যুদ্ধের' ও 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' অনেকস্থানেই 'যবন' বলিয়া মুসলমানদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক ছিল কি না, তাহা রাখালবাবুকে বলিতে হইবে না। পদ্মিনী উপাখ্যানের "একতায় হিন্দুরাজগণ, স্মৃতেতে ছিলেন যখন" অংশ 'পঞ্চপাঠ' নামক গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছিল। এবং এই পঞ্চপাঠ তখনকার বিদ্যালয়ের একমাত্র কবিতা পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' তো সেদিন পর্য্যন্ত মধ্য ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক ছিল। যাহা হউক অধিক বলিয়া মনে হুঃখ বৃদ্ধি করা ভাল নহে। তবে আমি বলি যে, সাহিত্যসম্মিলনই হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিণ্ড দূর করিবার প্রকৃত স্থল। যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ মনোমালিণ্ড দূর হয়, তজ্জন্ত চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই উচিত। এ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলেই তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যেন উহা কিছুই নহে, এইরূপ আমাদিগের হিন্দুসাহিত্যিক ভ্রাতারা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে যে বিষময় ফল ফলিতেছে; তাহাতে যে বিচ্ছেদসাগর গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে, তাহা তাঁহারা জানিয়াও জানিতেছেন না। যে লেখাতে বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব আসে, সেরূপ লেখা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায় দোষ কি? এরূপ অনুরোধ কি ব্যক্তিগত শাসন হইল? কখনও নহে, জাতীয় ভাষার, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্মিলিত সাহায্যের আবশ্যিক। অতএব যাহাতে মিলন হয় ও সকল মুসলমান সাহিত্যিক আসিয়া দ্বিভাষা ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে যোগদান করত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে একত্র মিলিত হয় তজ্জন্ত হিন্দুসাহিত্যিক ভ্রাতাগণের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

হিন্দু-মুসলমান ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধলেখক মৌলভী মোহাম্মদ কে, চাঁদ মহাশয় গত চৈত্র মাসের 'অর্চনা'র "সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন মুসলমান সাহিত্যসেবীগণ বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করেন নাই। মৌলভী সাহেবের মনে হয় যে "হিন্দু-সাহিত্যিকেরা মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার, ধর্মকর্মের ছিদ্রাঘেষণ করা, রাজললনাগণের উপর বৃথা কলঙ্কারোপ করা" এবং মুসলমানদিগের সম্বন্ধে "নিদারুণ শেলসদৃশ বাক্যবাণ ব্যবহার করা আজও পর্যন্ত ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহার। হিন্দুর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন।" তাঁহার মতে "সাহিত্য-সম্মিলন সভাই ইহার প্রতিকারের একটি প্রকৃষ্ট স্থল।" সাহিত্য-সম্মিলন তাহা করে নাই বলিয়া স্বভাবতঃ মৌলভী সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশাখের 'অর্চনা'র শ্রদ্ধেয় শ্রীবক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি মনে করেন, চাঁদসাহেবের কারণগুলো "সম্পূর্ণ কাল্পনিক।" "কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি একজন মুসলমানের অগ্রাঘ ব্যবহারে সমগ্র মুসলমান জাতিকেই গালাগালি দেন তাহা হইলে তিনিও যেরূপ ভ্রমে পতিত হন, মৌঃ চাঁদ মহাশয়ও সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" ব্যক্তিগত কার্যের জন্ত বাস্তবিকই সমাজ দায়ী হইতে পারে না। বাঁকিপুরের সম্মিলনের জন্ত রায় মহাশয় ও অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় প্রাণ-পাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সুতরাং সম্মিলনের উপর চাঁদসাহেবের অভিমানটুকু তিনি হজম করিতে পারেন নাই। মৌলভী সাহেবের পত্রে যেমন মনের অভিমানটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, রায়মহাশয়ের পত্রেও তেমনি তাঁহার সংঘত উদারতাটুকু দেদীপ্যমান। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন "হৃদয় উদ্বার করিলে ফোথাও দোষ দেখিতে পাইবেন না আর যদি দোষ দেখিব ইচ্ছা করেন তবে সম্মিলনের শত দোষ দেখিতে পাইবেন।"

* *
*

কিন্তু রাখালরাজ বাবুর মিষ্ট কথায় মৌলভী সাহেবের অভিমান দূর হয় নাই। তিনি এবারকার 'অর্চনা'য় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে অনেকগুলি পুরান কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনেক অপ্রিয় কথা মাঝে মাঝে স্পষ্ট করিয়া বলিলে সমাজের হিত হয়। তাই আমরা মৌলভী সাহেবের পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

* *
*

তর্কটা মোঃ চাঁদ সাহেবের বা রায় মহাশয়ের নিজস্ব নহে। প্রকৃত পক্ষে রায় মহাশয় ও মৌলভী সাহেব উভয়েরই অভিমত যে বাঙ্গালাসাহিত্যে বাঙ্গালীর উভয় পক্ষের কাহারও মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঘা শুকান, প্রাণে শান্তি দেওয়া। রক্ত গরম করিয়া দিয়া জাতীয় বিদ্বেষ বন্ধিত করা সংসাহিত্যের কর্তব্য-গণ্ডীর বাহিরে। মৌলভী সাহেবের অভিমানটুকু শুধু তাঁহার নিজের নহে। অনেক মুসলমান-সাহিত্যসেবীর মধ্যেও এই অভিমান বদ্ধমূল। আমি সাহিত্যসেবার প্রথম অবস্থায় 'নবনূর' ও 'কোহিনূরে'র লেখক ছিলাম। হিন্দুসাহিত্যিকগণ আসর জমাইবার জন্ত দুই একটা বে-ফাঁস কথা বলিয়া মুসলমানদের প্রাণে বিশেষ রকম ব্যথা দেন, সে কথা তখন নিত্যই শুনিতাম। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এমন কোনও লোক লেখনী ধরেন না যিনি স্বেচ্ছায় মুসলমানদের অবমাননা করিতে চাহেন। অনেকটা রীতির দোষে, অনেক সময় গল্পের প্লট জমাইবার জন্ত হিন্দু লেখকগণ মুসলমানের প্রাণে ব্যথা দেন। একটু চেষ্টা করিলেই এই অগ্নায়টুকু বন্ধ করা যাইতে পারে। মৌলভীসাহেবের দুইখানি চিঠির ফলে কতকটা কাজ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

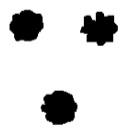
* *
*

রীতির দোষে ঐ "যবন" কথাটা আজিও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। একটু জোর করিয়া বলিতে গেলে শত্রুকে 'যবন' বলিতে হয়, অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে যেন সেটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোড়ামী দেখাইতে হইলে ব্রাহ্ম-সমাজকে গালি দেওয়া এক সময় বাঙ্গালা নাটকের রীতি ছিল। যবন কথার অর্থবোধ সম্বন্ধে আমি "যবনতত্ত্ব" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। রাখাল-রাজ বাবুর সহিত আমারও অভিমত যে, 'যবন'-কথার অর্থ প্রথমে ছিল "য়োনীয়" (Ionian) গ্রীক। কিন্তু উহার যাহাই অর্থ ইউক যখন বাঙ্গালা

দেশের অর্ধেক মুসলমান অধিবাসী ঐ কথাটার ব্যবহার উঠাইয়া দিতে চান, তখন ঐ কথাটা সাহিত্যে রাখিতে হইবে কেন? “নেড়ে” কথাটার উৎপত্তিও আমার মনে হয় সরল। মুসলমানেরা মাথার চুল কামাইত বলিয়া তাহাদিগকে “নেড়ামাথা” ও “নেড়ে” বলা হইত। কিন্তু এ কথাটা বলিলে ইতর-ভদ্র সকল মুসলমান অবমানিত হন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ভ্রাতৃ-বিরোধ নিবারণ করিবার জন্ত যে লোক—লেখাতেই হউক বা কথাবার্তায় হউক—এ দুইটা কথা বর্জন করিতে না পারে সে দেশের শত্রু। হিন্দু-লেখকগণ একটু সাবধান হইলেই মুসলমান-বাক্সালীকে আর অভিমান করিতে হয় না।



চাঁদসাহেব চাহেন যে, সাহিত্য-সম্মিলনে এ বিষয়ের আলোচনা হয়। যদি তাহা এতদিন না হইয়া থাকে তো সে দোষ তাঁহার এবং বন্ধুবর মোঃ আব্দুল গফুর সাহেব প্রভৃতির। সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্বে কর্মকর্তারা প্রত্যেক লেখকের নিকট প্রবন্ধ চাহিয়া পাঠান। সেই সময় চাঁদসাহেব এ বিষয় লিখিয়া পাঠান নাই কেন? সম্মিলন-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপায় সংক্রান্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিশ্চয় সফল ফলিত। তাঁহার উত্তরে এ বিষয় ‘রেজলিউসান’ হইতে পারিত। অবশ্য এ কার্য যেমন অপরেরও কর্তব্য, তেমনি তাঁহারও কর্তব্য। যদি অপরে দোষী হন তিনিও কি দোষী নহেন? আশা করি আগামী বারের সম্মিলনে কোনও হিন্দু কি মুসলমান লেখক যাহাতে উভয় পক্ষের কোনও সাহিত্যিক জাতীয় বিদ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবেন এবং প্রস্তাব করিবেন।



“হিন্দুর নিকট মুসলমান যে শৃগাল কুকুর অপেক্ষাও ঘৃণ্য”—এ কথায় মৌলভী সাহেব সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর অবিচার করিয়াছেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ অনেক সময় উভয় সম্প্রদায়ের লোকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে পারে না বটে, কিন্তু সে মিলনের অভাব যে ঘৃণায় প্রতিষ্ঠিত এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। আমরা হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে, মুসলমানের প্রতি ঘৃণা আধুনিক হিন্দুর প্রাণে আদৌ নাই। যেটুকু সামাজিক পার্থক্য আছে তাহা ধর্মমূলক, তাহা বোধ হয় চিরদিনই থাকিবে। তবে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ মিলন উভয় পক্ষের অন্ততঃ স্বার্থসিদ্ধির

জগৎও অবগুস্তানী । সে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া সম্পূর্ণ বাঙ্গালী জাতি গঠন করিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । যে সকল হিন্দুলোক অথবা মুসলমানের মনে কষ্ট দিবেন তিনি বাঙ্গালীজাতির শত্রু, এ কথা যেন কেহ বিশ্বাস না হন ।

* * *

প্রতিভা

আজকাল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে মাতৃভাষা সেবার জগৎ কৃতবিগ্ণ ভারতবাসীগণ যে বন্ধপরিষ্কার হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ প্রত্যেক প্রদেশের মাসিক সাহিত্যের আধিক্য হইতে পাওয়া যায় । বাঙ্গালা, গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষা যতটা উন্নতি করিয়াছে, আধুনিক হিন্দী ততটা উন্নতি করিতে পারে নাই । তাহার কারণ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে হিন্দী ও উর্দু ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা । উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান মাতেই ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাঁহাদের মাতৃভাষা সেবা করিবার বাসনা হইলেই উর্দু ক্রিয়াপদ রাখিয়া ফারসী ও আরবী শব্দে নিজেদের রচনা গুরুপাক করিয়া ফেলেন । এদিকে হিন্দু পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-বহুল ভাষা লিখিয়া হিন্দীর পুস্তকের ভাষা একেবারে খাঁটী বিগ্ণসাগরী বাঙ্গালার মত করিয়া আনিয়াছেন । সুতরাং আজকাল কৃতবিগ্ণ বাঙ্গালীর নিকট যেমন হিন্দী ভাষা সহজবোধ্য, হিন্দুস্থানী শিক্ষিত লোকের নিকটও তেমন লিখিত বাঙ্গালা ভাষা প্রাঞ্জল বলিয়া মনে হয় । ভাষার এই বিশেষত্বের জগৎ আমরা আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু পণ্ডিত জালাদত্ত শর্মা মহাশয়ের সম্পাদিত “প্রতিভা” মাসিকপত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি । আমরা যে দুই সংখ্যা “প্রতিভা” পাইয়াছি, তাহাতে ‘অর্চনা’ প্রভৃতি মাসিকপত্র হইতে দুই একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া পণ্ডিত জালাদত্ত শর্মা মহাশয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সখ্যতা-স্থাপন করিবার অবসর দিয়াছেন । ইহার বাঙ্গালী-প্ৰীতির অপর পরিচয় আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শ্রুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত । “শ্রায়মূর্তি শ্রুত গুরুদাস”কে লেখক মহাশয় ইংরাজী শিক্ষার সুফলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইয়াছেন । আমাদের মনে হয় ইংরাজী শিক্ষার কেবল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করিয়া শ্রুত গুরুদাস কু-ফলটুকু সম্যকরূপে বর্জন করিতে পারিয়াছেন । বলিয়া আজ তিনি ভারত-পূজা । আমরা ‘প্রতিভা’র দীর্ঘজীবন কামনা করি ।

ফরাসীর চক্ষে হিন্দু থিয়েটার ।*

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম এ, ও শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন ।]

একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া অনেকক্ষণ ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মানা প্রকার সংক্রামক রোগের জীবাণুপূর্ণ রাস্তা দিয়া, চারিধারে কাদা ছড়াইতে ছড়াইতে কলিকাতার দেশী পল্লী অভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তার পাশে দোকান ঘরে কেবোসিনের ডিবা জলিতেছে। দীপগুলি ছোট ছোট, না আছে চিম্নি না আছে কাঁচের ফানুস। মিটমিটে আলোয় মোটেই দীপ্তি নাই, আছে কেবল অপৰ্যাপ্ত ধোঁয়া ও তাহার অন্ধকার। চারি ধারেই স্নাতসেঁতে ভাব। জলা ভূমির বাষ্প যেন সর্বদাই দেহ বিরিয়া রহিয়াছে, মনে হয় যেন শিরা উপশিরায় প্রবেশ করিয়া শরীরের রক্ত পর্যন্ত দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। এই তরল বিষাক্ত বায়ুগুণ যেন জরের প্রকট মূর্তি— যেন নিত্যন্ত সজীব ভাঙবই সকলকে আক্রমণ করিতে উত্তম। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে; তাহা নানা প্রকার দ্রব্য অর্ধগলিত শর্করা, সবজী, কুম্ভাগণের ঘর্ষাক্ত দেহ এবং গোলাপ-চন্দন-বাসিত দেশী তামাকু হইতে নিঃসৃত গন্ধাকরজনক ঘ্রাণের এক অপূৰ্ণ সংমিশ্রণ। অবশেষে ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া পৌঁছলাম। নাট্যশালার অধ্যক্ষ দেশীয় লোক। তিনি নিজেরই আবার কয়েকখামি নাটকের রচয়িতা। সেগুলি এই রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হইয়া থাকে। এই সকল নাটক বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল অথচ কুসংস্কারাক্ত দেশীয় লোকগণের রুচিরই প্রকৃত পরিচায়ক। ইহার স্বপ্নের বাস্তবতা হইতে আপনাদিগকে কখনও মুক্ত করিতে পারে না বলিয়া রঙ্গালয়েও ‘অপেরা’ ও পরী রাজ্যের কুহকের একত্র সমাবেশ দেখিতে ভালবাসে। আমরা উপরে উঠিয়া আমরাদিগের জন্ত নির্দিষ্ট বক্সে গিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, বক্স শ্রেণীর উন্নত অংশগুলি মুসলমানী ধরণের খিলানযুক্ত তোরণ দ্বারের দ্বারা গঠিত। এই সুন্দর নাট্যশালাটি নরনাভিরাম উজ্জল বর্গে চিত্রিত—

* জুল বোয়ার ফরাসী হইতে। এই পুস্তক (Visions Le L'Inde) ১৯০৩ অব্দে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার তাহার কয়েক বৎসর পূর্বেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া যসিয়ে বোরা জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পান, সেইজন্য জ্বরের বিত্তী-বিকার কথা ভুক্তিতে পারেন নাই।—লেখক।

ইহাতে যেন ইংরাজী অপেক্ষা ইতালীয় প্রভাবই বেশী। সামান্য সম্ভ্রান্ত-গৃহের ভিত্তিগাত্রও ধ্যাননিমগ্ন স্মৃগণের চিত্রে পরিশোভিত। দেখিতেছি, এদেশের লোকেরা নাট্যশালায় আসিয়াও ভগবৎ চিন্তা হইতে বিরত হয় না। নীচে বেঞ্চির উপর স্থলোদর গম্ভীর মূর্ত্তি বাঙ্গালী বাবুরা ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের বুকে ভাঁজ করা চাদর বাঁধা। এদেশের মধ্য শ্রেণীর লোকদিগের ইহাই নাকি পরিচ্ছদের বিশেষত্ব। অত্র বক্সগুলি খালি পড়িয়াছিল। আমরা ব্যতীত অপর কোনও ইউরোপীয় দর্শক উপস্থিত ছিল না। মধ্যস্থিত বক্সটিতে (‘রয়াল বক্স’) একজন রাজা বসিয়া আছেন। তাঁহার উষ্ণীষের হীরক খচিত পালক সংযুক্ত শিরপেঁচটি হঠাৎ দেখিলে প্রোজল অগ্নিশিখার মত মনে হয়। দেখিলাম, যৌবনের সহজ সারল্য ও ঐশ্বর্যের বিলাস জড়িমার সহিত কেমন যেন পাশবিক ভাবও তাঁহার চক্ষে স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সন্নিকটে খাস বিলাতী ও জমকাল দেশী পোষাকের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যে সজ্জিত পাগড়িধারী পারিষদবর্গ ভিড় করিয়া ঘিরিয়া বসিয়াছে। উচ্চ পর্দার অন্তরালে স্বর্ণখচিত অবগুষ্ঠনগুলি ইতস্ততঃ বিকম্পিত হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিতেছে। নারীগণের পেলব দেহনতার নিরুদ্ধেগ স্পন্দন ও সুতীক্ষ্ণ নয়নের কুতূহলী চাহনী জাফরীর ফাঁক দিয়াও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহারাই অবরোধবাসিনী বঙ্গললনা। সজীবতায়, অঙ্গনৌষ্ঠবে, নিষ্ঠা ও মনীষায় ইহারা ভারতের অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া। ইহাদিগের সৌন্দর্য্য সুষমা স্বভাবতঃই ইতালি ও ফরাসী দেশের সুন্দরীগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিনয়ের যে সকল অংশ করুণ রসবহুল, সেই সব স্থলে আশা ও নিরাশার শিহরণ বিকম্পনাদি লক্ষ্য করার জন্য খোদাই কাজ করা ভিত্তি সংলগ্ন কাষ্ঠের ফাঁক দিয়া আমার সোৎসুক দৃষ্টি সেই সকল মহিলা শ্রেণীর প্রতি ধাবিত হইতেছিল। দূরে—গ্যালারির উপর—অদৃশ্যপ্রায় সাধারণ জনগণের অজ্ঞেয় হৃদয়গুলিও সমভাবেই স্পন্দিত হইতেছিল। দেশীয় রঙ্গালয়ের ঐক্যতানিক গীতবাণে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। তিন চারিজন বাদক কতকগুলি অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিয়া বয়স্ক বালকগণের যন্ত্রণাপীড়িত ক্রন্দনধ্বনির স্থায় এক প্রকার একঘেয়ে রকমের সুর বাহির করিতেছিল। ‘কাইরো নগরের নাট্যশালায় সুরসংযোগে আরব রাগ-রাগিণীর যেরূপ আলাপন শুনিয়াছিলাম, ইহাও কতকটা সেইরূপই বটে, তবে ইহাতে কোনওরূপ ককর্ষণতা নাই। এখানকার সঙ্গীতে মিশর দেশের সেই কি-জানি-কেমন শ্লেষব্যঙ্গক ভাব বড়

দেখিতে পাইলাম না—সেরূপ কণ্ঠ-উচ্চারণেরও (guttural) প্রাচুর্য্য নাই । শত সহস্র বৎসরের সেই করুণ চিরন্তন বেদনার স্বর পূর্ব্বেরই গ্রাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত যৌবনের চটুল চাপলা ও মাদক বিহ্বল ব্যলীকতাও যে না মিশিয়া গিয়াছে, তাহা নহে । এখানকার গ্রামাঙ্গিনী অভিনেত্রীগণের কেমন যেন গ্লানি বিহীন সংযত ভাব । এই রঙ্গালয়ের কক্ষগুলি যেন তাহাদের নিকট দেবালয় তুল্য পরম পবিত্র স্থান । রঙ্গমঞ্চে স্ব স্ব ভূমিকা-অভিনয়ের জন্য গায়ে রং ও পাউডার মাখিয়া তাহারা যে আর্থানারী-গণের প্রতিভূস্বরূপা তাঁহাদেরই গ্রাম শ্বেতবরনী হইয়া আসিয়াছে ।

অপরাধী ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

“ছিঃ ! ছিঃ ! কি কর ?”

আমি আমার সখের ক্যামেরাটি ভাঙ্গিতেছিলাম । স্ত্রীর কথার উত্তরে না দিয়া খুব জোরে “রসের লেন্সে”র উপর মোটা হাথুড়ির ঘা মারিলাম । ফটক লেন্স শত টুকরা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল । কল্যাণী কোহিনুর হীরার মত একটা টুকরা হাতে লইয়া বলিল—“ছিঃ ! ছিঃ ! এ কি পাগলামী ?”

আমি বলিলাম—শুনিবে কল্যাণী ?

আমার চোখে কি অগ্নি ছিল জানি না । সে বলিল—থাক্ পরে শুনব, স্থির হও ।

আমি কিন্তু স্থির হইতে পারিলাম না, তাহাকে শুনাইলাম । যে প্রাণের আগুন হাত-পা হাড়-মাস গুলাকে পুড়াইতেছিল, সেই আগুনই আমার মত স্বল্পভাষীকে বাগ্মী করিয়া তুলিল ।

সেদিন উপেক্ষের বাড়ী ফটো তুলিতে গিয়াছিলাম । প্রথমে গিয়াছিলাম কোতুক করিতে, শেষে কিন্তু—যাক্ সে কথা । উপেক্ষ-গৃহিণী সবিশেষ অবগত ছিলেন যে, আমি তাঁহার স্বামীর বহুদিনের বন্ধু । আমার নাম শুনিলে তিনি কোনও প্রকারেই উপেক্ষের চেয়ারের হাতের উপর বসিয়া বিলাস-বিলোল কটাফে ক্যামেরার দিকে চাহিয়া ফটো তুলাইতেন না । আমি খুব মোটা ময়লা কাপড় পরিয়া, গায়ে লাংকুথের কোট দিয়া, চীনার দোকানের নয় সিকা দামের ক্যাশিসের

জুতা পায়ে দিয়া ফটো তুলিতে গিয়াছিলাম। তাহার বাড়ীর চাকর-বাকর অবধি কেহ রহস্য প্রকাশ করে নাই। আমার নাম হইয়াছিল—গিরিধারী বাবু।

কিন্তু দ্বিতীয় প্লেট যেমনি খুলিয়াছি, উপেক্ষের কণা শাস্ত আসিয়া বিষম গোল বাধাইল। সে ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল—নলিন বাবু ?

বলে ‘অমৃতং বাল-ভাষিতম্’। কিন্তু অমন সাপের বিষের মত অনিষ্ট ঘটাইতে অপর কোনও কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার জননী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল—যাইবার সময় যে দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া পলাইল, ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিতেই গল্পের রাজপুত্র পাষণ হইত। “নলিন বাবু” বলিয়াই শাস্ত তাহার সেই নবনীত করে, আমার ক্যামেরার তিনটি সরু কাষ্ঠপদের একটি ধরিয়া টান মারিল, তাহাতে ক্যামেরা ভগ্ন-উরু দুর্ঘোষনের মত বুঁকিয়া পড়িল। প্লেটখানায় রোদ্দ লাগিয়া খারাপ হইল। একে উপেক্ষ-গৃহিণীর কটাক্ষাঘাতে হাত পা একটু কাঁপিতেছিল, তাহার উপর সকল দিক সামলাইতে গিয়া সুইডট ভূপতিত হইল। কাজেই শাস্ত আসিবার পূর্বে উপেক্ষ-দম্পতির যে যুগলরূপ ক্যামেরাবন্ধ করিয়াছিলাম তাহাও ধ্বংস হইল। মোটের উপর বালিকার এক অসংযত স্নেহ-সন্তুষ্ট্যে এত সাজ-সরঞ্জাম, এত ষড়যন্ত্র, এত পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড হইল। বালিকা বিজয়-গর্বে করতালি দিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জোর করিয়া ধরিলাম। সেই নবনীত মত দেহ, সেই গোলাপের মত মুখ, সেই বিজয়-গর্ভিত দুষ্ট চক্ষুর লালিত্যে আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কথা ভুলিয়া গেলাম। তাহাকে তুলিয়া লইয়া বারম্বার তাহার মুখচুষন করিলাম। সে শূন্য হাত পা ছুঁড়িতেছিল, আমার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলাম—শাস্ত ! তুমি ভারি দুষ্টু ! দেখ দেখি কি করলে ?

সে সেই বিভীষিকার দিকে চাহিল—সে চাহনিতে আত্মগানি ছিল না, অনুতাপ ছিল না, আমার দুঃখের জন্ত কাতরতা ছিল না। চিত্রকর মনের ভাব চিত্রে ফলাইয়া স্বহস্ত-চিত্রিত আলেখ্যে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কেশরী হরিণ মারিয়া যেমন গর্ভিত হয়, শাস্ত তেমনি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিল, তেমনি গর্ভ অনুভব করিতেছিল। সে বলিল—এতা কি ?

আমি বলিলাম—ছবির কল।

সে বলিল—কি ছবির কল ?

আমি তাহাকে বুঝাইলাম যে সেই যন্ত্রের সাহায্যে; লোকের মূর্তি অঙ্কিত হইতে পারে। তাহাদের ঘরে অনেকের ফটোগ্রাফ ছিল—শান্ত বুঝিল। কিন্তু শেষে বলিল—আমাল তবি ক'লে দাও।

কাল তুলিয়া দিব, বৈকালে তুলিব, মধ্যাহ্নে তুলিব। তাহাতেও না, সে এক হাতে আমার হাঁটুর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল অপর হাতে ক্যামেরার দিকে দেখাইতে লাগিল, আর এক একটা ওজরে অন্ততঃ পাঁচটা করিয়া 'না' বলিতে লাগিল। আমি শেষে আধ ঘণ্টার সময় চাহিলাম—তাহাতেও সে সন্মত হইল না। সে বলিল—একুনি।

অগত্যা তাহার সহিত প্রতারণা করিতে হইল। তাহাকে তাহার পিতৃ-পরিত্যক্ত কাষ্ঠাসনে বসাইলাম। শিশু ভারি সুখী। ক্যামেরা ঠিক করিলাম। বলিলাম—“ন'ড না, চোখ বুজো না”। সে স্থির হইয়া বসিল। আমি আবরণ মুক্ত করিলাম। প্রকৃত ছবি তুলিতে যাহা যাহা করিতে হয় সকলই করিলাম। সে বড় তৃপ্তিলাভ করিল, মধুর অধরে বড় মধুর হাসি হাসিল। শেষে বলিল—‘তবি দাও’।

তাহাকে বুঝাইলাম যে কলের ভিতর ছবি তৈয়ারি হইতেছে। সময় লাগিবে। সে কিছুতেই ছাড়িবে না। তাহার পিতা আমার কথা সমর্থন করিল। তবে আমি সেদিন নিষ্কৃতি পাইলাম।

তাহার পর আমাকে দেখিলেই শান্ত বলে—“তবি?” আমিও প্রতিজ্ঞা করি—“কাল দ'ব”। দুই শিশু একটার পর একটা নূতন খেলায় মাতিয়া যায়, আমার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। আমার কিন্তু প্রত্যহ আত্মগানি হইত, প্রত্যহ মনে করিতাম কল্য ক্যামেরা লইয়া গিয়া শান্তর ছবি তুলিব।

সেদিন মহা-উল্লাসে উপেক্ষের বাড়ী ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলাম। মনে মনে শান্তর আনন্দের হাসিটুকু কল্পনা করিতেছিলাম, সে ক্যামেরা দেখিয়া করতালি দিয়া নাচিবে, সে চিত্র মানস-চক্ষে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ তাহাদের বাটা গিয়া শুনিলাম—শান্ত আমার বাড়ী গিয়াছে।

বড় আত্মগানি হইল। প্রাণের মধ্যে বড় যন্ত্রণা হইল। আপনার উপর বিরক্ত হইলাম, নিজের দীর্ঘসূত্রতার নিন্দা করিলাম। নিজেকে ঘোর অপরাধী বিবেচনা করিলাম, অথচ স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলাম এতটা আত্ম-তিরস্কার নিরর্থক।

কাল উপেক্ষের বাড়ী গিয়াছিলাম। সকলে বসিয়া আছে কিন্তু কাহারও

মুখে কথা নাই, কাহারও দৃষ্টিতে জ্যোতিঃ নাই, আমার নিকট যেন তাহার মপরিবারে অপরাধী, কেহ সাহস করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে পারে না।

আমি কথা কহিলাম। খুব আন্তে বলিলাম—“কি ব্যাপার ?”

আমার সেই মূঢ় শব্দগুলো যেন সেই ঘরের গাঢ় নিস্তব্ধতার কাছে অপরাধী বলিয়া মনে হইল।

উপেক্ষ একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চাহনিতে আমার বুকের রক্ত অবধি জমিয়া গেল। উঃ! কি ভীষণ, কাতর চাহনি!

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—কি—ব্যা—

সে বালকের মত কাঁদিয়া বলিল—ভাই! শান্ত!—তুমি কি তার ছবি তুলেছিলে?

আমি অর্ধফুট স্বরে বলিলাম—না।

সে দুই হস্তে আমার স্কন্ধ ধরিয়া বলিল—আহা! বাছার আমার কোন চিহ্ন রহিল না! একখানা ছবিও না! ওঃ!

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। যে কথাটা বুঝিতেছিলাম সে কথাটা বিশ্বাস করিতে প্রাণ চাহিল না। আমি নলিনের ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলাম।

সে চোখ মুছিতে মুছিতে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া বলিল—তিন দিনের জরে।

আমি বলিলাম—অ্যা!

সে ধীরে ধীরে বলিল—আহা! শান্ত আপনাকে বড় ভালবাসত। বিকারের সময় অনেকবার আপনার নাম করেছিল—নলিন বাবু—তবি—তবি—

সে আর বলিতে পারিল না। অগ্রজের মত সেও কাঁদিতে লাগিল।

এবার আমার চক্ষের বাঁধ ভাঙ্গিল। উঃ! কি অপরাধই করিয়াছিলাম!

* * * * *

আমি ক্যামেরা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছিলাম—কল্যাণী এক কোণে দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছিতেছিল। তবু সে শান্তকে কখনও দেখেনাই। আহা! সে পারিজাত কুম্বের কোন চিহ্নই এ জগতে রহিল না—একখানা ছবিও না!

কবি ভুবনমোহন ।

[শ্রীনীগোপাল মজুমদার ।]

বঙ্গবাহীর যে সকল সেবককে কালবশে আমরা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে ঠাঁহাদিগের নাম, যে কারণেই হউক, বাদ পড়িয়া গিয়াছে, ভুবনমোহন ঠাঁহাদিগের অন্ততম । কত লেখকের নাম আমরা ভুলিয়াছি, ভুলিয়া যাইব, আমরাদিগকে বাধ্য হইয়া ভুলিতে হইবে— অকৃতীর সন্ধান কে রাখে?—বিন্তু ভুবনমোহন অকৃতী নহেন, ঠাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না—ঠাঁহার সন্ধান আর কেহ না রাখুক, অন্ততঃ ঠাঁহার স্বদেশবাসী রাখিবে ।

বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ২২শে আষাঢ় শনিবার খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থবংশে ভুবনমোহনের জন্ম হয় । শ্রীপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান । বঙ্গজ কায়স্থগণের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বাঙ্গালার সর্বত্র এই স্থান পুরিচিত । ভুবনমোহনের পিতার নাম তারকচন্দ্র ঝায়চৌধুরী, মাতা ভগবতী দাসী । তারকচন্দ্র যশোহরের এক থানায় মুহুরিগিরি করিতেন । পরে মুহুরি-গিরি ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদের উকীল হন । ১২৪০ সালে মুর্শিদাবাদের কোর্ট উঠিয়া গেলে তিনি কলিকাতায় যাইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হইয়া ছিলেন । ওকালতি করিয়া তিনি যথেষ্ট পরমা পাইতেন ; ইহা ছাড়া ঠাঁহার সম্পত্তির আরও নিতান্ত কম ছিল না । তিনি দেবসেবার বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন । শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রের দারিদ্র্যবিমোচনেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন । মন্দিরস্থাপন, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সংকল্পে তিনি নিজের নাম রাখিয়া গিয়াছেন । কালীঘাটে ঠাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি ঘাট এখনও আছে । কলিকাতায় ওকালতি আরম্ভ করিয়া পুত্র ভুবনমোহনকে ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন । পিতা পুত্র ভবানীপুরেই একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন । কলিকাতায় আসিবার চারি বৎসর পরে চক্রবেড়িয়ার তারকচন্দ্র একখানি বাটী ক্রয় করেন । ১২৪৫ সালের ১৬ই বৈশাখ ঠাঁহারা সপরিবারে এই চক্রবেড়িয়ার বাটীতে উঠিয়া আসেন । ভুবনমোহন বৈশাখ দশমী দিন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই । মিশনারীদের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন । এই সময়ের মধ্যে ইংরাজী তিনি 'সামান্যই শিখিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত । ইংরাজীশিক্ষার প্রসার তখনও এদেশে তেমন হয় নাই ; পারস্য ও উর্দু ভাষাই তখনকার লোকে বৈশী

শিখিত। কোর্টেও এই দুই ভাষা চলিত। ভুবনমোহনও প্রচলিত রীতি অনুসারে ঘরে বসিয়া মৌলবীর শ্বিকট উক্ত দুই ভাষা শিক্ষা করেন। ১২৪৬ সালে তিনি পরিণয়স্থলে আবদ্ধ হন। ১২৪৭ সালের ৩০শে ফাল্গুন হাতের সোণার বালা খুলিয়া রাখিয়া ভুবনমোহন সদর দেওয়ানী আদালতে যাইয়া উকীল হইলেন। তখন তাঁহার বয়স বোড়শ বৎসর মাত্র। তখনও এদেশে পরীক্ষা দিয়া উকীল হইবার প্রথা হয় নাই। যাহারা সম্রাটবংশীয়, ওকালতীর সনন্দ তাঁহারা সহজেই পাঠতেন। সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে গবর্নমেন্ট নিয়ম করিলেন, যে, পরীক্ষায় পাশ না হইলে কেহ উকীল হইতে পারিবেন না। ভুবনমোহন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উকীলবন্ধুদিগের মধ্যে কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, শ্রীনাথ দাস, গোপাললাল মিত্র, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হেমবাবু তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া ভুবনমোহন সাহিত্যের আশ্বাদ পাইলেন। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল যাহা তাঁহাকে কাব্যচর্চায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। ১২৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহাদের ভবানীপুরের বাটীতে দিকসুই মনবাসী কৃষ্ণমোহন ঞায়পঞ্চানন ও বাঁশবেড়িয়ার শ্রীধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তখনকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ কথক ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করেন। ভুবনমোহন সংস্কৃত জানিতেন না। কথকদিগের মুখে এই প্রথম তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনিলেন। সংস্কৃত শ্লোক যে কত মধুর, অমৃতময় তাহা এই প্রথম জানিতে পাইলেন। সংস্কৃতছন্দের গীতিময় উল্লসিত বন্ধার তাঁহার চিত্তকে মুগ্ধ করিল, নন্দিত করিল, পিপাসু করিল। সে মোহ সঙ্গীতের জগৎ, সে আনন্দ শব্দকোশল-সম্বৃত, সে পিপাসার কারণ সংস্কৃত কাব্যের উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। সংস্কৃত ভাষা না জানিলেও তাহার ধ্বনি তাঁহাকে জানাইয়া দিল, এমন ছন্দ, এমন শব্দসম্ভার, এমন পদলালিত্রা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি—ভারতবাসীর আপনার বলিতে যদি কিছু থাকে, তাহা এই। ভুবনমোহন ভাবিলেন, এমন সুন্দর জিনিষ অবহেলা করিবার নহে। সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণে কয়েকটি বাঙ্গালা শ্লোক রচনা করিবার ইচ্ছা হইল। উৎসাহের অভাব ছিল না, ইচ্ছা অচিরে কার্য্যে পরিণত হইল। কথকেরা দেখিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বয়ের কারণ আরও হইল এই, ভুবনমোহনের কোনও কোনও শ্লোক অবিকল সংস্কৃতছন্দের নিয়মানুযায়ী হইয়াছিল। সেই সকল সংস্কৃতছন্দের নাম কথকদিগের মুখেই

প্রথম শুনিলেন। ছন্দ কি, এবং কিরূপে তাহার নিয়ম শিক্ষা করা যায় জানিতে উৎসুক হইলেন। রাখাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুমে' ছন্দঃ শব্দের উপর যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে তাহা পড়িয়া তাঁহার কতকটা জ্ঞান হইল। কিন্তু, পিপাসা মিটিল না। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী এবং চিরঞ্জীবের বৃত্তরত্নাবলী দেখিয়া লইতে ছাড়িলেন না। সংস্কৃত তো বুঝিতেন না, কোনও ভট্টাচার্য্যাকে ধরিয়া উহার মোটাগুটি অর্ধটা বুঝিয়া লইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার অভ্যাস হইল, সংস্কৃতকাব্য পাইলেই, বুঝুন আর না বুঝুন, আগাগোড়া পড়িয়া যাইতেন। কিছুদিন এইরূপ করিয়া সংস্কৃতছন্দে তাঁহার ব্যুৎপত্তি পাকা হইল। অনেক সংস্কৃত শব্দও শিখিয়া ফেলিলেন।

১২৫৭ সালের ২৩শে বৈশাখ ভুবনমোহনের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রথমা বলিলাম, কেন না, ভুবনমোহন আবার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার তারিণী নামে এক কন্যা ও গঙ্গেশ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। ভুবনমোহনের দ্বিতীয় বার বিবাহ ১২৫৭ সালের ২৭শে মাঘ পুঁড়ার লোকনাথ বসুর কন্যার সহিত হয়। ইনি একটি কন্যা রাখিয়া কয়েক বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন। ইহার মৃত্যুর পর ভুবনমোহন খুলনা জেলার উৎকলনিগামী রামচন্দ্র বসুর কন্যা সৌদামিনী দাসীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের সময়ে ভুবনমোহনের পূর্বে দুই পক্ষের সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পত্নী এখনও জীবিত আছেন। ইহার গর্ভে ভুবনমোহনের ভূপতি ও গীষ্পতি নামে দুই পুত্র এবং দুই কন্যা হয়। ইহারা এখন ভবানীপুরের বাটিতেই বাস করেন। প্রথম পুত্র বিষয়কর্ম দেখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পুত্র পূর্বে 'হাওড়া হিতৈষী' নামে একখানা কাগজ চালাইতেন; কাগজখানি এখন উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখককে 'ইহারা ভুবনমোহনের জীবন সম্বন্ধে নানা মাল-মশলা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সময়েই ভুবনমোহনের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। ঋতবোধ, ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তরত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার 'ছন্দো-গ্রন্থ' সকল দেখিয়া, তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, উহাতে যত প্রকার ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ দেওয়া আছে, তত প্রকার ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লিখেন। "ছন্দঃ-কুসুম" নামক গ্রন্থ এই ইচ্ছারই ফল। উহার 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলিয়াছেন, "আমি ইহা পূর্বে মুদ্রাঙ্কন মানসে প্রস্তুত করি নাই, সংস্কৃত ছন্দঃ সকল সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইলে সুললিত এবং সুশ্রাব্য হইতে পারে কি না ইহা পরীক্ষা

করণার্থে রচনা করিয়াছিলাম ।” হেমবাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ছন্দঃকুসুম রচিত হইলে হেমবাবুর খিদিরপুরের বাসায় একটা বৈঠক করিয়া তাঁহার গ্রন্থ পড়া হয়। হেমচন্দ্র ছন্দঃকুসুমের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, কিন্তু বলিলেন—এই গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দের যে সকল বাঙ্গালা উদাহরণ আপনি দিয়াছেন, সেগুলি আমার নিকট কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। এই সকল ছন্দঃ অবলম্বন করিয়া আপনি যদি একখানি কাব্য লিখিতে পারেন তবে, আপনার কৃতিত্ব স্বীকার করিতে পারি। ভুবনমোহন সংস্কৃত ছন্দে একখানি কাব্য লিখিবেন অঙ্গীকার করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি “পাণ্ডবচরিত” নামে এক কাব্য লিখেন। সে কথা পরে বলিতেছি। ১৯৭০ সালের ফাল্গুন মাসে ছন্দঃকুসুম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকা হইতে জানা যায়, ভুবনমোহনের পরম বন্ধু বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। এবিষয়ে তিনি আর এক ব্যক্তির সহায়তা পাইয়াছিলেন, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ বিজ্ঞানরত্ন। রামনারায়ণ তাঁহার গ্রন্থখানি আত্মোপাস্ত পড়িয়া সংশোধিত করিয়া দেন। ছন্দঃকুসুম প্রকাশিত হইলে তখনকার অনেক কাগজে ইহার প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার “রহস্যসন্দর্ভে” লিখিলেন, “শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। * * * * ঐ গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরী ও বৃন্দরত্নাবলী গ্রন্থ, তাহার ভাষানুবাদ, ও ভাষায় ঐ সকল ছন্দের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দৃষ্টান্তগুলিই নূতন পদার্থ; কারণ এতৎপূর্বে কেহ তোটক প্রভৃতি তিন চারিটা ছন্দোভিন্ন অন্ত কোনও ছন্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সিদ্ধকাম হয়েন নাই। এইরূপে চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা সম্যক সফল হইয়াছে, এবং তদর্থে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত সংস্কৃত বৃন্দছন্দ ও মাত্রা-ছন্দ বাঙ্গালাতে রচিত হইতে পারে, এবং লঘু ও গুরুর প্রকৃত উচ্চারণ করিলে তাহাতে তাহাদের কাণ্ডির হানি হয় না। অধিকন্তু যাহারা কহেন যে মিত্রাক্ষর ভিন্ন বাঙ্গালাতে ছন্দ হয় না, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিবেন যে, ছন্দের অন্তপ্রয়োজনীয় অঙ্গ মিত্রাক্ষর নহে; তাহা অলঙ্কার মাত্র, এবং তাহার ত্যাগে ছন্দের কিছুমাত্র হানি হয় না।” (রহস্যসন্দর্ভ—সম্বৎ ১৯২১, ২ পর্ব, ১৩ খণ্ড, পৃ: ১৫)

ছন্দঃকুসুম প্রকাশিত হইলে লালমোহন বিদ্যানিধি কাব্যনির্গম গ্রন্থে, ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকায় উহার বহু শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত,

করেন। কবি হেমচন্দ্র মাইকেলের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিতে যাইয়া ভুবন-মোহনের ছন্দঃকুম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বাঙ্গালা ছন্দঃ রচনা হইতে পারে এবং ভুবনচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত ছন্দঃকুম্ব গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা যাইতেছে। কিন্তু বোধ হয় যে, যতদিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, ততদিন সে প্রণালীতে পণ্ডরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইহা ছন্দঃকুম্বখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সময় ভুবনমোহনের ছন্দঃকুম্ব বাহির হয়। হাইকোর্টে তিন বৎসর প্রাক্টিস্ করিবার পর তিনি মুম্বৈ হইলেন। মুম্বৈ হইয়া তিনি প্রথমে বাঁকুড়ায় গেলেন। সেখানে এককালে সাত বৎসর ছিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ১২৭৪ সালের ২২শে পৌষ তারিখে শ্রীপুরের বাটিতে ভুবনমোহনের পিতা তারকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভুবনমোহন বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া নেত্রকোণায় যান। জেলার জজ্ টিনিসাহেব তাঁহার কাজকর্ম খুব সমৃদ্ধ ছিলেন এবং সর্বদা তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। নেত্রকোণায় তিন বৎসর কাটিয়া যায়। ভুবনমোহন এই সময় রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং ছয় মাসের ছুটি লইয়া ভবানীপুরের বাটিতে আসেন। বিধাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিকিৎসায় ভুবনমোহন আরোগ্যলাভ করেন। ছুটি ফুরাইলে তিনি বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম সবডিভিসনে মুম্বৈ হইয়া যান। তখন স্বনামধন্য বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় জেলার জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহিত ভুবনমোহনের খুব সম্বন্ধ ছিল। হেমচন্দ্রের কথামত তিনি পূর্বে পাণ্ডবচরিত নামে সংস্কৃত ছন্দে একখানি কাব্য লিখেন, কিন্তু এতদিন তাহা ছাপান নাই। এই সময় উহা রমেশবাবুকে দেখাইলেন। রমেশবাবু তাঁহাকে উক্ত কাব্যখানি মুদ্রিত করিতে উপদেশ দেন। ১২৮৩ সালের চৈত্র মাসে কলিকাতা ষ্ট্যান্ডার্ড পত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া পাণ্ডবচরিত প্রকাশিত হয়। ভুবনমোহন তখন বনগ্রামে। এখানে পাঁচ বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকায় বদলি হন। ঢাকায় কিছুদিন কাজ করিয়া তিন মাসের ছুটিতে ভুবনবাবু ভবানীপুরে আসেন। ভবানীপুরে ছুটি কাটাওয়া, ডারানগুহারবারে যান। সেখানে এক বৎসর কাজ করিবার পর পেন্সন লন। সর্বশুদ্ধ তাঁহার পনের বৎসর কাজ হইয়াছিল। মাসিক ৪০০ টাকা মাহিনা পাইতেন, উহার তৃতীয়াংশ তাঁহার পেন্সন হইল। ১২৮৯ সালে, তাঁহার অবসর-গ্রহণের কিছুদিন পরে, ভুবনমোহন একবার বাটা হইতে রাগ করিয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হন। গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ঘুরিয়া তই মাস পরে বাটা ফিরিলেন। এই সময় তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তি খুব প্রবল হইয়াছিল। সাহিত্যিক আহার করিতেন, নিত্য পূজা করিতেন, সর্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি একখানি গ্রন্থও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—অবশ্য উহা গণ্যে, কিন্তু সে গ্রন্থ শেষ করিয়া হইতে পারেন নাই। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বার বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।

জীবনের শেষভাগ তিনি কাশীতে কাটান। ১৩০১ সালের আশ্বিন মাসের ৮ শারদীয়া পূজার পরবর্ত্তী দ্বাদশী তিথিতে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জীবনের বিবরণ সংক্ষেপে বলিলাম। তাঁহার কাব্যসম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। *

সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লেখার চেষ্টা কে প্রথম করেন তাহা জানি না। ভারতচন্দ্রের 'শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা' সংস্কৃত ছন্দে রচিত। তাঁহার সেই 'ছলচ্ছল, লৈটল, কলকল তরঙ্গা' বাঙ্গালী পাঠক কখনও ভুলিতে পারিবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন লেখক বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দঃ বসাইতে আবার চেষ্টা করেন। একজন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, আর একজন ভুবনমোহন রায়চৌধুরী, বলদেব পালিত আর একজন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার কাব্যে দুই একটা সংস্কৃত ছন্দঃ চালাইয়াছেন। হেমচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দে "দশমহাবিগ্না" লিখেন। গুনিয়াছি ভুবনবাবুর দেখা দেখিই তিনি উক্ত কাব্য-রচনা করেন। বলদেব পালিতের 'ভর্তৃহরি' কাব্য ১২৭৯ সালে, অর্থাৎ ভুবনমোহনের ছন্দঃকুসুম বাহির হইবার নয় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। ভর্তৃহরিকাব্য আগাগোড়া সংস্কৃত ছন্দে। ভুবনবাবু ছাড়া আর সকলেই ইচ্ছামত সংস্কৃত ভিন্ন অগ্র ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা যাইতে পারে যে, বলদেববাবুর 'কাব্যমঞ্জরী'তে সংস্কৃত ছন্দে রচিত কবিতা একবারেই নাই। কিন্তু ভুবনমোহন সংস্কৃত ছন্দঃ ছাড়া অগ্র ছন্দে কোনও কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার পুত্রেরাও জানেন না। তাঁহার ছন্দঃকুসুম গ্রন্থে ১৮৩ রকম সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালা উদাহরণ আছে। এই গ্রন্থের শেষে ১৫টা পারসী ছন্দেও কতকগুলি শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। ভুবনমোহনের নিজের ব্যবহারের জন্ত যে ছন্দঃকুসুমখানি ছিল তাহা পাইয়াছি। উহাতে পারসী ছন্দগুলির বাঙ্গালা উদাহরণের পাশেই পারস্য ভাষায় প্রচলিত কতিপয় শ্লোক স্বহস্তে টুকিয়া রাখিয়াছেন। ছন্দঃকুসুমে প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে ভাবের একটা পারস্পর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। কাব্যচ্ছলে গ্রন্থে কৃষ্ণের মানভিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। কবি ছন্দের লক্ষণ সংস্কৃতছন্দে গ্রথিত পণ্ডে নির্দেশ করিয়াছেন।

পাণ্ডবচরিত কাব্যখানি ছন্দঃকুসুমের সাহিত্যস্বরূপ রচিত হয়। দ্বাবিংশতি সর্গে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। এক এক সর্গ এক অথবা দুইটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় বলিতেছেন, "আদৌ সংস্কৃতছন্দঃ সকল সাধুভাষায় ব্যবহারের উপযোগিতা প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্যে সংস্কৃত ভাষার সহিত তদাভিজাতা প্রাকৃত ভাষার ভেদভাব নিরাকরণে পুনর্নির্লনসম্পাদন, আমার এই পুস্তকরচনার উক্ত দুই উদ্দেশ্যমাত্র ;

* তাঁহার কাব্যসম্বন্ধে ইহার পূর্বেও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। 'প্রবাসী' বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক, ১৩২০ সাল। 'অর্ঘ্য'—শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২০ সাল। 'টাকা রিভিউ ও মন্সিলন'—ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

ভক্তিগ্ন আর 'কিছুই বাসনা নাই।" কবি এই কাব্যের উপাদান মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভুবনমোহনের কাব্য সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র মহাশয় 'অর্ঘ্য' পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভুবনমোহনের কাব্য হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধে বাহ্যাহেতু উদ্ধৃত হইল না। কবির রচনায় শব্দনির্বাচন ক্ষমতা বেশ প্রকাশ প্রায়। ছন্দের উপর তাঁহার কি অসাধারণ অধিকার ছিল তাহাও বুঝা যায়। শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দঃ বসাইবার যাহা দোষ তাহাও উহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল অবিকল সংস্কৃত শব্দ আছে, হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়মে পড়িলে সেগুলি নিতান্ত খাপছাড়া শুনায় না। কিন্তু বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ক্রিয়াপদের অনুরূপ নহে; সেগুলিকে ঐনিয়মে পড়িলে নিতান্ত কদর্যা শুনায়। বিশেষতঃ কেবল সংস্কৃত শব্দ লইয়া বাঙ্গালাভাষা চলে নাই, চলিতে পারে না, বা চলিবে না। প্রাকৃত শব্দ না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার স্বাভাবিকতা থাকিত না। প্রাকৃত শব্দ, অর্থাৎ যে সকল শব্দ উচ্চারণের খাতিরে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সকল শব্দের উপর সংস্কৃতের হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়ম চালান অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়মে এই সকল প্রাকৃত শব্দ বা ক্রিয়াপদের উচ্চারণ কখনই সম্ভব নহে, তাহা হাশ্বোদীপক হয় মাত্র। এখানে একটি মজার কথা বলি। ভুবনবাবু ছন্দঃকুসুম যখন হেমচন্দ্রের খিদিরপুরের বাসায় গিয়া পড়িয়া শুনান, তখন একজন রসিক ব্যক্তি সহসা হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে কৈলাসদাদা চাদর আন"। তিনি ঠিকই ধরিয়াছিলেন। ছন্দঃকুসুম বা পাণ্ডুবচরিতে যেখানে বড় বড় সমাসগর্ভ বা ক্রিয়াপদ বিরল কবিতা আছে, সেখানে কবির লেখা বড় মধুর, সুন্দর হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলে, অস্তান্ত স্থানে রচনা "কৈলাসদাদা চাদর আন" গোছেরই হইয়াছে। সে যাহা হউক, শত দোষ থাকিলেও ভুবনবাবুর কাব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। তাঁহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল, তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে তাহার প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখিবেন, ইহার অদম্য অধ্যবসায়ের কথা তিনি যেন বিস্মৃত না হন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতার স্বনামধন্য সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রতি বৎসরের জায় এ বৎসরও 'কেশরঞ্জন পঞ্জিকা' প্রকাশিত করিয়াছেন এবং এই দুর্বৎসরেও উহা বিনামূল্যে সাধারণকে বিতরণ করিতেছেন। পঞ্জিকাখানি সাধারণের উপকারে আসিবে। আনন্দের সহিত আমরা উক্ত পঞ্জিকা এই সংখ্যা 'অর্চনা'র সহিত গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরণ করিলাম।

শ্রীচৈতন্য । *

[অধ্যাপক—শ্রীপ্রভাকর কাব্যমুখতি মীমাংসাতীর্থ ।]

অপারং কস্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দশুকুকী,
রসস্তোমং হৃদামধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রেছ্যতিমিতদীয়াং প্রকটয়ন্,
সদেবশৈতন্ত্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই শ্রীচৈতন্যকৃপালাভজন্তু চৈতন্যষ্টক নামক গ্রন্থের যে শ্লোকটি পাঠ করিলাম, তাহার অর্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তিনি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব, কোতুহলপরবশ হইয়া কোনও প্রণয়িজনবৃন্দের অনির্কচনীয় মধুররসরাশি অপহরণপূর্বক উপভোগ করিবার জন্ত তাঁহাদিগেরই কাঙ্ক্ষিত উগ্ররে প্রকাশ করিয়া স্বীয় কাঙ্ক্ষিত আচ্ছাদিত করিয়াছেন। ভক্তপ্রধান শ্রীপাদরূপ গৌরামী এই যে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌররূপ বর্ণনা করিলেন ইহা কিরূপ; এই শ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করিলে আমাদের কাছে বুদ্ধিতে হইবে শ্রীগৌরানন্দদেবের এই গৌররূপ, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, তাহা তাঁহার নিজের রূপ নহে, তিনি কোনও ক্রীড়া প্রকটনার্থ কুতুকী হইয়া (যেমন সাধারণ ক্রীড়ক ক্রীড়া প্রদর্শন কালে করে) স্বীয় রূপ পিহিত করিয়াছেন। যদি তাই হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত রূপ কি? কেনই বা তিনি নিমাই হইয়াও, শ্রীচৈতন্য হইয়াও গৌরানন্দ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে—যে রূপ ভাবে আমাদের দেশে এক বিরাট ভক্তসম্প্রদায় বৃদ্ধিলা থাকেন—সেইরূপ ভাবে বুঝিতে হইলে, আমাদের কাছে ভাল করিয়া তাঁহার চরিত্র ও কার্যকলাপ আলোচনা করিতে হয়—জন্মাবধি তিরোধান পর্য্যন্ত তাঁহার সমুদয় কার্য অনুসন্ধান করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষগণের আদিনিবাস শ্রীহট্টপ্রদেশে। বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গা-বাস বাসনায় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্র একজন স্বধর্মনিরত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে ইহাদের ৮টা কন্যা জন্মে ও শিশু অবস্থাতেই কালপ্রাপ্ত হয়। পরে বিশ্বরূপ নামে ইহার জ্যেষ্ঠ জন্মগ্রহণ

* সংস্কৃত সভায় ইহা লেখক কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

করেন। ইনি অকৃতদার ছিলেন, এবং ইনিও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পর ষাঁহার আবির্ভাব জন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ বরণ্য, ষাঁহাকে আমার বলিয়া বঙ্গবাসী, আমরা অত্রের নিকট শ্রাঘ্য এবং ষাঁহার জন্ত আজ বঙ্গবাসী, জনসাধারণের নিকট পূজা, সেই প্রবরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্য হইতেই অসাধারণমেধাবী ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি ইঁহার পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, শ্রীহট্টাদি প্রদেশে কলাপ ব্যাকরণ প্রচলিত, ইনি সেই কলাপ ব্যাকরণ প্রথমে অধ্যয়ন করেন। পরে কলাপ ব্যাকরণের একখানি 'পঞ্জি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহা এখন আর পাওয়া যায় না। আমরা দেখিতে পাই তিনি যখন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ ছাত্রবৃন্দ বলিয়াছিল, আপনার পঞ্জিদ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকি। যাক্ এই ভাবে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে সমগ্র গ্রামশাস্ত্রে ও তৎকাল-প্রচলিত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থায় বড়ই চপলস্বভাব ছিলেন। কথিত আছে, পূজাজপপরায়ণা কামিনীগণের পূজোপহার ছলপূর্বক ভক্ষণ করিতেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি প্রথমতঃ "লক্ষ্মীমণী" নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে তিনি যখন পূর্ববঙ্গে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন তৎকালে লক্ষ্মীদেবীর কাল হয়। তিনি গৃহে আগমন করিয়া পতিহীনা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগবিধুরা জননীর প্রীতিকামনায় পুনরায় "বিষ্ণুপ্রিয়া" নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমরা অনুমান করি, সম্ভবতঃ গুণাবিতা প্রথমা পত্নীর প্রতি বন্ধানুরাগ প্রযুক্ত দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কারণ আমরা বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুদেবীর বড় একটা উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াও তিনি মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এমন কি, ক্রীক্বেত্রে অবস্থান কালে মাতৃদেবীর নামে পৃথক ভাবে মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন। কুলিনগ্রামে অবস্থান সময়ে মাতার স্বহস্ত পাক অন্ন পরম প্রীতিভরে ভক্ষণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশাগত বৈষ্ণবদের নিকট হইতে মাতৃসন্দেশ সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ধর্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, তাঁহার এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও পুত্রাদি হয় নাই। তিনি এই সময় অধ্যাপনা কার্যে রত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া নানাস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিংবদন্তি আছে, নিম্বার্কমত প্রচারক কেশবাচার্য্য নামক কাশ্মীরদেশীয় কোনও দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া এই নবীন পণ্ডিতের

নিকট পরাজিত হইয়া যান। প্রবাদ আছে, তিনি ঞ্জয়শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—এবং রঘুনাথ শিরোমণি (কানভট্ট) মহাশয়ও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। একদা তিনি রঘুনাথ শিরোমণিকে স্বরচিত গ্রন্থখানি দেখিতে দেন, ইহাতে রঘুনাথ শিরোমণি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য, দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলেন, আমিও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার এই গ্রন্থখানি এত ভাল হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ থাকিতে কেহই আমার এই গ্রন্থের আদর করিবে না। ইহা শুনিয়া চৈতন্যদেব স্বরচিত গ্রন্থখানি তদগোঁই গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া দেন, এবং বলেন, ভাই আজ হইতে তোমার গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হউক। আমরা এরূপ মহত্ব ও স্বার্থত্যাগ কোথাও দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, যে ঘটনাস্রোত তাঁহাকে এত মহান্ করিয়া তুলিয়াছে, সেই ঘটনাস্রোত এবার তাঁহার নিকট আসিয়া সংযুক্ত হইল, তিনি পিতৃকৃত্য সাধনবাসনার গম্মাধামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম সংদর্শন করিয়া কি যেন তাঁহার পুরাণ স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইল, হঠাৎ তাঁহার অপূর্ব প্রেমময় ভাব জাগিয়া উঠিল, সেই হইতে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পথের পথিক হইলেন। যে পথে গমন করিলে লোক জন্মমরণ বর্জিত হয়, তিনি সেই পথের সন্ধান পাইলেন। গম্মাধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি দীক্ষিত হইলেন। আমরা এই দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই নিমাই-চন্দ্রকে চৈতন্যচন্দ্ররূপে পূর্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত দেখি। তখন হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ হইতে থাকে। তিনি নিরন্তর নামজপে রত থাকিতেন ও হরিসঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন। কখনও কখনও ভাবাবেশে বিভোর হইয়া বাহুজ্ঞান বিরহিত হইয়া তিনি উন্মত্তের ঞ্জয় বিচরণ করিতেন। একদিন ভাবাবেশে ছাত্রদিগকে তাড়া করিয়াছিলেন, তাহাতে ছাত্রগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। গয়া হইতে আগমনের পর হইতেই এঁকে একে ছাত্রগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে প্রকাশ্য রাজপথে তাড়া করাতে তাহারা তাঁহাকে নিরতিশয় নিন্দা করিতে লাগিল। এদিকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দৈবযোগে কেশব ভারতী নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আমরা দেখিতে পাই, তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পরও সন্ন্যাসীদিগের ঞ্জয় বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণে একান্ত বিরত থাকিয়া কেবল নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই করিতেন। আমরা দেখিতে পাই, তিনি প্রথমতঃ ঈশ্বরপুরীর শিষ্যত্ব, পরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। এই উভয় সাধুপুরুষই শঙ্করাচার্য্যসম্প্রদায় ভুক্ত। কেন না—শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ী

সন্ন্যাসিগণ, গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, কানন, পর্বত, সরস্বতী, এই দশ নামে খ্যাত । অতএব পূর্বোক্ত ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতী ইহারা শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত । কিন্তু ইনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীগণের গ্রাম বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন না, প্রত্যুত নানাস্থানে বেদান্ত শাস্ত্রের দোষই দেখাইয়াছেন । কাশীতে অবস্থান কালে যখন কাশীবাসী শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার এইরূপ সঙ্কীর্তন ও নৃত্যাদি দর্শনে বিস্মিত হইয়া এক সভায় মিলিত হন, তখন প্রকাশানন্দ নামক এক শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী—(যাহার ভক্তিয়াজন সময়ের নাম প্রবোধানন্দ—যিনি পরে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীবৃন্দাবন শতক এবং শ্রীবৃন্দাবন রসামৃত নামক গ্রন্থাদি রচনা করেন তিনি) তাঁহাকে দ্বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (আমরা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের উক্তি প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি ।)

সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে ।

কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন ।

ভাবুক সঙ্গে লঞা কর সংকীর্তন ॥

বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ।

তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম ॥

প্রভাবে দেখি যে তোমার সাক্ষাৎ নারায়ণ ।

হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ ॥

তখন শ্রীচৈতন্যপ্রভু উত্তর করেন—

প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায় ।

তোনার সভাতে মোরে বসতি না যুয়ায় ॥

এই শ্লোকে প্রভু নিজকে হীন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াছিলেন । তাহার কারণ, পূর্বে যে দশ আখ্যাধারী সন্ন্যাসিদিগের নাম বলিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে আচার্য্য কোনও কারণে গিরি ও পুরীর দণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং ভারতী সম্প্রদায়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া অর্ধেক করিয়া দেন, ইহাতে ভারতী-সম্প্রদায় হীন রূপে শঙ্কর-সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য । তাই প্রভু নিজকে হীন সম্প্রদায় বলিয়াছেন । তাঁর পর কেন নাম-সঙ্কীর্তন করেন তাহা বলিতেছেন :—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ ।

শুর মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদে অধিকার ।

কৃকমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ।

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অমুকণ ।

নাম লইতে লইতে মোর ভ্রাস্ত হইল মন ॥

তখন প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন—

কৃষ্ণভক্তি কর ইহার সবার সন্তোষ ।

বেদান্ত না শুন কেন তার কিবা দোষ ॥

তখন চৈতন্যদেব বলেন—

এত শুনি হাসি প্রভু বলিয়া বচন ।

ছুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন ॥

এই বলিয়া তিনি বেদান্তশাস্ত্রে শঙ্করভাষ্যের উপর কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করেন । এবং বলেন—

মায়াবাদমসচ্ছান্তঃ প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

এই ভাবে মায়াবাদের নিন্দা তিনি বহু বার করিয়াছেন । যখন পুরিধামে বাসুদেব সার্বভৌমের সহিত তাঁহার বিচার হয়, তখনও তাঁহাকে ঠিক এই ভাবে উত্তর প্রদান করিতে দেখি । এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয়—তিনি আগমোক্ত মার্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন । আগম শব্দে তন্ত্রশাস্ত্র—তন্ত্রশাস্ত্রেই আমরা পূর্বোক্ত মায়াবাদ মসচ্ছান্তঃ নামক বচন দেখিতে পাই এবং তন্ত্র শাস্ত্রেই বলিয়া থাকে—

“জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্গচানাথা ।”

এবং ঐ শাস্ত্রেই আছে—“আগমোক্ত বিধানেন কলৌদেবান্যজেৎ সুধী ।” চৈতন্যদেবেরও ইহাই মূলমন্ত্র ছিল—

“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈবকেবলম্ ।

কলৌ নাশ্বেব নাশ্বেব নাশ্বেব গতিরন্যাথা ॥”

“তৃণাদপি সূনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনামানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥”

তিনি তন্ত্র মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়াই হয় ত বৈষ্ণব মহাপ্রভুরা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ নাই ; তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন শক্তিপূজা ও জপাদির বিধান আছে, তদ্রূপ বিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুমন্ত্র জপেরও বিধান আছে । তবে হয়ত শক্তিপূজায় ছাগ ঘাতাদির বিধি দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন তন্ত্রশাস্ত্রে কেবলই ছাগঘাতাদির তথা পঞ্চমকারেরই বিধি আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও মার্গের উল্লেখ নাই । এই প্রকার ধারণার মূল যে অজ্ঞতা তাহাতে সন্দেহ নাই । বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় মতের

মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। দীক্ষা গ্রহণ, নাম জপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য যে তন্ত্রোক্ত তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। তবে কেন যে এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে একটা পার্থক্য ভাব লক্ষিত হয়, তাহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। যাক, আমরা প্রসঙ্গক্রমে একটু অবাস্তুর বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

শ্রীচৈতন্যপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তর কখনও শ্রীধামবৃন্দাবন, কখনও বা শ্রীক্ষেত্র এইরূপ করিয়া শেষে শ্রীক্ষেত্রেই ছিলেন—আমরা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার জীবনকাল, আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত-লীলা এই তিন ভাগ দেখিতে পাই। সংক্ষেপে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবরূপে অবতারি ।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারি ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দশত পঞ্চাশে হইল অন্তর্ধান ॥
২৪শ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস ।
নিরন্তর কৈল তাহাতে কীর্তন বিলাস ॥
২৪শ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
আর ২৪শ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে ।
কৃষ্ণপ্রম নামামৃতে ভাসিল সকলে ॥

এই হইল তাঁহার সংক্ষেপে কার্যকাল বর্ণনা। আমরা প্রথমে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি—এইবার তাহার সমাধানের প্রয়াস পাইব। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই বিষয়টাই বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য এবং এই বিষয়ের উপরেই তাঁহার অবতারত্ব নির্ভর করে।

আমরা দেখিতে পাই—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা কালে তিনি রথের অগ্রে অগ্রে একটা শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে গমন করিতেন। শ্লোকটা এই—

যঃ কৌমারহরঃ স এবহিবরস্তা এবচৈত্ররূপা
স্বৈচোন্মীলিতমালতী হরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ॥
সাঁচৈবান্মি তথাপিতত্ত্বরত ব্যাপারলীলাবিধৌ ।
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকঠতে ॥

ইহা শৃঙ্গার রসের শ্লোক । এখন আমাদের ভাবিবার বিষয়, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া একরূপ সময়ে কেন এই বিরুদ্ধার্থ যুক্ত শ্লোক গঠ করিতেন । আমরাও যেমন ইহার ভাবার্থ নির্ণয় করিতে পারি না, তদ্রূপ তদানিন্তন অনেকেই ইহার মনোদ্বাটন করিতে পারেন নাই । কেবল শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় ইহার ভাব প্রথমে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন ; তিনি ইহার ভাব অত্র একটী স্বরচিত শ্লোকে আভাষে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

প্রিয়ঃসোহয়ং কৃষ্ণঃ সহস্রি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ ।

তথাহং সারাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্থখং ॥

তথাপ্যস্তঃ খেলনধুরমুরগী পঞ্চমজুষে ।

মনোমে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

অর্থাৎ কোনও সময়ে গ্রহণ উপলক্ষে প্রভাসতীর্থে বৃন্দাবনের নন্দ প্রভৃতি গোপ-বৃন্দ ও গোপীকাগণ স্নানার্থ আসিয়াছিলেন । এবং শ্রীকৃষ্ণও দ্বারবতী হইতে সমস্ত যাদবগণ ও কামিনীগণ পরিবৃত হইয়া স্নানার্থ ঐ প্রভাসতীর্থে আসিয়াছিলেন । সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনবাসী গোপ ও গোপীগণের সাক্ষাৎ হয় । শ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় সেখানকার ভাব লইয়া—যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের উক্তিতে আছে—

“আহুশ্চতে নলিনাভপদারবৃন্দঃ

যোগেশ্বরৈহু দিবিচিহ্ন্যমগাধবোধৈঃ ।

সংসার কুপপতিতোত্তরণাবলম্বম্,

গেহং ষুধামপিমনস্যাদিহাৎসদানঃ ॥”

সেই স্থানে প্রধানা গোপী অর্থাৎ শ্রীরাধার মুখে, পূর্বোক্ত শ্লোক সন্নিবেশ করিয়াছেন ।

আমরা - “যঃ কোমার হরঃ”—ইত্যাদি শ্লোক ও শ্রীরূপগোস্বামীর - “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ”—ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমরা এইস্থলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার পাইলেও আমার মন সেই যমুনাপুলিনসংস্থিত তমালকুঞ্জের প্রতিই আকৃষ্ট হয় । এখানে বৃথের সম্মুখে মহাপ্রভুকেও তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধার মত অবলোকন করি । এইটাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্মমতের, সাধারণ ধর্মমত হইতে পৃথকত্ব । এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সাধুবৃন্দ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন । চৈতন্যদেব রাধা ভাবে সর্বকণ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । তাঁহার বাহ্যিক গৌরবর্ণ ঐ শ্রীরাধারই—অনিন্দ্যসুন্দরসুধাকরমনোহরগৌরবর্ণ । তিনি অন্তরে কৃষ্ণ,

বাহিরে রাখা। তিনি গোপী ভাব লইয়াই ভজনা করিতেন। সর্বদা সেই গোপী ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিতেন।

একদা দক্ষিণ দেশীয় ভূস্বামী বৈষ্ণব প্রধান শ্রীরামানন্দ রায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া নিজস্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইবার জন্তু বিশেষ করিয়া ধরিলে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—

গৌরদেহ নহে মোর রাখাঙ্গ স্পর্শন ।

গোপেন্দ্র সূত্র বিনা তেহোনা স্পর্শে অন্যজন ॥

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আশ্রয়ন ।

তবে নিজ মধুর্য্য রস করি আশ্বাদন ॥

এই তাঁহার নিজ শ্রীমুখের উক্তি। এখন আমরা শাস্ত্রে কি দেখিতে পাই— শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে আছে—

আসন্ বর্ণান্তরোচস্য গৃহতোহনুযুগে তশুং ।

শুক্লোরক্তসুখাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

এই প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, সত্যযুগে “শুক্লা”বতার ত্রেতায়া রক্তা-বতার “ইদানিং কৃষ্ণতাং গতঃ” এই বলায় দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান “শ্রীকৃষ্ণ” এখন “পারিশিষ্য শ্রায়” প্রযুক্ত কলিতে “পীত” অবতার—শ্রীরাধা ভাবভাবিত এই শ্রীচৈতন্যদেব। মহাভারতেও আমরা দেখি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাক্রোবরাস্তশ্চন্দনাস্রদী ।

সন্নাসকৃচ্ছমঃ শাস্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

এই প্রমাণলব্ধ পুরুষ শ্রীচৈতন্যকেই বুঝাইয়া থাকে। আরও শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাঙ্কুশং সাক্রোপাক্রান্তপার্বদং ।

ষট্শ্লঃ সতীর্জনপ্রায়ৈর্ষজ্জিহ্বিহি সুমেধসঃ ॥

এই প্রমাণলব্ধ পুরুষ কেবল শ্রীচৈতন্যদেবেই সম্ভব হয়। অতএব আমরা যে প্রথমে বলিয়াছি এই গৌরকান্তি তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার নিজবর্ণ অস্ত্র আছে, তাহা সুসঙ্গত হইতেছে। অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীধামবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ করিতে করিতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে সুখভোগ করিয়াছিলেন, সেই তন্ময়ত্ব সুখ উপভোগ করিবার জন্তই তিনি অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাখাভাব ভাবিত হইয়া অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ থাকিলেও দ্বিষা অর্থাৎ কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ব্যবহার দ্বারা সংকীর্ণন প্রায় এক ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এখন কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব সমস্ত জাতিকে বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া একাকার করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তৎপ্রবর্তিত বিরাট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই তাহার উদাহরণ দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এরূপ উক্তির মূল দেখিতে পাই না। অন্ততঃ শ্রীচৈতন্যদেব যে বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিবার পক্ষপাতী ছিলেন, এ কথা তাঁহার কার্যাবলি আলোচনা করিলে বোধ হয় না। তিনি নিজে কখনই বিষ্ণুদ্বৈত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ অন্ন গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র রায় পরম ভাগবত ও পরম প্রিয় হইলেও জাতিতে শূদ্র বলিয়া তিনি তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে নিকৃষ্ট এক সনাড়িয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে কেন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার রীতিমত কারণ দেখাইয়া দেন। তাঁহার জলপাত্র ও বহির্কাস ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণই বহন করিত, এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ আছে—একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“বর্ণাশ্রমাচারবতাপুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

শিক্ষুরাধ্যতে পস্থা নান্যন্ততোষকারণম্ ॥”

এইস্থলে তিনি বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়া হরির আরাধনা করিতে উপদেশ দিতেছেন। তবে যে যবন হরিদাস প্রভৃতিকেও নাম বিতরণ করিতে দেখি, তাহা নাম-বিতরণ মাত্র। ঐ যবন হরিদাস কখনই এক পংক্তিতে বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিত না, এমন কি মহাপ্রভু ও ভক্তগণ পিণ্ডার উপর থাকিলে তিনি পিণ্ডার নিম্ন ভাগেই বসিয়া থাকিতেন, এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। আর ইদানিং শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে যেমন মহাপ্রসাদে আর জাতিবিচার দেখা যায় না, সে সময় তদ্রূপ ছিল না—আমরা দেখিতে পাই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারাই মহাপ্রসাদ আনান হইত। প্রসাদ গ্রহণ সময়ে ও জাত্যানুসারে পংক্তিভেদ দৃষ্ট হইত। এই সব দেখিয়া তিনি যে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে যে আমরা এখন “জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব” এই লৌকিক উক্তি দেখি, উহা তাঁহার পর হইতে হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এইরূপ হইয়াছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই; প্রত্যুত, তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণই দেখিয়া থাকি।

এই ভাবে আমরা এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যতই আলোচনা করি, আমরা সবিশেষ গুণ ভাগই দেখিয়া থাকি। তিনি দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-ভ্রমণ প্রসঙ্গে গিয়া তর্কে বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এবং তদেশবাসী বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি রাসুদেব সার্কভৌমের নিকট—

“আস্মারামাশ্চনুনয়োনিগ্রহা অপূরক্রমে ।

কুর্কস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিখন্তুত গুণোহরিঃ ॥”

এই শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সুধীবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন । তিনি জীবনে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন । ঐ সমুদায় কার্য্য শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে আমরা বহুলপরিমাণে দেখিয়া থাকি । প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না ।

এই মহাপুরুষের তিরোধান এক অপূর্ব ব্যাপার । শেষাবস্থায় তিনি মুহুমূহু ভাবাবেশ হইতে থাকেন । ভাবাবেশ কালে তাঁহার গাত্রের সন্ধিসকল শ্লথ ও অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িত—

“প্রতিরোম কূপে মাংস ব্রণের আকার ।

তার উপর রোমোদগম কদম্ব প্রকার ॥

প্রতিরোমে স্নেদ পড়ে রুধিরের ধার ।

কণ্ঠ ঘর্ষর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥

দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার ।

সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা যমুনার ॥”

এই ভাবে প্রতিফণই তাঁহার সাত্বিক ভাব প্রকট হইত । সম্মুখে কোনও ভাবোদ্দীপক বস্তু দেখিলেই তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন লীলা মনে হইয়া ভাবাবেশ হইত । চটকপর্বত দেখিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধন-লীলার ভাব উদয় হইয়াছিল । পরিশেষে একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে—

এইমত মহাপ্রভু ব্রমিতে ব্রমিতে ।

আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥

চন্দ্রকাণ্ডি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জল ।

ঝলঝল করে যেন যমুনার জল ॥

যমুনার ব্রমে প্রভু ধাইয়া বলিল ।

অলঙ্কিতে যাই সিদ্ধজলে ঝাঁপ দিল ॥

এই ভাবে তাঁহার তিরোধান হয় । সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া যে পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পথের পথিক হইয়া কত সংসার তাপক্লিষ্ট ব্যক্তি, মরুতাপে তাপিত ব্যক্তি সুশীতল পানীয়ের গ্রাস, বিমল শান্তিধারা পাইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব জগৎ পৃথিবী ধন্যা, ভারতবর্ষ ধন্য, তথা আমাদের বঙ্গভূমি ধন্যা । আর আমরা বঙ্গবাসী বলিয়া আমরাও ধন্য । শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

“ অন্ধ ।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল ।]

“তোমার কি এতদূর সাহস হবে ? তা’ ত বিশ্বাস হয় না !”

রহমণ হস্তস্থিত একটা ফটোচিত্রের দিকে তাকাইয়া এই কথাগুলি বলিল । তাহার ওষ্ঠাধরে বিদ্রুপব্যাঞ্জক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল । সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া ছবিখানি সে যথাস্থানে রাখিয়া দিল । ছবিখানি এক অসামান্যসুন্দরী স্ত্রীলোকের কটো । তাহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় যেন হাসিতেছে ! প্রথম দৃষ্টিতে ছবিখানিকে জীবন্ত স্ত্রীমূর্তি বলিয়াই ভ্রম হয় । এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য, অসীম রূপরাশি পুরুষমানুষকে অনায়াসেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিতে পারে !

রহমণ মনে মনে কি এক মতলব আঁটিল । ছবির দিকে তাকাইয়া “বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, “আমার নিজের উপরও বিশ্বাস হচ্ছে না । ভয় হচ্ছে, পাছে দু’দিন বাদে, এ মোহের ঘোর কেটে যায় ! আর আমরাও পরস্পরের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠি । আমাদের এ অনুরাগ যে আজীবন স্থায়ী হবে, তা’ জোর করে বলা বড় শক্ত ।”

সে অধীর ভাবে ঘড়ির দিকে তাকাইল, নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণপ্রায় । তখন বারান্দায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল । এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় লাগিল । আপাদমস্তক আবৃত এক স্ত্রীলোক একাকিনী গাড়ী হইতে নামিল । রহমণ আর কালবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে উপরের ঘরে, আনিয়া উপস্থিত করিল ।

“সব ঠিকঠাক ?” স্ত্রীলোকটি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল ।

“নিশ্চয়ই, সব প্রস্তুত । অত সন্তুর্পণে কথা কহিবার কোনও প্রয়োজন নাই । এ বাড়ীতে এখন কেহই নাই । চাকর ও বাবুর্চি দু’জনকেই স্থানান্তরে পাঠিয়েছি ।”

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটি আরাম-কেন্দারার উপর বসিয়া গড়িল । রহমণ প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল । স্ত্রীলোকটি রহমণের অঙ্গুলীর মধ্যে নিজের অঙ্গুলিগুলি

সন্নিবেশ করিয়া কেদারার বড় হাতার উপর তাহাকে টানিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্ত্রীলোকটি মেজের দিকে তাকাইয়া বলিল,—“রহমন! আমার বড় ভয় পাচ্ছে!” রহমনের মুখের দিকে তাকাইয়া এ কথাগুলি বলিতে তাহার সাহস হইল না।

“এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? এ অবস্থায় সকল স্ত্রীলোকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু ভয় পাবার কোনও কারণ নাই। আজীবন আমি তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসব। প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও তোমাকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করব। তুমি কি অতীতের সে সব কথা ভুলে গেলে, পিন্নারা! বাল্যকালেই আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। সে আলাপ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ সদ্ভাবে পরিণত হ’ল। তখন মনে করেছিলাম, একদিন তোমাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করে জীবনের সকল তাপ শীতল করব। কিন্তু আল্লা সে সাথে বাদ সাধলেন। কোথা হতে বন্ধু জাহির এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়াল। তোমার পিতা তা’কেই আমার অপেক্ষা যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে তার হস্তেই তোমাকে সমর্পণ করলেন। সেদিন প্রাণের মধ্যে যে অব্যক্ত যন্ত্রণারশি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এ যাবৎ তা’দের দাহনে ভস্মীভূতপ্রায় হয়েছি। এত কষ্টের মধ্যেও এক সান্ত্বনা ছিল যে, মধ্যে মধ্যে বন্ধুর বাড়ী তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে প্রাণ অনেকটা শান্ত হ’ত। কিন্তু সেই অবধি অপর কোনও স্ত্রীলোককেই ভালবাসতে পারি নাই। বিবাহও করি নাই। ভগবান আজ যখন আবার সুদিন মিলায়েছেন, তখন তাহা আর উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁরই অসীম করুণারশি বক্ষে ধরে, এস আজ আবার আমরা সংসারপথে অগ্রসর হই। তুমিও আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাস!”

রমণী মুখে আর ইহার কোনও উত্তর দিল না। কেবল মাথা নত করিয়া প্রণয়াম্পদের হস্ত চুম্বন করিল। পরে আর্দ্রনয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—“হাঁ, আমার বিশ্বাস, তুমি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। দাম্পত্য-জীবনে সুখের আনন্দ কণামাত্রও ভোগ করি নাই। স্বামীর ভালবাসা লাভ করবার জন্ত আমি বড়ই লালায়িত হয়েছিলাম, কিন্তু তা’র পরিবর্তে আমার ভাগ্যে কেবল অবহেলা ও উপেক্ষা লাভ হয়েছে। যাক্, ও সব বিষয়ের উল্লেখ করে এখন আর কোনও লাভ নাই।”

“ও সব কথা আলোচনায় আর ফল কি! বিগত জীবনের পৃষ্ঠায় যা’ কিছু অঙ্কিত হয়েছে, সে সব মুছে ফেল। অতীতকে বিশ্বতির সাগরে ডুবিয়ে দাও। আমরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে দূরদেশে গিয়ে নূতন বাসা নির্মাণ ক’রব। এখানে

থাকলে, অনেকে আমাদের বিদ্রূপ করতে পারে, জাহির ফিরে এসে আমাদের স্মৃতির পথে আবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, আমরা স্মৃতি স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারব। জাহির নিকোঁধ, তাই এমন রত্ন চিনতে পারলে না! তুমি এখানে একটু বিশ্রাম কর। ব্যস্ত হ'বার প্রয়োজন নাই। এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে।”

“এ সব বিষয় ভাবতে ভাবতে অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি সব ভুলে তোমারই চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম। দেখো, দু'দিন বাদে যেন বিরক্ত হয়ে আমাকে চরণে ঠেলো না।”

“আজকের দিনে আর ওসব অমঙ্গলের কথা তুলছো কেন? মনে কর, আজ যেন তুমি আবার নূতন ভাবে দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করছো। তোমার পূর্বের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত একেবারে ভুলে যাও।”

রমণী মাথা নাড়িয়া বলিল,—“সে সব ভুলতে এখনও অনেক দিন লাগবে। রহমণ! একবার ভাব দেখি কি মহামূল্য রত্ন পশ্চাতে ফেলে যাচ্ছি। তোমার প্রেম লাভের জন্ত কি মহা ত্যাগস্বীকারই আমাকে করতে হচ্ছে। সে কথা ভাবতেও আমার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠে!”

“ওঃ! শিশুকণ্ঠার কথা বলছ!”

রমণী তাহাকে অঙ্গুলীসঞ্চালনের দ্বারা থামিতে বলিল।

“ও কথা আর তুলো না। তুমি জান, আরও অনেক দিন পূর্বে এ প্রস্তাব একবার আমাকে করেছিলে। তখন আসতে পারতাম, কিন্তু ওর জন্তই আসতে পারি নাই। আজ আর মনকে দমন করতে না পেরে চলে এসেছি। সে তখন ঘুমাচ্ছিল! জীবনে বোধ হয় আর সে চাঁদ মুখ দেখতে পাব না! রহমণ, এ কষ্ট ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই অনুভব করতে পারে না! বাছার ঘুমন্ত মুখে অশ্রুসিক্ত বিদায়ের শেষ চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়ে এসেছি। চুম্বনে শিশু শিহরিয়া উঠিল; একবার মনে হল, বুঝি বা জেগে উঠে; তা'হলে আর আসা হত না। জাহিরের আত্মীয়েরা অবশ্য তাকে সযত্নে লালনপালন করবে বলেই বোধ হয়! সেও খুব শান্ত, সুবোধ। একবার তা'কে দেখলে, কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারবে না। না, না, ও কথা ছেড়ে দাও। এস, আমরা অগ্র বিষয়ে কথা কই।” রমণী বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। ঘরের ভিতর তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, এই বাড়ীতেই পূর্বে জাহির থাকত না?”

“হাঁ, তোমাকে বিবাহ করবার পূর্বে, সে এ বাড়ীতেই থাকত। এ বাড়ী তা’রই ছিল, পরে আমাকে বিক্রয় করে।”:

“কি মজার কথা! আজ আবার এতকাল পরে আমরা সেই বাড়ীতেই বসে, তা’র বিক্রয়ে ষড়যন্ত্র করছি।”

“তুমি যে আসল কথা ভুলে যাচ্ছ। তোমার এতে দোষ কি, বল? জাহিরই ত তোমাকে একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেল! তার পর পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেল, তার আর দেখা নাই। স্বামীর এ উপেক্ষা ও অবহেলা স্ত্রীর পক্ষে অসহ!”

রমণী তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—“এ কথা সত্য। কিন্তু হঠাৎ তাহার একরূপ পরিবর্তন কেন হলো তা বুঝতে পারলাম না। বিবাহের পূর্বে ও কিছু পরেও তার স্বভাব চরিত্র এমন খারাপ হয় নাই। কোথায় আছে, তারও সংবাদ দেয় না। মধ্যে দু’ একখানা পত্র লিখেছিলো; তাও পাগলের প্রলাপ মাত্র, অর্থ করা ছরুহ; আবার চিঠিতে তার ঠিকানাও দেয় নাই।”

“এ রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও স্ত্রীলোক আছে। তা’র প্রতি অনুরক্ত হয়ে, তোমাকে সে একেবারে ত্যাগ করে চলে গেছে। যাক, আজ থেকে তুমি আমার হ’লে; আর জাহিরের সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রয়োজন নাই।”

রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিল,—“প্রথম হ’তেই অত্যাচার আরম্ভ করো না। সে সব কথা’র আলোচনা এত শীঘ্র ত্যাগ করতে পারা কি সম্ভব? যে সব বিষয় ভাবতে ভাবতে কত বিনীত রজনী কেঁদে কাটিয়েছি, আজও সে কথা মনে পড়ায় চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আজ আর আমার সে দিকটা তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা করি না। আজ হ’তে আবার নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করাই সম্ভব। জাহির বলে যে, কোনও লোক পৃথিবীতে ছিল, তা ভুলে যাবার চেষ্টা করবো। তবে কিছু দিন সময়—ও কি, বাইরের দরজার কড়া নাড়ে কে?”

তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় আবার ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। রহমণ ক্রকুটি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় স্ত্রীলোকটিকে চুপি চুপি বলিয়া গেল,—“পিয়ারা, তুমি না ছয় পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা কর গে। কি জানি এমন সময় কে আবার আলাতে এল! যেই আনুক, আমি পাঁচ মিনিটে তা’কে বিদায় করবার চেষ্টা করবো। তোমাকে বেশীক্ষণ একলা বসে থাকতে হবে না।”

স্ত্রীলোকটি ত্রস্তভাবে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলে, রহমন ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। পরে নীচে নামিয়া বাহিরের দরজা খুলিতেই সম্মুখে এক দীর্ঘকায় মূর্তি দণ্ডায়মান দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সে প্রস্তর মূর্তির স্থায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল অক্ষুটস্বরে ছ'টি কথা তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে নির্গত হইল,—“কি হে?”

“কি, রহমন, তুমি? আমি মনে করেছিলাম, তোমার লোক জন কেউ হবে। চল, উপরে যাই। আর কেউ আছে না কি?”

রহমনের মাথা ঘুরিতেছিল। কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ষা মুখে আসিল বলিয়া ফেলিল।

“না, আমি একলা। জাহির, এতকাল পরে তুমি যে হঠাৎ আজ এখানে আসবে, এ একেবারে আশাতীত। এস, ভিতরে এস।”

লোকটি অতি সম্ভর্পণে দেওয়াল ধরিয়া অগ্রসর হইল। উপরের ঘরে গিয়া রহমন দেখিল, তাড়াতাড়িতে পিয়ারা তাহার গাত্রাচ্ছাদন কেদারার উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জাহির যদি তাহা দেখিয়া চিনিতে পারে! আসন্ন বিপদে উদ্ধারলাভের জগু সে আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

জাহির এক হাত টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার ধারে দাঁড়াইল। তাহার নীল চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি রহমনের মুখের উপর নিবদ্ধ। জাহির মূহু মূহু হাসিতেছে। রহমনের অন্তরাখ্যা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, জাহির বোধ হয় সব জানিতে পারিয়া সেখানে তাহার স্ত্রীর অন্ত্রমণে আসিয়াছে। কিন্তু মুখের ভাবে ত রাগ বা হিংসার চিহ্নমাত্র প্রকটিত নাই! এ কি প্রহেলিকা? গভীর সন্দেহ-দোলায় তাহার মন ছলিতে লাগিল।

“রহমন, দোস্, আমাকে একবার আলিঙ্গন কর! আমি বহুদিন তোমার স্পর্শস্বথ অনুভব করি নি।”

রহমন বন্ধুকে কল্পিত কলেবরে আলিঙ্গন করিল। জাহির তখন তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে বলিল,—“আজ এত দিন পরে এই পুরাতন স্থানে বন্ধুর সহিত আলিঙ্গন কি সুখের! হায়, যদি আজ আমি দৃষ্টিশক্তি না হারাতাম!”

রহমন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“এ সব কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

জাহির ধীরে ধীরে বলিল,—“তা ত ঠিক। তুমি সে কথা জানবে কি

করে ভাই ! এই যে চোখ দেখছো, নীল, আকর্ণ বিস্তৃত,—কিন্তু সব অন্ধকার, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যতদিন বেঁচে থাকবো, কিছুই দেখতে পাবো না। অচেনা পথে যখন চলি, তখন পা টলতে থাকে ; মদ না খেলেও লোকে মনে করে আমি মাতাল হয়েছি। কিন্তু এ বাড়ীতে আসতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি ; এ যে আমার চির-পরিচিত স্থান ! ভাই, তোমার কাছে এসে, আজ মনে তবু অনেকটা শান্তি পাচ্ছি। অনেক চেষ্টা করে, মনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে তবে আজ এখানে আসতে পেরেছি। এ মুখ যে আর তোমাদের সম্মুখে দেখাতে পারবো, সে ছরাশা হৃদয় হতে একেবারে দূর করেই দিয়েছিলাম। একটু বসি ; তোমার সঙ্গে ভাই অনেক প্রাণের কথা আছে। সে সব কথা আর কা'কেও সাহস করে বলতে পারি নি। এক ঘাস জল দাও, গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। তুমি কথা কচ্ছো না কেন ? তোমার হয়েছে কি ? 'এসে পর্য্যন্ত যে তোমার মুখে একটা কথাও শুনতে পাই নি। খুব রাগ হয়েছে আমার উপর—নয় ? তা ত হবারই কথা !”

রহমণ হতবুদ্ধি হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে এতক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। এমন পদ্মকোরকের গ্রায় নীল বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় ! এ ব্যক্তি অন্ধ ? তাও কি বিশ্বাস হয় ! নিশ্চয়ই দৃষ্টিশক্তিহীনতার ভাণ করিয়া আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে। পিন্নারা বোধ হয় ঘরের ভিতর হইতে সব টের পাইতেছে। সে যদি একটু সাবধান হয়, তবেই আজ বন্ধুর নিকট মানরক্ষা ! নচেৎ এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু পূর্বে উহার মুখে যে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ছিল, আজ তাহা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে, দেখছি। জাহিরের প্রশ্নে তাহার চৈতন্য হইল। বুঝিল, এখন চূপ করিয়া থাকিলে বন্ধুর মনে সন্দেহের মাত্রা নিশ্চয়ই ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

“জাহির, কথা আর কি বলবো ? তোমার ভাবগতিক দেখে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি যে চোখে দেখতে পাও না, তা আমি পূর্বেও বুঝতে পারি নি, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কথা কি সত্য ?”

“এ কথা সত্য। হৃদদৃষ্টবশতঃ আমি যথার্থই আজ দৃষ্টিশক্তিহীন। আমি নিজেই প্রথম বুঝতে পারি নাই, কি ভয়ঙ্কর পরিবর্তন আমার হয়েছে ! জীবনে কি ভীষণ মৃত্যুদণ্ড স্বেচ্ছায় বরণ করে লয়েছি। তুমি জান না, আজ এখানে আসবার পূর্বে আমি কত ইতস্ততঃ করেছি। এ অবস্থায় তোমাদের সম্মুখীন হ'তে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরে ভাবলাম, আমার হুঃখ কষ্ট

ভোগের কথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই সহানুভূতি প্রকাশ করবে। রহমণ, আমার ভীষণ অধঃপতন হয়েছিল। শয়তান আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। সংসর্গ-দোষে একেবারে পাপের পঙ্কিল সাগরের তলদেশে ডুবে গেছলাম; সবেমাত্র হু' এক দিন হ'ল আবার সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠেছি। আমার বুদ্ধিবুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল; এখন আবার একটু আধটু প্রকৃতিস্থ হয়েছি বলে মনে হয়। প্রবল ইঞ্জিরের বিরুদ্ধে আমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল; কিন্তু কৃতবিকৃত হয়েও আল্লাহর রূপায় আজ আমি রণে জয়ী হয়েছি। আশা করি, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার এমন পতন হবে না! কিন্তু ভাই, পাপের বড় ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে,—অমূল্য চক্ষুরত্ন আমার চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে!

সঙ্গদোষে স্বভাব চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে। ঘোর অত্যাচার ও অনাচারের ফলে নানাবিধ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তির পীড়া জন্মে। পরে অর্থাভাবে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি একেবারেই হারাই। পূর্বে যদিও মধ্যে মধ্যে গৃহে ফিরিবার কথা ভাবতাম, কিন্তু অন্ধ হওয়ার পর হ'তেই সে দুরাশা একেবারে ত্যাগ করি। ষাদের মনে অশেষ দুঃখকষ্ট দিয়ে, একপ্রকার নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে চলে আসি, আজ অন্ধ হয়ে কোন্ সাহসে আবার তা'দের গলগ্রহ হয়ে সেবা শুক্রযা ভোগ করতে বাব? দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর হতেই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়; কিন্তু এখন আর উপায় নাই! হয়, আল্লা কেন পূর্বেই আমার চৈতন্য করাইয়া দেন নাই! কিন্তু তাহ'লে ত আর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত না!”

বাল্যের পুরাতন বন্ধুর নিকট মনের ভার লাঘব করিয়া, জাহির অনেকটা শাস্তি অনুভব করিল। হু' এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আমার বলিতে লাগিল,—“ভাই, মনস্থ করেছি, আর সংসারে প্রবেশ করব না। ফকিরের বেশ ধরে দূরদেশে আল্লাহর নাম করে ঘুরে বেড়াব। চক্ষু হারিয়েছি, স্ত্রীকন্তার ভালবাসা, স্নেহলাভে বঞ্চিত হয়েছি, এতেও বোধ হয় আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই। তাই ধোদার নাম করে, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবো স্থির করেছি। চিরদিনের জন্য স্ত্রী কন্তা ত্যাগ করে যেতে মনের মধ্যে বেঁ কি কষ্ট হচ্ছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না। শিশুকন্তার জন্য প্রাণ কত কাঁতর হয়, তা মুখে বলে বিশ্বাস করবে না; যদি হৃদয় চিরে এ যন্ত্রণা দেখারার হ'ত, ত দেখাতাম! এখনও মধ্যে মধ্যে এ অভাগার স্বল্পদেশে তার কচি হাত

হু'খারির কোমল স্পর্শ অনুভব করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।—ও কি, কিসের শব্দ ?”

রহমণ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ ঘর হইতে উখিত স্ত্রীলোকের ক্রীণ আর্ন্তনাদ ! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—“না, না, ও কিছু নয় ; আমার কাশির শব্দ। কি বলছিলে, বল না।”

“আমি মক্কা যা'বার সঙ্কল্প করেছি। তাই একবার লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ছেলেবেলা হ'তেই তোমার নিকট প্রাণের কথা কয়ে অনেকটা শান্তি পেতাম। তাই আজ আবার ছুটে এসেছি। একটু পরেই চলে যাব। আর ষাবার সময় একবার স্ত্রীকণ্ঠ্য সংবাদটা জানবার জন্ত প্রাণ বড় কাতর হয়ে উঠলো। তাদের চিন্তায় মক্কাতে গিয়েও আমি নিশ্চিত মনে খোদার নাম করতে পারবো না ! যদি কখনও সুবিধা পাও, আমার স্ত্রীকে এ সব কথা বুঝিয়ে বলো। তবে আমি চলে গেলে, তা'রা দুদিন বাদে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে যাবে। তখন আবার সুখে স্বচ্ছন্দে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারবে। আল্লা, তাদের সুখে রাখুন !”

জাহির চূপ করিল। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। চক্ষু দিয়া টম্‌টম্ জল পড়িতে লাগিল। রহমণ তাহাকে সাশ্বনা দিয়া বলিল,— “তাই, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। কেন, তুমি বৃথা এ সব সন্দেহ করছো ? আমি বেশ জানি, তুমি চলে যাওয়াতে, তোমার স্ত্রী তোমার জন্ত বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। তুমি এ অবস্থাতেও ফিরে গেলে, সে দাসীর শ্রায় প্রাণপণ তোমার সেবা করবে। এ তুমি স্থির জেনো। আর স্ত্রী কণ্ঠ্য বিষয়ও ত তোমার ভাবা উচিত। তা'রা এখন কিরূপ নিঃসহায় অবস্থায় আছে, একবার অব দেখি। তোমার অবস্থায় পড়লে, আমি নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে যেতাম।”

“রহমণ, তোমার কথা শুনে, আবার আমার ঘরে ফিরে যেতেই লোভ হচ্ছে। একবার পিয়ারার নিজমুখে শুনতে ইচ্ছা যায় যে, তা'কে এত দুঃখ কষ্ট দিলেও, সে এখনও আমাকে ভালবাসে, আমার প্রতি সে এখনও অমুরক্ত। তাই, আমাকে দেখলে কি সে বখাৰ্খই সস্তুষ্ট হবে ? তাই, বন্ধুর সহিত প্রতারণা করো না। সত্য কথা বলে বল। একে ত দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মরছি, তা'র উপর যদি আবার বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করতে হয়, তা'হলে বোধ হয় আমাকে আবার আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে।”

“না, না, কোনও ভয় নাই। আমি যা বলছি, সব সত্য। তুমি নড়ো না; চুপ করে বস। আমি এখনই আসছি।” রহমেনের ভয় হইল, পাছে জাহির এখনই স্ত্রীর অবর্তমানে বাড়ী চলিয়া যায়। তাহ’লেই ত পুনর্বার বিপদপাতের সম্ভাবনা। সে পাশের ঘরের দরজার নিকট গিয়া পিয়ারাকে বাড়ী বাইতে সঙ্কেত করিল। এমন সময় স্বন্ধদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখে জাহির। সর্বনাশ, তবে কি সত্যই সে অন্ধ নহে, তাহাদের অভিসন্ধি ধরিবার জন্ত এতক্ষণ ছল করিতেছিল! তাহার সমস্ত দেহ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল,—“একি, তুমি কেমন করে এখানে এলে? এই বুলে চোখে একদম দেখতে পাও না!”

“ভাই, এ স্থান যে আমার বড় পরিচিত! তোমার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে আমি এখানে এসেছি। এ বাড়ীর তুমি যেখানে যেতে বলবে, আমি সেখানেই যেতে পারি। আচ্ছা, দেখ, এই পাশের ঘরে গিয়ে টেবিল হ’তে তোমার একখানা বই আনছি, টেবিলের উপর বই পাব ত?”

রহমেন নিষেধ করিবার পূর্বেই জাহির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রহমেনের অন্তরাগ্না গুরু গুরু কাঁপিতে লাগিল। সধ বুঝি বিফল হইল! সে মনে মনে আল্লার নাম স্মরণ করিতে লাগিল। তাহাদের ষড়যন্ত্র ত সব বাহির হইয়া পড়িবেই; তাহার উপর এ দৃশ্য দেখিলে জাহিরেরও জীবনের সকল সুখ শান্তিই একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে! আল্লা কি তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাদের দু’জনকেই এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন না!

জাহির ঘরের ভিতর ঢুকিল। টেবিলের পাশেই চেয়ারে তাহার স্ত্রী বসিয়াছিল। স্বামীকে নিকটে আসিতে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পাশ কাটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় বোধ হয় তাহার বস্ত্রাঞ্চল জাহিরের গাত্রস্পর্শ করিল। অন্ধ স্বামী কিছুই টের পাইল না। আল্লা যে তাহার অমূল্য চক্ষুরত্ন চিরদিনের জন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আজ তাহার সার্থকতা রহমেন ও পিয়ারা লক্ষ্য করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল!

পিয়ারা বাহিরে আসিয়া গাত্রাচ্ছাদন তুলিয়া লইয়া রহমেনকে চুপি চুপি বলিল,—“খোদা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি শীঘ্র ওকে বাড়ী-পাঠিয়ে দাও। আমি ও’র জন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকবো।” বলিয়াই সে তীরের গায় বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

জাহির হাসিতে হাসিতে পুস্তক হস্তে হাজির হইল। বন্ধুর হাতে বইখানি

দিয়া বলিল,—“দেখলে, যা বলেছি, তা ঠিক ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, রহমণ, আমার মনে হলো, ঘরের ভিতর থেকে থেকে যেন আমার গা ছুঁয়ে চলে এল। কেউ কি তোমার সঙ্গে কিছু পূর্বে কথা বলছিল ? আমি যেন ঘরের ভিতর হ’তে অল্প ব্যক্তির মূহু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম !”

“জাহির, এ সবই তোমার ভ্রান্তি মাত্র। এথেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একজন সঙ্গী তোমার বিশেষ দরকার। নচেৎ যে কয়দিন বেঁচে থাকবে, তোমার কষ্টের সীমা থাকবে না। এ অবস্থায় স্ত্রী ভিন্ন আর কেউই তেমন সম্বন্ধে তোমার তত্ত্বাবধান করবে না। একটু বস। স্থির হও। হৃচ্চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। বিশ্রামের পর গাড়ী ডেকে, আমি তোমাকে বাড়ী রেখে আসবো।”

“ভাই, তাই হোক ! আমার আর কোনও আপত্তি নাই।”

মিলনের অন্তরায় ।

(প্রত্যুত্তর)

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ ।]

বন্ধুবর মোঃ মোহাম্মদ কে চাঁদ আমার যুক্তির উদ্দেশ্য ভাল বুঝিতে পারেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম “ইহা (সাহিত্য-সম্মিলন) ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ব্রাহ্ম হিন্দু, বৌদ্ধ কাহারও নহে, ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকের।” তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাহিত্যসেবার সময় আমাদের হিন্দু মুসলমান নাম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করিতে হয়। শ্রর রবীন্দ্রনাথ “ঘরে বাইরে” পুস্তকে কিম্বা (শ্রী) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার “শ্রোতের ফুলে” কোথায় হিন্দুধর্ম বা হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা সাহিত্যসম্মিলন বা সাহিত্যপরিষদ দেখিবেন না। তাহার প্রতিবাদ করিতে হয় হিন্দুসমাজ করুন কিম্বা হিন্দুধর্মের মুখপত্র বলিয়া বাহাদের দাবী আছে তাঁহারা করুন অথবা যে কোনও ধর্মাবলম্বী করিতে পারেন। ঐতিহাসিক ভ্রম হয়, ঐতিহাসিকগণ তাহার প্রতিবাদ করিবেন।

ক্রীকৃত অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় যে, সিরাজউদ্দৌলার কলকালনের চেষ্টা

করিয়াছিলেন, তাহাতে মুসলমানের কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন, এ কথা তিনি মনে রাখেন নাই। সিরীজউদ্দৌলা মুসলমান না হইয়া খ্রীষ্টান হইলেও অক্ষয় বাবু এইরূপই করিতেন।

এইবার মোহাম্মদ কে চাঁদ মহাশয়ের লেখা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিনি “বহুবচন” ব্যবহার করিয়া কিরূপ ভ্রম করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন “সভাস্থলেই হউক, আর মাসিকপত্রিকাতেই হউক, যদি মুসলমানেরা তাঁহাদের ওরূপ লেখার উপর মন্তব্যপ্রকাশ করেন বা মিলনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করেন, অমনি হিন্দুরা খড়্গাহস্ত হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কোনও রকমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। রাখালরাজ বাবু কি অস্বীকার করেন যে, মুসলমান বিরুদ্ধ কথা তাঁহার মাসিক পত্রিকায়, ইতিহাসে, উপন্যাসে, নাটকে বা কাব্যে লিখেন না বা লিখেন নাই?” এখানে দেখিতেছি, আমাকেই লক্ষ্য করিয়া “হিন্দুরা” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ আমার ছায় একজন নগণ্য ব্যক্তি যে কিরূপে “হিন্দুরা” হইতে পারে তাহা বুঝিলাম না। আর আমার ছায় নিরামিষাণী ব্যক্তি যে কিরূপে খড়্গ-হস্ত হইতে পারে তাহাও বুঝিলাম না। সে কথা যাউক, চাঁদ মহাশয় যে, আবার ২১৪ জনের জন্ত “হিন্দুরা” শব্দ ব্যবহার করিলেন, তাহা কি ঠিক হইয়াছে ?

ইহা অসম্ভব নহে যে, কোনও কোনও গ্রন্থকার মুসলমানের চরিত্রিকনে কোনও মুসলমানকে হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার আবার হিন্দুকেও ত হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যদি কোনও গ্রন্থকার কেবল উত্তম চরিত্রই চিত্র করেন, তাহা হইলে গ্রন্থের প্লট জমিবে কি না সন্দেহ। গ্রন্থকারকে মানব চরিত্রের সব দিক দেখাইতে হইবে। সুতরাং যদি হীনচরিত্র মুসলমান হয় তবে মুসলমান মহাশয়েরা চটিবেন, সে যদি হিন্দু হয় তবে হিন্দুরা চটিবেন, সে যদি হিন্দুস্থানী হয় তবে হিন্দুস্থানী খাপ্পা হইবে, আর যদি সে ব্রাহ্মণ হয় তবে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইবে। এরূপ ভাবিলে ত গ্রন্থ লেখা চলে না। কোনও মুসলমান সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি অনৈতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে মুসলমানের প্রাণে আঘাত লাগিবে কেন? একজন মুসলমান সম্বন্ধে যদি কোনও লোকের ব্রাহ্মধারণা থাকে তবে তাহাতে সকল মুসলমানের চটিবার কারণ কি? যদি মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে কোনও হিন্দু গ্রন্থকার মানিকর বিষয় লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে সমস্ত মুসলমান সমাজের ক্ষুব্ধ হইবার কথা। আর তাহাই বা কেন? হিন্দু সমাজও তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন। কিন্তু একজন হিন্দু গ্রন্থকারের অপরাধের

অন্ত মুসলমান সমাজ কি “হিন্দুরা” অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন? ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য সমস্ত সমাজকে অপরাধী করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

চাঁদ মহাশয় বলিয়াছেন “কায়স্থের ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করাতে জাতীয় রেযা-রেষি প্রকাশ পায় না। ইহা সামাজিক রেযা-রেষি মাত্র। কায়স্থ কখনও ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিতে ভুলিবেন না বা ব্রাহ্মণকর্তৃক আহূত হইলে ভক্তিসহকারে তাঁহার বাটীতে আহার করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।” হইলই বা সামাজিক রেযা-রেষি? কতকগুলি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে স্থান বিশেষে এমন সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে যে, পরস্পরের সহিত মিলনের অন্তরায় ঘটিয়াছে, পরস্পরের সহিত রীতিমত বিবাদ চলিয়াছে! তবে তাহাতে সমস্ত সমাজের কিছু যায় আসে নাই। এইরূপ একদিন বৈজ্ঞ বড় কি কায়স্থ বড়, এই কথা লইয়া অনেক কলঙ্কজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেইরূপ যদি মুসলমান সম্বন্ধে কোনও হিন্দু লেখকই এইরূপ লেখেন, তাহাতে মুসলমানগণ ব্যথিত হইবেন। তখন পার্শ্বক্য এই দাঁড়াইবে যে, মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী, আর ব্রাহ্মণ বা বৈজ্ঞেরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা ধরিলে বোধ হয় প্রায় সমান হইবে। উত্তর ক্ষেত্রেই কতকগুলি লোকের ব্যবহারে সমাজের এক অংশ মনঃকষ্ট পাইতেছেন, তাহা লইয়া সাহিত্য-সম্মিলনে কথা উঠিবে কেন?

চাঁদ মহাশয় আর একটি ভ্রম করিতেছেন মুসলমানকে “জাতি” বলিয়া। আমি বলি, বাঙ্গালার সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে যাহারা বাঙ্গালায় কথা বলেন তাঁহারা বাঙ্গালী জাতি। ইহাই হইল আমাদের সাহিত্যিকের সংজ্ঞা। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী হইলেই বাঙ্গালী, তাঁহার মাতৃভাষা যাহাই হউক না কেন। বাঙ্গালার মুসলমান জন্মতঃ বাঙ্গালী, হয়ত দশ বিশটা পরিবারে আরব, পারস্যের রক্ত প্রবাহিত থাকিতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালার মুসলমান একটা পৃথক্ জাতি হইল কিরূপে? পদ্মিনী উপাখ্যানে যাহাদিগকে মুসলমান না বলিয়া যবন বলা হইয়াছে, তাঁহারা ত বিদেশাগত একটা জাতি। বাঙ্গালার মুসলমানের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্মের সম্পর্ক। বাঙ্গালার দেশী খ্রীষ্টানেরা, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইংরাজ বা ফরাসীর সহিত একজাতিত্ব দাবী করিলেও যেরূপ হয়, চিতোর আক্রমণকারী মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার মুসলমানের একজাতিত্ব দাবী করাও সেইরূপ। ইয়ুরোপের কোনও খ্রীষ্টান রাজার সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থিকর ব্যাপার প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার দেশী খ্রীষ্টান সমাজের যেরূপ স্কন্ধ হইবার কথা, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে বাঙ্গালার মুসলমানদিগেরও সেইরূপ হওয়া

উচিত । একধর্মাবলম্বী বলিয়া যদি তিনি স্পেনের বা মিশরের মুসলমান রাজাদের সহিত জ্ঞাতিত্ব দাবী করেন, তাহা হইলে সহানুভূতির পরিধিটা আর একটু বাড়াইয়া সকলের সহিত মানবজাতির জ্ঞাতিত্ব দাবী করিতেও পারেন ।

তবে একটা কথা উঠিতে পারে, জাতির টান বড় না ধর্মের টান বড় ? আমার ত মনে হয় জাতির বা ভাষার টানই বড় । আমি নিজের সম্বন্ধে তিনটি টানের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব । যখন ধর্মের কথা উঠিবে তখন বাঙ্গালী বিহারী নির্বিশেষে ঠাকুরবাড়ীতে বুলন দেখিতে যাইব তখন বিহারী হিন্দুর সহিত আমার জ্ঞাতিত্ব । যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সজা হইবে তখন হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে বাঙ্গালীর সহিত মিলিব । আবার যখন ছত্রীজাতির যুবক সভার অধিবেশন হয় তখন আমি ছত্রীরূপে তাহাদের সহিত মিশি । সমাজের ব্যাপার জীবনের অল্পক্ষণ জুড়িয়া থাকে, ধর্মের ব্যাপার দিবসে ২৪ ঘণ্টা, আর ভাষার ব্যাপার সমস্ত ক্ষণ । তাই বলিতেছিলাম, ভাষার টান বা জাতির টান, ধর্মের টান অপেক্ষাও অধিক । এইজন্তই বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ বর্ধমানের সভাতে উর্দুর পরিবর্তে বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা করিয়া লওয়ার আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম ।

সেই জন্তই বলি, সাহিত্য-সম্মিলনে ধর্মের ব্যাপার বা সামাজিক ব্যাপার লইয়া বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই । সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে যতটুকু হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন তাহা সাহিত্য-সম্মিলন করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যপরিষদ বা সাহিত্য-সম্মিলন এখনও সমালোচনায় হাত দেন নাই ।

যাহা প্রথমে বলা উচিত ছিল, তাহা শেষেই বলি । আমি কখনই ভাবি নাই যে, চাঁদ মহাশয় “হিন্দু মুসলমানের বিরোধী হইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ।” আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে, কে চাঁদ মহাশয় যে বিষয়গুলিকে হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় মনে করিতেছেন আমি বলি সেগুলি কিছুই নহে । পূর্বে কোনও কোনও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোবিবাদ ছিল তথাপি মুসলমানেরা সাহিত্য-চর্চা করিয়া আসিয়াছেন । আজকাল সংবাদপত্র হওয়াতেই অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও লোকে বড় করিয়া দেখিতেছে, তাই মিলনের অন্তরায়ের কথা উঠিতেছে । যে ব্যাপার লইয়া ঘটনার কালে কোনও কথাই উঠে নাই, সে সকল দৃষ্টান্ত এখন তুলিয়া ফল কি ? যেমন সাহিত্যপরিষদে অনেক শিক্ষিত মুসলমান যোগদান করেন নাই, সেইরূপ অনেক হিন্দুও যোগদান করেন নাই ।

পূজার দালানে প্রবেশের সম্বন্ধে যে অস্পৃশ্যতার কথা উঠিয়াছে তাহার

সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলেই ধর্ম্মাছুষ্ঠানের কথা উঠিলে, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও কথা না বলাই ভাল, তবে চাঁদ মহাশয় এ কথা স্বরণ রাখিবেন যে, ধর্ম্মাছুষ্ঠান ব্যাপারে বিলাত ফেরত হিন্দু, দীক্ষিত ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সকলেরই আসন মুসলমানের সমান। যে সকল শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য মনে করেন বা ঘৃণা করেন, তাঁহারা কেহ সম্মিলনে যোগদান করেন না। যেদিন সাহিত্য সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গ একবাক্যে মুসলমানগণকে ঘৃণা প্রদর্শন করিবে, সেদিন মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অভিযোগের কারণ হইবে, কিন্তু তখন সম্মিলনের মৃত্যু ঘটবে। মতুবা ২।৪ জন প্রতিনিধি সেরূপ করিলে, সেরূপ প্রতিনিধিগণই তাড়িত হইবেন। সমাজের কে কোথায় কাহার প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শন করিতেছে, তাহা লইয়া সম্মিলনের মাথাব্যথা কিসের ?

শিখা স্মৃতিতে বহুবিষয়ে মনোবিবাদ সত্ত্বেও যেরূপ উভয় সম্প্রদায়ের লোকে মুসলমান লীগে যোগদান করিতেছেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মনোবিবাদ সত্ত্বেও (আংশিক রূপে) তাঁহারা উভয় দলেই যেমন সাহিত্যিকরূপে সম্মিলনে যোগদান করিতেছেন, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকেও তাহাই করিতে হইবে। “জনকয়েক হিন্দু বা জনকয়েক সাহিত্যিক আমাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন”, এ কথা মনে রাখিলে তাঁহারা মিলিতে পারিবেন না। লোকে পুত্রশোক পাইয়াও হাসি-মুখে সংসারের কাজ করিয়া যায়, আর কোথায় কে কি বলিয়াছেন বলিয়া অন্ত্যর্ধনা সমিতি বা সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের উপর রাগ করিলে চলিবে কেন ?

যদি কোনও সংবাদপত্র, মাসিকপত্র বা পুস্তকে কোনও আপত্তিকর বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকে যেরূপ প্রতিবাদ করেন, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। ইহার জগু তাঁহাদের মুসলিম লীগও আছেন। সাধারণতঃ যে সংবাদপত্রে আপত্তিকর লেখা বাহির হয়, তাহাতেই প্রতিবাদ পাঠান নিয়ম, তিনি প্রকাশিত না করিলে অন্য সংবাদপত্রে পাঠাইতে হয়, কে চাঁদ মহাশয় এরূপ কিছু করিয়াছিলেন কি ? এরূপ করিবার সাধারণের যেরূপ অধিকার, তাঁহারাও সেইরূপ অধিকার ছিল। তিনি সে অধিকার বুঝিয়া না লইলে দোষ কাহার ?

ভেক-তত্ত্ব ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

“আষাঢ়শ্র প্রথম দিবসে” যখন নীরদমালা আকাশ ছাইয়া ফেলে, তখন আর আকুল হইয়া কোকিল কুজন করে না। স্মরসিক কবি তাহার সরস কৈফিয়ত দিয়াছেন—

“দর্দু রাঃ যত্র বক্তারঃ তত্র মৌনং হি শোভনং” ।

কিন্তু কবিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলেও, “কটুরব” ভেককুল আমাদের প্রাণে প্রানুট-জল-স্নাতা পল্লাজননী সিন্ধু মুখের অসংখ্য স্মৃতির উদ্রেক করে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নীরব নিশীথে যখন কর্কশ-কণ্ঠ দর্দু রকুল শকারমান ঝিল্লি-কীটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তখন কোন্ শব্দটা অধিক কর্কশ; তাহা নির্ধারণ করিয়া নিভুল রায় দিতে একটু সময় লাগে। কিন্তু এই দুইটা শব্দের সঙ্গে একটু বর্ষার টিপ্ টিপ্ শব্দ, মাঝে মাঝে একটা গ্রাম্য কুকুরের রব ও তাহার প্রতিধ্বনি একত্র মিলাইলে যে অসংখ্য স্মৃতি আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে, তাহা অমূল্য। তাই যেমন বাঙ্গালী আজীবন কাক, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়াকে ভুলিতে পারে না, তেমনি ব্যাঙ ও ঝিঝিপোকা, শিবা ও সারমেয়ের বেহুর কর্কশ স্বর আজীবন বাঙ্গালীর স্মৃতি-মন্দিরে বিরাজ করে।

বিজ্ঞান-জগতেও ভেকের একটা বিশেষ আদর আছে, অবশ্য তাহার রূপের জন্ত বা তাহার কণ্ঠস্বরের জন্ত নহে। কুমীর, কচ্ছপ, জলটোঁড়া, গোসাপ প্রভৃতি খাঁটি উভচর বটে, কিন্তু মগুক যেমন খেচর ও জলচর, ঠিক সে রকম উভচর ইহারা কেহই নয়। ব্যাঙের জন্ম জলে; শৈশবে ও বাল্যে ইহা খাঁটি জলচর, যৌবনে তবে সে খেচর হইবার অধিকার পায়। মশক প্রভৃতি অনেক কীট পতঙ্গ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী জীবনযাত্রা আরম্ভ করে জলে, কিন্তু শেষে পূর্ণ-বয়ব হইয়া স্থলে ও বিমানে বিহার করে। মেরুদণ্ডযুক্ত জীবদের মধ্যে কেবল মগুক জাতির জীবনের ইতিহাসটা ঐ প্রকারের। তাই জীব-বিজ্ঞানে শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে মৎস্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম, স্তন্যপায়ী ব্যতীত অ্যান্ফিবিয়া বা উভচর বলিয়া একটি জীবশ্রেণীর বিভাগ আছে। কোনও কোনও জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মৎস্য ও অ্যান্ফিবিয়াকে ইক্টিওডিসিডা নামক বড় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু অ্যান্ফিবিয়া যে মৎস্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম বা স্তন্যপায়ী নয়, এ কথা সর্ববাদীসম্মত।

ভেক সর্বদেশে পাওয়া যায় এবং ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীও বড় কম নয়। জীবজন্তুদের সাধারণ গুণ ও দেহের গঠন দেখিয়া বিজ্ঞান তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ করে। সেই বিভাগ মত ভেক নয় পরিবারভুক্ত। সেই নয়টি পরিবারে আবার ২২ শ্রেণী আছে এবং সেই ২২ শ্রেণী ৪০০ জাতিতে বিভক্ত। আমি ইংরাজি শব্দ speciesকে জাতি বলিতেছি, কারণ সাধারণতঃ এক শ্রেণী বা জিনাসের দুই জাতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে সম্ভাবন উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দোঁ-আঁসলা শাবক সম্ভাবনোৎপাদন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়। অশ্ব ও গর্দভের পুত্র অশ্বতর শাবক উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু আরবী ঘোড়া ও ফকীরের টাট্টুর মিলনে যে ঘোড়া জন্মে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে। আরবী ঘোড়া ও ফকীরের টাট্টু এক জাতীয় জীবের দুই প্রকার বা variety. সেই রকম ৪০০ জাতীয় ভেকের যে অসংখ্য প্রকার আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা ত আসল ভেকের (Ranidae) জাতির সংখ্যা। ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাড়ে নয় শত জাতি আছে। আমরা মোটামুটি আমাদের দেশে সোনাব্যাঙ, কোলাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ ও গেছোব্যাঙ দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের চোখে এই সকল ভেকের মধ্যে জাতির ও প্রকারের পার্থক্য যথেষ্ট আছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশের মগুক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বাদে ৪৩ শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রত্যেক শ্রেণী আবার নানা জাতিতে বিভক্ত—আবার এক এক জাতীয় ভেকের মধ্যে নানা প্রকারের ভেক আছে। ভেক-জগত যে কত বিস্তৃত, ইহা হইতে বুঝা যায়।

দর্দুর অণ্ডজ। বলা বাহুল্য, উচ্চশ্রেণীর সকল জীবই অণ্ডজ। মানুষ, হাতী, কুকুর, বাঘ, খরগোস, মহিষ, টিয়াপাখি, কচ্ছপ, গোখরো সাপ, মশা, পিপীলিকা, ভেটকী মাছ এবং কতক কতক প্রবাল জীব সবাই অণ্ডজ। তবে মানুষের ডিম মাতৃজঠরে বাড়িতে থাকে, মানব-শিশু পূর্ণাবয়ব হইলে তবে সে ভূমিষ্ঠ হয়; হাতী, ঘোড়া, কুকুর, শৃগাল, মেঘ, মহিষ, সবারই জন্ম-বিধি ঐ প্রকার। কিন্তু টিয়াপাখি বা পায়রার ডিম পূর্বেই বাহির হয়। পক্ষী ডানা ঢাকা দিয়া বকের ভলায় সম্বন্ধে তা দিয়া তবে শাবককে পূর্ণাবয়ব করে। তখন ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হয়। সাপ, কচ্ছপ, কুমীর, মশা প্রভৃতির ডিমের ব্যবস্থা অনেকটা ঐ প্রকার। কিন্তু এই সকল জীবের ডিমের একটা নিয়ম আছে। স্ত্রীলোকের দেহের মধ্যে “ডিমকোষ” নামক একটি অবয়ব আছে। যৌবনে সেই ডিমকোষের ডিম তাহাদের দেহের জরায়ু প্রভৃতি অণ্ড অবয়বে আসিয়া পড়ে।

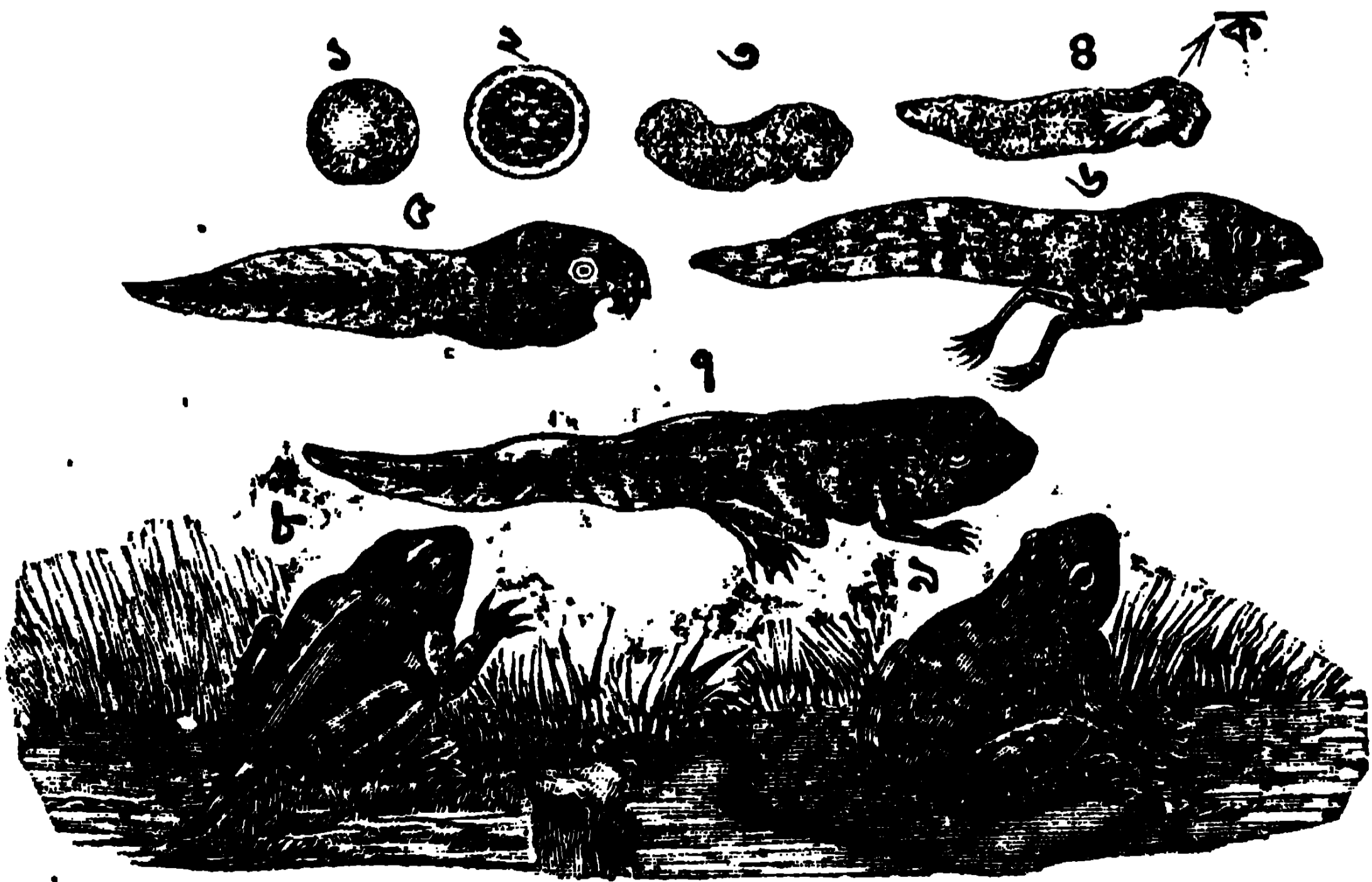
পুরুষ-জীবের শরীরে শুক্র থাকে। স্ত্রীলোকের ডিম এক প্রকার জীব-কোষ মাত্র—সর্বত্রই অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয়। সেই কোষের মধ্যে একটি খুব সূক্ষ্ম কৃষ্ণকায় দানা থাকে—তাহাকে বলে nucleus, তাহার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে—সেই পদার্থেই জীবে পরিণত হইবার শক্তি নিহিত। পুরুষ জীবের শুক্রেতে সামান্য কীটাণুবৎ পদার্থে জীবনীশক্তি আছে। যখন এই কীটাণুবৎ পদার্থ স্ত্রী-দেহের সেই ডিম্বের সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর পদার্থের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে, তখন নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। জীবের ডিম্ব এইরূপে Fertilised বা উর্ধ্ব হয়। প্রায় সকল উচ্চ জীবের সেই ডিম্ব ও শুক্রের মিলন স্ত্রীলোকের দেহের মধ্যে হইয়া থাকে। এ কার্যভার মদনদেবের উপর।

কিন্তু কোনও কোনও জীবের ডিম্ব ও শুক্রের মিলন দেহের বাহিরে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মৎস্য এই শ্রেণীর জীব, ইহারা ডিম পাড়ে, পুরুষ-মৎস্য তাহার ঘ্রাণে কামোন্মত্ত হইয়া যায়। তাহাদের দেহ ইহাতে শুক্রস্থলন হয়। বাহিরে নদীর স্রোতে বা সরোবরের শান্ত জলে দুই পদার্থের সংযোগ হইয়া ডিম্বগুলি উর্ধ্ব হয়। সকল মাছের ডিম পাড়িবার এ ব্যবস্থা নয়, হাঙ্গর প্রভৃতির অণু দেহের ভিতর সফল হয়।

আমাদের কটুরব দর্দুরের কিন্তু ডিম্ব উর্ধ্ব করিবার পদ্ধতি উক্ত প্রকারের। উর্ধ্ব না হইয়াও জীবের শরীর হইতে ডিম্ব বাহির হয়—গৃহে একটি হংসী পুষিলে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমার একটি চীনদেশের হংসী আছে। জাহাজেই তাহার সহচরের মৃত্যু হয়। আমি কলিকাতায় তাহার “জোড়া” পাই নাই বলিয়া তাহাকে একেলা রাখিয়াছি। এই হংসীটি দুই তিন মাস অন্তর সাত আট দিন ধরিয়া একাধিক্রমে প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম পাড়ে। সেগুলি অনুর্ধ্ব ডিম্ব—সাধারণ কথায় তাহাদের বলে “বাওয়া ডিম।” সে ডিম্বের মধ্যে হংসের শুক্রকীট নাই বলিয়া সে ডিম্ব শাবক উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আকারে প্রকারে, গন্ধে, স্বাদে “বাওয়া ডিম” ও আসল “উর্ধ্ব” ডিমে কোনও প্রভেদ নাই।

হংসী যেমন উর্ধ্ব ও অনুর্ধ্ব উভয় প্রকারের ডিম পাড়ে, ভেকী কেবল অনুর্ধ্ব অণুই প্রসব করে। এ কথা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা খুব সহজ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি ভেকী ধরিয়া কাচের পাত্রে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে সে অণু প্রসব করে। কিছুদিন পরে যে অণু গাঁজিয়া যায় তাহা আর সফল হয় না। ইহারা পুকুরে এই প্রকারে ডিম পাড়ে। কেবল যে পুকুরের

জলেই পাড়ে তাহা নহে—কখনও পুকুরের ধারে কখনও সঁাতসেঁতে জমিতে গাছের পাতায় তাহারা অণু-প্রসব করে। এ সময় প্রায় সর্বদাই তাহাদের সঙ্গে ভেক থাকে। আকাশে কালো মেঘ উঠিলেই ভেক ডাকিতে আরম্ভ করে—তাহাদের সঙ্গীতে (?) মুগ্ধ হইয়া ভেকী তাহাদের নিকটস্থ হয়। ভেক গ্যাঙোর গ্যাঙোর করিয়া থপথপ করিয়া নাচিয়া ভেকীর হাতের ভিতর দিয়া হাত দিয়া তাহাকে খুব চাপিতে থাকে। অবশ্য ভেকের আলিঙ্গন না পাইলেও ভেকী অণু-প্রসব করে। তবে বোধ হয়, পরস্পরের মিলন-সুখ অণু প্রসবে সহায়তা করে। সেই অণু থাকে এক তাল জেলির মত পদার্থের মধ্যে, ডিম দেখিতে কাল কাল বীজের মত, সংখ্যায় বিস্তর। পাখীর ডিমের ভিতরের খেত পদার্থটার মত এই চট্চটে নাল-হড়হড়ে পদার্থ ডিমের রক্ষার জন্ত। মাঝের কালো দানা পাখীর ডিমের কুসুমের মত—তাহারই মাঝে আসল জীবনী-শক্তি-যুক্ত ডিমের সঁার। ভেকী ডিম পাড়িলে ভেক সেই পদার্থের উপর আপনার ধীজ ছাড়ে। শুক্রকীটের একটা লক্ষণ এই যে, সেটা সর্বদাই স্পন্দনশীল। স্পন্দিত হইতে হইতেই সেই শুক্রকীট ডিম্বের কালো আবরণ ভেদ করিয়া ডিম্বের সারাংশের মধ্যে প্রবেশ করে। উভয় সাবে মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন ডিম উর্বর হয়।



ডিম্ব “সফল” হইলেই কালো আবরণটার ভিতর জল চুকিয়া সেটা ফাঁপিতে থাকে, ফাঁপিয়া বড় হয়। এই প্রবন্ধের প্রথম চিত্রটা সেইরূপ সফল ডিম্বের।

বলিয়াছি, স্পন্দনই শুক্রকীটের লক্ষণ । অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াও শুক্রকীট স্পন্দন করিতে থাকে, তাহাষ্টে আবরণের ভিতর ডিম ফাটিয়া দুই খণ্ড হয়, ক্রমে অনেক টুকরা দানা দানা হইয়া সমস্ত ডিমটা টেপারি ফলের মত দেখিতে হয় । কি প্রকারে ক্রমশঃ ঐরূপ হয় তাহা আমি অত্র প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । কারণ সকল জীবের—অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর জীবের—জীবনরহস্য এ তত্ত্বে নিহিত । যাহা হউক, ডিমের ভিতর নানা প্রকার অদল বদল হইয়া ক্রমে ভেকের ছানা বাহির হয় । ৩য় চিত্র ভেক-শিশুর প্রথম অবস্থার ।

কোনও কোনও মেরুহীন জীবের “বাওয়া ডিমের বাচ্ছা” হয়—অর্থাৎ কেবল মাতৃ-অণুে শিশুর উদ্ভব হয় । তাহাদের বিষয় নানা প্রকার ভুক্ত আছে । কোনও কোনও বিজ্ঞানবিদের অভিমত যে, সেই সকল জীবের একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গ বিচ্যমান । আবার কোনও কোনও অণু গাছের কলমের মত । সে সকল কথা অত্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত । কিন্তু এতদিন সর্ববাদীসম্মত ধারণা ছিল যে, মেরুদণ্ডযুক্ত উচ্চশ্রেণীর জীবের “বাওয়া ডিমে” শাবক হয় না, পুরুষের শুক্র না মিলিলে ডিম্ব আদৌ উর্ধ্ব হয় না । ১৯১০ সাল হইতে এখন সে ধারণা উন্টাইয়াছে, এবং ভেক-ডিম্বের পরীক্ষা দ্বারা মত পরিবর্তিত হইয়াছে । পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ভেকের অণু ভেকের শুক্রের দ্বারা উর্ধ্ব না হইলেও ভেক-শিশু উৎপন্ন হইতে পারে । বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষা-ফল বিজ্ঞান-জগতে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে ।

এ পরীক্ষা করিয়াছিলেন প্রথমে ১৯১০ সালে মুসো বাটেলোঁ (M. Bataillon) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত । এই পরীক্ষা বর্ণনা করিয়া সার রে ল্যাঙ্কেষ্টার “বাওয়া ডিমের বাচ্ছা” ব্যাণ্ডের নাম দিয়াছেন—“পিতৃহীন ভেক ।” এইরূপ সন্তানোৎপাদনের ইংরাজী নাম—Parthenogenesis বা “কুমারীর সন্তান-প্রসব” ।

বাটেলোঁ সাহেব বেশ পরিস্কার জলে ভেকীকে ডিম পাড়িবার অবসর দিয়াছিলেন । সে জলে মোটে ভেকের শুক্র ছিল না । তিনি বহুদিন ধরিয়া প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিরূপে ভেকের শুক্রকীট ভেকীর অণুর কালো চামড়া ভেদ করিয়া ডিমের সারের মধ্যে প্রবেশ করে । তিনি খুব দক্ষতার সহিত সরু সূচ দিয়া সেইরূপ ভাবে ডিমে ছিদ্র করিয়া দিলেন । ছিদ্র হইবা মাত্রই ডিম্বের ভিতরে স্পন্দন আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ ডিম ফুটিয়া ব্যাঙাচি বাহির হইয়াছিল ।

বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষা বর্ণনা করা যত সহজ, কার্যো পরিণত করা তত সহজ নয়। বাহা হউক, পরীক্ষা যে নিভুল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ অগ্ৰাণ্ণ পণ্ডিতেরাও এ পরীক্ষা করিয়াছেন। এবং ল্যাক্সেটার সাহেব স্বয়ং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথমে জড়পিণ্ডের মত শিশু বাহির হইয়া তাহা ব্যাঙাচিতে পরিণত হয়। তখন ভেক-শিশু একেবারে মৎশ্বের মত জলচর। মৎশ্বের সঙ্গে ইহাদের মোটামুটি পার্থক্য এই যে, ইহাদের গাত্রে গুল্ল থাকে না এবং মাছের মত ইহাদের পাখা থাকে না। ‘অবশ্য অনেক মৎশ্বের গাত্র মসৃণ থাকে। সুতরাং এক পাখনার অভাব ব্যতীত মৎশ্ব ও ব্যাঙাচিতে কোনও বাহ্য প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থ চিত্রে আমি একস্থল ক চিত্রিত করিয়াছি। ছোট ব্যাঙাচির মাথার দুই পার্শ্বে ঐ রকম অঙ্গ থাকে। মাছের “কান্‌কো”র ঢাকনি তুলিলে লাল কাঁটা কাঁটা যে কান্‌কো যন্ত্র থাকে, তাহার দ্বারা মাছেরা জল হইতে অম্লজান টানিয়া লইয়া রক্ত পরিষ্কার করে। আমাদের ফুস্‌ফুস যে কার্য করে, মাছদের ঐ যন্ত্রদ্বারা সেই কার্য সাধিত হয়। জলের সঙ্গে অম্লজান মিশ্রিত থাকে, শিশু ব্যাঙাচি ঐ ক-চিত্রিত যন্ত্র (gills) দ্বারা জল হইতে অম্লজান টানিয়া লয়। ইহাদের মুখের নীচে দুইটি গোল “খুবনী” থাকে। তাহার সাহায্যে তাহারা কঠিন পদার্থে সংবদ্ধ থাকিতে পারে।

ব্যাঙাচির বাহিরের কান্‌কো বেশী দিন থাকে না। প্রথমতঃ সে বাহিরের কান্‌কোর দ্বারা শ্বাস লয় বটে কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের কান্‌কোর ঢাকনী গজায় ও ভিতরে মাছের মত কান্‌কো তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে বাহিরের কান্‌কো শুকাইয়া যায়; তখন ঠিক মাছের মত ভেক-শিশু ভিতরের কান্‌কোর দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে, অর্থাৎ জলে মিশান অম্লজান টানিয়া লয়। আমি কাচের পাত্রে রাখিয়া দেখিয়াছি, দশ বারো দিনে বাহিরের কান্‌কো শুকাইয়া ব্যাঙাচির ভিতরের কান্‌কো কার্যক্ষম হইয়াছে। ৫ নং চিত্র সে অবস্থার ব্যাঙাচির। এ সময় ইহাদের মস্তকের ও দেহের বর্ণ খুব কালো, শরীরটা স্বচ্ছ, তাহার ভিতর পাকানো নাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙাচি অবস্থায় ভেক উদ্ভিদ-ভোজী। ব্যাঙাচির জীবনী-শক্তি খুব প্রবল। কারণ লাল মাছের সহিত স্বচ্ছ জলে ইহারা যত স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, মাটি-গোলা ঘোলা জলেও ইহারা প্রায় সেইরূপ স্বচ্ছন্দে বাস করে। আমি উভয়বিধ

জলেই ব্যাঙাচি রাখিয়া দেখিয়াছি, প্রচুর পরিমাণে শৈবাল ঝাঁঝি, পাটা প্রভৃতি খাওয়া দিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও ব্যাঘাত হয় না। প্রায় এক মাস পরে তবে ব্যাঙাচির প্রথম পাদোদ্যম হয়। ৬ নং চিত্র সেইরূপ ব্যাঙাচির। প্রথমে মনে হয়, ইহারাই সম্মুখের পদ—কিন্তু তাহা নহে। এই সময় তাহাদের ভিতরের ফুস্ফুসও প্রায় নির্মিত হইয়া উঠে এবং তাহাদের শরীরের রক্ত কান্কে ছাড়িয়া ফুস্ফুসে যায় অল্পজ্ঞান গ্রহণ করিতে। ভেকের মুখও ক্রমশঃ বড় চওড়া হইতে আরম্ভ করে। অবশ্য অমন সুন্দর মুখ কিছু একদিনের সৃষ্টি নয়, তাই ক্রমশঃ দেহের পরিণতির সহিত মুখেরও পরিণতি হয়। প্রথম পা দুইটি পশ্চাতের। প্রায় মাসাবধি পশ্চাদের দুই পদের সাহায্যে খেলিয়া বেড়াইবার পর তবে সম্মুখের পা গজাইয়া উঠে। এই অবস্থায় ব্যাঙাচির বেশ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমশঃ সম্মুখের অঙ্গ লম্বা হইতে থাকে। চতুষ্পদ ব্যাঙাচির (৭ম চিত্র) লাঙ্গুল ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া লাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদ ব্যাঙাচিতে পরিণত হয় (৮ম চিত্র) এবং ক্রমশঃ লাঙ্গুল খসিয়া ব্যাঙাচি একদিন লাফ মারিয়া একেবারে পূর্ণাবয়ব ভেকে পরিণত হয়; খেচর জীব হইয়া জলের ধারে কচুবনে বসিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া খায়।

ভেকের জন্মবিধিও যেমন অপরূপ, তাহাদের ভোজনবিধিও তেমনি অপূর্ণ। যতদিন ব্যাঙাচি থাকে ততদিন সে উদ্ভিদভোজী, কিন্তু ভেক হইয়াই সে একেবারে পোকা মাকড় ধরিয়া জঠর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। দেহের যেমন পরিবর্তন হয়, ইহাদের রুচিরও তেমনি পরিবর্তন ঘটে।

ব্যাঙের রূপ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ বড় করিতে চাহি না। ব্যাঙের বাহ্য দেহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের গলা বা ঘাড় নাই। হাত অপেক্ষা পা অনেক বড় বলিয়া ভেকের চলন অমন কুৎসিত। হাতের মাত্র চারিটি আঙ্গুল—পায়ের আঙ্গুলগুলা যেমন চামড়া-জোড়া, হাতের আঙ্গুলগুলা তেমন নয়। ইহাদের হাতের বুড়া আঙ্গুলের চিহ্নমাত্র চামড়ার ভিতর থাকে—বাহিরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রকট নহে। মণ্ডুক-দেহ খুব নরম—ইহাদের গাত্রে কোন প্রকার শুষ্ক বা লোম নাই। ভেকের চক্ষু বেশ বড়—ড্যাবডেবে। ঠিক চক্ষের নিম্নেই দুই পার্শ্বে দুইটা কালো দাগ আছে, সেই দুইটা ইহাদের কাণ। আমাদের কাণের ভিতর যে চামড়ার পটহ আছে, তাহাতে ব্যোমের হিল্লোল লাগিলে তবে আমরা শুনিতে পাই। আমাদের বাহিরের কাণ বা হাতীর কুলার মত কাণ ব্যোমের স্পন্দন ধরিবার যন্ত্র মাত্র, আমাদের আসল যন্ত্র সেই পটহ হইতে আরম্ভ। ভেক-ভাষিক

পণ্ডিতেরা সেই কালো অংশ দুইটা ভেকের পটহ বলিয়া নির্দেশ করেন। ভেকের যেমন ঘাড় নাই, তেমনি তাহার কণ্ঠ নাই এবং দুইটা ছিদ্র ভিন্ন নাসিকাও নাই। তাই তাহার মুখ অত কুশ্রী! ব্যাঙ বসিয়া থাকিলে মনে হয় যে, তাহার কোমর ভাঙ্গা। কিন্তু বাস্তবিক সে কোমর-ভাঙ্গা নয়। তাহার মেরুদণ্ড ও কোমরের হাড়ের সংযোগ-স্থল ঐরূপ দেখিতে হইয়াছে।

ভেকের শীকার ধরিবার বিশেষত্ব আছে। ঈশপের গল্পে আছে যে, ভেকের ব্রহ্ম ভাব দেখিয়া শশকেরা আত্মহত্যার সঙ্কল্প বিসর্জন করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভেক শীকার ধরিবার সময় তুড়ু ক তুড়ু ক করিয়া লক্ষ্যপ্রদান করে, আর সাপের মত চেরা জিহ্বা বাহির করিয়া পোকা ধরে। ইহাদের জিহ্বাও অপূর্ব। আমাদের জিহ্বা যেমন মুখের পিছনদিকে বদ্ধ সম্মুখদিক অসংলগ্ন, উহাদের তেমনি জিহ্বা নীচের চোয়ালের সামনের দিকে আবদ্ধ, ভিতর দিকটা অসংলগ্ন—অর্থাৎ ঠিক আমাদের জিহ্বার উল্টা। উহারা যখন জিহ্বা বাহির করে, উহাদের জিহ্বার ভিতর দিকটা বাহিরে আসে, আমরা জিহ্বা বাহির করিবার সময় সম্মুখের অংশটি বাড়াইয়া দিই মাত্র। মণ্ডূকের রসনায় আঠা থাকে—উল্টা জিহ্বাটা বাহির করিয়া পোকের গাত্রে লাগাইতে পারিলেই হইল। ইহাদের দাঁত কাঁটার মত, আর কেবল উপরের মাড়িতে আছে।

দর্দুরের ভিতরকার অবয়বদি প্রায় মানুষের মত, অবশ্য অনেক বিষয়ে ছোট ছোট পার্থক্য আছে। সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। কেবল একটা কথা মোটামুটি বলিয়া রাখি যে, ইহাদের বক্ষাস্থিও আছে, মেরুদণ্ডও আছে—কিন্তু পঁজরা নাই। তাই তাহাদের পেটের দিকটা অত তুলতুলে নরম। পঁজরা নাই বলিয়া মণ্ডূক ঠিক অন্ত্রাণ্ড উচ্চশ্রেণীর জীবের মত ফুসফুস ফুলাইয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। ইহারা মুখ নাড়িয়া বাতাস গিলিয়া ফুসফুসে পাঠায়। ব্যাঙের চানড়ার ছিদ্র দিয়াও শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অনেক ঘটপদের মত ইহাদের গাত্রে রক্ত দিয়া অঙ্গারজান নির্গত হয়।

ভেক নানা বর্ণের হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় এক প্রকার ভেক আছে, যাহাদের দেহের বর্ণ সেখানকার গাছপালার অনুরূপ। আমাদের দেশের বড় 'সোণা ব্যাঙের দেহ যখন সূর্যের আলোকে ঝকঝক করে, তখন বলিবার উপায় নাই যে, ভেক বড় কুৎসিত জীব।

সর্প ভেকভুক । আর ভেকভুক ফরাসী জাতি । শুনিয়াছি, চীনদেশের
রক্ষনশালাতেও ভেকের আদর আছে । আমাদের দেশের অনেক আদিম জাতি
সর্প ও মূষিক ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহারা মণ্ডুক খায় কি না বলিতে পারি না ।
তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিধান আছে যে, পাগলের পক্ষে সোণা ব্যাঙের
ঝোল প্রশস্ত ।

অন্তরে ।

[শ্রীঅবনীকুমার দে ।]

চাহি না তোমারে আমি নিমিষের তরে কভু,
তুমি যে আমারি চির অনাদি অনন্ত প্রভু ।
কি সাধ্য আমার বল তুমি তোমা' প্রাণসখা !
চাহি না দেখিতে তোমা' যদি নাহি দাও দেখা ।
কি দুঃখ রেখেছ হেথা কিছু না খুঁজিয়া পাই,
থাকে যদি দেহ মোরে আমি যে গো তাই চাই ।
শুধু আলো শুধু স্মৃতি সে ত মহা অন্ধকার,
তোমারে ভোলায়ে রাখে মোহপাশে বার বার ।
তুমি ত ভুলিতে নার কেমনে ভুলিব অশমি,
তোমারি এ পূর্ণ অঙ্গ তোমাতেই পূর্ণ স্বামী ।
নিশিদিন চিত্ত মোর সমর্পিয়া তবু করে,
তোমারি এ চিত্তখানি রেখেছি তোমারি তরে ।
কা'রো নাহি অধিকার এ চিত্ত মাঝারে মোর,
অন্তরে অন্তরে গাঁথি রচিয়াছ মায়া ডোর ।
সকলের মূলে তুমি হে অনন্ত মূলাধার !
জগত-জীবন-স্বামী তুমি নাথ সবাকার ।
পরম উপাশ্রয় মম হে দেব মহিমাময় !
তোমারি পবিত্র প্রেমে তোমাতে হইব লয় ।
যতই তোমার তরে অন্তরে ডাকিতে পারি,
তত সে নিকটে তব—তত আমি মনে করি ।

আনো ঘোর অন্ধকার প্রলয়ের রুদ্ধতাল,
 উল্লাসে নাচিব আমি হে অনন্ত মহাকাল ।
 আনো হুঃখ আনো ক্লেশ আনো দৈন্ত যন্ত্রণায়,
 সকলি করিব নাথ' নিবেদন তব পায় ।
 তোমারই দান তব—তোমাকেই নিতে হবে,
 এ অনন্ত গুরুভার তোমাতেই লয় পাবে ।
 তুমি যে গো নির্ঝিকার নিখিল-জগতস্বামী,
 তুমিই অন্তরে মোর হে মম অন্তরস্বামী !
 কি সাধ্য তোমার প্রভো ! ঠেলিবে চরণে মোরে,
 বাধিব চরণ তব—তব রচা কস্মডোরে ।
 আমি দাসী তুমি নাথ প্রকৃতি-পুরুষ মোরা,
 আমি ছাড়া তুমি নও আত্মায় আত্মায় যোড়া ।

কোবে ।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম, এল্, এম্, এম্ ।]

প্রত্যুষে মোজী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের জাহাজখানি ধীরে ধীরে
 অস্তুর্দেশীয় সাগরের মধ্য দিয়া কোবে অভিমুখে গমন করিতে লাগিল ।
 “হপ্পো” ও “কিউসিউ” পরস্পর বহুদূরবর্তী হইলেও, সাগর মধ্য পর্বতাকীর্ণ
 হওয়ায় আমরা একবারও গিরিবহুল স্থলভূমির দৃশ্য হারাই নাই । সর্বক্ষণই
 কোনও না কোনও পর্বতের পাদমূল দিয়া কিম্বা কোনও পর্বত বেষ্টন করিয়া
 সমস্ত পথটুকু অতিবাহিত করিতে লাগিলাম । চারিদিকে কি মনোরম দৃশ্য !

সেদিন গুরুপক্ষের ছাদশী । নক্ষ্যার ঘনান্ধকার সে ছবিখানিকে ঘেরিতে
 পারিল না । চন্দ্রকর-বিধৌত সে দৃশ্য আরও মনোরম দেখাইতে লাগিল ।
 রাত্রি প্রায় একটার সময় জাহাজখানি কোবেতে পৌঁছিল । একজন জাপানী
 ডাক্তার সদলবলে ষ্টীমারে করিয়া যাত্রীদের পরীক্ষা করিতে আসিলেন ।
 জাপানী রাজকর্মচারী এই প্রথম দেখিলাম । সকলেরই পরিচ্ছদ সামরিক
 পরিচ্ছদের স্থায়, বুকে দুই সারি করিয়া পিস্তলের বোতাম, হাতে ও গলায়
 জরি । তবে পদের তারতম্য অনুসারে চাকচিক্যের স্বাতন্ত্র্য ছিল । সকলেরই
 মুখে একটু উদ্ধত ভাব, যেন আপনাদের স্বাধীনতা গর্বে গর্বিত । জাহাজের
 কাণ্ডেন প্রত্নতি সাহেব কর্মচারী সকলকেই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইতে হইল ।

কাহারও দিকে ক্রক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা বেশ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিদেশী জাহাজ বলিয়া যেন পরীক্ষা কিঞ্চিৎ কঠোর। আবশ্যক মত ইংরাজীতে দুই চারিটা প্রশ্ন করিলেন। সে ইংরাজী খুব কাঁচা। পরীক্ষা শেষ হইলে “Good night” বলিয়া আপনাদের ষ্টীমারে প্রত্যাভর্তন করিলেন। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কোবে বন্দরটা জাপানীদের জাহাজ ও নৌবাহিনী গঠনের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ অর্ণবপোত অর্ধ গঠিত অবস্থায় দেখিলাম। জাপানীরা নৌ-গঠন বিজ্ঞায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

কুলেতে নামিয়া দেখি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মানাবর্ণে অলঙ্কৃত বহুতর রিক্সা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিবামাত্র রিক্সাওয়ালারা ঘেরিয়া ফেলিল। সকলেই ভঙ্গা ইংরাজীতে ছ’ একটা কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। এখানকার রিক্সাওয়ালাদের পরিচ্ছদ বেশ একটু নূতন ধরণের। পায়ে খুব মোটা নীল কাপড়ের বুট জুতা হাঁটু অবধি আসিয়াছে। জুতার তলা এক ইঞ্চি পুরু চামড়ায় নিশ্চিত। ইহা অনেকটা রাইডিং বুটের মত, কিন্তু চামড়ায় প্রস্তুত নহে। হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঐরূপ নীল মোটা কাপড়ের ইজের। গায়ে ঐ কাপড়ের চায়না কোট। সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত শিরোদেশ ছোট টোকোর মত টুপীতে আবৃত। সমস্ত অঙ্গের মধ্যে কেবল কঙ্গী হইতে হাত দু’টা ও মুখখানি অনাবৃত। ইহারা চীনা রিক্সাওয়ালাদের মত অত বলিষ্ঠ নহে, এবং অত দ্রুত টানিতেও পারে না, কিন্তু পোষাক, কায়দায় সকল রিক্সাওয়ালাদের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে। রিক্সা ব্যতীত অন্য কোনও যান দেখিলাম না। প্রায় সকল যাত্রীই এক একখানি রিক্সা লইয়া আপনাপন গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। আমিও একখানি রিক্সা লইয়া জাহাজ পরিত্যাগ করিলাম।

বন্দ—কোবে সহরটির পশ্চাতে পাহাড় এবং সম্মুখে সমুদ্র। সহরের এক ধারে সমুদ্র উপকূলে “বন্দ” অবস্থিত। ইহা একটি প্রায় ১০০ শত ফুট প্রশস্ত পথ। সমুদ্রের ধারটা প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। পথের অপর পার্শ্বে ঠিক সমুদ্রের দিকে সম্মুখ করিয়া সুরমা ও সুবৃহৎ সৌধাবলি নির্মিত হইয়াছে। এই পথটা সান্ধ্যবায়ু সেবনের পক্ষে অতি মনোরম স্থান। এই স্থানে বসিয়া নানা দেশীয় অর্ণবপোতগুলির গতিবিধি বেশ লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে বসিবার জন্য লোভাসন রক্ষিত হইয়াছে। সৌধগুলির প্রায় অধিকাংশই প্রস্তর গঠিত।

ও সুউচ্চ, ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য জাতীয় কল্লল বাঁ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের থাকিবার জন্ত নির্মিত হইয়াছে । অনেকগুলির উপর পতাকা-দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় । হু'একটিতে পাশ্চাত্য হোটেল আছে । এই সকল সুবৃহৎ অট্টালিকার অলিন্দে বসিয়া সমুদ্রের সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ করা যায় । এখান হইতে নানা স্থান পরিদর্শনের খুব সুবিধা । কারণ, এখানে রিক্সাওয়ালাদের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা আছে । এখানকার রিক্সাগুলি সর্বোৎকৃষ্ট ; দ্বিচক্র যানের মত চক্র-বিশিষ্ট এবং বহু যানের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় ।

আমেরিকা হাতোবা—বন্দর অনতিদূরে “আমেরিকা হাতোবা” বা জাহাজে উঠিবার প্রকাণ্ড জেটী । সমস্ত জেটীটা প্রস্তর নির্মিত এবং অতিশয় প্রশস্ত হইয়া রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । যেন মনে হয়, প্রশস্ত রাস্তা দিয়া একেবারে জাহাজে উঠিলাম । কোবে বন্দরটা জেটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত । বড় বড় জাহাজগুলি বন্দরেই থাকে । জেটী হইতে একখানি ছোট ষ্টীমার আরোহী লইয়া বন্দরে সর্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে । সম্ভ্রান্ত ভ্রমণকারীরা এখান হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া থাকেন । জেটীর এক পার্শ্বে একটা বৃহৎ কাঠের একতলা গৃহ । তাহার শিরোদেশে একখানি বৃহৎ কাঠফলকে বড় বড় করিয়া লেখা “Baggage keeper”. এইখানে যাত্রীরা আপনাদের মালপত্র রাখিয়া জাহাজে নিশ্চিত মনে চলিয়া যাইতে পারেন । এখান হইতে তাঁহাদের মাল যথাসময়ে জাহাজে প্রেরিত হইয়া থাকে । একজন যাত্রীকে আর মাথা ঘামাইতে হয় না । কারণ জাহাজে মাল লইয়া আরোহণ করিতে যাওয়া বড় সহজ কার্য্য নহে ।

রাত্রে এ স্থানটা বড়ই মনোরম শোভা ধারণ করে । অনেকগুলি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ পথের ও জেটীর চারি পার্শ্বে স্থাপিত । আশে পাশে “ক্যফে” বা ক্যফিখানায় আনন্দের ফোয়ারা চলিতেছে । দলে দলে যুবক যুবতীরা রিক্সা করিয়া নৈশ-বায়ু উপভোগ করিবার জন্ত এখানে আসিয়া থাকে ।

কোবে—সমুদ্রতীর পরিত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিদেশীদের চক্ষে একটা অভিনব দৃশ্য আসিয়া পড়ে । রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কঙ্করীময়, বিশেষত্ব কিছুই নাই । মনুষ্য চলাচলের জন্য পথের দুই পার্শ্বে কোনও বাঁধান স্থান নাই । সকলকেই রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিতে হয় । তবে এখানকার বিশেষত্ব এই যে, এত বড় সহরে পথে অশ্বখান কচিৎ দৃষ্ট হয় । সকলেই রিক্সা ব্যবহার করে । আরও বিশেষত্ব এই যে, বড় বড় পথ

গুলিতে দুই পার্শ্বে টেলিগ্রাফের প্রকাণ্ড স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জাপানের অগ্রাণু বৃহৎ সহরের মত এখানে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী বা বৈদ্যুতিক আলোক নাই। রাস্তার ধারে প্রায় কেরোসিন তেলের আলোই জলিয়া থাকে। আজকালকার কথা বলিতে পারি না, এত দিনে হয়ত বৈদ্যুতিক আলোর বন্দ্যুবস্ত হইয়া থাকিতে পারে।

বড় রাস্তাগুলির দুই ধারেই অধিকাংশই কাঠের বাড়ী। জাপানের প্রায় সর্বত্রই কাঠের বাড়ীর প্রচলন। ভূমিকম্পের ভয়ে সাধারণ লোকে ইষ্টকনির্মিত বাটী নির্মাণ করিতে চাহে না। বাটীগুলি প্রায় দ্বিতল। নীচে দোকান, উপরে কেহ কেহ বসবাস করিয়া থাকেন। দোকানের নামের অগ্র এখানে কাষ্ঠফলক প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। তৎপরিবর্তে বেশ একটা অভিনব উপায় দেখিলাম।

দ্বিতলের কোনও একটা জানালার মধ্য দিয়া একটা বাঁশ বা কাষ্ঠদণ্ড মাছধরা ছিপের মত বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার অগ্রভাগ হইতে দড়ি দিয়া একটা প্রকাণ্ড চিত্র-বিচিত্র পতাকা লম্বিত। তাহার আশে পাশে ও মধ্যে দোকানের বিবরণী লিখিত আছে। অনেকস্থলে এরূপ নিশানের পরিবর্তে 'চাইনীজ' লণ্ডনের মত লম্বা কাগজের লণ্ডনের গায়ে দোকানের নাম লিখিত। রাত্রে তাহার মধ্যে বাতি জালিয়া দেওয়া হয়, এজন্য খরিদারের দোকান অনুসন্ধান করিয়া লইবার কোনও অসুবিধা হয় না। কোনও কোনও দোকানের নাম ইংরাজীতে লেখা। এগুলির অগ্র প্রায়ই কাষ্ঠফলক ব্যবহৃত হইয়াছে।

দোকানগুলি এই সকল নিশানে সজ্জিত থাকায়, রাস্তায় প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন কোনও উৎসব হইতেছে। নানা বর্ণে চিত্রিত জাপানী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া জাপানী পুরুষ ও রমণীরা সর্বদাই কেনা-বেচায় ব্যস্ত। তাহাদের মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব। পুরুষেরা অনেকে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু রমণীরা আপনাদের জাতীয় রমণীয় বেশভূষা ত্যাগ করে নাই। তাহাদের মস্তকে সূচিকণ উন্নত কবরী, পদে মখমলের বেড় দিয়া কাষ্ঠপাছুকা বাঁধা, অঙ্গে বহু বর্ণ বিচিত্রিত "কিমনো" *। আমার মনে হয়, জাপানী রমণীরা পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলে অতিশয় কদর্য্য দেখিতে হইত। ইহাদের দেশীয় পরিধেয় এত সুন্দর যে, অনেক পাশ্চাত্য রমণীকেও এই বেশে সজ্জিত দেখিলাম।

আগুন লাগিবার খুব ভয় থাকায় পথের মাঝে মাঝে টেলিফোন করিবার স্তম্ভ সর্বত্র বিরাজমান। এখানে আর একটা প্রথা প্রচলিত দেখিলাম।

* জাপানীদের ঢিলা দেহাধরণ।

মাল বহিবার জন্ত গো-শকটের পরিবর্তে কলিফাতার ময়লা-ফেলা গাড়ীর মত ছোট গাড়ীতে করিয়া একজন লোকে মাল লইয়া যায়। ইহা বেশ সুবিধাজনক মনে হইল। আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থা হইলে খুব ভাল হয়। এখানে রাস্তায় দ্বিচক্রযানের প্রচলন খুব বেশী।

কোবের অধিকাংশ রাস্তাই অপ্রশস্ত। বড় বড় রাস্তাগুলির মধ্যে “মতোমাচি দোরি” “সান্নো মিয়াদোরি” ও “সাকেয়ি মাচি” উল্লেখযোগ্য। “মতোমাচি” অনেকটা আমাদের বড়বাজারের মত সর্বদাই লোকাকীর্ণ ও নানাপ্রকার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। “সান্নোমিয়া দোরি”তেও অনেক দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। “সাকেয়ি মাচি” বেশ সুপ্রশস্ত পথ। ইহার দুই পাশে অনেক ইষ্টক নির্মিত অট্টালিকা-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়েরা এইখানেই বিপণি-স্থাপন করিয়াছে। এই পথ দিয়া একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে অনেকগুলি মুদ্রা পরিবর্তনের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীরা এখানে আপনাদের মুদ্রা দিয়া জাপানী মুদ্রা ক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল দোকানের মাথার উপর বৃহৎ অক্ষরে কাষ্ঠফলকে “Exchange” এই কথাটা লেখা থাকে। বড় বড় “কাক্ফে” গুলিও এই পথে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোবের সাধারণ রাস্তাগুলি আলোকিত করিবার জন্ত আলোকস্তম্ভ ব্যবহৃত হয় না। ছোট রাস্তাগুলিতে মাঝে মাঝে বাটীর প্রবেশ-পথের মাথার উপর একটা করিয়া লোহার ব্র্যাকেট লাগান আছে। কাঠের প্রাচীরে ইহা অতি সহজেই সংলগ্ন করা যায়। তাহার উপর কাচের লঠনের মধ্যে চিমনি দিয়া আলো জ্বালান হয়। বড় রাস্তাগুলিতেও এরূপ বন্দোবস্ত, কিন্তু দোকানের আলোকে সে রাস্তাগুলি সন্ধ্যার পর বড়ই সমুজ্জল হইয়া উঠে। ছোট রাস্তাগুলিতে সরকার হইতে জল দিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। অধিবাসীদের আপন আপন গৃহ-সম্মুখ জলসিক্ত করিতে হয়। এইরূপে অতি সহজেই সমস্ত পথটীতে জলসেচন হইয়া থাকে। বিকাল বেলায় যখন পুরুষেরা আপন আপন কার্যে বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট বালতি করিয়া রাস্তায় জল ছিটাইয়া দেয়। তাহারা তখন বেশভূষায় সজ্জিত থাকে না, গৃহ-কার্য করিবার জন্ত অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। অনেকের নথ বন্ধ। জাপানীদের মধ্যে যে এখনও আদিম সভ্যতা বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

জন্মনী ভারতবর্ষ ।*

—

(৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুকরণে)

[শ্রীমত্যাশাধন মুখোপাধ্যায় ।]

১

পুণ্য ভারত ধন্য ভারত ধন্য গো মাতা ভারতবর্ষ ।
মহিমা মা তোর অসীম অপার জলধির মত অতলস্পর্শ ॥
গরজি যেথায় উঠিল অয়ি মা ভীষণ আরাবে পাঞ্চজন্ত ।
রক্ষিতে সব ধার্মিক বরে করি ধরিত্রী পিশাচ শূন্য ॥
কোরাস—পূত হইলা পৃথিবী আজি গো তোমার রাজীব চরণ চুমি ।
ধ্বনিত হইল বিশাল গগন দশদিশি পূরি ভারতভূমি ॥

২

আধারে আছিল মাগো যে বিশ্ব ফুটিল তাহাতে আলোক পুণ্য ।
ছুটিল তাহাতে প্রবাহ অতুল জাগাল পৃথী সে দেশ ধন্য ॥
যে দেশ প্রথমে বিতরে ধর্ম্ম যাহাতে দীপ্ত অর্ক বিশ্ব ।
ভক্তি আনত শীর্ষ যাদের লুটায় তাহারা তোমারি শিষ্য ॥
কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি ।

৩

গগন ভেদিয়া উঠিল কাহার ঔকার ধ্বনি জীমুত মন্ড্রে ।
শিহরি পুলকে উঠিল বিশ্ব ধ্বনিত হইল রঞ্জে রঞ্জে ॥
সেই বীর বাণী লইল পৃথিবী মহাসমাদরে বক্ষে ধরিয়া ।
সেই মহাতানে মুগ্ধ জলধি আছাড়ি পড়িছে চরণ লেহিয়া ॥
কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি ।

৪

মূরজ মন্ড্রে উঠিল যেথায় নিমাই কণ্ঠে অমিয় তান ।
সে মহাছন্দে ডুবিল বিশ্ব কাঁদিল যতক পাপীর প্রাণ ॥
কোথায় এমন প্রেমের ঠাকুর বিতরে এ হেন ত্যাগ-ধর্ম্ম ।
দেব বাণী সম কার হেন বাণী আলোকিয়া হৃদি পশিছে মর্ম্ম ॥
কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি ।

* কবি বালক । তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য এ কবিতাটি প্রকাশ করিলাম । অঃ সঃ

৫

জয়দেব যেথা গাছিল গীতি কাকলীতে তার ভরিল বঙ্গ ।

লহরীতে তার বহিল অজয় নাচিল উর্ধ্ব শোভি বরাদ্দ ॥

এষে সেই দেশ যেথায় প্রতাপ সমরে মাতিল মোগল সঙ্গে ।

এষে সেই দেশ যেথায় বিজয় জিনিল লক্ষা ফিরিল সঙ্গে ॥

কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

রাতকাণা—কৌতুক-নাট্য, মূল্য ১/০ হয় আনা । শ্রীযুক্ত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । যে করজন নবীন নাট্যকারের বঙ্গ-রঙ্গালয়ে নাম হইতেছে, এই গ্রন্থপ্রণেতা নির্মলশিব বাবু তাঁহাদের অন্ততম । তাঁহার দুই একখানি নাটক ইতিপূর্বে 'রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে, এবং সম্প্রতি সমালোচ্য গ্রন্থখানিও 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে । ইহা অনাবিল হান্তরসে পূর্ণ । পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না । এই গ্রন্থের কলেবর ক্ষুদ্র । পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও কম । সূত্ররাসম্বন্ধে থিয়েটারে ইহার বিশেষ আদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । গ্রন্থখানি পাঠে আমরা ভুগু হইয়াছি ।

ঠাকুরদাদার গল্পের খুলি—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ । শ্রীকমলজয় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত । প্রতি খণ্ডের মূল্য ১/০ । প্রাপ্তিস্থান, কল্যাণপুর, হাবড়া ।

'নিবেদনে' জানিলাম, এই পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত এবং ইহা ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়া ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে । সম্পাদক হরত সাধু ইচ্ছায় এই কার্যাত্মক গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 'ব্যবসাদারী' দেখিয়া হান্তসম্বরণ করিবার উপায় নাই । গরীব বালকের পক্ষে "একেবারে পাঁচ সিকা, দেড় টাকা দিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা বড়ই কষ্টকর" বিবেচনার সম্পাদকপ্রবর প্রতি খণ্ডের মূল্য ১/০ ধার্য্য করিলেন বটে, কিন্তু ৬০ খণ্ডে পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া 'গরীব বালকে'র নিকট উক্ত পাঁচ সিকা বা দেড় টাকার পরিবর্তে ৫১/০ গ্রহণ করিবেন কেন, তাহার উত্তর কি ? বিকট ব্যবসাদারী নহে কি ?

এই গল্পের খুলি আবার 'সচিত্র' । 'নিশি বিশের জ্বালায় ছুটে এলো' ছবিখানি কাঠফড়কেনের অতিকৃতি । ইহাতে ছেলে জুলিবে কি ?

এই দুই সংগ্রহ—কয়েকটা গল্প আছে, উন্মথ্যে 'হরিন্দ্র' ও 'দেবরথ' উল্লেখযোগ্য । গল্পের ভাষা বালকদের উপযোগী এবং উপকথাগুলি শিকাগ্রন্থ । উপকথার ভাগ কনাইয়া গৌরাণিক গল্পের সংখ্যা বাড়াইলে পুস্তকখানির উপকারিতা বাড়িবে । আশা করি, গল্পের সংখ্যা হইতে ইহার বিশেষ সংস্কারসাধন হইবে ।

পঞ্চভূত।

১। পৃথিবী।

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

‘ভাষাপরিচ্ছেদ’কার লিখিয়াছেন,—“ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতানি”—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই কয়টা দ্রব্যের নাম পঞ্চভূত। তন্মধ্যে ক্ষিতি বা পৃথিবীর ১৪টা গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার। এই ১৪টা গুণের মধ্যে গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে,—অন্য কোনও দ্রব্যে থাকে না। তাই ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন,—“ক্ষিতাবেব গন্ধঃ”। ‘সুগন্ধি জল’ ‘সুরভি সমীরণ’ ইত্যাদি রূপে জল ও বায়ুতে যে গন্ধের অনুভব হয়, তাহা তদন্তর্গত পার্থিব ভাগের গন্ধ। এই জন্মই পার্থিব অংশের সহিত অমিশ্রিত জল বা বায়ুতে কোনই গন্ধোপলব্ধি হয় না। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীধরাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, শঙ্কর মিশ্র ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই কথাই স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)।

সংস্কার ত্রিবিধ,—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। তন্মধ্যে বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কারই পৃথিবীতে থাকে। বাণাদি পার্থিব পদার্থে বেগ প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয়। একটা বৃক্ষের শাখা নীচের দিকে টানিয়া আবার ছাড়িয়া দিলে তাহা যথাস্থানে গিয়া অবস্থিত হইয়া থাকে। শাখার এই পূর্বস্থানে নিয়মতঃ

(১) “সুগন্ধি সলিলং সুগন্ধিঃ সমীরণ ইতি প্রতীয়াৎ দ্রব্যাস্তরংপি গন্ধোহন্তীতি চেৎ, পার্থিবদ্রব্যসম্বারেণ তদগুণোপলব্ধেঃ। কথমেব নিশ্চয় ইতি চেৎ তদভাবেহুপলব্ধাৎ।”

—স্মারকমলী, ২৯ পৃঃ।

“যত্তু সুগন্ধি সলিলং সুরভিঃ সমীরণ ইতি তৎপার্থিবকুসুমাদ্যধিবাসনিবন্ধনম্।”—কিরণাবলী, ৪৬-৪৭ পৃঃ।

“জলাদাবপি গন্ধোহস্তি, ভবতি হি সুরভি জলং সুরভিঃ সমীরণ ইতি প্রতীতিরিত্তি চেৎ ন, তত্র অন্ত্রোপাধিকত্বাৎ। ন হি কুসুমাদ্যধিবাসাবসন্নমপহার প্রতীতিরিন্নহুদেতি।”—কণাৎ-রহস্য, ৪-৫ পৃঃ।

“জলাদেঃ কুসুমাদিসম্পর্কানৌপাধিকমেব গন্ধবৎ ন তু স্বাভাবিকম্।”—ক্ষিতি, অগ্নিবীর হস্ত-লিখিত পুঁথির ৫ পৃঃ।

অবস্থান দেখিয়াই শাখাদিতে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কল্পিত হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার অনুমেয়,—তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। “গুরুত্ব গুণেরও প্রত্যক্ষ হয় না,—পতন দেখিয়া তত্ত্বপদার্থের গুরুত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। বল্লভাচার্যের মতে অধঃসংযোগাবচ্ছেদে গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় (২)।

শুক, নীল, পীত, রক্ত, কপিল, হরিত ও চিত্র—এই সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতেই থাকে। পৃথিবীর রসও ষড়্ বিধ,—তিক্ত, কটু, কষায়, মধুর, অম্ল, লবণ। শিবাদিত্য, স্বকৃত “সপ্তপদার্থী” গ্রন্থে চিত্ররসও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“রসোহপি মধুরতিক্তকটুকষায়াম্ললবণচিত্রভেদাৎ সপ্তবিধঃ।”—(সপ্ত-পদার্থী, ২০ পৃঃ)

কিন্তু “তর্কভাষা”র ‘ত্ৰায়প্রদীপ’ নামক টীকায় বিশ্বকর্মা চিত্ররস স্বীকারের অর্থোক্তিকতা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রূপাদি ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ, কাজেই একই আশ্রয়ে নীল পীতাদি রূপদ্বয় থাকা সম্ভবপর নহে; এখন চিত্র-রূপ স্বীকার না করিলে আসনাদি অবয়বী নীরূপ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে চাক্ষুশ প্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ বলিয়া আসনাদি পার্থিব পদার্থের অতীন্দ্রিয়ত্বের আপত্তি হয়। সুতরাং চিত্ররূপ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু রসেন্দ্রিয় দ্রব্য গ্রাহক নহে, কাজেই নানা রসবিশিষ্ট অবয়বের দ্বারা যে অবয়বী নির্মিত হইবে, তাহা নীরস হইলেও ক্ষতি নাই (৩)।

সুরভি ও অসুরভি এই দ্বিবিধ গন্ধই পৃথিবীতে বর্তমান। অধিকাংশ তর্কিকেরাই চিত্রগন্ধ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, সুরভি কপাল ও অসুরভি কপালিকা দ্বারা যে ঘট নির্মিত হয়, তাহা নির্গন্ধ। তাদৃশ ঘটে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহা অবয়বের গন্ধ। কিন্তু “গন্ধো দ্বিবিধঃ সুরভির-সুরভিষ্চ।” ভাষ্যের এই অংশের ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—
“অসুরভিঃ সুরভ্যগন্ধঃ, তেন দুর্গন্ধভিন্নশ্চ চিত্রশ্চ সত্ত্বেহপি ন দ্বৈবিধ্যব্যঘাতঃ।”

(২) “গুরুত্বং পতনানুমেয়ম্। অধঃসংযোগাবচ্ছেদেনাপি প্রত্যক্ষমিতি বল্লভাচার্য্যঃ।”—কণাদিরহস্য, ৮ পৃঃ।

(৩) “নমু ষড়্ রসা হরিতকীতিব্যবহারাদেবং চিত্ররসোহপি শ্রাদিত্তি চেৎ। মৈবম্। রূপাদেব্যাপ্যবৃত্তিধনিয়মেনৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি রূপধরং স্পর্শধরং বা ন সম্ভবতীতি চিত্ররূপস্য তথাবিধস্পর্শস্য বানলীকারেবরবিনো নীরূপত্বাদ্যাপত্তাবতীন্দ্রিয়ত্বাদ্যাপত্তিস্তত্র বাধিকা। অত্র চু রসস্য ত্রব্যগ্রাহকদ্বারীরসত্ত্বেহপি বাধকাত্বাৎ।”—ত্ৰায়প্রদীপ, ১২০ পৃঃ।

অর্থাৎ এখানে অনুরভি পদের অর্থ, সুরভি ভিন্ন গন্ধ, সুতরাং দুর্গন্ধ ব্যতীত চিত্র-
গন্ধ থাকিলেও গন্ধের দ্বৈবিধ্যের ব্যাঘাত হইল না। কাজেই বলিতে হয়,
জগদীশ, চিত্ররূপের স্থায় চিত্রগন্ধও স্বীকার করিতেন। এই গন্ধবস্তুই পৃথিবীর
লক্ষণ,—যাহার গন্ধ আছে, তাহাই পৃথিবী। এখন আপত্তি হইতে পারে,
পাষাণাদি পার্থিব বস্তুতে গন্ধ নাই, সুতরাং পৃথিবীর গন্ধবস্তু—এই লক্ষণ
অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত হইয়া পড়িল। সমস্ত লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলেই অব্যাপ্তি
দোষ হয়। ইহার সমাধান এই যে, পাষাণেও গন্ধ আছে, তবে সে গন্ধ
অনুৎকট বলিয়া উপলব্ধ হয় না। পাষাণ-ভস্ম চূর্ণে যখন গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়,
তখন পাষাণেও গন্ধ আছে, ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। যে দ্রব্যের
ধ্বংসে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এই উভয়ের উপাদান কারণ একই। দৃষ্টান্ত—
মহাপট ধ্বংস জন্ত খণ্ডপট। ভস্মের উপাদানে গন্ধ ছিল বলিয়াই ভস্মে গন্ধের
উপলব্ধি হয়, এখন পাষাণও সেই গন্ধবদবয়বের দ্বারা আরক্ত বলিয়া তাহারও যে
গন্ধ আছে, ইহাতে অনুমানই প্রমাণ।

পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত—না উষ্ণ, না শীত।° রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—
পৃথিবীর চারিটা গুণই পাকজ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগবশতঃ বিজাতীয় রূপরসাদি
▶ পৃথিবীতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটে প্রথমাবস্থায় শ্যামরূপ থাকে, তাহাতে
অগ্নিসংযোগ করিলে রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। বিজাতীয় রসাদিও অগ্নিসংযোগে
উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগ্নিসংযোগে বিজাতীয় স্পর্শের স্পষ্ট প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি হয় না বলিয়া
পাকজ স্পর্শে অনেকের বিপ্রতিপত্তি আছে। সেইজন্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে
শ্রীধরাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্য উভয়েই স্পর্শের পাকজত্বসিদ্ধির উপায় নিরূপণ
করিয়াছেন। শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—সুস্তাদি পার্থিব পদার্থে স্পর্শের পাকজত্ব,
অনুমানরূপ প্রমাণবলে সিদ্ধ হইবে। সুস্তাদির স্পর্শ পাকজ, যেহেতু তাহাতে
পার্থিব স্পর্শত্ব আছে, দৃষ্টান্ত ঘটাদির স্পর্শ। ঘটাদির স্পর্শ যে পাকজ,
তাহাও অনুমানগম্য। অনুমানের আকার এই,—‘ঘটাদিস্পর্শঃ পাকজঃ
একেন্দ্রিয়গ্রাহত্বে সতি তদগতগুণত্বাৎ, তদগতরূপবৎ।’ ঘটাদিতে একেন্দ্রিয়
দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত যে যে গুণ আছে, তাহা পাকজ, দৃষ্টান্ত রূপ, রস ও
গন্ধ। রূপ কেবল চক্ষুদ্বারা, রস কেবল জিহ্বাদ্বারা ও গন্ধ কেবল নাসিকাদ্বারা
প্রত্যক্ষ হয়। সেই দৃষ্টান্তে ঘটাদির স্পর্শও যখন কেবল ত্রিগেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ
হয়, তখন স্পর্শও পাকজ। কেবল ঘটাদির গুণ হইলেই যে পাকজ হইবে, তাহা

নহে ; এই অর্থ 'একেন্দ্রিয়গ্রাহতে সতি' বলা হইয়াছে । ঘটাদিগত সংখ্যা-
গুণ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—তাহা চক্ষুঃ ও শ্রবণ—উভয় ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ
হইয়া থাকে । আবার কেবল একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেই পাকজ হয় না । তাহা
হইলে জ্ঞানাদি ও শব্দেও পাকজত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে ; কেন না জ্ঞান, ইচ্ছা
ও শব্দও এক এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—জ্ঞান, ইচ্ছাদির কেবল মনের দ্বারা ও শব্দে
কেবল কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় । তা'ই 'তদগতগুণত্বাৎ' বলা হইয়াছে ।
একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া যাহা ঘটাদির গুণ, তাহাই পাকজ । জ্ঞান বা শব্দ
একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও তাহা ঘটাদির গুণ নহে । জ্ঞানাদি আত্মার গুণ, শব্দ
আকাশের গুণ । কাজেই আর ব্যভিচার হইল না (৪) । উদয়নাচার্য্যও
নানা বিচারের পর অনুমানরূপ প্রমাণবলেই পার্থিব স্পর্শের পাকজত্ব সিদ্ধ
করিয়াছেন (৫) ।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ এই কয়টা গুণের পরিচয়
দেওয়া আর আবশ্যক মনে করি না,—পরত্ব ও অপারত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই
যে,—এই দুইটা গুণ 'দ্বিবিধ, কালিক ও দৈশিক । জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বকে
কালিক এবং দূরত্ব ও নৈকট্যকে দৈশিক পরত্ব ও অপারত্ব বলা হয় ।

এই পৃথিবী দ্বিবিধ,—নিত্য ও অনিত্য । পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য, তদ্ভিন্ন
সমস্ত পৃথিবীই অনিত্য । অনিত্য পৃথিবীরই অবয়ব আছে, পরমাণু নিরবয়ব ।

[ক্রমশঃ ।

শিশুর বর্ণমালা ।

[শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ ।]

পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতঃ দুই প্রকারের বর্ণমালা আছে, সংস্কৃত ও ইয়ুরোপীয় ।
ইয়ুরোপীয় বর্ণমালা সীরিয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত, আরবী বর্ণমালার উদ্ভব সেই
বর্ণমালা হইতে । সংস্কৃতের বর্তমান বর্ণমালা যে আদিম নহে, অর্থ কোন

(৪) "অপ্রতীয়মানপাকজেষু স্তম্ভাদিষু স্পর্শস্য পাকজত্বমনুমানাৎ স্তম্ভাদিষু স্পর্শঃ পাকজঃ
পার্থিবস্পর্শত্বাদ ঘটাদিস্পর্শবৎ ঘটাদিস্পর্শস্যাপি পাকজত্বমেকেন্দ্রিয়গ্রাহতে সতি তদগুণত্বাৎ
তদগতরূপবৎ ।"—শ্রীমদ্ভাস্করী, ৩১ পৃঃ ।

(৫) "তস্মীৎ পার্থিবস্পর্শোহপি পাকজঃ পার্থিববিশেষগুণত্বাদ গন্ধবদিত্যবধেয়ম্ ।"—
শ্রীমদ্ভাস্করী, ৩১ পৃঃ ।

বর্ণমালা হইতে গৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুমান করেন। কিন্তু সে বর্ণমালা কিরূপ ছিল আর কোন্‌কালে ইহা গৃহীত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক, এই দুই বর্ণমালারই আদিম রূপ আমরা এখনও শিশুর প্রথম বর্ণমালায় দেখিতে পাই, এ কথায় বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না।

শিশু যখন প্রথম অব্যক্ত শব্দ করিতে শিখে, তখন সে জিহ্বা ভাল করিয়া নাড়িতে পারে না, কেবল মুখব্যাদান পূর্ষক কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত করে, তখন একটি স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহাই সংস্কৃতের “অ” এবং সমস্ত ইউরোপীয় বর্ণমালার এবং সীরিয়, আরবী প্রভৃতি বর্ণমালার আদি অক্ষর “আ” (A), এই উভয় বর্ণেরই উচ্চারণ প্রায় একরূপ, স্থানে স্থানে নাম বিভিন্ন। তাহার পরে শিশু মুখ বন্ধ করিতে গেলে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করে, তাহাতে যে বর্ণের উচ্চারণ হয় তাহা “ব”। ইহা হইতে ইংরাজীর এ বি, (A B) গ্রীকের অ্যাল্ফা বিটা, আরবীর আলিফ্ বে, প্রভৃতির উদ্ভব বলিয়া বোধ হয়।

শিশুর এই ‘অ’ ‘ব’ উচ্চারণের পূর্বে তাহার প্রথম জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভীক-বান্ধালী জাতির শিশু স্মৃতিকাগারের মৃত্তিকায় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠে, আর সাহসী ইউরোপীয় জাতির শিশুও অট্টালিকার কক্ষের মেঝেতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠে। তখন সকল শিশুই একটা অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ করিয়া থাকে। এখন শিশু যদি প্রথম স্বর উচ্চারণ করিয়া মুখমধ্যস্থ বায়ুটুকু বাহির করিবার সময় মুখের মধ্য দিয়া বাহির না করিয়া ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া নাসিকার মধ্য দিয়া বাহির করে, তবে গোড়া হইতে যথাক্রমে ৩টি বর্ণের উচ্চারণ হয়, “অ, উ, ম্”। তাই এই তিনটি মিলিয়াই কি বেদের প্রণবের উৎপত্তি?

কণ্ঠ হইতে নির্গত বায়ু যদি কণ্ঠের পরে তালুতে আঘাত করে তবে ‘অ’র পরে ‘ই’, তৎপরে মুখবন্ধের সময়ে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্বে ‘উ’। কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ না করিয়া যদি তন্মধ্যে একটি চোঙার আকার করা যায়, তবেই ঠিক ‘উ’, এই চোঙা বা নলটি একটু দীর্ঘ করিলেই ‘ও’। তাই ইউরোপীয় বর্ণমালার স্বরে ক্রমান্বয়ে “অ, ই, ও” এবং সংস্কৃতের বর্ণমালার “অ ই উ” এই ৩টি স্বর দেখিতে পাই। ইহাদের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই আকারই শিশুর বর্ণমালায় প্রথমে থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ ঐ ঐ প্রভৃতি মিশ্রস্বরের উচ্চারণ শিশু করিতে পারে না।

সংস্কৃতে ব্যঞ্জনবর্ণের ৩টি বিভাগ দেখিতে পাই। ‘ক’ হইতে ‘ম’ পর্যন্ত স্পর্শ

বর্ণ, শ ব স হ উভয়বর্ণ এবং ঘ র ল ব এই ৪টি অন্তঃস্থ বর্ণ। শিশু কবর্ণ, তবর্ণ ও পবর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক, গ, ত, দ ও প, ব এই ছয়টি বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। শিশু 'চল্' বলিতে 'তল্' বলিবে এবং 'কাঁটাল' বলিতে 'কাঁতাল' বলিবে। আবার 'খাবো' বলিতে 'কাবো' বলিবে এবং 'ঘা' বলিতে 'গা' বলিবে। অর্থাৎ শিশুর বর্ণমালায় চবর্ণ ও টবর্ণের এবং অবশিষ্ট বর্ণের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির যথা 'খ' 'ঘ', 'থ, ধ' এবং 'ফ' 'ভ'এরও স্থান নাই।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ইংরেজেরা 'তুমি' বলিতে 'টুমি' বলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাহেবেরা দন্ত্য তবর্ণ উচ্চারণ না করিয়া মূর্দ্ধন্ত টবর্ণ উচ্চারণ করে। কিন্তু ইংরেজের টি (t) বর্ণ মূর্দ্ধন্ত নহে, দন্ত্য। এই দন্ত্য টি একটু জোরে উচ্চারিত হয় বলিয়া অনেকটা মূর্দ্ধন্ত ট-এর কাছাকাছি শোনায়। কোন কোন ইউরোপীয় জাতির টি বর্ণের উচ্চারণ ঠিক তএর ন্যায়।

এই ক গ, ত দ, ও প ব-এর উচ্চারণ এত সহজ এবং স্বরবর্ণের এত কাছাকাছি বলিয়াই প্রাকৃত ভাষায় অনাদি অযুক্ত এই বর্ণ কয়টির লোপ হইত ; যথা—নকুল স্থানে নউল, সাগর স্থানে সাঅর, সীতা স্থানে সীআ, ইত্যাদি।

উয় বর্ণের মধ্যে 'স' ও 'হ' এবং অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে 'ল' তাহার প্রথম সম্বল। কিন্তু এই 'স' আদি অপেক্ষা পদের অন্তে উচ্চারণই তাহার পক্ষে সহজ এবং 'হ'ও অর্দোচ্চারিত। 'স' ও 'হ' উভয় বর্ণই প্রথমে বিস্ময়, ভয়, ক্রোধ, কষ্ট প্রভৃতি প্রকাশার্থ পদের অন্তেই ব্যবহৃত হয়, যথা উস্, আহ্। জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তে স্পর্শ না করাইয়া দন্ত ও জিহ্বার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিয়া জোরে বায়ু নির্গত করিলে "স" আর জিহ্বাগ্র উত্তোলন না করিয়া "স" উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে "হ" উচ্চারিত হয়। ইহাতেই বোধ হয় আরবীয়েরা "সিন্দু" "সপ্ত" প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত "স" স্থানে "হ" উচ্চারণ করিয়া "হিন্দু", "হপ্ত" বলিত। "হ" ও "ঃ" প্রায় একরূপ বর্ণ। তজ্জন্ত সংস্কৃতেও "উস্" স্থানে "উঃ" হইত।

শিশুর প্রথম বর্ণমালায় যেমন চবর্ণের স্থান নাই, তেমনি রোমান কোন বর্ণমালায় এবং আরবী কোন বর্ণমালায় "চ" নাই। আরবীয়েরা "চ"এর স্থানে "ছ" উচ্চারণ করিত। রোমান বর্ণমালাতেও এখন ২১৩ টি অক্ষর সহযোগে "চ" বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ করা হয়। তামিল বর্ণমালাতেও চবর্ণ নাই। ত্রিযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, তামিলভাষীরা তাহাদের বর্ণমালা সংস্কৃতের বর্ণমালা হইতে লইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান হয়, সংস্কৃতের আদিম

অবস্থায় অর্থাৎ ভারতীয় আৰ্য্যদিগের বৈদিক ভাষারও পূর্বের বর্ণমালায় “চ” বর্ণ ছিল না। “চ”এর উচ্চারণ কি তবে চীনাদের নিকট প্রাপ্ত ?

রোমান ও আরবী বর্ণমালাতে এবং তামিলের বর্ণমালাতেও দেখিতে পাই খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ এই দশটি মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে অধিকাংশই নাই। কেবল থ, ফ, ভ এই তিনটির অনুরূপ বর্ণ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, বৈদিক ভাষার আদিম অবস্থায় হয়ত মহাপ্রাণ বর্ণগুলি ছিল না। অনুরূপ বর্ণ বলিলাম এই কারণে যে, সংস্কৃতের ফ ও ভ ইংরাজীর এফ্ (f) বা ভি (v) হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। সংস্কৃতের ফ ও ভ কেবল ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কিন্তু ইংরাজীতে দন্ত ও ওষ্ঠ উভয়ের সাহায্য প্রয়োজন। একটি অল্প বধির লোকে “এম্” বলিতে “এফ্” বলিত অর্থাৎ তাহার বর্ণমালায় “স”এর স্থানে সর্বত্র “ফ” হইত, এই “ফ” অবশ্য দস্তোষ্ঠ্য।

রোমান বর্ণমালায় ও শিশুর বর্ণমালায় প্রথমে “শ”এর স্থান নাই। শিশু যেমন বড় হইয়া কষ্টে “শ” বলে, ইংরাজেরা তেমনই এস্ ও এচ (sh) যৌগে “শ”এর কাজ চালাইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, আরবীয়েদের বর্ণমালায় “শ” আছে কিন্তু “প” নাই। “প”এর কার্য “ব” দিয়া চলে।

“চ”এর সম্বন্ধে একটি শেষ কথা বলিয়া লই। সকলেই জানেন “চ” তালব্য বর্ণ, কিন্তু পূর্ববঙ্গে এমন কি নদীয়া জেলার পূর্বাংশে যেরূপ “চ” উচ্চারিত হয় তাহা তালব্য “চ” নহে, দন্ত্য “চ”।

য (y) র, ল, ব (w) এই চারিটি স্বরেরই বিকৃতি। শিশু ইহার মধ্যে ‘ল’ বর্ণই প্রথম উচ্চারণ করিতে পারে। জিহ্বার মূলের দুই পার্শ্ব ঈষৎ উত্থিত হইয়া মুখ নির্গত বায়ুর সাহায্যে জোরে মুখের মধ্যে পড়িলে “ল” হয় এবং জিহ্বার মধ্যভাগের দুই পার্শ্ব ঐরূপে পড়িলে “র”। ‘ল’ অপেক্ষা ‘র’ উচ্চারণ কঠিন। চীনাদের ভাষায় “র” যুক্ত কোন শব্দ নাই। চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতের ‘র’ যুক্ত নামগুলির ‘র’ স্থানে ‘ল’ করিত। প্রাকৃত জনও এইরূপ ‘র’ স্থানে ‘ল’ করিত বলিয়া “হরিদ্রা” স্থানে “হলদা” হইত এবং এই কারণেই সংস্কৃতেরও “রঘু” “লঘু” একার্থক। র, ড ও ল’এর অভেদের সূত্র এই কারণেই হইয়াছিল।

শিশুর বর্ণমালায় অল্প কোন যুক্ত ব্যঞ্জনের স্থান থাকে না, কেবল তাহার উচ্চারিত বর্ণ সে দ্বিধ করিতে পারে। সে ‘কন্ম’ ‘অক্কা’ সহজেই বলিতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণেই সংস্কৃতের যুক্ত বর্ণগুলি প্রাকৃতে এইরূপেই পরিবর্তিত হইত।

“রত্নমালা”-পরীক্ষা ।

(২)

[শ্রীহারাগচন্দ্র বিষ্ণুরত্ন ।]

মহর্ষি বাদরায়ণ স্বীয় শারীরকসূত্রে ছানোগ্য এবং মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে বর্ণিত এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের জগৎপাদানত্ব এবং জগদ-ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত কুরিয়াছেন ; “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাত্” (ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ ২৩ সূত্র) “তদনন্তমারম্ভগণশকাদিভ্যঃ” (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ ১৪ সূত্র) “প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছন্দেভ্যঃ” (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ ৬ সূত্র) ইত্যাদি সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ স্বীয় পূর্বোক্ত মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন । আচার্য্য শঙ্কর ঐ সকল স্থলে এবং অগ্ৰাণ্ড স্থলেও বহুল যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা উক্ত মতের উপপাদন করিয়াছেন । পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় প্রবলবেগে এই মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু তিনি সূত্র, ভাষ্য ও ভাস্করী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের প্রামাণিক গ্রন্থে প্রদর্শিত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের কোন সত্ত্বর দেন নাই অথবা স্তমীমাংসা করেন নাই ।

ইহার পর, পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় লিখিতেছেন যে, “এই নিমিত্ত কারণ-বৃত্তি বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদকগুণসকল, কার্য্যদ্রব্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইয়াও, কার্য্যদ্রব্যে স্বসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করিয়া, কারণদ্রব্যের সাজাত্য সম্পাদন করিয়া থাকে, এইরূপ স্বীকৃত হইতেছে (১) ।” এখানে “এই নিমিত্ত” (অতঃ) এই অংশের দ্বারা তর্করত্ন মহাশয়, “যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগ্নয়ং বিজাতং ভবতি” এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার মতে যে কার্য্যকারণের সাজাত্য সমর্থিত হইয়াছে, সেই স্বীয় সম্মত শ্রুতিবোধিত সাজাত্যের উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত উপক্রম-বিরুদ্ধ হইয়াছে । উপসংহারেও “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য দ্বারা অভেদ প্রতি-পাদিত হইয়াছে ; অতএব তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত উপসংহারেরও বিরোধী হইয়াছে । “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের দ্বৈতমতেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ;

(১) “অতঃ কারণবৃত্তয়ো বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক গুণান্তে সাক্ষাৎ কার্য্যদ্রব্যসম্পূর্ণস্তোহপি তত্র স্বসজাতীয়ঃ গুণান্তরমারম্ভমাণাঃ কারণদ্রব্যসাজাত্যঃ নিব্বর্তনস্তীত্বাপন্নম্যতে ।”—বৈতোত্তি-
রত্নমালা, ৫১ পৃষ্ঠা ।

বহুপূর্বে মাধ্বমতাবলম্বী স্থপণ্ডিত দ্বৈতবাদিগণ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন (২)। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণের ঐ সকল ব্যাখ্যান্তর উপক্রমের বিরোধী বলিয়া আদরণীয় নহে। উপক্রমের সহিত বিরোধ-পরিহার করিয়া তাহার অনুকূলভাবে উপসংহারের অর্থ অবধারণ করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষি জৈমিনি-প্রমুখ মীমাংসকগণের মত। মীমাংসা দর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় পাদে প্রথমাধিকরণে এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

জ্যোতিষ্টোম প্রকরণগত শ্রুতিতে “প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি, স তপোহতপাত, তস্মান্তেপানান্ত্রয়ো দেবা অসৃজ্যস্তাঋর্ষির্বাযুরাদিভ্যাঃ তে তপোহ-তপ্যন্ত, তেভ্যস্তেপানেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অসৃজ্যস্তাঋঋদো বারোঋজুর্বেদ আদিত্যাং সামবেদঃ” এইরূপ উপক্রম করিয়া, পরে “উচ্চৈঋচা ক্রিয়তে, উপাংগু যজুষা, উচ্চৈঃ সাম্না” এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দ বেদ-বিশেষের বোধক এবং মন্ত্রবিশেষেরও বোধক (৩) ; এইজন্য এখানে “উচ্চৈ-ঋচা ক্রিয়তে” ইত্যাদি বিধিবাক্যে ঋক্ প্রভৃতি শব্দ বেদবোধক অথবা মন্ত্র-বোধক—এইরূপ সংশয় করা হইয়াছে। অতঃপর, “শ্রুতের্জাতাধিকারঃ শ্রাৎ” এই সূত্রদ্বারা পূর্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে, এখানে ঋগাদিশব্দে ঋগাদিমন্ত্রই বুঝিতে হইবে ; শ্রুতিতে ‘ঋচা ক্রিয়তে’ ইত্যাদিরূপে ঋগাদি উল্লিখিত হইয়াছে ; ঋক্, যজুঃ ও সামশব্দের মন্ত্রেই শক্তি, লক্ষণার দ্বারা বেদ বোধিত হইয়া থাকে। উপরিকথিত বিধিবাক্যে যদি ঋক্ প্রভৃতি শব্দ ঋক্ প্রভৃতি বেদের বোধক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। এই লক্ষণা স্বীকারই দোষ।

ইহার পর, “বেদো বা প্রায়দর্শনাৎ” এই সিদ্ধান্ত সূত্রের দ্বারা স্থির করা

- (২) “আহ নিত্যপরোকং তু তচ্ছদোহবিশেষিতঃ ।
 ত্বং শব্দশ্চাপরোকার্থং তন্নোতৈক্যং কথং ভবেৎ ।
 ‘আদিত্যোযুপ’ ইতিবৎ সাদৃশ্চার্থা তু সা শ্রুতিঃ ।”
 “অতত্ত্বমিতি বা ছেদন্তেনৈক্যং স্থনিরাকৃতম্ ।”

—সর্বদর্শনসংগ্রহ—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন ।

(৩) পাদবন্ধ মন্ত্রের নাম ঋক্, গীতিবিশিষ্ট মন্ত্রের নাম সাম ও গদ্যাক্ষক মন্ত্রের নাম যজুঃ ।—“তেষামৃগ্ণ্যত্রার্থবশেন পাদব্যবহা ।” “গীতিষু সামাখ্যা ।” “শেবে যজুঃপবঃ ।”
 মীমাংসাদর্শন, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ সূত্র ।

হইয়াছে যে, এইস্থলে উপক্রমে ঋক্ প্রভৃতি শব্দ কেবল মন্ত্রবোধক নহে, কিন্তু মন্ত্র-ব্রাহ্মণসমুদায়স্বাক বেদের (৪) বোধক ; এই প্রবল উপক্রমের অনুরোধে, উপসংহারস্থিত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দও মন্ত্রমাত্রবোধক নহে, কিন্তু মন্ত্রব্রাহ্মণ-সমুদায়রূপবেদবোধক, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। এখানে উপক্রম অর্থবাদ এবং উপসংহার বিধি ; তথাপি উপক্রম প্রবল বলিয়া আদৃত হইয়াছে। উপক্রম প্রথমে বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে ; উপসংহার তখনও নিজের স্বরূপ-লাভ (স্বার্থবোধন) করে নাই বলিয়া উপক্রমের বাধক হইতে পারে না ; পরে যখন উপসংহার আত্মলাভ (স্বার্থবোধন) করে, তখন একবাক্যতার অনুরোধে উপক্রমের অবিরোধে আত্মলাভ (স্বার্থবোধন) করিয়া থাকে। এইরূপে মীমাংসাদর্শনে উপক্রমের অধিক বলবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয় এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল। ষাঁহারা বিশেষ জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শাবরভাষ্য, তন্ত্র-কার্ত্তিক, শাস্ত্রদীপিকা, মীমাংসাকুতূহল প্রভৃতি গ্রন্থ পরিশীলন করিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে উপক্রমে, একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; উপসংহারে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ স্বীকার না করিলে এবং উক্ত মহাবাক্যকে জীব ও ব্রহ্মের সাদৃশ্যপ্রতিপাদক অথবা জীবব্রহ্মের অভেদনিষেধকরূপে বিবৃত করিলে, উপক্রমের একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞার সহিত উপসংহারের বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব মীমাংসাদর্শনের পূর্বোক্ত অধিকরণের সহিত দ্বৈতবাদিগণের উক্ত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিরোধ দাঁড়াইতেছে, ইহা নিঃসংশয়রূপে বুঝা যাইতেছে। এইজন্য দ্বৈতবাদিগণের উক্ত সিদ্ধান্ত মীমাংসানুগত নহে বলিয়া বিচার-নিপুণ মনীষিগণের উপেক্ষণীয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় এইস্থলে বলিয়াছেন যে, “কারণবৃত্তি বিজাতীয়-ব্যবচ্ছেদক গুণ কার্যদ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে।” এই নিয়ম সাধারণভাবে মানিলে, ‘দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণ এসরেণুতে স্বসজাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন করুক’ এইরূপ আপত্তি হয় ; এইজন্য একটু আগে যাইয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন যে, কারণবৃত্তি বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক গুণ এখানে তাদৃশ বিশেষ-গুণকেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কারণবৃত্তি বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক বিশেষ-গুণই কার্যদ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করিয়া থাকে। দ্ব্যণুকের পরিমাণ

(৪) “মন্ত্রব্রাহ্মণয়োবেদনামধেরম্।” আপস্তম্বজ্ঞপরিভাষাত্ত্ব, ১ম খণ্ড, ৩৩ সূত্র ।

বিশেষগুণ নহে বলিয়া এসরেণুতে স্বসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে না। কিন্তু চৈতন্য ব্রহ্মের বিশেষ গুণ, সে-ই বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক, অতএব ব্রহ্মকার্য জগতে অবশ্যই ব্রহ্মগত-চৈতন্য চৈতন্য উৎপাদন করিবে (৫)।

এখানে তর্করত্ন মহাশয় সজাতীয় ও বিজাতীয় শব্দ অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখনভঙ্গী অস্পষ্ট, তাই তিনি কোন্ ধর্ম দ্বারা সাজাত্য অথবা বৈজাত্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট বলিয়া দেন নাই। “বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদকাঃ” এই বিশেষণ অব্যাবর্তক বলিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ বিজাতীয়ের ব্যাবর্তক সকল গুণই হইতে পারে। কোন কোন আপাতদর্শী প্রাচীন তার্কিক “কারণগুণাঃ কার্যগুণানারভন্তে” এই ব্যাপ্তির অনুসরণ করিয়া জগতে চৈতন্যের আপত্তি দিয়াছিলেন। মহর্ষি বাদরায়ণ “মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্” (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায় ২য় পাদ ১১ সূত্র) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়া উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য শঙ্করও ঐ সূত্রের তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরবর্তী আপাতদর্শী তার্কিকগণ ঐ ব্যাপ্তির সঙ্কোচ করিয়া ‘কারণগত বিশেষগুণ কার্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করিয়া থাকে’—এইরূপ ব্যাপ্তি স্থাপন করিয়া তদনুসারে জগতে চৈতন্যের আপত্তি দিয়াছিলেন। এই আপত্তি নূতন নহে; ইহা বহু বৎসরের পুরাতন আপত্তি। অমলানন্দযতি-প্রণীত “বেদান্তকল্পতরু” গ্রন্থে প্রথমে এই আপত্তি পূর্বপক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে;—

“আরভেত গুণং কার্যে সজাতিঃ সমবায়িগঃ।

বিশেষগুণ ইত্যস্যা ব্যাপ্তেঃ কা হু প্রতিক্রিয়া ॥”

ইহার পর, গ্রন্থকার অমলানন্দ “উচ্যতে, ন তাবদস্তি বিশেষগুণঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ-সন্দর্ভের দ্বারা বিশেষগুণের খণ্ডন করিয়াছেন। এইস্থলে গ্রন্থকার প্রথমতঃ শ্রীমদাচার্য্য উদয়ন প্রণীত “স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদোচিতাবান্তরসামান্যবিশেষবস্তো বিশেষ-গুণাঃ” এই বিশেষগুণলক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার পর, প্রসিদ্ধতার্কিক ব্যোমশিবাচার্য্য প্রণীত “স্বসমবেতবিশেষণবিশিষ্টত্বে সতি স্বাশ্রয়ৈক-জাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বং বিশেষগুণত্বম্” এই বিশেষগুণলক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (৬)। বিশেষগুণের সম্ভাবিত লক্ষণান্তরও এই ভাবে খণ্ডন করিতে

• ৫) “বৈতোক্তিরত্নমালা” ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) কাশীতে লাজার্স কোম্পানীর মুদ্রিত “বেদান্তকল্পতরু” ২৬২ পৃষ্ঠা ও “বেদান্ত-কল্পতরু পরিমল” ৪১৮—৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইবে, ইহা বলিয়া দিয়াছেন (৭)। অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষগুণ দূরে থাকুক, গুণপদার্থই স্বীকার করেন না। শ্রীহর্ষপ্রণীত “খণ্ডনখণ্ডখাত্ত” গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে “রূপাদীনাং গুণত্বশ্চৈব নিশ্চৈতুমশক্যত্বাৎ” ইত্যাদি গ্রন্থসন্দর্ভের দ্বারা গুণের খণ্ডন করা হইয়াছে (৮)। এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে ; সকলের পক্ষেই এখন এই সকল গ্রন্থ সুলভ ; অতএব আমরা এখানে এই সকল গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অনর্থক বর্ধিত করিব না। এখন তार्কিক-প্রবর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, যাহারা গুণ বা বিশেষগুণ কিছুই স্বীকার করেন না, তাঁহাদের প্রতি বিশেষগুণঘটিত উক্ত ব্যাপ্তিবলে আপত্তি দেওয়া চলে কি ? তিনি যদি অদ্বৈতবাদিগণকৃত পূর্বোক্ত খণ্ডনের উদ্ধার করিয়া বিশেষগুণঘটিত উক্ত ব্যাপ্তির স্থাপনপূর্বক আপত্তি দিতেন, তাহা হইলেই সুসমীচীন হইত। তাহা না করিয়া, পুরাতন খণ্ডিত আপত্তিটার পুনরাবৃত্তি করিয়া এরূপ পিষ্টপেষণ করায় তাঁহার কি লাভ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তार्কিকপ্রবর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদর্শিত পূর্বোক্ত বিশেষগুণঘটিত ব্যাপ্তি তार्কিকমতেও নির্দোষ নহে। ‘কারণগত বিশেষগুণ কার্যে সজাতীয় গুণান্তর

(৭) দিনকরীগ্রন্থে বিশেষগুণের একটি লক্ষণ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। দিনকর ভট্ট গুণত্বজ্ঞাতি মানেন না, এইজন্য এই লক্ষণ তাঁহার প্রণীত নহে। “বিশেষগুণত্বঃ চ ভাবনান্তো যো বস্তুবৃত্তিবৃত্তিস্পর্শাবৃত্তিধর্মসমবারী তদন্তত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্তগুণত্বম্।” গুণত্বজ্ঞাতি না মানিলে এই লক্ষণ করা যায় না। দীধিতিকার, দিনকর ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িক-গণ গুণত্বজ্ঞাতি খণ্ডন করিয়াছেন। সে খণ্ডনের যথার্থ উদ্ধার অদ্যাবধি কেহ করিতে পারেন নাই। পদার্থতত্ত্বনিরূপণের টীকার রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার গুণপদ শব্দ্যতাবচ্ছেদরূপে গুণত্বজ্ঞাতি সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু এই রীতিতে জাতিসিদ্ধি জগদীশগদাধরপ্রমুখ প্রামাণিক তार्কিকগণের সম্মত নহে। (অনুমিতি,—“পূর্ণার পরমান্ননে” এই অংশের জগদীশ ও গদাধর কৃত বাধা দ্রষ্টব্য।) অতএব নৈয়ায়িক মতেই গুণত্বঘটিত উক্ত লক্ষণ হয় না। “বিশেষগুণ” এরূপ পরিভাষায় বিশেষ প্রমাণ বা ফলও দেখিতে পাওয়া যায় না। অদ্বৈতবাদিগণ গুণ, জাতি প্রভৃতি কোন পদার্থই স্বীকার করেন না। “খণ্ডনখণ্ডখাদ্যো”র চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই সকল পদার্থ খণ্ডিত হইয়াছে। যাহাদের মতে জাতিই নাই, তাঁহাদের মতে গুণত্বজ্ঞাতি কোথা হইতে আসিবে ? অতএব এই গুণত্বঘটিত বিশেষগুণত্বও অদ্বৈতবাদিগণের মস্ত হইতে পারে না।

(৮) লালারসের “খণ্ডনখণ্ডখাদ্য” ৫৭২—৫৮১ পৃষ্ঠা অথবা চৌখাখার “খণ্ডনখণ্ডখাদ্য” ১০৭১—১০৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উৎপন্ন করে ।’—এখানে কোন্ ধর্মের দ্বারা সাজাত্য গ্রহণ করিতে হইবে ? গুণত্ব অথবা স্ববৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যরূপত্বাদিধর্মের দ্বারা সাজাত্য ধরিলে শ্রাম-কপাল-দ্বয়-নির্মিত ঘটে রক্তরূপের আপত্তি হইয়া পড়ে । এই আপত্তিনিবারণের জন্ত যদি স্ববৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যব্যাপ্যনীলত্বাদিধর্মের দ্বারা সাজাত্য লওয়া হয়, তাহা হইলে চিত্ররূপ স্থলে ব্যভিচার হইয়া পড়ে । সুরভি ও অসুরভি কপাল দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন ঘটে কোন গন্ধই উৎপন্ন হয় না, এই ঘট নির্গন্ধ হয় (৯) । এইস্থলেও উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হয় । এইরূপ নানারস ও নানাস্পর্শ বিশিষ্ট নানা অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন অবয়বী নীরাস ও নিঃস্পর্শ হয় । যদি চিত্রগন্ধ চিত্ররস ও চিত্রস্পর্শ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার এই সকল স্থলে আছেই । এখানে ইহাও বক্তব্য যে, চিত্রগন্ধ ও চিত্ররস সম্প্রদায়স্বীকৃত নহে । স্নেহ প্রভৃতিও বিশেষগুণ (১০) । সেস্থলে গুণত্বব্যাপ্য-ব্যাপ্য ধর্মরূপে আমরা কোন ধর্মই পাই না । যদি তार्কিকশিরোমণি রঘুনাথের নবীন মত অবলম্বন করিয়া তর্করত্ন মহাশয় চিত্ররূপ প্রভৃতি অস্বীকার করেন (১১) এবং পূর্বেকৃত স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদিরূপ হইতে অব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদিরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে এরূপ বলেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিস্তার নাই । দীর্ঘিতিকার স্বপ্রণীত “পদার্থত্বনিরূপণে” যেমন চিত্ররূপ খণ্ডন করিয়াছেন, তেমনই গুণত্বজাতিও খণ্ডন করিয়াছেন (১২) । বিশেষগুণত্ব গুণত্বঘটিত ; এইজন্য এই নবীন মতানুসারে বিশেষগুণ-ঘটিত উক্ত ব্যাপ্তি হইতেই পারে না । যে মতে যে পদার্থ স্বীকৃত নহে, সেই মতে সেই পদার্থঘটিত নিয়ম কিরূপে হইতে পারে ?

(৯) “সুরভ্যাসুরভিকপালদ্বয়নির্মিতনির্গন্ধঘটে”—মুক্তাবলীপ্রকাশ—পৃথিবীনিরূপণ ।

(১০) “বুদ্ধ্যাদিষটকং স্পর্শাস্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকোদ্রবঃ ।

অদৃষ্টভাবনাশকা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ ॥” ভাষাপরিচ্ছেদ ।

(১১) “চিত্রমপি নাতিরিক্তং রূপং সমানাধিকরণবিজাতীয়রূপসমুদায়াদেব তথাবিধব্যবহারোপপত্তেঃ । নীলাদের্নীলাদ্যতিরিক্তরূপাজনকত্বাচ্চ ।

মুক্তাবলী, ১০০ তম কারিকাব্যাখ্যা ।

পদার্থত্বনিরূপণ ৩০ পৃষ্ঠা ।

(১২) “এবং গুণত্বমপি ন রূপাদিচতুর্বিংশতাবেকা প্রত্যক্ষসিদ্ধা জ্ঞাতিঃ । অতীন্দ্রিয়েবু প্রত্যক্ষাবোগাৎ । তুরগাদেবকৃষ্ণগতিমন্তে ব্রাহ্মণাদেচ দোবাদ্যভাবেপি গুণব্যবহারাত্চ । একস্য কার্য্যতাবচ্ছেদকস্য বিরহেহপি যেন কেনাপি রূপেণ কারণতাদ্যনুগম্য জ্ঞাতিকল্পনে চাতি-প্রসঙ্গো জ্ঞাতিকল্পনপ্রসঙ্গশ্চেতিদিক্ ।”

—পদার্থত্বনিরূপণ ৫১—৫২ পৃষ্ঠা ।

দীধিতিকারকৃত চিত্ররূপের এই খণ্ডন পরবর্তী তार्কিকগণের সম্মত নহে। তार्কিকপ্রধান জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কামৃতে চিত্ররূপ স্বীকার করিয়াছেন (১৩)। তর্কসংগ্রহে চিত্ররূপ স্বীকৃত হইয়াছে। দীপিকা ও নীলকণ্ঠিতে যুক্তি দ্বারা চিত্ররূপ স্থাপন করা হইয়াছে (১৪)। পদার্থ তত্ত্বনিরূপের টীকাকার রঘুদেব শ্রায়ালঙ্কারও শিরোমণির উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তিনি শিরোমণির মতে গৌরব উদ্ভাবন করিয়া, চিত্ররূপ স্বীকারে লাঘব দেখাইয়া চিত্ররূপ স্থাপন করিয়াছেন (১৫)। অতএব দীধিতিকারের পরবর্তী এই সকল তार्কিকের মতেও উক্ত ব্যাপ্তি ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

আমরা এ পর্যন্ত বাহা লিখিলাম, তাহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইবেন যে, 'কারণগত বিশেষগুণ কার্যদ্রব্যে স্বসজ্জাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে'—এরূপ নিয়ম নব্য ও প্রাচীন সুবিখ্যাত তार्কিকগণের মধ্যে কাহারও মতেই সুসঙ্গত নহে। দীধিতিকার ও তাঁহার পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকগণের মতানুসারে উক্ত ব্যাপ্তি হুঁষ্ট, দীধিতিকারের পরবর্তী জগদীশ তর্কালঙ্কারপ্রমুখ তार्কিকগণের মতেও ঐ ব্যাপ্তি দোষগ্রস্ত। এরূপ স্থলে তार्কিকপ্রবর তর্করত্ন মহাশয় কাহার মত অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যাপ্তির উপগ্রাস করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি সগর্বে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তর্করত্ন মহাশয়ের গর্বাড়ম্বর (১৬) লক্ষ্যচ্যুত-সাম্বন্ধ ধাম্বকের বৃথা গর্বাড়ম্বরেরই অমুকরণ করিতেছে।

যাঁহারা জগতের সত্তা স্বীকার করেন, "তুষাতু হুর্জনঃ" গ্রামে তাঁহাদের মত লইয়াই জগতের চৈতন্যাপত্তিদোষের সমাধান করা হইল, অর্থাৎ জগতের সত্তা

(১৩) "রূপং পৃথিবীতেজোজলবৃষ্টি তচ্চ গুরুকৃষ্ণরক্তপীতচিত্রাদিভেদেন বহুবিধং পৃথিবী-
বৃষ্টি।"—তর্কামৃত, ৮ পৃষ্ঠা।

(১৪) নির্ণয়সাগরের পুস্তক, ৫০—৫১ পৃষ্ঠা।

(১৫) মুদ্রিত সটীক পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, ৩৩—৩৫ পৃষ্ঠা।

(১৬) "তর্কাত্তিহুর্গমণিরিপ্রকটপ্রভাবঃ

পঞ্চাননোবিবিধতন্ত্রবনাস্তচারী।

অদ্বৈতদিগ্ধিপথলাবগমায় তেবাং

মৌলৌ কনোতি কতিচিৎ করজ্ঞাপাতান্ ॥"

—ঐতোত্তি রত্নমালা।

স্বীকার করিলেও জগতের চৈতন্যাপত্তি হইতে পারে না, ইহা দেখান হইল।
বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জগতের সত্ত্বাই অঙ্গীকৃত হয় নাই; জগতের
বস্তুতঃ সৃষ্টিই হয় নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের মত। অতএব উক্ত ব্যাপ্তি
বলে সেই গগন-কমলিনীকল্প জগতে চৈতন্যের আপত্তিই দেওয়া যায় না।

পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যদি চৈতন্যস্বরূপ হয়,
তাহা হইলেও জগৎ অনির্করচনীয় বা জড় হইতে পারে না; চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম
হইতে চৈতন্যস্বরূপ জগৎই উৎপন্ন হওয়া উচিত (১৭)। এ কথাই উত্তর
পূর্বে প্রথম প্রবন্ধে কিছু দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, যাহারা জগতের
সত্ত্বাই স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট এই আপত্তিও অকিঞ্চিংকর।

বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও প্রবন্ধ একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল বলিয়া এবারে এই
খানেই বিশ্রাম লইতেছি।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জগতের সত্ত্বা কেন অঙ্গীকৃত হয় নাই, এই বিষয়ে বারাস্তরে
বিশেষ আলোচনা করা হইবে।

[ক্রমশঃ ।

“ঘোড়ার ডিম”

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ।]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নানা প্রকার আজগুবি সমাচারে মানুষকে বিস্মিত করে,
অনেক অসম্ভবকে অলীকতার গণ্ডীর বাহির করিয়া দেয়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাতেই
এ কথা বিদিত। কিন্তু বিজ্ঞান যখন আবহমানকাল প্রচলিত বয়োবৃদ্ধ প্রবচনের
বিরুদ্ধে খড়া ধারণ করে, তখন আমরা প্রবচনেরই বিজ্ঞতা মানিয়া চলি—
বিজ্ঞানকে বিজয়ী বীরের সম্মানটুকু দান করি না। বিজ্ঞান বহুদিন বলিয়া দিয়াছে
যে, “ঘোড়ার ডিম” অলীক নয়, তাহার একটা অস্তিত্ব আছে; কিন্তু প্রবচন বলে
—“‘ঘোড়ার ডিম’ মানে বাজে কথা, ভূয়ো কথা, ছাই ভস্ম, ঝাবিস, কারণ
ঘোটকী ত আর হংসী বা মোরগীর মত ডিম পাড়ে না”। বিজ্ঞান বলে—“না, না,
ঘোড়ারও ডিম হয়, কথাটা একেবারে অলীক নয়”। সাদা ভাষা বলে—“হয়

হ'ক—আমি অমন সরস শব্দটুকু বর্জন করিতে পারিব না। কেহ বাজে কথা বলিলে তাহার উত্তর হইবে—‘ঘোড়ার ডিম’।”

গতবারের “ভেক-তঙ্ক” প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, খুব নিম্নশ্রেণীর জীব ব্যতীত সকল জীবেরই জন্ম অণুে। শাস্ত্রে আছে—বিষটাই ব্রহ্মার অণু। সত্য-মিথ্যা জানি না, কিন্তু এ কথাটা ঠিক যে, জীবের মধ্যে ব্রহ্মার যে সৃষ্টি-শক্তি আবদ্ধ আছে, সে শক্তির কার্য হয়—অণুে। অর্থাৎ অণুর দ্বারা সৃষ্টি বাড়ে। মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, ষট্পদ, মাকড়শা প্রভৃতি অণু প্রসব করে, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে ছাগল, ভেড়া, মেঘ, মহিষ, কুকুর, শৃগাল, হাতী, ঘোড়া, নর, বানর সকলেরই জীবদশার প্রথম বিকাশ ডিম্বে। এত বড় মানুষ—চিন্তাশীল জীব—বিশ্বজগতের এক রকম ভাগ্যান্বিতা—তাহাকেও প্রথমে পোকা-মাকড়, মাছ, পাখী প্রভৃতির মত ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইতে হয়। অবশ্য নর, বানর, মেঘ, মহিষ প্রভৃতির ডিম্বের সহিত হংসী কুকুটী প্রভৃতির ডিম্বের একটা খুব বিশেষ পার্থক্য আছে। মাছ, পাখী, উভচর ভেক, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির অণু যেমন তাহাদের শরীরের বাহিরে পরিণত হয়, ঘোড়ার ডিম বা মানুষের ডিম সে রকম দেহের বাহিরে পরিণত হয় না। এক কথায় ইহারা ডিম পাড়ে না। পুরুষের শুক্রকীট রমণীর দেহের মধ্যে অণুর সঙ্গে মিশিলে আল ডিম্বের জন্ম হয়। ঠিক সেই সময় হইতেই মানুষের সৃষ্টি। স্ত্রীলোকের রজঃ বা পুরুষের শুক্র মানুষ নয়। কিন্তু যে শুভমুহূর্তে এতদুভয়ের মিশ্রণ হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই মানুষের প্রথম জন্ম। সেই মিশ্রণ হইলেই মানবীর অণুর সৃষ্টি হইল। ইহাই মানবীর অণু।

তবে হংসীর অণুর মত মানবীর অণু বা অণু-ডিম্ব ভূমিষ্ট হয় না। এই কথাটা আলোচনা করিলেই অণু-ডিম্ব ও হংসী-ডিম্ব যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্যটুকুর কারণ পাওয়া যাইবে। হংসীর ডিম্ব দেহের বাহিরে পরিণত হয়, তাই তাহাকে প্রকৃতির অসংখ্য শক্তির সহিত যুক্তিতে হয়, অনেক পদার্থ তাহার উপর শক্তি পরীক্ষা করে। তাই তাহার একটা কঠিন আবরণের আবশ্যক হয়। সুতরাং যে সকল জীব ডিম পাড়ে তাহাদের ডিমের আবরণ থাকে। যে সকল জীবের ডিম্বের পরিণতি মাতৃ-জঠরে, তাহাদের আর কঠিন আবরণের আবশ্যক হয় না। তাই ঘোড়ার ডিম্বের “খোলা” থাকে না। এই আবরণ ব্যতীত এতদুভয় প্রকার অণু আরও একটা পার্থক্য আছে। যে সময় ডিম্বের ভিতর নানা প্রকার অদল বদল হইয়া ক্ষুদ্র কোষ জীবের অবয়ব

লাভ করে, সে সময় তাহার পুষ্টির জন্ত পরিপোষণ-পদার্থের আবশ্যক হয় ; যে সকল জীব মাতৃজঠরে পরিণত হয়, অর্থাৎ যাহাদের জননীরা ডিম পাড়ে না, ভ্রূণগুলিকে দেহের মধ্যে রাখে,—তাহারা মাতার দেহ হইতে পুষ্ট হয়, মাতৃদেহের নানারূপ পদার্থ হইতে নিজের দেহ রচনা করিবার উপাদান লাভ করে। সুতরাং সে সকল ডিমের সঙ্গে বিধাতাকে পরিপোষক-উপাদান রাখিতে হয় না। কিন্তু যে জীবকে মাতৃজঠর হইতে ডিম্বাবস্থায় বাহির হইয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদিগকে এই দুর্গম সংসারপথের পাথরস্বরূপ কতকটা সম্পত্তি দান না করিলে বিধাতাকে আমরা বলিতাম পক্ষপাতদুষ্ট। তাই তিনি হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, ভেকের ডিম প্রভৃতির মধ্যে অনেকটা পরিপোষক-পদার্থ রাখেন। আমরা হংসীর ডিম্বে যখন জঠর জ্বালা নিবারণ করি, তখন হংসীর প্রকৃত ডিমের আহাৰ্য্যটুকু উদরসাৎ করি মাত্র। তাহার মধ্যে যে আসল অণুটুকু থাকে তাহা খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেটুকু হয়ত এক ইঞ্চির এক ভাগের ১৩০ কি ১৫০ ভাগ। সুতরাং আমরা দেখি যে সকল ডিম্ব মাতৃদেহের ভিতর পরিণত হয় ও যে সকল ডিম্ব দেহের বাহিরে বর্জিত হয়, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে—বাহিরে বর্জমান ডিমের কঠিন আবরণ থাকে এবং সেই আবরণের মধ্যে প্রকৃত ডিম্বের পরিপুষ্টির জন্ত অনেকটা পদার্থ থাকে।

ঠিক যে মুহূর্ত্তে মানুষের বা কুকুরের বা ঘোড়ার বা প্রজাপতির জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যে উহারা নিজ নিজ পিতামাতার রূপ পায় না, তাহা বলা বাহুল্য। ঠিক সজীব অণুর উদ্ভবের সময় হইতে, পিতামাতার মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট জীবের উদ্ভব-কালের মধ্যে, অণুর মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটে। মানুষের ডিমের পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করিলে কৃতকণ্ডলা বড় কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙাচীর যেমন অনেকগুলো পরিবর্তনের পর ভেকত্ব লাভ হয়—মানুষের ডিমের ভিতরের শিশুরও তেমনি নানা রকম পরিবর্তন ঘটয়া তবে নরদেহ লাভ হয়। এই রকম পরিবর্তন সকল উচ্চ-শ্রেণীর জীবের অণুর ভিতর হইয়া থাকে।

আপনারা মনে করিতে পারেন যে, কুকুরের বাচ্ছা যেমন ক্রমশঃ বাড়িয়া বড় সারমেয়ের আকার ধারণ করে, কিম্বা খোকামণি যেমন শশীকলার মত বাড়িয়া ৩০ হাত মানুষে পরিণত হয়—অণুর ভিতরের পরিবর্তনগুলো সেই প্রকারের। অর্থাৎ হাত, পা, মুখ, চোখ, মাথা বা শিরদাঁড়া যদিও প্রথম

অবস্থায় ঘোড়ার ডিমের ভিতর অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয় তবু সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হাত, পা, মুখ, চোখ, মাথা, শিরদাঁড়া—সবই পরিণতবয়স্ক অশ্বের সেই সব অবয়বের অনুরূপ। তবে সেগুলো অপরিণত শিশুর বলিয়া অতি ক্ষুদ্র ও অপরিণত। ঘোটকীর ডিম যেমন এক ইঞ্চির একশত বিশ ভাগের এক ভাগ সেই পরিমাণে সেই ডিমের ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ছোট। এ ধারণাটা মোটেই নিভুল নয়। ঘোড়ার ডিমের ভিতরকার শিশু ঘোড়ার ছায়া মাত্র বা মানুষের ডিমের ভিতরের শিশুর রূপ মানুষের রূপের সংক্ষিপ্ত চিত্র মাত্র—এ ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন।

প্রথম অবস্থায় সকল জীবের অণুর ভ্রম এক রকম দেখিতে। সে সময় ব্যাঙ, ছুছন্দর, খরগোষ, কচ্ছপ, মানুষ, ভেঁদড়, ঘোড়া বা কাটবিড়ালী, মৌমাছি বা হাতী সকলেরই ভ্রমের আকৃতি এক। সে অবস্থায় সকল ভ্রম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সরল-শরীর এক-কোষময় আদিপ্রাণী প্রোটোজোয়ার মত দেখিতে। তাহার পরের অবস্থায় ভ্রমের চেহারা হয় নানা প্রকার কৃমি-কীটের মত। সে সময় সেই কৃমি-কীটের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর সকল ভ্রমের আকৃতি একই প্রকারের। তাহার পর আরও কতকগুলো পরিবর্তনের পর উচ্চশ্রেণীর সকল ভ্রমের আকৃতি হয় স্কন্ধকাটা ল্যানস্লেট নামক মৎশ্বের মত। তাহার পর মনুষ্য-ভ্রম মাছের আকৃতি, উভচর ভেকের আকার প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তবে স্তন্যপায়ী জীবের আকার ধারণ করে। স্তরে স্তরে নানা স্তন্যপায়ীর আকার পাইয়া শেষে বানরের আকার ধারণ করে। পরে নরের আকার লাভ করে।

উপরে যে কথা বলিলাম, তাহা হইতে একটা কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সকল জীব একই প্রকারের, তাহাদের ভ্রম বহুদিন অবধি একই রকমের থাকে। অর্থাৎ যদি মানুষের পরিবর্তনশীল ভ্রম মাত্র এক অবস্থায় ল্যানস্লেট মৎশ্বের রূপ ধারণ করে তবু তাহাকে বানরের ভ্রমের মত একই রকমের পরিণতির চক্রে অধিক দিন থাকিতে হয়। কারণ ল্যানস্লেটের ভ্রমের ঐখানে শেষ, কিন্তু বানর ও মানুষের ভ্রমকে ক্যান্সারের মত মারাত্মক জীব, ঘোড়ার মত ক্ষুরযুক্ত জীব, কুকুর জাতীয় জীব প্রভৃতির দেহ পর পর পাইতে হইবে। ভূমিষ্ঠ “হইবার” তিন চারি মাস পূর্বের মানব ও বানর ভ্রম পাশাপাশি রাখিলে বলা শক্ত কোন্ট কোন্ জীবের ভ্রম। তেমনি গাধা, ঘোড়া, জৈব্রার ভ্রমের মধ্যে জ্ঞাতিক্রমের সংস্রব আছে বলিয়া তাহাদের পার্থক্য বহুদিন অবধি বুঝিয়া উঠা কঠিন।

এইরূপ ক্রণের দেহের জ্ঞাতিত্বের লক্ষণ অনেক সময় ক্রণ ছাড়িয়া শিশুর গাত্রে অবধি ফুটিয়া উঠে । বাড়িতে মুনিয়া পাখী পুষিলে এ কথা বুঝিতে পারা যায় । শৈশবকালে প্রায় সকল মুনিয়া দেখিতে এক রকম, কিন্তু যত দিন যায় তত যেন বিভিন্ন শ্রেণীর মনিয়ার বিভিন্ন রূপের ছটা ফুটিয়া উঠে । কাহারও বর্ণ কাল হয়, কাহারও গায়ে ছোট ছোট দাগ হয় । আমি যৌবন-লক্ষণের কথা বলিতেছি না । সে তো সকল জীবের মধ্যে দেখা যায় । যৌবনে সিংহের কেশর হয়, মানুষের গোঁফ দাড়ি গজায়, ময়ূরের পুচ্ছ হয়, টিয়াপাখির গলায় “কণ্ঠী” বাহির হয় । এ সকল যৌবন-লক্ষণ । কিন্তু শৈশবকালে টিয়া ও চন্দনার বাচ্ছার বা ফুলটুসি ও মদনার ছানার, এমন কি মোরগ ও ময়ূর শাবকের পার্থক্য কয়জন ধরিতে পারেন ? বাঘ ও সিংহের যৌবনের আকৃতি ত অত পৃথক, কিন্তু শৈশবে সিংহশিশুর গায়ে বাঘের মত ডোরা থাকে । সেরকম একটি সিংহ-শিশুর মৃত-দেহ আমাদের ষাড়ঘরের স্তম্ভপায়ীদের মধ্যে আছে । এই সকল লক্ষণকে শৈশব-লক্ষণ বা juvenile character বলে । আমি গতবৎসর শীতকালে দুইটি বুল্বুলি পুষিয়াছিলাম । শৈশবে তাহাদিগকে দেখিয়া সকলকেই বলিতে হইয়াছিল যে, সেগুলি সাধারণ রকমের কাল-বুল্বুলি । কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাদের একটির উদর শুভ্র হইল এবং মাথার ঝুঁটি দৃঢ় হইল । তখন সকলে বুঝিল উহা কাঠুরী বুল্বুলি ।

তাহা হইলে আপনারা এখন বুঝিলেন যে ঘোড়ার ডিমের ভিতরের ঘোড়ার ক্রণ জন্মলাভ করিয়াই অশ্বের রূপ পায় না । পোকা-মাকড়, মাছ ব্যাঙ প্রভৃতি নানাপ্রকার বেষ্ট পরিবর্তন করিতে করিতে অশ্বক্রণ শেষে যেরূপ আকৃতি পায় তাহা গাধা, জেব্রা, কোয়াগা প্রভৃতি জীবের মত শেষে সে ঘোড়ার রূপ পায় বটে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরও তাহার দেহে এমন সব শৈশব-লক্ষণ থাকে যাহা হইতে তাহার নিকট-আত্মীয়দের পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে । আমি ঘোড়ার কথা বলিলাম কারণ আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি না আপনাদের মনুষ্য জাতির বিখ্যাত সুন্দরীদের জ্ঞাতি-ভগ্নী ওরাঙ-ওটাঙের কণ্ঠা ; অথবা আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অতি কাস্তদেহ, শান্ত-স্বভাব তাঁহারা বরবপু পাইবার পূর্বে মাতৃ-জঠরে এক একবার প্রটোজোয়া কুমি, লানস্লেট, ভেক, কেসেরু, গরু, কুকুর প্রভৃতির অনুরূপ দেহ লক্ষণকালের জন্তও ধারণ করিয়াছিলেন । কথাটা বিরক্তিকর বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্দিগের অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা ইহার যথার্থ্য সপ্রমাণ হইয়াছে ।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই বেশ-পরিবর্তনের অর্থ কি? ঘোড়ার ডিমের ভিতর যখন ঘোড়ার ভ্রূণ জন্মিল তখন সে ছোটখাট একটি ঘোড়া হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত। এত রকম সাজসজ্জা করিয়া কুমি, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতির অনুরূপ রূপ ধরিতে ধরিতে অশ্বের রূপ ধরিবার তাৎপর্য কি? তাহার পর কুকুর শৃগালের ভ্রূণই বা বহুদিন এক প্রকার থাকে কেন, আর শূকর ও শৃগালের ভ্রূণের পার্থক্যটা, কুকুর ও শৃগালের ভ্রূণের পার্থক্য ফুটিয়া উঠিবার পূর্বেই বা ফুটিয়া উঠে কেন?

এই সকল ভ্রূণের সাদৃশ্যের মধ্যে বিজ্ঞান এক বিশেষ বিধির প্রক্রিয়া দেখিয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত যে, কোনও জীবের জাতীয় পরিণতির ইতিহাসের, সেই জাতীয় প্রত্যেক জীবের নিজের পরিণতির ইতিহাস—পুনরাবৃত্তি মাত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে যে সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যজাতি নরত্ব লাভ করিবার পূর্বে সেই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথটা আরও খুলিয়া বলি—পূর্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্য ভ্রূণ প্রথমে এককোষ জীবের আকার ধারণ করে, তাহার পর নানা-প্রকার কীট, ষট্পদ, মৎস্য, সরীসৃপের দেহ ধারণ করে। ইহা হইতে বিজ্ঞানবিদেরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি ঐরূপে হইয়াছে। এককোষ জীব হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া মনুষ্যজাতি জন্মিয়াছে। তাহার অন্ততম প্রমাণ ভ্রূণের পরিবর্তনের ইতিহাস।

এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইংরাজ, ফরাসী বিশেষতঃ জার্মান ভ্রূণ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত মহাশয়েরা সকল জীবের ভ্রূণ-তত্ত্ব অনুশীলন করিতেছেন এবং কোন্ ভ্রূণের সহিত মনুষ্যের কোন্ অবস্থার ভ্রূণের সোসাদৃশ্য আছে তাহা মিলাইয়া মানুষের অভিব্যক্তির ক্রম নির্ধারণ করিতেছেন। কেবল মানুষের কেন, সমগ্র জীব-জগতের অভিব্যক্তির তালিকা রচনা করিতেছেন।

কিন্তু এইরূপ অনেক অনুশীলন করিয়া পণ্ডিত মহাশয়গণ যে সকল তালিকা নির্মাণ করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে ঐক্য নাই। আমি প্রবন্ধটি অধিক জটিল করিতে চাহি না। কেবল দুইটি তালিকার উল্লেখ করিব মাত্র। ইংলণ্ডের স্তার রে ল্যাক্সেপ্টার অভিব্যক্তির যে ক্রমনির্ধারণ করিয়াছেন, জার্মানীর হিকেল সাহেবের ক্রমের সহিত এ ক্রম মিলে না। ইংরাজ ও জার্মান পণ্ডিতদের মতানৈক্যের কারণ অবশ্য ইহাদের আধুনিক জাতীয় দ্বন্দ্ব নয়। হিকেল প্রসঙ্গক্রমে ভ্রূণ-তত্ত্ব অনুশীলন করিবার যে বাধা-বিঘ্নের কথা বলিয়াছেন, আমার বোধ

হয় তাহার দ্বারা এ বৈষম্যের সমাধান করা যাইতে পারে। মোটের উপর নিয়মটি সত্য যে, কোন জাতির অভিব্যক্তির ক্রম তজ্জাতীয় প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিগত পরিণতির ক্রমে পাওয়া যায়। তবে কেন সেই ক্রম সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত হইল ?

জাতীয় অভিব্যক্তির ক্রম ব্যক্তিত্বের পরিণতির ইতিহাসে পাওয়া যায়— বলিয়াছি বলিয়া ভাবিবেন না যে সকল ক্রমগুলির লক্ষণ ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে লক্ষিত হয়। যদি অভিব্যক্তির ক্রম হয় ক, খ, গ, ঘ, ঙ—তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই ক্রমের পরিণতির ইতিহাসে ক, খ, গ, ঘ, ঙ দেখিতে পাই না। কখনও পাই ক গ ঙ কখনও পাই খ গ ঙ, কখনও পাই ক খ ঙ ইত্যাদি। কাজেই মাঝের ফাঁক—যাহার চিহ্ন লোপ হইয়াছে সেটা কি ছিল তাহা নির্ধারণ করা দুঃস্বপ্ন হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নয়। অনেকস্থলে ঠিক ক্রমের লক্ষণ ক্রম দেখাইতে দেখাইতে আবার কতকগুলো ব্যতিক্রম দেখায়। যেমন ঠিক ক, খ, গ, ঘ, ঙ—না দেখাইয়া ইহা হয়ত দেখায় ক, খ, G, ঘ, ঙ অথবা ক, গ, S, ঙ। এই G বা S রূপ ব্যতিক্রম গুলাকে প্রথমতঃ ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে এবং দ্বিতীয়তঃ উহাদের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক গণ্ডগোল বাধে। অন্য জাতীয় জীবের ক্রম লইয়া পরীক্ষা করা যত সহজ, মানুষের ক্রম লইয়া পরীক্ষা করা তত সহজ নয়। কারণ এরূপ অনুশীলন করিতে গেলে মরহত্যা করিতে হয়। ইহাতেই পণ্ডিত মহাশয়দিগের মতানৈক্য হওয়া সম্ভব।

এ প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—

(১) ঘোড়ার ডিম অলীক নয়।

(২) ঘোড়া ডিম পাড়ে না বটে কিন্তু দেহের মধ্যে ডিম রাখে এবং তাহাতে অঙ্ক-ক্রমের পরিণতি হয়।

(৩) ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি সকল জীবের ক্রম নানা প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।

(৪) এই সকল ব্যক্তিগত রূপান্তর ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির জাতীয় অভিব্যক্তির ক্রম সূচনা করে এবং

(৫) ক্রমে সকল ক্রম ঠিক যথাযথ পাওয়া যায় না এবং মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মানুষের অভিব্যক্তির ক্রম বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত পরিণতির ক্রম জাতীয় অভিব্যক্তির ক্রমের পুনরাবৃত্তি—এ নিয়মকে হিকেল সাহেব অভিব্যক্তির মূল নিয়ম বা fundamental law বলিয়াছেন।

প্রতীক্ষা ।

[শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি, এ ।]

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় কারেণ্টান নগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাদাম ডিডের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এখানে বৈঠক বসিলেও সেই রাত্রে বৈঠকের কিছু বিশেষত্ব ছিল। দুই দিন পূর্বে মাদাম ডিডে প্রচার করেন যে, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সে রাত্রে অভাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বন্ধনা করিতে পারিবেন না। অত্র সময় হইলে হুয়তঃ সে নগরের কেহ মাদামের এই আকস্মিক ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করিত না ; কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন ফ্রান্সের এক প্রান্ত হইতে অত্র প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কেঃন উদ্দীন হইয়াছে। তখন, ফরাসী-বিপ্লবের অরাজকতার সকলে শঙ্কটাপন্ন অবস্থার দিন কাটাইতেছিল। বিশেষতঃ ধনীদিগের পক্ষে তখন বড়ই দুঃসময়। বিন্দুমাত্র সন্দেহে তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত। সুতরাং মাদামের এই আকস্মিক ব্যবহারের ফল যে কোন মুহূর্ত্তে শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই, দুই রাত্র মজলিস /বন্ধ রাখিবার পর মাদাম সহসা আবার উৎসবের আয়োজন করার সভাস্থ সকলেই অতিমাত্র বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত মাদামকে লক্ষ্য করিতেছিল।

সেই বিপ্লববাদের অভিব্যক্তির সময় মাদাম কারেণ্টান নগরে কি ভাবে বাস করিতেন, সাধারণে 'তাহাকে কি চক্ষে দেখিত, তাহা জানা আবশ্যিক। মাদামের স্বামী ফরাসী-বাহিনীর লেপ্টন্যান্ট-জেনারেল ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া, তিনি রাজধানী মধ্যে বাস নিরাপদ নহে বিবেচনায় কারেণ্টানে আগমন করেন। এখানে তাঁহার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সুদূর দেশে তিনি কতকটা নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার ধারণাই সত্য হইয়াছিল। কারণ এই বিপ্লবে উত্তর ফ্রান্সের ঞায় দক্ষিণ ফ্রান্সে রক্তের বহা প্রবাহিত হয় নাই। মাদাম এখানে আসিয়া স্থানীয় রাজপুরুষ ও অধিবাসীবৃন্দের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ তাহাকে ঘৃণা বা হিংসা না করে তজ্জন্ম সকলকে প্রত্যহ নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও ব্যবহারের মাধুর্য্যে তিনি সকলকে বশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টত্রিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহে পূর্ণযৌবনের লাবণ্য না থাকিলেও তখনও যে তিনি সুন্দরী ছিলেন তাহা সকলেই স্বীকার করিত। ক্ষীণ, সুগঠিত দেহে একটা কমনীয়তা তখনও বিরাজ করিতেছিল। কথা কহিবার সময় আবেগে তাঁহার মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিত। কৃষ্ণতায় উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়ে সর্বদা করুণার ধারা প্রবাহিত হইলেও এক শাস্তশীতল জ্যোতিঃ তাহা হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে জানাইত যে, তিনি নিজ সুখের জন্ত জীবনধারণ করিতে ছিলেন না। অতি অল্প বয়সে এক ঈর্ষাপরবশ বৃদ্ধের সহিত মাদামের বিবাহ হয়। স্বামীর ব্যবহারে ও সর্বদা উচ্ছৃঙ্খল রাজসভার সংসর্গে বাস করাতে তাহার মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জ্যোতির পরিবর্তে বিবাদের কালিমায় আবৃত হইয়াছিল। তাঁহার নারী-হৃদয় ব্যক্ত হইবার পূর্বেই কে তাহাকে অচল শিলাখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল,—ফলে, অতৃপ্ত বাসনারাশি তাহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে সুপ্ত ছিল। এই কারণে মাদামের বহির্সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্যটা আরও রমণীয় ছিল। এই সৌন্দর্য্যই সময়ে সময়ে তাঁহার বদনে প্রতিভাত হইত। তাঁহাকে দেখিলেই সম্মান করিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহার ব্যবহারে ও কথায় এক অব্যক্ত মাদকতা মাথান ছিল—সে মাদকতা শুধু যৌবন-লাবণ্যভরা নারীতেই সম্ভবে। সরল ব্যক্তি প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু তাঁহার গৌরব-মণ্ডিত আত্মসম্মত প্রাণে শঙ্কার সৃষ্টি করিত। তাহারা বুঝিত যে, মাদামের আত্মা সাধারণ মানবের আত্মা অপেক্ষা অনেক উচ্চে বিচরণ করে।

শুধু একটি বৃত্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল—সেটি মাতৃস্নেহ। তাঁহার হৃদয়ের সব বৃত্তিগুলি একমাত্র পুত্রের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। এই পুত্র দূরে থাকিলে তিনি নিজ দুর্ভাগ্যে আক্ষেপ করিতেন, কল্পিত শঙ্কায় কাতর হইতেন, আর নিকটে আসিলেও তাহাকে দেখিয়া কখনও পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই পুত্রের জন্তই তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাহার আর কোন আত্মীয় ছিল না। এই পুত্র তাহার স্বামীর বংশের একমাত্র প্রতিনিধি। সুতরাং অতি যত্নে, অননুসাধারণ ক্রেশস্বীকার করিয়া তিনি এই পুত্রটিকে লালনপালন করিয়াছিলেন। পুত্রও মাতাকে যথার্থই ভাল বাসিত। স্নেহের চক্ষে তাহারা পরস্পরের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এই যুবক সাবলেপ্টনাণ্টের পদ লাভ করিয়া ফ্রান্সের তৎকালীন রীতি-অনুযায়ী রাজপুত্রের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিপ্লব-

বাদীরা যখন প্রচার করিল যে, রাজবংশীয়ের সহিত যাহারা বিচরণ করিবে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে, তখন তিনি পুত্রের অনুগামী হইলে তাহাকে হয়তঃ পথের ভিখারী হইতে হইত। পুত্র কুশলে থাকিলেই তাঁহার শান্তি, এই ভাবিয়া পুত্রকে ছাড়িয়া তিনি কারেণ্টনে আসিলেন ও স্থানীয় সকলকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রধান হইবার চেষ্টা সে যুগে বড় নিরাপদ ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি যখন মাতৃত্বের মূর্তি ধরিয়া দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে দেখা দিতে লাগিলেন, দ্বিধাশূন্য হইয়া সকলের হৃৎকম্প দূর করিতে লাগিলেন, ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতে লাগিলেন, তখন দরিদ্রগণ তাঁহাকে ভক্তির অঞ্জলি দিতে লাগিল। এদিকে নিত্য নূতন উৎসবের দ্বারা তিনি ধনীদেবও বশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাটীতে নগরের প্রোকিউরার, মেয়র, প্রেসিডেন্ট, সরকারী উকিল ও এমন কি সাধারণ-তন্ত্রের বিচারালয়ের বিচারকবৃন্দ পর্য্যন্ত পদার্পণ করিতেন। ইহাদের মধ্যে, প্রথমোক্ত চারিজনের শুধু এই সুন্দরী বিধবাটীর উপর নহে, তাহার বিপুল সম্পত্তির উপরও বিলক্ষণ লোভ ছিল। এই সরকারী উকিল পূর্বে মাদামের এটর্নী ছিলেন—সুতরাং তিনি মাদামের সম্পত্তির পরিমাণ পর্য্যন্ত বেশ জানিতেন। বহু দিনের ব্যবহারেও মাদাম ইহাকে চিনিতে পারেন নাই। এ ব্যক্তি নিজ মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া মাদামের সহিত মৌখিক সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল।

কাউন্টেন্স কারেণ্টান নগরের সকলের হৃদয়ে এমন একটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, যখন এক সন্ধ্যায় তাহারা সহসা শুনিল যে, কাউন্টেন্স তাহা-দিগকে নিজ প্রাসাদে অভ্যর্থনা করিতে অক্ষম তখন সত্যই তাহারা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ইহার কারণ জানিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহাদের শত প্রশ্নের উত্তরে কাউন্টেন্সের বৃদ্ধা পরিচারিকা বৃজিটি শুধু জানাইল যে, তাহার মনিব গৃহ মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে-ছেন না—এমন কি, বাটীর কাহারও সহিত নহে!

তখন চিরস্তন প্রথানুযায়ী উক্ত নগরের সকলে নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রয়োগে কাউন্টেন্সের এই আচরণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। একজন বলিল, “কাউন্টেন্সের পীড়া হইলে নিশ্চয়ই ডাক্তার ডাকা হইত। কিন্তু ডাক্তার সারাদিন আমার বাটীতে দাবা খেলিয়াছে। ডাক্তার পরিহাস করিয়া

আমায় বলিতেছিল যে, 'আজকাল এক রকমের ব্যাধিরই আধিক্য দেখা যাইতেছে.....তাহা দুরারোগ্য !'

কাউন্টেস যে এ বয়সে উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবেন তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিল না। পরদিন কিন্তু সকলের মনে এক সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। কারণ সে দিন বৃজিটি অত্রদিন অপেক্ষা অধিক বাজার করিয়াছিল। ঘটনাটা সত্য। সেদিন বাজারে একটি মাত্র শশক বিক্রয়ার্থ আসে। বৃজিটিই তাহা অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করে। তারপর নগরের বৃদ্ধরা বলিল, তাহারা প্রাতঃ-ভ্রমণে যাইয়া কাউন্টেসের বাটীর সামনে দিয়া বেড়াইবার সময় লক্ষ্য করিয়াছে যে, মাদামের বাটীতে খুব কাজের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সকলে এ সম্বন্ধে আবার গবেষণা আরম্ভ করিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালেও যখন সকলে জানিল যে, কাউন্টেস তখনও সুস্থ হন নাই, তখন তাহারা নগরের মেয়রের ভ্রাতা এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর বাটীতে মজলিস বসাইল। নগরের সকলেই এই বৃদ্ধকে সম্মান করিত। কাউন্টেসও তাহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। বৃদ্ধের বাটীতেও সকলে কাউন্টেসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। সরকারী উকিল নাটকীয় কলা-কৌশলের সহিত বর্ণনা করিল যে, কাউন্টেসের পুত্র আসিবে। মেয়র বলিল, কোন পুরোহিত 'লাভেণ্ডী' হইতে পলাইয়া আসিয়া কাউন্টেসের নিকট আশ্রয় লইয়াছে। জেলার প্রেসিডেন্ট বলিলেন, কোন চৌয়ান বা ভেণ্ডিয় দলপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া এখানে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, কোন পদস্থ ব্যক্তি কারাগার হইতে পলাইয়া আসিয়া কাউন্টেসের নিকট আশ্রয় লইয়াছে। মোটের উপর সকলেরই কথার তাৎপর্যা, কাউন্টেস কোন বিপদের প্রতি দয়া দেখাইতে গিয়া তৎকালীন আইন অনুযায়ী 'অপরাধিনী' হইয়াছেন ও এজন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে ফাঁসী যাইতে হইবে। শুধু সরকারী উকিল বলিলেন, "যাহাই হউক, এখন আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে, এ ব্যাপার লইয়া মোটে আন্দোলন না করিয়া কাউন্টেসকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করা।" তিনি আরও বলিলেন, "যদি তোমরা এই ঘটনাটা প্রচার করিতে থাক, তাহা হইলে আমাকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ফলে কাউন্টেসের প্রাসাদে খানাতল্লাস হইবে— আর তারপর—" তিনি বলিতে বলিতে চুপ করিলেও সকলে তাঁহার বাকি কথা-টুকুর মর্ম্ম বুঝিয়াছিল।

উক্ত নগরে কাউন্টেসের যে কয়জন যথার্থ বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত

কাউন্টসের এই আচরণে শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তৃতীয় দিনে কমিউনের প্রকিউরার তাহার পত্নীকে দিয়া কাউন্টসকে জানাইলেন যে, তিনি যেন সন্ধ্যাকালে পূর্বের স্থায় আবার উৎসবের আয়োজন করেন। বৃদ্ধ বণিক কিন্তু আরও একটু সাহসী হইয়া সেই প্রাতে কাউন্টসের বাটী উপস্থিত হইলেন। দ্বার পার হইয়াই তিনি লক্ষ্য করিলেন, কাউন্টস বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। অনুকম্পা-কাতর প্রাণে বৃদ্ধ ভাবিলেন, সে নিশ্চয় তাহার প্রণয়ীকে বাটীতে আশ্রয় দিয়াছে। কাউন্টসের মুখভাব দেখিয়াও তাহার এই ধারণা বন্ধমূল হইল। নারী-সুদরের এই প্রগাঢ় অনুরাগ ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে বৃদ্ধের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি নগরবাসীর ননোভাব কাউন্টসকে জানাইলেন ও শেষে বলিলেন, “যদি তুমি কোন পুরোহিতকে আশ্রয় দিয়া থাক তাহা হইলে অনেকে হয়তঃ তোমার পক্ষ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তুমি যদি তোমার প্রণয়পাত্রকে আশ্রয় দিয়া থাক, তাহা হইলে কেহ তোমার প্রতি করুণার লেশমাত্র দেখাইবে না।” এই কথায় কাউন্টস শুধু বৃদ্ধের দিকে এক কটাক্ষপাত করিলেন। সে দৃষ্টিতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ছিল— বৃদ্ধের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

তারপর তিনি বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গেলেন ও নিজ বক্ষদেশ হইতে একখানি মলিন পত্র বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন ও রুদ্ধ-স্বরে শুধু বলিলেন “পড়ুন”। তিনি অবসন্ন দেহে একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ এদিকে নিজ চশমাজোড়া বাহির করিয়া তাহার কাঁচ দুইখানি পরিষ্কার করিতেছিলেন। সহসা কাউন্টস তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বর পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, “আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।” বৃদ্ধ শুধু বলিলেন, “আমি কি তোমার সহযোগিতা করিতে আসি নাই?” কাউন্টসের দেহ কাঁপিয়া উঠিল। এই নগরে তিনি আজ একজন বন্ধু পাইলেন।

বৃদ্ধ পড়িলেন, কাউন্টসের একমাত্র পুত্র গ্রেনভাইল অভিযানে যোগদান করে। যুদ্ধে সে বন্দী হয়। সেস্থানের কারাগার হইতে সে মাতার নিকট করুণ অথচ আশাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র প্রেরণ করিয়াছে। কারাগার হইতে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে মাতাকে জানাইয়াছে যে, নির্দিষ্ট তিন দিনের মধ্যে সে ছদ্মবেশে মাতার নিকট পৌঁছাবে। যদি সে না আসিতে পারে তাহা হইলে মর্মান্বর্ণী বেদনা মাথান ভাষায় মাতার নিকট শেষ বিদায় চাহিয়াছে!

পত্রসম্মত বৃদ্ধের হাতখানি কাঁপিতেছিল। তিনি বলিলেন, “তুমি বুদ্ধি-

মতীর মত কার্য্য করিতে পার নাই। বাটীতে এত খাণ্ডসামগ্রী সংগ্রহ করিলে কেন ?” “পুত্র যখন আমার নিকট আসিবে তখন অত্যধিক পথশ্রমে ও অতিমাত্র ক্ষুধার জ্বালায়—” অভাগিনী আর বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ বুলিলেন। বলিলেন, “আনি আমার ভ্রাতাকে তোমার পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিব।”

অতীতে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে বৃদ্ধ বণিক কার্য্য করিতেন এখন সেই বুদ্ধির সাহায্যে কাউন্টেন্টকে কতকগুলি সুপারামর্শ দান করিয়া তিনি প্রাসাদভ্যাগ করিলেন। পরে নানাছলে প্রত্যেকের বাটী দেখা দিয়া জানাইলেন যে, সেই সন্ধ্যায় কাউন্টেন্ট তাহার প্রাসাদে আবার মজলিসের ব্যবস্থা করিতেছেন। কাউন্টেন্টের বাত হইয়াছিল। গ্রাম্য ডাক্তার ট্রান্টিনের ব্যবস্থামত জীবন্ত শশকের চামড়া বক্ষ মধ্যে রাখিয়া দুইদিন বিশ্রাম করাতেই তিনি বিবম বাত-ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, নগরের কাহারও বাত হইলে ট্রান্টিন তাহার এই প্রিয় ঔষধটিই সকলকে ব্যবহারের জগ্য পরামর্শ দিত। অনেকে বৃদ্ধ বণিকের এই কথায় আস্থা স্থাপন করিলেও জনকয়েক ব্যক্তি ইহাতে মোটে সন্দুষ্ট হয় নাই। সরকারী উকিলও তাহাদের মধ্যে একজন।

* * * * *

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আসিয়া দেখিল, কাউন্টেন্ট একটি বড় চিম্নীর পাশে একখানি কেদারায় বসিয়া আছেন। তাহারিও অগ্নিকটাহের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে উপবেশন করিল। সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু বৃদ্ধ বণিকের চক্ষেই কক্ৰুণা ও সহানুভূতি ভাব দর্শনে সাহসী হইয়া কাউন্টেন্ট অতিমাত্র ধীরতার সহিত সকলের অর্থহীন আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যাবলী সহ করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সাধ্যমত তাহাদের আলাপনে যোগদান করিয়া সকলকে অগ্রমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কেবল সরকারী উকিল ও একজন বিচারক নীরবে একপার্শ্বে বসিয়া কাউন্টেন্টকে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল ও কক্ষের কোলাহল সত্ত্বেও বাহিরের কোন শব্দ শুনিলে উৎকর্ণ হইয়া তাহার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন প্রশ্ন দ্বারাও তাহার কাউন্টেন্টের সংবন্ধের বাধ ভাঙিতে প্রয়াস পাইতেছিল। শুধু মাতৃহের বলে কুক বাঁধিয়া কাউন্টেন্ট শান্তভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। বস্তুতঃ এক সুদক্ষ অভিনেত্রীর স্থায় তিনি নিজ ভূমিকা অভিনয় করিতেছিলেন।

তারপর সকলে ক্রীড়ায় বসিলে তিনি “লোটো” আনিবার ছলে নিজ কক্ষে আসিলেন। সম্মুখে বৃজিটিকে দেখিয়া বলিলেন, “বৃজিটি আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে!” হুঃখ ও মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইল। একবার চক্ষে হাত দিবারাত্র পদ্বপত্রস্থিত বারির গ্রায় অশ্রুরাশি ঝরিতে লাগিল। শয়নকক্ষের দিকে চাহিতেই তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ উখলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “সে তো এখনও আসিতেছে না! সে আসিবে—নিশ্চয় আসিবে। সে বাঁচিয়া আছে—আনার স্থির বিশ্বাস সে বাঁচিয়া আছে। বৃজিটি কিছু শুনিতে পাইতেছ? ওঃ, সে ধরা পড়িয়াছে কি এখন এই নগরের দিকে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্ত আমি আমার জীবনের বাকী অংশটুকু ছাড়িয়া দিতে এখনই প্রস্তুত।”

কক্ষের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিক আছে কি না তিনি দেখিলেন। তখন চুল্লীমধ্যে অগ্নি পূর্ণতেজে জ্বলিতেছে। জানালার শাশীগুলি বন্ধ আছে—আসবাবপত্র মার্জিত হইয়া চক্চক করিতেছে। হুঙ্কফেননিভ শয্যার দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, কেবল দাসী নহে গৃহকর্ত্রীও শয্যা-বিস্তার কালে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পুষ্পপরাগসহ মাতৃস্নেহের অনাবিল সৌগন্ধ কক্ষটিকে আমোদিত করিতেছিল। পথক্লান্ত সৈনিকের কি অভাব তাহার সুখের জন্ত কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা কাউণ্টেসের মাতৃহৃদয় বেশ বুঝিত। তাই কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্য সু-খাণ্ড, শ্রেষ্ঠ মণ্ড, নূতন পাছকা, পরিষ্কৃত বসন সমুদয়ের মধ্যেই মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি হইতেছিল।

সহসা চমকিত হইয়া কাউণ্টেস বলিলেন, “ঐ আটটা বাজিতেছে! সে আসিবে—এখনই আসিবে।”

আর অধিকক্ষণ বৈঠকখানা ছাড়িয়া থাকিতে তাঁহার সাহস হইল না। বৈঠকখানা মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, যদি পথে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়! তখন বৃজিটির স্বামী উৎসুক হৃদয়ে বহির্দ্বারে পাহারা দিতেছিল। আর কাউণ্টেস পথের প্রত্যেক শব্দে চমকিত হইয়া আশা করিতেছিলেন, ঐ বুঝি পুত্র আসিয়া তাহার প্রাসাদ দ্বারে দাঁড়াইল!

* * * * *

ঠিক এই সময়ে এক যুবক প্যারীনগরী হইতে যাত্রা করিয়া কারেণ্টান নগরের দিকে আসিতেছিল। তখন সেনাদল পর্য্যন্ত সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিবার সময় পাইত না। নাগরিকের দল নাগরিকের বেশেই প্রজাতন্ত্রের সেনাদলে

যোগদান করিত। এই যুবকটিও সেনাদলের একজন। সে তাহার দল ছাড়াইয়া আগে আগে আসিতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা তখন শুভ্র রজতকিরণ-ধারা ঢালিয়া ধরাতল প্লাবিত করিয়া দিলেও দূরে পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ ক্রমেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছিল। স্মৃতরাং যুবক ক্লান্ত হইলেও যথাসাধ্য দ্রুত পাদক্ষেপে নগরের দিকে আসিতেছিল। তাহার পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র পেটিকা ও হস্তে একগাছি মোটা লাঠি ছিল।

সে যখন নগরে প্রবেশ করিল তখন নগর নীরবতার শান্তিমাথা ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সে ঘুরিতে ঘুরিতে এক তন্তুবায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া মেয়রের বাটী উপস্থিত হইল। মেয়র তাহাকে পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, ইঁা বড় ঘরের ছেঁলে বটে!

“তোমার নাম কি?”

“জুলিয়ান জুসিউ”।

“কোথা হইতে আসিতেছ?”

“প্যারী হইতে।”

“তোমার সঙ্গীরা বোধ হয় এখনও দূরে আছে?”

“তাহারা আমার তিন লীগ পিছনে।”

মেয়র তাহাকে কাউন্টসের বাটী রাত্রিতে থাকিবার আদেশ দিলেন। সেনাদের এই ভাবে আশ্রয়দান করিতে তখন সকলে বাধ্য ছিল।

তখন রাত্র সাড়ে নয়টা। অভ্যাগতের দল একে একে বিদায় লইতেছিল। তখনও শুধু সরকারী উকিল যায় নাই। কাউন্টস কম্পিত-হৃদয়ে তাহার প্রস্থান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সহসা সরকারী উকীল বলিল, “সিটনী! আমি প্রিজাতম্বের আইন প্রতিপালন করিতে বাধ্য।” কাউন্টসের বক্ষ হুকু হুকু কাঁপিয়া উঠিল। উকিল বলিল, “তোমার কি আমার নিকট প্রকাশ করিবার কিছুই নাই?”

যথাসাধ্য মনোভাব দমন করিয়া তিনি বিশ্বয়সূচক স্বরে বলিলেন, “না।”

উকিল কাউন্টসের পাশের চেয়ারে বসিলেন, কোমল স্বরে বলিলেন, “হায়-নারী! এ সময় একটা কথা তোমায় ও আমায় ফাঁসীকাঠে লট্কাইতে পারে। আমি তোমার হাবভাব আগাগোড়া লক্ষ্য করিতেছি ও বেশ বুঝিয়াছি যে, তুমি আজ সকলকে প্রতারিত করিয়াছ। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তুমি তোমার পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছ।”

কাউন্টেন্স অসম্মতি-সূচক শিরঃসঞ্চালন করিলেও তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, উকিলের হিংস্র চক্ষু ইহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, “বেশ তাহাকে আসিতে দাও। কিন্তু কাল সকাল সাতটার পর সে যেন এখানে না থাকে। কারণ কাল ইরতঃ সরকারী পরওয়ানা লইয়া আনাকে তোমার বাটা খানাতল্লাস করিতে আসিতে হইবে।”

উদ্ভ্রান্ত ও নিনির্মেষ নয়নে কাউন্টেন্স তাহার মুখ পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি হিংস্র ব্যাঘ্রের প্রাণেও করুণার ধারা প্রবাহিত করিতে পারিত! তখন সাধ্যমত মিষ্টস্বরে সে বলিল, “আমি তোমার দেহহিতৈষিতা, তোমার বদাচর্য ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া প্রজাতন্ত্রের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিব।”

কাউন্টেন্স বুঝিলেন, তাহাকে জালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছিল—মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নির্বাতনিষ্কম্প দীপের স্তায় বসিয়া রহিলেন।

সহসা কে দ্বারে করাঘাত করিল।

ত্রস্তে উকিলের পদনিম্নে জানু পাতিয়া বসিয়া কাউন্টেন্স বলিলেন, “তাকে বাঁচাও, ওগো তাকে বাঁচাও!”

লালসামদির নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া উকিল বলিল, “নিশ্চয়, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে—আমাদের প্রাণ বিনিময়েও!”

সে কাউন্টেন্সের হাত ধরিয়া তুলিল।

কাউন্টেন্স শুধু অক্ষু টকঠে বলিলেন, “হায়! আগার সর্বনাশ হইল!”

উকিল বলিল, “মাদাম, এই উপকারের প্রত্ন্যপকার স্বরূপ আমি তোমার নিকট কিছু চাই।”

কক্ষে কর্তী একাকিনী আছেন এই ভাবিয়া বৃজিটি চীৎকার করিয়া বলিল, “ঠাকুরাণী! সে”—আনন্দে জ্ঞানহার্য হইয়া সে ঐ কথা বলিতে বলিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সরকারী উকিলকে তথায় দেখিয়া তাহার আর বাঙ-নিম্পত্তি হইল না!

খুব সপ্রতিভ ভাবে উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার কথা বলিতেছ, বৃজিটি?”

*

*

*

*

সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা না থাকিলেও কাউন্টেন্স মানসিক উত্তেজনার

বশবর্তী হইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, দ্বার উন্মোচন করিলেন ও পুত্রকে দেখিতে পাইয়া দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিলেন, “আমার পুত্র, আমার পুত্র !”

তিনি পুনঃ পুনঃ পুত্রের মস্তক চুষন করিতে লাগিলেন। অপরিচিত কণ্ঠে সেই সেনা ডাকিল “মাদাম !”

সহসা সর্পদৃষ্ট ব্যক্তির ছায় ত্রস্তে পিছাইয়া আসিয়া মাদাম বলিলেন, “এতো সে নহে !”

তাহার দিকে চাহিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া বৃজিটি বলিল, “হাঃ ভগবন ! ঠিক তাহারই মত দেখিতে !”

এক মুহূর্তকাল কেহ কথা কহিল না। কাউণ্টেসের সেই হতাশব্যঞ্জক চাহনীতে মৈত্রীটি পর্যাণ্ড বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল।

কাউণ্টেসের পক্ষে এই আঘাত মন্বাত্তিক হইল। তিনি নিজ দুঃখের পরিমাণ এইবার বুঝিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বৃজিটির স্বামী তাঁহাকে ধরিলে তিনি সেনাটিকে বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিতে পারিতেছি না। আমার ক্ষমা কর। ভৃত্যগণ তোমার সেবা করিবে।”

বৃজিটি তাঁহাকে টানিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল।

ক্ষণপরে বৃজিটি বলিল, “মা ! ঐ সৈন্যটা কি অগষ্টির বিছানায় শয়ন করিবে ? অগষ্টির জুতা পায়ে দিবে ? অগষ্টির খাদ্য খাইবে ? আমার ফাঁসী দিলেও আমি কিন্তু—”

বাণাহত হরিণীর মত কাউণ্টেস চমকিয়া উঠিলেন, আর্তস্বরে শুধু ডাকিলেন, “বৃজিটি !”

বৃজিটির স্বামী ধমক দিয়া তাহাকে বলিল, “তুই কি কত্রীকে হত্যা করিতে চাহিস্ নাকি ?”

এই সময় পাশের কক্ষে অগষ্টির ঘরে সেনাটি চেয়ারে বসাতে কক্ষমধ্য হইতে একটা শব্দ আসিল। সে শব্দ মাদামকে বড়ই বিচলিত করিল। তিনি বলিলেন, “আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না। চল সবজীঘরে যাই। রাত্রে বাহিরে কি হইতেছে তাহা সমস্তই সেখান হইতে দেখিতে পাইব।”

এখনও পুত্রকে পাইবার ক্ষীণ আশা তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল।

বাহিরে ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজমান ছিল। সহসা সেনাদল নগরমধ্যে প্রবেশ করাতে তাহাদের কোলাহল কাউণ্টেসের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। প্রতি শব্দে, প্রতি পদশব্দে তিনি আশা করিতেছিলেন, ঐ বুঝি তাঁহার নয়নের নগ্ন, সংসারের একমাত্র অবলম্বন আসিতেছে ! আর ক্ষণপরেই তিনি বুঝিতেছিলেন যে, তিনি প্রতারিত হইতেছেন !

আবার সমস্ত নগর নীরব গম্ভীর হইল। সমস্ত রাত্রি পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় সবজীঘরে বসিয়া বসিয়া উষাকালে তিনি কক্ষে ফিরিলেন। বৃজিটি সর্বক্ষণই তাহার মনিবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কাউণ্টেস কক্ষে প্রবেশ

করিবার কিছু পরেই সে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু কক্ষদ্বারে পা দিয়াই সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার নারী-হৃদয় বিষম কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বরবিষ্কারিত নেত্রে সে দেখিল, ধরাতলে কাউণ্টেসের মৃতদেহ পড়িয়া আছে!

পার্শ্বের কক্ষে সেই সেনাটি তখন বেড়াইতেছিল ও গুণ গুণ স্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছিল। বৃজিটি সিদ্ধান্ত করিল, “আঃ হতভাগা সেনাটা এক রাত্রেই বাড়ীটাকে যেন আস্তাবল করে তুলেছে! নিশ্চয়ই ওর চীৎকার ও পদশব্দে কর্তার মৃত্যু হইয়াছে।”

ঠিক তাই নহে,—আরও একটা মহৎ চিত্তবৃত্তি কাউণ্টেসকে নিহত করিয়াছে। পুত্রের চিন্তাই তাঁহাকে স্বপ্নের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছিল—সেই চিন্তাই তাহাকে সংসার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিল—সন্দেহ নাই। ঠিক যে সময় কাউণ্টেসের পুত্রকে ‘লীমবিহান’ নামক স্থানে পশুর মত গুলি করিয়া মারা হয়, ঠিক সেই সময়ই কাউণ্টেস ধরাশয়্যা গ্রহণ করেন। *

সাহিত্য প্রসঙ্গ ।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র ।]

যাঁহারা বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছু খবর রাখেন, তাঁহারা ভালরূপেই জানেন যে ‘কথ্য ভাষা’র প্রচলন লইয়া কতকগুলি মাসিক কিরূপ খেপিয়া উঠিয়াছে। এতাবৎ ‘অর্চনা’ এবং বর্তমানে ‘ভারতবর্ষ’ প্রমাণ যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া আসিতেছে যে, চলতি ভাষা সাহিত্যে চলিবে না। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় মন্তব্যসহ পণ্ডিতপ্রবর ডে বীমস্ লিখিত ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য সমাজের যে অনুষ্ঠান পত্র’খানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা অবিকল পুনর্মুদ্রিত করিলাম। এই পত্রে ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি ও প্রতিপত্তির ইতিহাসও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আশা করি, যুধ্যমান সাহিত্যিকবৃন্দ ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন এবং নিজেদের ভ্রম ও ক্রটিস্বীকারের অবসর পাইবেন।

* * *

দুই তিন শত বৎসর পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত ‘একাডেমি’ গুলি কিরূপে জাতীয় ভাষা গঠনে সহায়তা করিত, এই অনুষ্ঠানপত্রে তাহারও বিশেষ আলোচনা আছে। ‘অভিধান প্রস্তুত করাই এই সব সভার মূল কর্ম’ ছিল। বাঙ্গালা ভাষারও একটা গতি-নির্ণয়ের জন্ত বীমস্ সাহেব সেই আদর্শে একটা সভাস্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী হউক বা

নাই ইউক, বিভিন্ন শাখাসম্বলিত আমাদের সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে । ইউরোপে ২১৩ শতাব্দী পূর্বে স্থাপিত একাডেমিগুলি স্ব স্ব দেশের ভাষায় যে উপকার করিতে পারিয়াছে, দুঃখের বিষয় আধুনিক দিনে আমাদের সাহিত্য পরিষৎ তাহার কণামাত্র পারে নাই । ইহা আমাদের গৌরবের কথা নহে— লজ্জার কথা । এখনও যদি ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ পণ্ডিতবর বীম্‌স সাহেবের নির্দেশানুযায়ী কার্য করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অশেষ উপকার-সাধন করা হইবে এবং সাহিত্য পরিষৎও গৌরবমণ্ডিত হইবে ।

* *

*

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ—(অনুষ্ঠান পত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপর্যাপ্ত প্রদেশের সাহিত্য-পেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে । পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ-অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশ পর্যটন বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন । অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ।

এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায় । এক দল পাণ্ডিত্যাভিमानে অপৰ্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল । সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন । অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন ।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা পাঁচটি প্রধান; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালীয়, এবং স্পানীয় । তত্তদদেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য পুস্তকাদির জন্ম এক একটা পৃথক ও সুনির্গীত ভাষা অবধারিত আছে । সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন । বলটিক্ হইতে আল্প পর্যন্ত সকল জার্মান জাতি, সাবয় হইতে পালারোর পর্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্যন্ত সকল ফরাসি-সেরা এবং কাটালান গালিসিয়ান; আণ্ডালুসিয়ান কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক এক সুনির্গীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ ভেদ অথবা নির্গীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না ।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ঐ ঐ ভাষার ঐক্য ছিল না । ইংলণ্ডে “হাবলক দি ডেন” লিঙ্কন প্রদেশের স্থানীয় ভাষায়, “পিয়স প্লোমান” হার্টস প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত । বারবর এবং সর ডেবিড

লিগুসে উত্তর প্রদেশীয় ইংরাজি অর্থাৎ “লোলাগু” স্বচে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্বমাত্রে কোন ভাষার সহিত তুলনা না করিলে ষড়দেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না। এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা “লিগুসের” স্বচ. এবং লাংলাগোর ষ্ট্রাফোর্ডশায়র ইংরাজি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সপ্তম হেনরির রাজ্য কালে বিদ্রোহ শান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাশীল ধনগুণবিশিষ্ট মহাত্মাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করাতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্বাপেক্ষা উন্নতভাব গ্রহণ করিয়াছিল। এবং এলিজাবেথের রাজ্যকালে অদ্বিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখকচূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে ইংরাজি ভাষা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্ত, তদবধি আধুনিক ইংরাজি ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তদ্রাজ্যের যেরূপ ছিন্নাবস্থা, ভাষারও তদ্রূপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সে সকল ভাষাই লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেণ্ট এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেঙ্গল, অর্থাৎ অক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান। নরমান পিকাদে' এবং অপরপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড় বড় লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটি, প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেঙ্গল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ অব্দে এলিয়াট এবং ১৫৮০ অব্দে মণ্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতাবদ্ধ করেন।

১৬৩৫ অব্দে কার্দিনাল্ রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমি স্থাপন পূর্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

জর্মানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিস্তৃত। সহজেই তদ্দেশে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল, এবং জরমানি রোমরাজ্যের অধীন না হওয়ায় একতা লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্প মাত্রই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা ; ৩৫০ খৃষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগণিক, ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস, আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান ভাষাত্রয় ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা প্রায় হইয়া, “হাইজরমান” নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর অপর ভাষা ঐরূপ মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত “লোজরমান” আখ্যা প্রাপ্ত

হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতাব্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিকরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খৃঃ “কারল দি গ্রেট” কর্তৃক বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস্ থাকা জন্ত ভাষাও ফ্রাঙ্কিস্ ছিল। অটকিউ রেবেলসের এবং অপর অপর গ্রন্থকারের রচনা অণুবাদিত বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লোজরমানে, কতক সাক্সনে, কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষা ভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্সন কবিরা, কখন স্বাবিয়ান লেখকেরা, কখন লোজরমান গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী, বহুজ্ঞানাপন্ন লথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোডচ এবং ববেরিয়ার ভাষার মধ্যবর্তী সাক্সণির ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন সহকারে ভদ্র সমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম পুস্তক অনুবাদ করিয়া তাহা ১৫০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে স্থানীয় ভাষা সমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভদ্র সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ঐ মত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভদ্র সমাজে শত শত বৎসরাবধি ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অনুমান করিতে পারা যায় যে, সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই, ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভাষার একতা ও উদ্দীপনা সাহিত্যাদির আলোকাভাবে ইটালী অন্ধকারপূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাত তারার স্বরূপ দান্তে এবং পেত্রার্কার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণ সকল সমস্ত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় “একাডেমি” হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্ণীতাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লোরেন্স নগরের একাডেমি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খৃঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীয় ভাষা টস্কান্ নামে বিখ্যাত ছিল। টস্কান্ ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালির অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থাপিত হয়, কিন্তু ফ্লোরেন্সের একাডেমি সর্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েক জন সভ্য মূলসভা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম “একাদামি দেলা ক্রস্কা”। চালুনির মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেই জন্ত ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কার্য, এবং রচনা সকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাহার দোষ লোকের বিচারশক্তির এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৫৯০ খৃঃ এই সভা হইতে “বকেবলেরিয়া ডিলা ক্রুস্কা” নামক প্রথম গুচ্ছ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয় ।

গথদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্পেন দেশ মূর্খতারূপে পূর্ণ ছিল । কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয়, এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল । ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাষ্টিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে । উসিনা নাহারো এবং রুহো স্পেনের আত্ম বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারত্রয়, — সরবন্টিস, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ১৬০৩ খ্রীঃ সর বন্টিস কৃত “ডন্ কুইজট” প্রকাশ হয় । লোপের নাটকাদি তৎপরে, এবং কালদেরণের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয় ।

পঞ্চম চারল্‌স এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে যে মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করত স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই কাষ্টিলিয়ান । কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাষ্টিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত । কাটালান আরাগণ বিসকে গালিসিয়া আন্দালুসিয়া বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাপর প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই । সুতরাং কাষ্টিলিয়ান স্পেনের সাধুভাষার পদে অভিষিক্ত হইয়াছে । সর বন্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশ সম্বন্ধে অত্মপি আপনাদিগকে স্প্যানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহা “কাষ্টালো” বলিয়া থাকে । স্পেনে, ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে, এবং তদ্বারা স্পেনের সর্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে ।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্টরূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল । সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা যাইতেছে । এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত “একাডেমি ।”

ফ্লোরেন্সের একাডেমি, এবং তদনুকরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সভ্যতা পত্রকার গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অপরাপর প্রধান কবিদিগের, অর্থাৎ দান্তে আরিয়স্তো এবং তাসোর রচনা এবং পলসি, বইয়াদো প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন । স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপকথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল । এতদভিপ্রায়জনিত প্রথা ও কর্মপ্রণালী নিয়ে লিখিত হইতেছে । সভ্যরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন । যে যে শব্দ নিয়ম সঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন, তাঁহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন,

তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সভার মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য্য হইলে, লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমুদয় আদর্শ সদৃশ হইয়াছে কি না, তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মানুসারে সংশোধিত করত একাডেমির সভ্যদের বিচার জন্ত অর্পিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যত্নপি মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর, এবং বৃথা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধের অনেক অলীক কল্পনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্বারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হইতেন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্ভূত হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সৃজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে, ফ্রান্সের সর্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত, এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূরকল্পিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভদ্র সমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াস-বোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে তাহা উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খৃঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খৃঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল বসুএট মালিব্রান্শ এবং আর্নল্ড নামক লেখক সকল অতি পরিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্ভূত ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ নিজ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য্য গুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেই মত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে সফল প্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেই মত সাহিত্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতি রোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্থ করিতে সক্ষম নহেন। উত্তম রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থবোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার বিশেষ গুণ লেখক আপন মাতৃ ভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্ত নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোন মতে সক্ষম নহেন। *

• ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা পদ্ধতি

সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চর্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের জ্ঞানকৃত সমবেতচেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত। কি প্রকারে জন্মিল, তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিক্রম ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি “চসর” নিজ কবিতাবলী স্মৃতিষ্টি করণ জন্ত অনেক ফ্রেঞ্চ শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অত্যাধিক প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউফিস গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং কিয়দিনের জন্ত তাঁহার পুস্তক মহামাণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে যথার্থ নাম, তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরে প্রচুর শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সামান্য ভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষার ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভদ্র সমাজেরও কথাবার্তা অশ্লীল ছিল। ইউফিসের প্রণালী দ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস ১৫৯৭ খৃঃ প্রকাশ হয় এবং ৫০ বৎসর পরেই গুণ লিখিবার এ প্রকার বিগুদ্ধ নিয়ম দেখা যায়, যে তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির “আরকে-ডিয়া” বেকনের সারবতী ও গভীর রচনা, এবং হকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা, ইংরাজ মাত্রেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খৃঃ প্রকাশিত মিলটনের “আরিওপেজিটিকা” বোধ হয়, ইংরাজি গণের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থপত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত লিখিত হয়, এবং কবিবর পণ্ডে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গুণ প্রবন্ধ গান্ধীর্ষ্য ও সৌন্দর্য্য এবং স্মৃতিষ্টি রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর স্মলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষণ করে না। প্রাচীনদিগের গান্ধীর্ষ্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর, ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেনুয়েল জনসন কর্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা, কিন্তু বিগুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খৃঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজি শব্দ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্ত পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাতিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জনসন, তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকের স্থানীয় অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, অভিধানে কেবল বিগুদ্ধ অর্থবোধক ইংরাজী শব্দের সংকলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশ মাত্রই সমাজের আদরণীয় হইয়া অত্যাধিক ইংরাজী ভাষার “মাগ্নাচার্টা” হইয়া, পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

জরমানদিগের ভাষার আত্মোপাস্ত জন্ম বৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্ত-ক্ষেপণ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্কবিতর্ক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে উচিত কি না, তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ সমূহ প্রয়োগ পূর্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অথচ রুঢ়, স্থানীয় কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্ষমতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালী-বদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বোধ হয়। বাঙ্গালায় এমত কোন সর্বজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্ত হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকেরও এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জনসন সদৃশ কোন ব্যক্তি সকলন পূর্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্ত সকল বাঙ্গালীর মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করত তদ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-দেশের পরমোপকার হইবেক, সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষাপ্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ এবং এ দেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গ একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা রাজধানী, অতএব আদিসভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্যের তথায় বাস করা আরম্ভক। অপর সভ্যগণ অন্ত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের জন্ত একটী গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্লরেন্টাইনদিগের স্থায় সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখকর হইতে পারে। কলিকাতায় এপ্রকার উদ্যানের অভাব নাই। এবং বুদ্ধিবিদ্যা-সম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাঙ্লাদজনক ও শুভকর

হইবেক । সুখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ পূর্বক দেশের কুশল সাধন করিতে পারে ।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কৰ্ম । অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই । গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করিবেন । এমতে সাহিত্যের ক্রমে নিম্নলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক । সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে । এবং প্রাচীন কবি-গণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচন সহকারে সঙ্গীতেরও উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক ।

প্রথম উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচারের আবশ্যক । ঈশ্বর প্রসাদাৎ সম্প্রতি কলিকাতায় এবং দেশান্তরে পল্লীগামেও ইহার অভাব নাই । সভার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার এই হইবে যে, ঐক্য এবং প্রীতিবন্ধনে সকলে বাঁধা থাকিবেন, এবং একতাবলে বলিষ্ঠ হইবেন । পল্লীগামস্থ পণ্ডিতেরা মফঃস্বলে কোন কথা প্রচলিত থাকিলে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কি না এবং সংস্কৃত যে যে শব্দ সহজে অর্থ বোধক হইবেক, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন । বঙ্গভাষা অপার । ইহা প্রণালীবদ্ধ করা মহৎকার্য্য মনে করিলে আনন্দ হয় ।

অধিকাংশ সঙ্গ্যগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন হিতৈষী এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক । অনেক উৎসাহশীল এবং বঙ্গ হিতৈষী ইংরাজ মহাত্মা আগ্রহ সহকারে এবিষয়ে উৎসাহদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । ভরসা হয়, সভা স্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম গৌরবান্বিত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সভার অধিপতি পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন ।

— ০ —

যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স সাহেব কর্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে । ইহা প্রচারিত হইবার পূর্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম । বীম্‌স সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । তাঁহার কৃত প্রস্তাব যে পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য । তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই । আমরা ভরসা করি যে সকল বঙ্গ-পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন । তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব । ইতি । বঙ্গদর্শন সম্পাদক ।

— ০ —

খনা ও লীলাবতী ।

[ত্রীমতীশচক্র সিদ্ধান্তভূষণ ।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষে খনা ও গণিতশাস্ত্রে লীলাবতী অসাধারণ বিদ্বাণী ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিম্বদন্তী মূল করিয়া অনেক গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, দেখা যাউক।

খনার সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে,—অবন্তিদেশে (উজ্জয়িনী নগরে) রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় বরাহ নামে এক অলোকসামান্য প্রতিভাশালী জ্যোতিষী ছিলেন; তাঁহার পুত্র মিহির; এই মিহিরের স্ত্রী খনা। খনা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় ঋগুরকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। ঋগুর বরাহ আত্মমর্যাদাহানিভয়ে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া পুত্র মিহির দ্বারা পুত্রবধুর বধ সম্পাদন করেন।

বরাহ, মিহির এবং খনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের উজ্জলতম রত্ন বরাহমিহির অবন্তিদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তিনি লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক, বিবাহপটল, সমাসসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, যোগযাত্রা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা এই কয়খানি গ্রন্থ লিখিয়া অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক, বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে। অত্র গ্রন্থগুলি মুদ্রিত না হইলেও নিতান্ত দুশ্রাপ্য নহে। বরাহমিহির বৃহজ্জাতকের শেষে [২৬শ অধ্যায়ে] আত্মপরিচয় স্থলে বলিয়াছেন—

আদিত্যদাসতনয়স্তদ্ব্যাপ্তবোধঃ

কাপিথকে সবিতুলকুবরপ্রসাদঃ ।

আবন্তিকে। মুনিমতান্তবলোক্য সম্যগ্-

ঘোরাং বরাহমিহিরো। কচিরাং চকার ॥

আদিত্যদাসের পুত্র অবন্তিদেশীয় আচার্য বরাহমিহির পিতার নিকট শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া কাপিথক গ্রামে উপাসনা দ্বারা ভগবান্ সূর্যদেব হইতে বরলাভ

করিয়া মুনিদিগের মত সম্যক্ অবলোকন করতঃ মনোজ্ঞ হোরাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । কাপিথক স্থলে কাম্পিল্লক পার্বাস্তুরও দেখিতে পাওয়া যায় ।

বৃহজ্জাতকের ভট্টোৎপল, মহীধর ও মহাদেবকৃত টীকা প্রসিদ্ধ আছে । একটি কেরলী টীকাও আছে । এই কেরলী টীকায় দশমাধ্যায়ের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে—“তথাচার্য্যপুত্রোগোক্তং—ষোষোভাবঃ স্বামিদৃষ্টো যুতো বা” ইত্যাদি । এই বচনটি পৃথুষশঃকৃত ষট্‌পঞ্চাশিকায় দেখিতে পাওয়া যায় । পৃথুষশাঃ নিজেও ষট্‌পঞ্চাশিকার প্রারম্ভেই নিজকে বরাহমিহিরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । ষট্‌পঞ্চাশিকার প্রথম শ্লোক এইরূপ—

“প্রণিপত্য রবিং মূর্ধ্ন। বরাহমিহিরান্নজেন পৃথুষশসা ।

প্রশ্নে কৃতার্থগহনা পরার্থমুদ্दिशा सदृशसा ।”

পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অহর্গণানয়ন প্রকরণে “সপ্তাশ্বিবেদসংখ্যাং শককালমপাস্ত্র” ইত্যাদি বচন হইতে আমরা জানিতে পারি—৪১৭ শকে [৪৯৫ খৃঃ অঃ] পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচিত হইয়াছিল ।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় বরাহমিহির ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন উক্তি নাই । কালিদাস * স্বকৃত জ্যোতির্বিদ্যাতরণে [২২শ অধ্যায়ে] বিক্রমাদিত্য সভাবর্ণনে বরাহমিহিরকে বিক্রমাদিত্য সভার একতম রত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

পরবর্তী গ্রন্থকারদের নিকট বরাহমিহির বরাহনামেও পরিচিত ছিলেন । সংগ্রহকারগণ “তথাচ বরাহঃ” বলিয়া বরাহমিহিরের বচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন । বৃহৎসংহিতা অষ্টাপি বরাহসংহিতা নামে পরিচিত ।

বরাহমিহির খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অবস্থিদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি আদিত্যদাসের পুত্র এবং পৃথুষশার পিতা । তিনি বরাহ নামেও পরিচিত ছিলেন । এই ঐতিহাসিক তথ্য সপ্রমাণ হইল । সংস্কৃত সাহিত্যে বরাহমিহির ভিন্ন বরাহ নামে আর কোনও জ্যোতির্বিদের পরিচয় পাওয়া যায় না ।

বঙ্গভাষায় রচিত খনার যে সকল বচন আছে, তাহার সকলগুলি এক সময়ে রচিত নহে, ইহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন । কতকগুলি বচন প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত হইলেও আধুনিক

* এই কালিদাস প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস হইতে ভিন্ন । ইনি ১১৩৪ শককে [১২৪১ খৃঃ অঃ] জ্যোতির্বিদ্যাতরণ রচনা করিয়াছিলেন ।

বাঙ্গালার লিখিত বচনও নিতান্ত অল্প নহে। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে অবস্থি-
দেশে কোন বিদ্বাণী রমণীর বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা প্রবৃত্তি কতদূর যুক্তিসহ
তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা
ভাষার কি আকার ছিল তাহা অপরিজ্ঞাত হইলেও নিতান্ত অননুমেষ্য নহে।
অবস্থিদেশে বর্তমান সময়েও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা নাই। বঙ্গদেশের বাহিরে
খনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতিও নাই। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই
বুঝা যায়, খনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে যখন যিনি কোন সংক্ষিপ্ত ও সরল নিয়ম আবিষ্কার
করিয়াছেন, তখন তিনিই সেই নিয়ম বাঙ্গালা ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিয়া লোক-
সমাজে খনার নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন; অনেকেই এইরূপ মত প্রকাশ
করিয়া থাকেন। খনার নামে এই সকল বচন প্রচারিত হইল কেন তাহা
জানিবার কোন উপায় নাই।

লীলাবতী সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে,—প্রসিদ্ধ
জ্যোতির্বিৎ ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামে এক বালবিধবা কণ্ঠা ছিলেন।
তিনি পিতার নিকট জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সংস্কৃত
সাহিত্যে সুপরিচিত “লীলাবতী” ও “বীজগণিত” নামক প্রসিদ্ধ গণিত পুস্তকদ্বয়
রচনা করেন। বাঙ্গালীগণ এই রমণীর নামে বিশেষ গর্ব অনুভব করিয়া
থাকেন, অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থেও এই গর্বের পরিচয় পাওয়া যায়। “লীলাবতী”
ও “বীজগণিত” যদি প্রকৃতই লীলাবতী নাম্নী কোন বিদ্বাণী রমণীর রচিত হয়
তবে বাস্তবিকই গর্বের বিষয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে ভাস্করাচার্য্যকৃত পাটীগণিত গ্রন্থের নামই “লীলাবতী” ইহা
লীলাবতী প্রণীত নহে। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” গ্রন্থের
চারিটি খণ্ড; তাহার প্রথম খণ্ড লীলাবতী, দ্বিতীয় খণ্ড বীজগণিত, তৃতীয় খণ্ড
গণিতাধ্যায় এবং চতুর্থ খণ্ড গোলাধ্যায় নামে অভিহিত। লীলাবতী গ্রন্থের
প্রারম্ভে গ্রন্থকারের নাম নাই, গ্রন্থশেষে—“ইতি শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য্যবিরচিত
সিদ্ধাশিরোমণ্যন্তর্গত লীলাবতী সংজ্ঞক পাটীগণিতাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ” এই পরিচয়
আছে। “লীলাবতী” লীলাবতীরচিত বলিয়া কেবল বঙ্গদেশেই জনশ্রুতি,
অন্তত্র ভাস্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে।

• “লীলাবতী”র দুইটি উদাহরণে লীলাবতীর সম্বোধন আছে, * অত্যাঙ্গ

* ‘অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতি ক্রহি সহিতান্’ ইত্যাদি [সম্বলব্যবকল উদাহরণ]।

‘বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি প্রোচ্যতাং’ ইত্যাদি [গুণন উদাহরণ]।

উদাহরণে সখে, মিত্র, বালে, গণক, বৎস, নন্দন, ইত্যাদি সম্বোধন আছে। গ্রন্থের নাম “লীলাবতী”, নমস্কার শ্লোকেও স্পষ্টভাবে লীলাবতী শব্দের প্রয়োগ আছে *। ইহা দ্বারা লীলাবতী নামী কোন রমণীর সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। এই বিষয়ে পশ্চিমদেশে তিনটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—

(১) ভাস্করাচার্য স্বীয় কন্যা লীলাবতীর জন্মকুণ্ডলীতে বৈধব্য যোগ দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দেন নাই; এবং তাঁহার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্ত স্বরচিত পাটীগণিতের নাম লীলাবতী রাখেন।

(২) ভাস্করাচার্যের স্ত্রী লীলাবতী বক্ষ্যা ছিলেন; তাঁহার নামের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত গ্রন্থের নাম “লীলাবতী” হয়।

(৩) ভাস্করাচার্যের অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তদীয় অধ্যাপক নিজ কন্যা লীলাবতীকে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। লীলাবতীও মনে মনে ভাস্করাচার্যাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া ছিলেন। ভাস্করাচার্য “গুরুপুত্রী সহোদরতুল্যা” মনে করিয়া সেই সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন। লীলাবতী সতীত্ব হানিতরে অন্য পতি গ্রহণ করেন নাই। ভাস্করাচার্য ইহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্তই স্বরচিত গ্রন্থের নাম “লীলাবতী” রাখিয়াছিলেন।

ডাক্তার ভাউদাজী কর্তৃক নাসিকে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে ভাস্করাচার্যের পুত্রপৌত্রাদির অস্তিত্ব জানা যায়। অতএব দ্বিতীয় জনশ্রুতি অমূলক। প্রথম ও তৃতীয় জনশ্রুতির মূলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি সমূলক হইলেও একটিই সত্য হইবে, পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তিনটিই সত্য হইতে পারে না। কোন জনশ্রুতিতেই লীলাবতীর বিদ্যাবত্তা বা গ্রন্থকর্তৃত্বের প্রমাণ নাই।

শিশুকালে খনা ও লীলাবতীর গল্প শুনিয়া মনে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতাম। খনা সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত দুই একখানি ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠ করিয়া মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, অবস্তিদেশীয়া রমণী বাঙ্গালা ভাষায় রচন লিখিলেন কেন? পরে বৃহজ্জাতক ও ষট্‌পঞ্চাশিকা অধ্যয়ন কালে

* ‘ঐতিং ভক্তজনন্ত বো জনয়তে বিদ্বং বিনিদ্বন্ স্মৃত

ভং বৃন্দারকবৃন্দবসিতপদং নদ্বা মতজ্ঞাননম্ ।

পাটীং সমুপণিতস্ত বচমি চতুরঐতিপ্রদাং প্রস্কুটাং

সংক্ষিপ্তাকর কোমলামলপদৈ লীলিত্যলীলাবতীম্ ॥’

কার্তিক, ১৩২৪] পক্ষী ও পতঙ্গ জাতির বিকাশের ভেদ । ৩২৫

বরাহমিহিরের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিয়া সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হয় । লীলাবতী ও বীজগণিত অধ্যয়ন সময়ে লীলাবতীর জনশ্রুতি সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয় । এই সন্দেহদ্বয় আমার মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া দেয় । অনুসন্ধিৎসা পরতন্ত্র হইয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিলাম ।

এই বিহ্বীষণের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পাঠকগণ হতাশ হইতে পারেন, আমিও তাঁহাদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু সত্যের গোপন করিতে পারি না । অনেক স্থলেই কবিকল্পিত সুবর্ণমন্দির ঐতিহাসিকের কঠোর কুঠারাঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, ইহা চিরন্তন প্রথা । আমি ঐতিহাসিক নহি, কোতূহলের বশবর্তী হইয়াই ইহার ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ।

পক্ষীজাতি ও পতঙ্গ জাতির বিকাশের ভেদ ।

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্ এ ।]

পক্ষী উড়িতে পারে, পতঙ্গ উড়িতে পারে, স্মতরাং উভয়ই একজাতি ইহাই যে সাধারণ ধারণা হইবে তাহা বিচিত্র নহে । কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, পক্ষী ও পতঙ্গ কেবল যে জীবন-ব্যাপারেই ভিন্ন তাহা নহে, পরস্তু মূল বিকাশেও ভিন্ন ।

পক্ষী ও পতঙ্গ যে একজাতি নহে, তাহাদের দেহের মূল গঠনই ইহার অন্যতর প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে । পক্ষী মেরুদণ্ডী জীব, কিন্তু পতঙ্গ অমেরুদণ্ডী জীব ।

পক্ষী ও পতঙ্গের জন্মেও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । পক্ষী ডিমে তা দিলেই ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে শাবক বহির্গত হয় । পতঙ্গের ডিমে তা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না । আপনা হইতেই ডিম ফুটিয়া শাবক নির্গত হয় ।

শাবকের লালন-পালনেও, পতঙ্গ, পক্ষীর অনুরূপ নহে । পক্ষীর শাবককে কিছুকাল পিতামাতা আহার যোগাইয়া প্রতিপালন করিয়া থাকে, পতঙ্গ-শাবক পিতামাতার সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজের আহার নিজে যোগাড় করিয়া লয় ।

পক্ষী ও পতঙ্গের পক্ষগঠনও একরূপ নয় । পক্ষীর পাখাতে যেরূপ পালক

বা রোম গুরে গুরে সজ্জিত দেখা যায়, পতঙ্গের পাখায় সেরূপ পালক সজ্জিত দেখা যায় না। পতঙ্গের পাখা কাগজের ন্যায় একটীমাত্র পাতলা আবরণ। ইংরেজী পতঙ্গের বিশেষ জাতিবাচক যে “Hymenoptera” নাম পাওয়া যায়, তাহা পাতলা আবরণের অর্থই প্রকাশ করে।

পতঙ্গজাতির উৎপত্তির মূল রহস্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কীটই পতঙ্গের মূলজাতি। শৈশবে অনেক পতঙ্গই কীটরূপে বর্তমান থাকে; বয়স্ক হইলেই ইহাদের পক্ষ উদ্গত হয়। আমাদের “কীট পতঙ্গ” কথায় ‘কীট’ ও ‘পতঙ্গ’র নাম যে এক সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে, তাহা কীটের সহিত পতঙ্গের উল্লিখিত জন্মগত সম্বন্ধ হইতে হইয়াছে বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়।

পতঙ্গের জন্ম সম্বন্ধে আর একটা সত্য এই যে, ডিম হইতে পতঙ্গের জন্ম হইলেও এই ডিমে তা দেওয়ার আবশ্যকতা হয় না, ইহা সূর্যোত্তাপের দ্বারা আপনিই ফুটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“ইহারা কোথাও বৃক্ষপত্র, কোথাও বা অণ্ড প্রসব করে। প্রসবের পর গর্ভিণী মরিয়া যায়। জগদীশ্বরের কৃপায় সূর্যের উত্তাপে ঐ ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।”

পক্ষীর উৎপত্তি ও পাখার গঠনের সহিত পতঙ্গের উৎপত্তি ও পাখার গঠনের তুলনা করিলে ইহাদের প্রথম বিকাশের কোতুকাবহ রহস্যই আবিষ্কৃত হইতে পারে। পক্ষীর ডিমে তা দ্বারা ছানা ফুটান এবং পতঙ্গের সূর্যোত্তাপে ছানা ফুটা এই পৃথক প্রক্রিয়া হইতে পক্ষী যে সূর্যের অল্প সম্পর্ক বিশিষ্ট স্থানে বা শীতপ্রধান স্থানে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পতঙ্গ সূর্যের অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পর্ক বিশিষ্ট স্থানে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অনুমিত হয়। ইহাদের পাখার গঠনের পার্থক্য হইতেও আমরা উপরিউক্ত তথ্যই লাভ করিতে পারি। পক্ষী আদিতে শীত-প্রকৃতিক স্থানে জাত বলিয়াই ইহার পাখা ঘনসন্নিবিষ্ট পালকচ্ছাদিত হইয়াছে, আর পতঙ্গজাতি উষ্ণপ্রকৃতিক স্থানে জাত বলিয়াই ইহার পাখা পাতলা আবরণযুক্ত হইয়াছে।

শীতকালে যে পতঙ্গজাতি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানেও বিরল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে যে ইহাদের সাবিশেষ বাহুল্য লক্ষিত হয়, ইহাতেও প্রকৃতির উষ্ণপ্রভাবই যে পতঙ্গজীবনের বিশেষ অনুকূল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কার্তিক, ১৩২৪]° পক্ষি ও পতঙ্গ জাতির বিকাশের ভেদ। ৩২৭

পক্ষী ও পতঙ্গজাতির দেহে যে যথাক্রমে রক্ত ও রসের সঞ্চয় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাহাদিগের উৎপত্তির আদিতত্ত্বই আমাদিগকে জ্ঞাপন করে। পক্ষীর রক্ত উষ্ণ সুতরাং শীতপ্রধান স্থানে ইহার প্রথম উৎপত্তি বলিয়া শীত হইতে রক্ষার জন্য ইহার রক্ত যে উষ্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। পতঙ্গের দেহে রক্তের পরিবর্তে রস। ইহা শীতল ও তরল। উষ্ণপ্রধান স্থানজাত বলিয়া শীতল রসই ইহার দেহধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

পক্ষী ও পতঙ্গের বাসস্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পক্ষী নীড় নির্মাণ করিয়া বাস করে, কিন্তু পতঙ্গ, বাসের জন্য কোন নীড় নির্মাণ করে না। ইহাতেও পতঙ্গকে উন্মুক্ত ও উষ্ণ স্থানের জীব বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

পতঙ্গের সহিত উদ্ভিজ্জ রাজ্যের সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণ করিলেও ইহা যে উষ্ণ স্থানেরই জীব, তৎসম্বন্ধে কম সন্দেহই থাকে। পত্র ও পুষ্প পতঙ্গের কেবল পোষণ করে তাহা নহে, কিন্তু পতঙ্গকে আশ্রয়ও দান করে। তৃণ হইতে গুল্ম, লতা, বীকৃধ, বৃক্ষ প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভিজ্জরাজ্যই পতঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্পের মধুপান ও পরাগভক্ষণ দ্বারা পতঙ্গকে জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া পুষ্পবৃক্ষের সহিত যেমন পতঙ্গের বিশেষ যোগ হইয়াছে, তেমনই পতঙ্গ-~~সঙ্গে~~ পুষ্পে বীজোৎপাদন হয় বলিয়াও পতঙ্গের সহিত পুষ্পবৃক্ষের বিশেষ সম্পর্ক হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জরাজ্যের বিশেষতঃ পুষ্পজাতীয় উদ্ভিজ্জের গ্রীষ্মপ্রধান স্থানেই বিশেষ সমৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। শীতপ্রধান স্থান বিশেষতঃ মেরুপ্রদেশ উদ্ভিজ্জজীবনের পক্ষে অনুকূল নহে, তথায় উদ্ভিজ্জের যেমন অসম্ভাব দৃষ্ট হয়, পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদের তেমনই একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদের ফুলের দ্বারা পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, আর ফলের দ্বারা পক্ষী আকৃষ্ট হয়। এইরূপে পতঙ্গের দ্বারা ফুলের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়, আর পক্ষীর দ্বারা ফলের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদ প্রায়ই অল্পচ বলিয়া পতঙ্গজাতি ইহাদিগের মধ্যেই বিহার করে। পক্ষান্তরে পক্ষিজাতি উচ্চ বৃক্ষে বিহার করে। এইরূপে পতঙ্গজাতি আকাশের নিম্নপ্রদেশের জীব, আর পক্ষিজাতি উর্দ্ধপ্রদেশের জীব হইতেছে। পক্ষিজাতির 'বিহগ', 'খগ' নাম তাহাদের উর্দ্ধবিচরণ হইতেই হইয়াছে। "পতন্ সন্ গচ্ছতি" পড়িতে পড়িতে যায়, পতঙ্গ নামের এইরূপ

ব্যুৎপত্তি দ্বারা ইহার উদ্ভবন ক্ষমতা যে কম তাহাই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ পতঙ্গের পক্ষ ও পক্ষীর পক্ষের তুলনা করিলে পক্ষীর পক্ষ পতঙ্গের পক্ষ অপেক্ষা যে অনেকগুণ দৃঢ় এবং উর্দ্ধ ও দূরপ্রদেশে উদ্ভবনের অধিক উপযোগী তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অন্যদিকে পতঙ্গের আবার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে রৌদ্রে প্রসিদ্ধিত হইয়া পক্ষিজাতি যখন কুসারে বা নিবিড় পত্ররাজি মধ্যে লীন হইয়া অবস্থান করে, পতঙ্গ সকল তখন পক্ষ বিস্তারকরতঃ সূর্য্যকিরণে বিচরণ করিতেই আনন্দানুভব করে, এবং সূর্য্যদেবও তখন পতঙ্গদিগের উপভোগের জন্যই যেন পুষ্প সকলকে বিকশিত করিয়া দিয়া ইহাদিগের সহিত পতঙ্গদিগের ক্রীড়া ও বিহারের সুযোগ সজ্জা করিয়া দেন।

সূর্য্যের এক নাম যে 'পতঙ্গ' পাওয়া যায়, তাহা বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা পরিকল্পিত বলিয়াই আমরা মনে করি। সূর্য্য উত্তাপের দ্বারা পতঙ্গ জাতির ডিম ফুটাইয়া ইহাদিগের জীবনদান করেন, তাহাতেই তিনি পতঙ্গ জাতির জীবনদাতা বলিয়া তাহাদিগের পতঙ্গ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। অপরন্তু সূর্য্য ও পতঙ্গ উভয়ই পূর্ণের সৌন্দর্য্যবিস্তারে উভয়ের সহযোগী, সুতরাং সূর্য্যও পতঙ্গেরই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কণ্ঠহার ।

(১)

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল।]

যুবতী সুন্দরী—অসামান্য সুন্দরী ! সে তীব্র সৌন্দর্য্য-সুধাপানে পুরুষের চিত্তচকোর উন্মত্ত হইয়া উঠে। বর্ষাসমাগমে নবপল্লবিত বৃক্ষের শ্রায় যৌবনের ভারে তাহার সমস্ত শরীর নূতন মাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে মাধুর্য্য অলৌকিক হইলেও, দিব্য আভামণ্ডিত বলিয়া মনে হয় না। তাহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শয়তান যে সব স্ত্রীলোককে পৃথিবীতে প্রেরণ করে, তাহাদের একরূপ সুন্দরী করিয়াই পাঠায়।

যুবক তাহাকে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। সে ভালবাসার কোনও সীমা ছিল না ; সে ভালবাসা তাহার সিদ্ধির পথে কণ্ঠকন্ডরূপ কোনও

পার্থিব বাধাবিহীন গ্রাহ্য করিত না। সে ভালবাসা আনন্দের অঙ্ঘ্রিবেণে বৃথা কঠোর পরিশ্রম করিয়া শেষে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্খলনে ছুঃখকেই শিয়রে বরণ করিয়া লয়। বোধ হয়, গত জন্ম-জন্মান্তরের কোনও ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার কোমল সরস প্রাণে একরূপ প্রেম-মরীচিকার সৃষ্টি হইয়াছিল।

যুবতী অপরাপর বিষয়ে তাহার দলের অন্যান্য স্ত্রীলোকের ছায় সমভাবাপন্ন না হইলেও, তাহাদের ছায় সেও বড় বিলাসিনী ও অব্যবস্থিতচিত্ত। তাহার মানস-সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ছায় মুহূর্তের মধ্যে শত শত সাধ উদ্ভিত ও লীন হইতেছে। যুবকও বুদ্ধিমান ও সাহসী, কিন্তু মায়াবিনীর মায়াজক্রতলে নিম্পেষিত হইলে, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়; তাহার উপরে উঠিবার আর কোনও স্থামর্থ্য থাকে না। প্রণয়িনীর চিত্রাঙ্কিতবৎ আকর্ষণ বিস্তৃত নীলাভ পদ্মনেত্র ছুটির দিকে চাহিলে, তাহার সহজবুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায়; যুবক একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়।

(২)

যুবতীকে একদিন কাঁদিতে দেখিয়া যুবক কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—

“একি, কাঁদছো কেন?”

যুবতী চোখের জল মুছিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। মুহূর্তপরেই আবার সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যুবক বিস্মিত নেত্রে তাহার সম্মুখীন হইয়া সাদরে তাহার হাত ধরিল। যুবতী তখন ঘরের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া স্রোতস্বিনীর খরপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছিল। যুবক স্নেহার্জকণ্ঠে পুনর্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন কাঁদছো, বল না?”

ক্ষুদ্র বাড়ীখানির পাদদেশ ধৌত করিয়া নদী ফুলিয়া ফুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেউগুলি নদীবক্ষে উথিত হইয়া ক্রমে তীরের উপর সশব্দে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সূর্য্যদেব স্তবর্ণরশ্মি-মণ্ডিত নারিকেল বৃক্ষের শিখর দেশের পশ্চাতে ডুবিয়া গিয়াছে। গোধূলির ধূসর অন্ধকার রাশি নদীগর্ভ হইতে উথিত হইয়া কোমল স্তম্ভ আবরণ-বস্ত্রের ছায় মৃদুসমীরণভরে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ; কেবল নদীপ্রবাহের কল্কল, ছল্ছল শব্দ সে গভীর নীরবতার বক্ষে মধ্যে মধ্যে আঘাত করিতেছে।

যুবকের দিকে মুখ ফিরাইয়া যুবতী বীণাবিনিদ্রিত কণ্ঠে উত্তর করিল, “কেন কাঁদছি, ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি নিজেই জানি না,

কেন কাঁদছি, তোমাকে উত্তর দেব কি করে ! আর জবাব দিলেও তুমি তা বুঝতে পারবে না । স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে ফল্পনদীর গায় অনেক গুপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্রোত চক্ষুর অন্তরালে বয়ে যায় ; তার মর্মস্থল হ'তে যে গভীর দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে বাতাসে কম্পিত হয়ে উঠে, তা'তে তার কণামাত্রও প্রকাশ পায় না । আমাদের কল্পনানেত্রের সম্মুখে কত সোণালী রংয়ের সুখস্বপ্নের ছবি ভাসতে থাকে, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব । অনন্ত রহস্যময় নারী-চরিত্রের অবোধগম্য অসামান্য বৃত্তিসমূহের রহস্য-উদ্ঘাটন করবার উপযুক্ত ক্ষমতা ভগবান পুরুষ মানুষকে দেন নাই । তোমার পায়ে ধরি, এ দারুণ মর্ম-ব্যথার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করো না । সে কথা তুমি শুনলে, নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে, আমারও লজ্জার সীমা থাকবে না !”

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া যুবতী মাথা নীচু করিয়া রহিল । যুবক বিশ্বয়বিষ্কারিত নেত্রে পুনর্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“বল না, ব্যাপারটা কি খুলেই বল না । আমাকে কি তুমি এতই নীচ অপদার্থ ভাব যে, তোমার এত বড় একটা দুঃখের কারণকে আমি হেসে উড়িয়ে দেব ! এ পর্য্যন্ত আমার কোনও কাজে কি আমার বিষয়ে এ রকম কোনও ধারণা তোমার মনে আমি জন্মিয়ে দিয়েছি ?”

যুবতী কিয়ৎক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল । শেষে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—“তবে কি সে কথা শুনে তোমার এতই ইচ্ছা ? কিন্তু শুনে আমাকে উপহাস করতে পারবে না । এ গভীর মর্মবেদনা বরং সহ্য করতে পারছি, তোমার উপহাস কিন্তু তীক্ষ্ণ শরের গায় আমার অন্তরে গিয়ে বিধবে ।

“কাল সন্ধ্যায় মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরতি দেখতে গেছলাম । মায়ের মন্দির লোকে লোকাকীর্ণ । মন্দিরের মধ্যস্থিত দেবীপ্রতিমা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দেখতে হয়েছিল । কাঁশর ঘণ্টার শব্দে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠেছে । পুরোহিত মহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত সাক্ষ্য-আরতি সম্পন্ন করছিলেন । সে স্থানে তখন যেন একটা ভক্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো ।

“আমিও এক মনে চোখ বুঝে দেবীর আরাধনা করতে লাগলাম । একবার হঠাৎ চোখ চাহিতেই দেবীমূর্তির উপর নজর পড়িল । সেদিক হ'তে দৃষ্টি আর ফিরাতে পারলাম না । ঠিক যে প্রতিমার উপরই আমার লক্ষ্য পড়েছিল, তা নয়, তাঁর কর্ণদেশস্থ একটি দ্রব্যের উপর—পূর্বে সেটি আর কখনও দেখি”

নাই,—তার কি যে মোহিনী শক্তি তা বলতে পারি না, আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া লইল ! ভয়ে শিউরে উঠো না—জিনিষটা হচ্ছে মায়ের গলার কণ্ঠহার ! আমি জোর করে অণু দিকে চোখ ফিরালাম । পুনর্বার চোখ বুজে মায়ের আরাধনা করবার জন্ত চেষ্টা করলাম ; কিন্তু অসম্ভব ! আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল ! পোড়া চোখ দু'টা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে ফিরে কেবল সেইদিকেই ফিরে যেতে লাগলো । মন্দিরের ভিতরকার, ঝাড়ের আলো সেই কণ্ঠহারের উপর প্রতিফলিত হওয়ায়, উজ্জ্বল পাথরগুলো যেন আরও জ্বল জ্বল করছিল । নানাধর্ণের অসংখ্য উজ্জ্বল চঞ্চল আলোকরশ্মি—লাল, নীল, সবুজ, পীত—জ্বলন্ত অগ্নিকণার ঘূর্ণির ঞায়, অগ্নিময় প্রেতাত্মার বিহ্বল নৃত্যের ঞায়, সেই মহামূল্য রত্ননিচয়ের চতুর্দিকে নাচতে লাগলো !

“আমি মন্দির ত্যাগ করে বাড়ী ফিরলাম, কিন্তু সে চিন্তা মন হ’তে কিছুতেই দূর করতে পারলাম না । মুখে কিছু আহার আর রুচলো না ; জোর করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম ; কিন্তু পোড়া চোখে কিছুতেই ঘুম আর এলো না । রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে গেল ; অথচ সে চিন্তার ভার ভূতের ঞায় আমার ঘাড়ে চেপে রইলো ! ভোরের বেলা একটু তন্দ্রা এলে, তারপর—শুনলে কি তুমি বিশ্বাস করবে ? তন্দ্রার বোরে দেখলাম, এক সুন্দরী স্ত্রীলোক গলায় সেই কণ্ঠহার ছলিয়ে আমার সম্মুখে হাজির হলো । এ দেবীপ্রতিমা নহে—আমাদেরই ঞায় রক্তমাংসে গঠিত এক নারীমূর্তি । আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপসহকারে হাসতে লাগলো ; খানিকক্ষণ পরে তার কণ্ঠহারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমাকে বললে,—‘দেখতে পাচ্ছে, কেমন ঝকঝক জ্বলছে ! যেন নিদাঘের নিশীথে আকাশ হ’তে তারাগুলি সব চুরি করে কে যেন এ মালা গেঁথেছে । দেখতে পাচ্ছে ? এ হার গলায় পরা তোমার ভাগ্যে নাই, কখনও হবে না । এর চেয়ে বেশী মূল্যবান হার তোমার থাকতে পারে, কিন্তু এমন উজ্জ্বল রত্নখচিত—এমন সুন্দর—’ হঠাৎ আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল । কিন্তু সে স্বপ্ন তখনও আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো । তারই স্মৃতি জ্বলন্ত লৌহশলাকার ঞায় আজ দিনরাত আমাকে দগ্ধ করছে । শয়তানের একি পৈশাচিক লীলা ! একি, তুমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলে কেন ? আমায় পাগল ঠাওরাচ্ছ, নয় !”

• যুবকের মনের মধ্যে চিন্তার যে গভীর ঝড় বহিতেছিল, তাহারই আঘাতে বাহিরে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল । যুবতীর শেষ কথায় সে অবনত

মস্তক উন্নত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—“হায়, অপর কোন রমণীর গলায় সে কণ্ঠহার শোভা পায় নি কেন ? রাজার ভাণ্ডারে সে রত্ন থাকলেও নিস্তার ছিল না । রাণী যদি নিজের গলায় সে হার পরে থাকতেন, তাহ’লেও যে ভাল হতো ! শয়তান স্বহস্তে ধরে রাখলেও, নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও তোমার জন্ত সে হার আমি ছিনিয়ে কেড়ে আনতে পারতাম ! কিন্তু, হায় মা মঙ্গলচণ্ডীর গলা হ’তে—আমাদের গ্রামের আরাধ্যা দেবীর গলা হ’তে—আমি, আমার জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর—না, না,—সে অসম্ভব, অসম্ভব !”

যুবতী অশ্রুটস্বরে গুঞ্জন করিল,—“না, কখনই অসম্ভব হ’তে পারে না !” সে আবার মুখে হাত ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া একদৃষ্টিতে নদীর উর্নিমালার প্রতি তাকাইয়া রহিল । তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া তরঙ্গগুলি ধীরে ধীরে অট্টালিকার পাদদেশে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল । নিশাদেবী তারকাখচিত নীলাশ্বর পরিধান করিয়া প্রেমাম্পদের মিলন-আশায় অভিসারে ঘাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন ।

(৩)

মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মন্দির । চারিদিকে লোকালয় । গ্রামের মধ্য ভাগেই দেবীর প্রস্তুতনির্মিত মন্দির । গভীর নিশীথের ঘন অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া মন্দিরের নিকট এক মনুষ্যমূর্তির ছায়া দৃষ্ট হইল । এ কি, এ যে আমাদেরই সেই পরিচিত যুবক ! যে বিষয়ের চিন্তা মাত্রেই তাহার দেহ আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই কার্যে পরিণত করিবার এত সাহস তাহার কোথা হইতে আসিল ? প্রণয়িনীর জ্বালাময়ী উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য কি এতটা মনের জোর দিয়া দিতে পারে ? তাহার পদ্যকোরকবৎ নেত্রের দুই বিন্দু মুক্তাফলের কি এতই অসীম ক্ষমতা ? তাহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে ? কিন্তু সেই ত দাঁড়াইয়া—তাহার ভীষণ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে উত্তত ! তাহার চঞ্চল দৃষ্টিপাতে, গভীর দীর্ঘশ্বাসে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঘন কম্পনে, কপোলদেশে সঞ্চিত বুড় বুড় শ্বেদবিন্দুজালে, প্রাণের অব্যক্ত ভাষা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে !

যুবক একবারে চারিদিকে তাকাইল । নিকটে জনমানবের উপস্থিতির কোনও চিহ্ন নাই । মন্দিরটি এখন সর্বজন-পরিত্যক্ত । এক একদিন কোনও অভাগা বা অভাগিনী আত্মীয়স্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষায় দেবীর মন্দিরে হত্যা দিয়া

পড়িয়া থাকে । কিন্তু আজ আর সেখানে কেহই নাই । শয়তান আজ তাহার সহায় হইয়া এমন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে । চতুর্দিক নিস্তরু; কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য শৃগাল কুকুরের চীৎকার ধ্বনি সে গভীর নিস্তরুতা ভঙ্গ করিতেছে !

যুবক অনেকটা নির্ভয় অন্তঃকরণে অগ্রসর হইল । মন্দিরের উপর উঠিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল । নির্জন অন্ধকারময় স্থানেও মনুষ্য-কণ্ঠস্বরের গায় অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় । তাহা বোধ হয় বাতাসের মৃদুন্দ শব্দ, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, অথবা প্রকৃতিদেবীর অশরীরি আত্মার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ! যুবকের মনে হইতে লাগিল, তাহার সম্মুখে পশ্চাতে, আসে পাশে, মনুষ্যকণ্ঠের চাপা মৃদু স্বর । মনুষ্য গমনাগমনের ধীর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে । প্রতি মুহূর্ত্তেই কোনও অজানা বিপদের আশঙ্কায় সে চমকিয়া উঠিতে লাগিল ।

মন্দিরের দ্বারে তিনটি শক্ত চাবির তালা লাগান ছিল । যুবক তাহার জগু প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল । সে হস্তস্থিত লৌহশলাকার দ্বারা তালা ভাঙিয়া ফেলিয়া, ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর ঢুকিল । পূজারি সন্ধ্যা-আরতি শেষ করিয়া মন্দিরের ভিতর একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছে ! সেইটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে । এই গ্রামের বাজারে পঞ্চানন্দের বিগ্রহ আছে । গ্রামবাসীর বিশ্বাস, পঞ্চানন্দ দেব রাত্রে বিশ্রামার্থ দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তজ্জগুই রাত্রে মন্দিরের ভিতর একটি আলো জ্বালান থাকে । সেই ক্ষীণ আলোকে সে দেখিতে পাইল, দেবীর গলায় কণ্ঠহার জ্বল জ্বল জ্বলিতেছে !

আর তাহাকে পায় কে ? এবার এ অমূল্য ধন নিশ্চয়ই তাহার হস্তগত হইবে । প্রেমাস্পদের বদনকমলে আর বিষাদের রেখা তাহাকে দেখিতে হইবে না । এই কণ্ঠহার লইয়া গিয়া সে স্বহস্তে তাহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবে এবং যাহার জগু গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তাহার বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, প্রণয়িনীর অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা, সে পুরস্কার সে নিশ্চয়ই লাভ করিবে । তাহার দৃষ্টি হইতে পৃথিবীর অগ্ন্যাগ্ন সকল মূর্ত্তি, সকলু দ্রব্যই একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল, কেবল যুবতীর প্রেমনিরভারাক্রান্ত চিত্রাঙ্কিতবৎ নেত্রদুটি তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে লাগিল ।

• যুবক সাহসে ভর করিয়া দেবীমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল । কিন্তু, এ কি, তাহার পা যে নড়ে না ! তাহার মনে হইল, যেন পাষাণের

মেজের সহিত তাহার পা সংলগ্ন হইয়া গিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আতঙ্কে তাহার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। যেন একটা বরফের মত ঠাণ্ডা অস্থিচর্ম্মসার হস্ত তাহাকে অনিবার্য্য বেগে নড়িতে চড়িতে দিতেছে না। উন্মুক্ত দরজা দিয়া সে একবার বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। আকাশের তারাগুলি নিবিড় মেঘজালের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া এক বিরাট অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি গম্ভীরমূর্ত্তি—যেন আসন্ন প্রলয়ের পূর্বলক্ষণ! তাহার ধারণা হইল যেন দেবীপ্রতিমা, মন্দিরের ভিতরকার অগ্ন্যাগ্ন সকল দ্রব্যই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে আর শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাণহীন মন্দিরটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খাইতেছে!

যুবক জোর করিয়া পা চালাইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিক অন্ধকার—নির্ঝাণোন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরশ্মি অন্ধকারের অপেক্ষা আরও ভয়প্রদ বোধ হইল। যেন অসংখ্য ভীষণতায় নরমূর্ত্তিপূর্ণ জল্লাদপ্রসূত কোনও স্বপ্ন-রাজ্যে সে বিচরণ করিতেছে। সে প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া দেবীর মুখের দিকে তাকাইল। এ কি, এই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেও দেবীর প্রশান্ত বদনে যে গম্ভীর মূহু হাস্যরেখা ফুটিয়া রহিয়াছে! সে নির্ঝাক হাসি ক্ষণেকের জন্ত তাহার চিন্তালোড়িত মস্তিষ্কে শান্তি আনয়ন করিয়া পরক্ষণেই আবার ~~বিষ্ময়~~ ও ভয়ে তাহাকে আপ্পন্ন করিয়া দিল। একরূপ অদ্ভুত সর্বগ্রাসী ভয় সে জীবনে আর কখনও অনুভব করে নাই!

সে প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিল। দেবীপ্রতিমা হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহার কম্পান্বিত দক্ষিণ হস্তখানি সেদিকে প্রসার করিয়া দিল এবং পরমুহূর্ত্তেই কোনও ধনী ভক্তের পবিত্র দান সেই মহামূল্যবান কর্ণহার দেবীর কর্ণদেশ হইতে ছিনাইয়া লইল!

আর কি, ঈষ্পিত ধন ত তাহার হাতের ভিতর! তাহার কম্পান্বিত অঙ্গুলিগুলি অস্বাভাবিক জোরে সেটিকে ধরিয়া রহিল। এবার তাহাকে এ স্থান হইতে পলাইতে হইবে—ইহা লইয়াই চম্পট! কিন্তু চোখ তুলিয়া পথ দেখিয়া হইতে তাহার সাহস হইল না। দেবীপ্রতিমা বা মন্দিরাত্যন্তরস্থ অগ্ন্যাগ্ন দেবদেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তির দিকে সে তাকাইতে পারিল না। তাহার মনে হইল এই সব যেন রহস্যময় ভীতিপ্রদ ভীমকায় মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া মন্দিরের এক কোণে আসিয়া সমবেত হইতেছে।

ইঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া মন্দিরের আলোটা নিভাইয়া দিল।

তখন চোখ খুলিয়া সে একবার চারদিকে তাকাইয়া অমানি এক তীব্র আর্তনাদ মন্দিরকক্ষ বিকম্পিত করিয়া তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে উথিত হইল। একি, স্থানটি যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর জীবন্ত মূর্তিতে পরিপূর্ণ! তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সূচাক বেষে সজ্জিত হইয়া মন্দির-তলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাঁহারা আবার রোষকষায়িত নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেন?

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা কোথায় সব অদৃশ্য হইলেন। পরক্ষণেই তাহার মৃত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়াপ্রতিবেশীর প্রেতাশ্মা, ভীষণাকৃতি দৈত্য ও দানবের মূর্তি, রক্তলোলুপ হিংস্র জন্তুগণের সূক্ষ্ম দেহ তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া একে একে সব চলিয়া গেল।

সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দেহের শিরাউপশিরাসমূহ ঘন ঘন জোরে কাঁপিতে লাগিল। এক ঝলক রক্ত তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল। সে দ্বিতীয়বার চীৎকার করিয়া মেজের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সে চীৎকার ধ্বনি বড়ই কর্কশ, পৈশাচিক!

* * * * *

পরদিন প্রভাতে পূজারী মন্দিরে আসিয়া দেখিল, যুবক মেজের উপর ~~উঠিয়া~~ রহিয়াছে। তাহার চোয়ালে খানিকটা রক্ত বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কণ্ঠহার তখনও তাহার মুঠার ভিতর রহিয়াছে। পূজারীকে নিকটে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবক ভয়ঙ্কর অট্টহাস্ত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

“এ তা’র জন্য! তা’র জন্য! সে বড়ই কেঁদেছিল!”

যুবকের উন্মত্ত দৃষ্টি দেখিয়া ও প্রলাপ বাক্য শুনিয়া সবাই স্থির করিল যে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে!

পঞ্চভূত ।

(পূর্বানুবৃত্ত)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ।]

দুইটা পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, তিনটা দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু—এই ভাবে ক্রমশঃ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। পুঞ্জবাদী বৌদ্ধেরা এ ক্ষেত্রে শঙ্কা করেন যে, এইরূপ অসংখ্য কার্যকারণভাব স্বীকার না করিয়া বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকেই ত ঘটাদি দ্রব্য বলিতে পারি। পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া পরমাণুপুঞ্জাত্মক ঘটাদিরও প্রত্যক্ষ না হইক, এ কথা বলিতে পার না। প্রত্যেক পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও পরমাণুপুঞ্জের দৃশ্যত্ব অসম্ভব নহে। যেমন চক্ষুর দোষ জন্মিলে একটা কেশ দেখা যায় না, কিন্তু কেশসমূহ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। শ্রায়স্কন্ধ, ভাষা ও বার্তিক প্রভৃতি গ্রন্থে এই বৌদ্ধমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

“স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়শ্চ পটুমন্দভাবাদ্ বিষয়গ্রহণস্য তথাভানো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ ।”—৪।২।১৪

ইন্দ্রিয় নির্দোষ হইলেই জ্ঞান যথার্থ হয়, আর ইন্দ্রিয়ের দোষ জন্মিলে জ্ঞানও ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। যাহার চক্ষুঃ আগন্তুক দোষে দূষিত হইয়াছে, সে চক্ষুগ্রাহ্য কেশকেও দেখিতে পায় না, কিন্তু কেশগুচ্ছ প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আর যাহার চক্ষুর কোনও দোষ নাই, সে কেশরাশির শ্রায় প্রত্যেক কেশও দেখিতে পায়। কাজেই কেশ অতীন্দ্রিয় নহে। যাহার চক্ষুঃ খারাপ, সেও হয় ত চশমা পরিলে প্রত্যেক কেশও দেখিতে পায়। কিন্তু পরমাণু সেরূপ নহে,—তাহা কদাপি কাহারও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। তাই উদ্যোতকর ‘শ্রায়বার্তিকে’ বলিয়াছেন,—“পরমাণবস্তৃতীন্দ্রিয়া দর্শনবিষয়ত্বং ন প্রতিপদ্যন্তে ।” ইন্দ্রিয়ের এমন কোনও পটুতা নাই যে, তাহার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বস্তুও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। চক্ষুর সহস্র উৎকর্ষ থাকিলেও সে কখনও গন্ধ, রস বা শব্দের গ্রাহক হইতে পারে না। ভাষ্যকার বাৎশ্রায়ন বলিয়াছেন,—“চক্ষুঃ খলু প্রকৃষ্যমাণং নাবিষয়ং গন্ধং গৃহ্নাতি ।” বার্তিককার উদ্যোতকর ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। (১)

(১) “ন হি চক্ষুঃ প্রকৃষ্যমাণং রসং গৃহ্নাতি ।”—বার্তিক, ৫০৮ পৃঃ ।

“ন তু পটুতরং চক্ষুঃ শব্দং গৃহ্নাতি ।”—বৃত্তি, ২০৪ পৃঃ ।

সুতরাং যাহা একেবারেই অতীন্দ্রিয় পরার্থ, তাহার সমূহেরও কদাপি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তা'ই মহর্ষি, সূত্রে বলিয়াছেন,—“নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ।” বিশ্বনাথ, এই অংশের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—“তথা চ স্বাবিষয়ং পরমাণুং সমূহত্বাপন্নমপি কথং চক্ষুর্গৃহীয়াদিতি ভাবঃ।” কেশ কাহারও না কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, এই জন্ত তাহার সমূহেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু ঘটাদি বস্তু যদি পরমাণুপুঞ্জাত্মক হয়, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার অদৃশ্যত্বের আপত্তির নিরাস হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা স্বমত স্থাপনের জন্ত আর একটা দৃষ্টান্ত দেখায় যে, যেমন অতিদূরে একটা মনুষ্য বা একটা বৃক্ষ দেখা যায় না, কিন্তু সৈন্তবাহিনী বা অরণ্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, সেই রূপ পরমাণুপুঞ্জেরও দৃশ্যত্ব অনুপন্ন নহে। নৈয়ায়িকেরা পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারেই এ কথারও খণ্ডন করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

“সেনাবনাদিবদিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণ্ণনাম্।”—২।১।৩৬

প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, কাজেই পরমাণুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না— তাহা অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। মনুষ্য বা বৃক্ষে মহত্ব আছে, এই জন্ত তাহা অতীন্দ্রিয় নহে; দূরত্বাদি দোষ প্রতিবন্ধক ছিল বলিয়া একটা মনুষ্য বা একটা বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যসমুদায়রূপ সৈন্তবাহিনীর বা বৃক্ষসমূহরূপ অরণ্যের প্রত্যক্ষে দূরত্বাদি দোষের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করি না বলিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ হয়। উক্ত গৌতম-সূত্রের ব্যাখ্যায় ‘শ্রায়সূত্রবিবরণ’কার রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—“মনুষ্যবৃক্ষাদেচ প্রত্যেকং মহত্বেন প্রত্যক্ষত্বাৎ তথা প্রত্যক্ষশ্চ দূরত্বাদিদোষেণ প্রতিবন্ধাদনুৎপত্তিঃ সমুদায়ত্বেন প্রত্যক্ষে চ তদোষশ্চ প্রতিবন্ধকত্বাকল্পনাৎ তথা প্রত্যক্ষং জায়তে।” (শ্রায়সূত্রবিবরণ, ১০২ পৃঃ)

যদি এইরূপ শঙ্কা করা যায় যে, অনুমানরূপ প্রমাণবলে পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইবে; অনুমানের আকার এই,—‘পরমাণবো নাতীন্দ্রিয়া রূপাদিমত্বাৎ, ঘটাদিবৎ’—পরমাণু অতীন্দ্রিয় নহে, যে হেতু তাহার রূপ আছে, যাহার রূপ আছে, সে অতীন্দ্রিয় হইতে পারে না, দৃষ্টান্ত—ঘটাদি। এইরূপে পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইলে পরমাণুপুঞ্জাত্মক ঘটাদির আর অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না। এ শঙ্কার সমাধান এই যে, এই অনুমান নির্দোষ নহে, ইহাতে ‘উপাধি’ আছে। যাহা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর

অব্যাপক, তাহাকে উপাধি বলে (২) । এহলে 'মহত্ব'ই উপাধি । সাধ্য যেখানে আছে, সেখানে মহত্ব আছেই, কিন্তু হেতু পরমাণুতেও আছে, সেখানে মহত্ব নাই । যে স্থলে 'উপাধি' থাকে, সে হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী, তাহা অনুমিত হয় । আবার 'উপাধি'র অভাবকে 'হেতু' করিয়া 'পক্ষে' 'সাধ্য'র অভাবও সিদ্ধ হইয়া যায় । যথা,—'পরমাণুবোহতীন্দ্রিয়া মহত্বাভাবাৎ'—পরমাণু অতীন্দ্রিয়, যে হেতু তাহাতে মহত্ব নাই । কাজেই পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা আর সিদ্ধ হইল না । 'ত্ৰায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা'র বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, 'পরম সূক্ষ্ম বলিয়া পরমাণু প্রত্যক্ষের যোগ্য হয় না, সূতরাং তাহা মিলিত হইয়াও প্রত্যক্ষের গোচর হইতে পারে না ; পবনসমূহ মিলিত হইলেও তাহা কদাপি চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হয় না (৩) ।'

অবয়বাবয়বি-বাদের বিপক্ষে বৌদ্ধেরা আর একটা শঙ্কা করে যে, শরীরাদি বস্তু যে একটা অবয়বী, ইহা তুমি কিছুতেই বলিতে পার না । একটা বস্তুতে কখনও বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় থাকে না । কিন্তু হস্ত কম্পমান হইলেও শরীর নিষ্কম্প থাকে । এখন কম্পন আর কম্পনাভাব—এই বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের (শরীর যদি একটা অবয়বী হয়) একই শরীরে থাকা সম্ভবপর নহে । আর আমাদের মতে পরমাণুসমূদায়ই শরীরপদবাচ্য, কাজেই তাহার এক অংশে ~~দেহ~~ ও অল্প অংশে কম্পনাভাব থাকিতে পারে । এই কথার উত্তরে 'ত্ৰায়কন্দলী'র ~~বাবু~~ ~~শ্রীধরাচার্য্য~~ বলিয়াছেন, হস্তের স্পন্দন হইলেই যে শরীরের স্পন্দন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই । যখন হস্তমাত্র সঞ্চালনের কারণ উপস্থিত হয়, তখন কেবল হস্ত স্পন্দিত হইবে, আবার শরীর-ক্রিয়ার হেতু উপস্থিত হইলে শরীরও স্পন্দিত হয় । শরীর আর হস্ত ত এক বস্তু নহে,—শরীর অবয়বী, হস্তাদি অবয়ব । সূতরাং হস্তের স্পন্দনের সময়ে শরীর নিঃস্পন্দ থাকিলেও কোনও অনুযোগের কারণ দেখা যায় না (৪) । 'কণাদরহস্তে' শঙ্করমিশ্রও

(২) "সাধ্যস্ত ব্যাপকো বস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা ।

স উপাধির্ভবেৎ —————" ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৮ শ্লোক ।

(৩) "পরমাণবস্ত পরমসূক্ষ্মতয়া ন স্বরূপেণ গ্রহণার্থী ইতি মিলিতা অপি ন গ্রহীতব্যা এব, ন জাতু মিলিতা অপি পবনসমূহা ভবন্তি চাক্ষুসাঃ ।"—তাৎপর্য্যটীকা, ২৭৫ পৃঃ ।

(৪) "পাণৌ কম্পমানে শরীরকম্পাবশ্তাবনিয়মাত্বাৎ যদা পাণিমাত্রং চালয়িতুং কারণং ভবতি তদা তন্মাত্রং চলতি, ন শরীরং কারণাত্বাৎ, যদা তু শরীরস্তাপি চলনকারণং ভবেৎ তদা শরীরং চলত্যেব নাম্যাচলনমতীতি কুতো বিরোধঃ ।"—ত্ৰায়কন্দলী, ৪০ পৃঃ ।

এই ভাবের কথাই লিখিয়াছেন (৫) । অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, পরমাণু-পুঞ্জকে ঘট বলিলে তাহার অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় । পরমাণুতে মহত্ব নাই বলিয়া তাহা অতীন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় বস্তু মিলিত হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না ।

বিশ্ববিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, “স চ দ্বিবিধা । নিত্য চানিত্যা চ । পরমাণুলক্ষণা নিত্য । কার্যালক্ষণা অনিত্যা ।” ইত্যাদি প্রশস্ত-পাদ ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

“মহত্বং ন পরিমাণাস্তরং কিন্তু বিলক্ষণসংস্থানবস্তুমেব, তদেব চ দ্রব্যস্ত প্রত্যক্ষতয়াং প্রযোজকমতঃ প্রত্যেকপরমাণোরপ্রত্যক্ষত্বেহপি সংস্থান প্রভেদাবচ্ছিন্নস্ত তস্য প্রত্যক্ষত্বং নানুপপন্নমিতি তু নব্যবৌদ্ধাঃ ।”—(সূক্তি) ।

মহত্ব পরিমাণ নহে,—বিলক্ষণ সংযোগের নামই মহত্ব, ইহাই দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ । এই জন্ত প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও বিজাতীয় সংযোগবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জাত্মক ঘটের প্রত্যক্ষ অনুপপন্ন নহে—ইহাই নব্য বৌদ্ধদিগের মত । এই মতের উপর এরূপ আশঙ্কা করা যায় না যে, পরমাণু নিত্য, সূত্রাং ঘট পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশের প্রতীতি কেমন কল্পিয়া হয় ? কেন না, বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুই কণিক, কাজেই পরমাণুরও তাহারা উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করে । “তথা চ ত্রসরেণোর্মহত্বাৎ প্রত্যক্ষং ন তু দ্বাণুকাদেশুদভাবাৎ” ইত্যাদি “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাদেবভট্ট, পূর্বপ্রদর্শিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের উত্থাপন করিয়া দোষ দিয়াছেন যে, ঘটকে যদি পরমাণুপুঞ্জাত্মক বলা হয়, তাহা হইলে ‘ঘট’ ইত্যাকারক প্রতীতির বিষয়তা অসংখ্য পরমাণুতে স্বীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হয়, কাজেই অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে (৬) । এই ভাবে অবয়বী সিদ্ধ হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কাজেই তাহা অনিত্য । এই অবয়বধারা অনন্ত হইলে অর্থাৎ অবয়বাবয়বি-প্রবাহের কোথায়ও বিশ্রাম স্বীকার না করিলে পর্বত আর সর্ষপ উভয়েই অনন্তাবয়বাবয়ব বলিয়া তাহাদের তুল্য পরিমাণের আপত্তি হয় । অবয়বের সংখ্যার তারতম্যানুসারেই পরিমাণের তারতম্য হইয়া

(৫) পাণ্যবচ্ছেদেন যত্র চলত্বমুপলভ্যতে তত্র পাদাবচ্ছেদেনাচলত্বং তত্রাবয়বিনোহচলত্বম-বয়বস্য পরং চলত্বমবিরোধাত্ ।”—কণাদরহস্য, ১২ পৃঃ ।

(৬) “অত্র নাস্তিকানুযায়িনঃ...ইত্যাহঃ । তন্ন ঘট ইত্যাদি প্রতীতিবিষয়তয়া অনেক পরমাণু কল্পনে গৌরবাদি ত্যবয়বাত্তিরিক্তাবয়বিসিদ্ধিরিতি দিক ।”—মুক্তাবলী প্রকাশ, ১৪৮ পৃঃ ।

ধাকে । এখন পর্বত আর সর্ষপ উভয়ের অবয়বই যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে পর্বতের অবয়বের সংখ্যা আর সর্ষপের অবয়বের সংখ্যার কোনও বিশেষ থাকিল না । কাজেই সর্ষপের ও পর্বতের সমান পরিমাণ হউক । আপত্তির আকার এইরূপ,—“সর্ষপো যদি সাক্ষাৎপরম্পরাসাধারণমের্কারন্তকানুনাবয়-
বারকঃ শ্রাৎ এতাবৎপরিমাণাধিকপরিমাণঃ শ্রাৎ ।” অবয়বাবয়বি-ধারার বিশ্রাম স্বীকার না করিলে দ্ব্যণুক আর ত্রসরেণুরও তুল্য পরিমাণের আপত্তি হয় ; কেন না, ত্রসরেণুর শ্রায় দ্ব্যণুকও সাবয়বের দ্বারা আরক হইল । তা’ই—
“অনন্তাবয়বারকৃৎবিশেষেণ মেরুসর্ষপাদীনাং পরিমাণভেদানুপপত্তেঃ ।” ইত্যাদি ‘কিরণাবলী’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাবসরে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

“যদি দ্ব্যণুকং সাবয়বারকং শ্রাৎ মহৎ শ্রাদিতি মহত্বাপত্তিরেব তুল্যপরিমাণ-
ত্বাপত্তিঃ । যদ্বা দ্ব্যণুকত্রসরেণোঃ সাবয়বারকত্বেন তুল্যপরিমাণাপাদনে তাৎ-
পর্যাম্ ।”—(প্রকাশ) ।

[ক্রমশঃ ।

সাহিত্য ও সমাজ ।

(মিলনের অন্তরায়)

[শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।]

‘সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায়’ বিষয়ে ইতঃপূর্বে মৌলবী কেঃ, চাঁদ মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়ের এই পত্রিকায় মসীযুদ্ধ হইয়াছে । মৌলবী সাহেব সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায়ের জন্য বন্ধিম হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত হিন্দুলেখকগণকে দায়ী করিয়াছেন । রাখালরাজ বাবু যথাশক্তি প্রতিবাদ করিয়াছেন । শেষে সম্পাদক মহাশয় উভয়েরই সপক্ষে ও বিপক্ষে কিঞ্চিৎ বলিয়া আপোস-রফার ব্যবস্থা করিয়াছেন । ভালই । কিন্তু উহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর হইয়াছে কি না, আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই । চাঁদ সাহেব যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষেরই আছে । নবাবনন্দিনী কতলু খাঁর ছহিতা আসেসা কেন জগৎসিংহের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, বন্ধিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে তাহার সহস্রের পাওয়া যাইত । এখন এ সম্বন্ধে হিন্দুদের কৈফিয়ৎ

এই—উপন্যাস উপন্যাসই, উপন্যাস ইতিহাস নহে। ইহা ত গেল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষের কথা। কিন্তু কেঃ, চাঁদ সাহেব রবীন্দ্রনাথকে কেন যে হিন্দুলেখক-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রচলিত হিন্দু-সমাজের বিধিনিষেধ অমাত্য করিতে যিনি গৌরববোধ করেন, তিনি হিন্দু নহেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম যিনি মানেন না, তিনি ব্রাহ্মচার্য্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই করুন, আর গায়ত্রীর সাধনাই করুন, হিন্দু নহেন। ব্রাহ্মরাও হিন্দু-নামে পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করেন না, ইহা চাঁদ সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ ও দার্জিলিং পাহাড়ের কাহিনীটিকেও একই ধারার অন্তর্গত করিয়া আমরা বলিতে পারি—গল্প গল্পই, গল্প সত্যঘটনা নহে। অর্থাৎ, এ বিষয়ে ‘কাফের’ হিন্দুদের বলিবার কথা এই—ভাই মুসলমান, তোমাদের মনে আঘাত দিবার জন্ত আমরা কিছু লিখি নাই, তথাপি যদি তোমরা ইহাতে দোষ গ্রহণ কর, তবে আমরা নাচার।

কিন্তু আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা কিরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাও দেখা কর্তব্য। প্রথমতঃ, মুসলমান সমাজের মুখপত্র ‘মহম্মদী’তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের কথাই বলি। বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি ‘কনোজ-কুমারী’ নামে একখানি উপন্যাস আছে। উপন্যাস হিসাবে ‘কনোজকুমারী’র মূল্য কতটুকু বা কতখানি, না পড়িলে বলা যায় না। বিজ্ঞাপন পড়িলাম, বিজ্ঞাপনের বাহারটাই দেখুন।

“মোসলেম-বিষেধপূর্ণ বিবিধ পুস্তক পড়িয়া যাহারা (যাহারা)-মর্দাহত হইয়াছেন, তাহারা একবার কনোজকুমারী পড়িয়া দেখুন, শান্তি (শান্তি) পাইবেন। পত্রে পত্রে জাতীয় মহাত্ম্য (মাহাত্ম্য) ছত্রে ছত্রে মধু বর্ষণ। আর্ষাদিগের বিশাল ভারতবর্ষ কিরূপে মোসলেম পদানত হইয়াছিল ইহাতে তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বীরশ্রেষ্ঠ সোলতান মোহাম্মদ যোরীর ভারতবিজয়, হিন্দু স্বাধীনতার (স্বাধীনতার) অবসান, কনোজরাজ-ছহিতার আশ্চর্য্য প্রেম, কুতুবুদ্দিনের প্রেম প্রত্যাখ্যান, সূর্য্যসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা, পৃথ্বীরাজের ভ্রাতৃপুত্রী (?) হরণ ও শোচনীয় পরিণাম এবং অপূর্ব্ব মোসলেম মাহাত্ম্যপূর্ণ উপাদেশ উপন্যাস।”

এমন বিজ্ঞাপন পড়িয়াও আর কেহ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করিবার আশা করিতে পারেন কি? এই জাতীয় বিজ্ঞাপন হিন্দু বঙ্কিমের বা ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের কোনও উপন্যাসের বিক্রয়-বাহুল্যের জন্ত কোনও পত্রিকায় কেহ দেখিয়াছেন কি? কনোজকুমারী পাঠকের মনে

যে ভাবেরই রেখাপাত করুক, বিজ্ঞাপনটি যে হিন্দুবিদ্বেষপূর্ণ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'কনোজকুমারী'-তে পত্র পত্র জাতীয় মাহাত্ম্যই থাকুক, আর ছত্রে ছত্রে মধুই থাকুক, আমরা উহা না পড়িয়াও বিজ্ঞাপনদাতার কৃপায় (শাস্তি নহে) সাধনার পরিবর্তে শাস্তি পাইয়াছি। এখন ভিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, 'প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক' কনোজকুমারী-তে 'কনোজরাজহুহিতার আশ্চর্য্য প্রেম, কুতুবুদ্দিনের প্রেম প্রত্যাখ্যান, সূর্যাসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা, পৃথ্বীরাজের ভ্রাতৃস্পৃতী (?) হরণ ও শোচনীয় পরিণাম' থাকতেই কি উহা 'অপূর্ব মোসলেম মাহাত্ম্যপূর্ণ উপাদেয় উপন্যাস' হইয়াছে? 'অপূর্ব' অতি সহজেই হয়, কিন্তু মোসলেম মাহাত্ম্যপূর্ণ হইল কিরূপে? আমাদের বিশ্বাস, উপন্যাসলেখক যদি উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচারে মনোযোগী হইতেন, তবে হিন্দু ও মুসলমানের দোষগুণের বিচার হয়, উভয় জাতির মিলনের পথে কাঁটা পড়ে না। প্রতিশোধের চেষ্টার বিরোধ বাড়ে, মিলন সুদূরপর্যন্ত হয়। ঐতিহাসিক হউক বা না হউক, কোনও ঘটনাকে পল্লবিত না করিলে উপন্যাস জন্মে না। ইহা উপন্যাসলেখক বা বিজ্ঞাপনদাতা না জানিলেও অনেক উপন্যাস-পাঠক জানেন। কোনও উপন্যাস যদি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক হয়, তবে সেই 'প্রকৃত' ঘটনা ঐতিহাসিকের দৃষ্ট হইতে সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত অন্য ঐতিহাসিকের মতভেদ আছে কি না, তাহার মত প্রকৃত, কেন প্রকৃত, ইহাও বিজ্ঞাপনে দিলে ভাল হয়, অভাবে উপন্যাসের ভূমিকায় থাকা উচিত।

বলিতে ভুলিয়াছি, কনোজকুমারী উপন্যাস মহম্মদীর পুস্তকবিভাগে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের কথা ছাড়িয়া দেখা যাউক, মহম্মদীর সম্পাদকমণ্ডলী হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন। বিগত এই আশ্বিনের মহম্মদী হইতে 'বকর ইদ' প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বকর ইদ আগতপ্রায়। এই সময় কোরবানী উপলক্ষে দেশে হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় দেশের দূরদর্শী ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। কোরবানী মোসলমানের পক্ষে অপরিত্যজ্য ধর্ম্মকার্য্য। ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে মোসলমান সমাজ বৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও মর্মান্বিত হইয়া থাকেন। অবশ্য 'গো-বধ' হিন্দুধর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহার উহা দেখিলে মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন। সেইজন্য আমরা মোসলমান সমাজকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে অনুরোধ করি। যথাসম্ভব গোপনীয় স্থানে হিন্দুর চক্ষের আড়ালে 'কোরবানী'র চেষ্টা করা উচিত। বর্তমান সময়ে দেশে কোনপ্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, এরূপ কার্য্যে কোন পক্ষেরই যোগদান করা উচিত নহে।"—

ভাল কথা। মাত্র বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে কেন, ভবিষ্যতে শান্তির সময়েও যাহাতে দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়, দেশের দূরদর্শী নেতাদের সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইত। অতঃপর মহম্মদী হিন্দু ভ্রাতাদিগকে কি বলিতেছেন শুনুন।—

“এই উপলক্ষে হিন্দুভ্রাতাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি যে, মোসলমান তাহাদের মনে আঘাত দিবার জন্ত কোরবাণী করে না। ইহা তাহার ধর্মকার্য। হিন্দুভ্রাতারা আপনাদের শাস্ত্র ও সংস্কার অনুসারে প্রতিমা পূজা করিয়া থাকেন, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহার মিছিল বাহির করিয়া থাকেন, এসলামে ইহার স্থায় মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু মোসলমান তাহাতে বাধা দেয় না, স্থায় ও আইনের হিসাবে দিতে পারে না। ঠিক এইরূপ মোসলমানের গো কোরবাণী হিন্দুর নিকট পাপজনক হইলেও হিন্দুও স্থায় ও আইনের হিসাবে তাহাতে বাধা দিতে পারে না। হিন্দু যদি বলেন মোসলমান গো কোরবাণী করিলে আমার ধর্মের হানি হয়, আমার ধর্মভাব আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে এই যুক্তি অনুসারে মোসলমানও ত বলিতে পারে, হিন্দু প্রতিমা পূজা করিলে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রতিমার মিছিল বাহির করিলে আমার ধর্মভাবে গুরুতর আঘাত লাগে। অর্থাৎ গো কোরবাণী বন্ধ করিবার পক্ষে হিন্দুর দাবী ষতটা, প্রতিমা পূজা বন্ধ করার পক্ষে মোসলমানের দাবী তাহা অপেক্ষা বড় কই ছোট নহে। আশা করি, উভয় পক্ষ স্বদেশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইবেন।”

স্থায়, আইন আবার যুক্তি! তবে কি মুসলমানের গো-কোরবাণী বন্ধ করিতে হইলে হিন্দুর প্রতিমা পূজাও বন্ধ করিতে হইবে? সম্মুখে ছুর্গোৎসব— সমস্তা বটে!

ধর্ম যুক্তির শাসন মানে, কিন্তু আইনের শাসন মানে না। স্থায়, আইন ও যুক্তি এই তিনটি মানিয়া মুসলমান ভ্রাতারা সকল বিষয়ে চলেন কি না, তাহারাই জানেন; হিন্দুরা কিন্তু সকল বিষয়ে ঐ তিনটিকে মানে না, সেইজন্য চোর-পুত্র জেলে গেলে তাহার মাতাপিতা স্থায়, আইন ও যুক্তি অবহেলা করিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

গো-কোরবাণীতে বাধা দিলে মুসলমানের ধর্মকার্যে বাধা দেওয়া হয় বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা উচিত, বকরিদ পর্বে কোরাণের হুকুম মোতাবেক যে শ্রেণীর গাভী কোরবাণীর জন্ত নির্দিষ্ট আছে, অধিকাংশ মুসলমান ভ্রাতা তাহাই কোরবাণী করেন কি না। ধর্মকার্যের দোহাই দিয়া অধর্মের অনুষ্ঠান কি হিন্দু, কি মুসলমান কাহারও পক্ষে শোভন নহে।

• হিন্দুরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রতিমার মিছিল বাহির করেন, মুসলমানরাও

ঢোল-কাঁসী বাজাইয়া মহরমের মিছিল বাহির করেন। ঐ মহরমের মিছিলের সঙ্গে হিন্দুর ধর্মের আন্তরিক কোনই যোগ না থাকিলেও অনেক হিন্দু এই ব্যাপারে মুসলমান ভ্রাতাদিগকে সর্বাঙ্গতঃ করণে উৎসাহ দেয়। দেওয়াই উচিত। হিন্দুর প্রতিমার মিছিলের সঙ্গে গো কোরবাণীর তুলনাটি আদৌ সঙ্গত হয় নাই।

হিন্দুরা গাভীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে বলিয়াই মুসলমান ভ্রাতারাও তাহাই করুন, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু মুসলমান যেমন তাঁহার দেবতার প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন দেখিলে ব্যথিত হইয়েন, হিন্দুর পক্ষেও এই কথাটি খাটে। তথাপি বকরিদ পর্বে গুপ্তস্থানে গো-কোরবাণী করিলে তাহাতে বাধা দিতে যাওয়া বর্তমানকালে কোনও হিন্দুর পক্ষে উচিত নহে। দূরদর্শী হিন্দুরা এইরূপ ব্যাপারে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু দেশে যেমন অশিক্ষিত গুপ্তা হিন্দুর অভাব নাই, তেমনই অশিক্ষিত গুপ্তা মুসলমানেরও অভাব নাই। ঐ সকল হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মনে আঘাত দিতে গিয়া দাঙ্গা করে। ধর্মকার্য্য সম্পাদন করা উহাদের উদ্দেশ্য নহে, দাঙ্গা করাই উদ্দেশ্য। বিরোধপ্রিয় ঐ সকল হিন্দু ও মুসলমানের কার্য্যে বাধা দিলে, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মভাবে বাধা দেওয়া হয় না। গ্রাম, অহিংসা পদে পদে অবহেলা করার প্রবৃত্তি যাহাদের প্রবল, সেই হিন্দু বা মুসলমানের কোনও কার্য্যই প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত মুসলমান সমর্থন করেন না। মুসলমানের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোনও হিন্দুরই উচিত নহে, অপর পক্ষে হিন্দুর ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা কোন মুসলমানেরও উচিত নহে। কিন্তু যে দেশের হিত না হইয়া অহিতই হয়, তাহা বর্জন করা হিন্দুরও উচিত, মুসলমানেরও উচিত। বর্তমানকালে আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশে গোহত্যা নিবারণ উচিত কি অনুচিত, বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজ এ বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা স্বথী হইব। গো-মাংস বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরূপ কি না, সে সম্বন্ধে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত-গণের মতামত জানাও আবশ্যিক।

আরও একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। কোনও কোনও হিন্দু প্রতিমার সম্মুখে ছাগ বলি দেয়, কোনও কোনও হিন্দু দেয় না। ইহাতে কোনও হিন্দুরই ধর্মভাব বাধা প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ বকরিদ পর্বে মুসলমান ভ্রাতারা গো-কোরবাণী না করিয়া উট, হুয়া বা ছাগল—যাহার যেমন সঙ্গতি-

কোরবানীর ব্যবস্থা করলে, মুসলমানের ধর্মভাব ক্ষুণ্ণ হয় না, হিন্দুর সহিত বিরোধের আশঙ্কাও থাকে না। আমাদের অনেক মুসলমান বন্ধু গোহত্যার বিরোধী। তাঁহারা অবশ্যই অধার্মিক নহেন, অ-মুসলমানও নহেন। বলা বাহুল্য যে, যে যে কারণে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সংঘটিত হয় না, গো-কোরবানী তাহাদের একটি। ইহা বুঝিয়া উভয়পক্ষের নেতারা আপোস-রফার চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা ।*

আবাহন ।

[শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ।]

মুষ্ক-বঙ্গ নাচিছে হৃদয়ে
এস মা বঙ্গ-জননী,
ধরনের পরে পূজিবে ভক্ত
এস মা বঙ্গে সিংহবাহিনী ।
গন্ধ-বিভোর মত্ত পবন
এসেছে শুভবার্তা লইয়া,
ভিখারী কণ্ঠে আবাহন-গীতি
উঠে বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া ।
ঝিল্লী-মুখর-স্বপ্ত-পল্লী, যেন মা—
আজিকে উঠেছে জাগিয়া,

ভাণ্ডার শূন্য করিয়া প্রকৃতি
দেছে, সজীব চিত্র আঁকিয়া ।
কোথা স্বর্গ, ইহার অধিক—
যুঁচু যে মোরা জানি না কেহ—
বুঝি স্বর্গের গরিমা হরেছে ধরণি
পূত পুলকিত মুক্ত গেহ ।
এস মা পার্বতী, এস ভগবতী,
কর মা মোদের আশিস্ দান,
এস অন্নপূর্ণা ! এস মা অপর্ণা !
পতিত পুত্রে করুমা ত্রাণ ।

* নূতন লেখককে উৎসাহদান ও বঙ্গসাহিত্যে নূতন লেখকের প্রবেশলাভের সহায়তা করা 'অর্চনা'র অন্ততম উদ্দেশ্য। আমরা সেইজন্য 'অর্চনা'র কয়েক পৃষ্ঠা নবীন লেখকদিগের জন্য নির্দিষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিব। বর্তমান যুদ্ধাবসানে 'অর্চনা'র কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে; বলা বাহুল্য, সেই সময়ের 'অর্চনা'র কলেবরের অনুপাতে 'নবীন লেখকের পৃষ্ঠা'র সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে।—সম্পাদক।

স্মৃতদ্রা ।

[শ্রীমতী উমালতা ঘোষ ।]

নীলব, নিস্তক, স্থির, পাণ্ডব শিবির—
 স্তিমিত দীপের মালা, রণ-কোলাহল
 শ্রান্ত বেন রণবাদ্য রঞ্জনী গভীর ।
 স্বপ্ত নিদ্রার কোলে, শ্রান্ত সৈন্যদল ।
 আহতের ক্ষীণ কণ্ঠ, উঠে ধীরে ধীরে
 ক্ষতশ্রাবে ক্ষীণ তনু, শিরেরে মরণ—
 সাথী সাথে নারী এক পশিলা শিবিরে—
 ক্ষতে স্নিগ্ধ কর তার দিলা প্রলেপন ।
 মেলি নেত্র, ক্ষীণস্বরে, কহিল সেনানী
 স্নিগ্ধতম করণার কর-পরশনে—
 “ব্যথিতের যত ব্যথা মুছালে জননী !
 কে তুমি মা দয়াবতী ? কহিবে কি দীনে !”
 ভীত কণ্ঠে, কহি উঠে, সাথী স্থলোচনা
 চিনিয়াছি এই দুটে কৌরব-সেনানী

অপাত্রে অর্পেছ দেবী তোমার করুণা !
 এই ছরাচার তব, বিপক্ষ-বাহিনী !
 কাতরে বিন্মরে কহে সে কৌরব-বীর—
 “পাণ্ডব বাহিনী মাঝে, বন্দী তবে আমি !”
 “চিন্তাহীন হও বৎস,—মুছ অশ্রুনির ।
 মাতৃ অঙ্কে সম্মানের, কি ভয় বাহনি !”
 সবিন্মরে সহচরী হেরিলা আননে,
 উঠিয়াছে উদ্ভাসিয়া, স্বরগ গরিমা
 বর্গীর পবিত্র জ্যোতিঃ উছলে নরনে,
 এতথারে মূর্তিমতী, করুণা মহিমা ।
 স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি আহতের পানে,
 কি যেন বিশ্বর তৃপ্তি, পশিয়াছে প্রাণে ।
 চিনিলে কে মাতৃ মহাপ্রাণা সতী,
 কারণ্য রূপিতা দেবী দয়াবতী !

শান্তি ।

[শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ।]

এতদিন পরে দেব পেয়েছি তোমারে—
 দরশে পরশে তোমা' বিশ্বের মাঝারে ।
 কামনে কামনে ভরা প্রভাতের ফুল—
 তোমার হাসিটি বেন করি' মসগল ।
 তোমার নিবাস বুঝি মাতার পবনে—
 বার জালা, কি যে তৃপ্তি মুছ পরশনে !

তোমার নয়নভারা প্রভাত তপন
 বিরাট হৃদয়খানি অসীম গগন ।
 কত বর্ষ নিশিদিন, শয়নে স্বপনে—
 খুঁজিয়াছি তোমা দেব, নিদ্রা-জাগরণে ।
 এখন পেয়েছি তোমা' অন্তরে বাহিরে—
 কিবা প্রিয়দর্শন—তুলনা নাহিরে ।

ঐতিহাসিক স্মৃতি-সহায় ।

[শ্রীকালিকানন্দ মাজিলা ।]

নিয়ম ।—প্রত্যেক স্মরণীয় ঘটনা সম্বন্ধে দুই লাইন কবিতা থাকিবে । কেবল প্রথম লাইনের শব্দগুলির অধ্যাক্ষর সমূহের পর পর মূল্য ধরিলেই ঘটনার সময় নির্ণীত হইবে । যে সব অক্ষরগুলির মূল্য দেওয়া হয় নাই, সেগুলির মূল্য ধরিলেই আনুমানিকতা নাই । অক্ষরের মূল্য :—

ক, চ, ট, ত, প, হ, য, ব, র, ল
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

নির্গাত খৃষ্টাব্দের প্রথম অঙ্কটি • হইলে উহা 'পূর্ব খৃষ্টাব্দ' বুঝিতে হইবে ।

১। শ্রীগোরাঙ্গের আবির্ভাব—(কতবপ = ১৪৮৫)

কলুষী তরাতে বসে প্রভু শ্রীগোরাঙ্গ ।

আবিভূত নবদ্বীপে সহ সাক্ষোপাঙ্গ ॥

২। টাইমুরের ভারতাক্রমণ—(কটরব = ১৩৯৮)

কঠিন টাইমুর রক্তে বহাইল নদী ।

ভয়ে দিল্লীবাসীগণ কাঁপে নিরবধি ॥

৩। সোমনাথ লুণ্ঠন—(কলচত = ১০২৪)

করি লুট সোমনাথ চলিল তখন ।

রত্ন লভি মায়ায় হরষিত মন ॥

৪। জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ—(ককষত = ১১৭৪)

করাইল কত যত্নে সমুদ্রের তীরে ।

অনন্তম জগন্নাথের মন্দিরে ॥

৫। মহারানী ভিক্টোরিয়া জাতি—(করলক = ১৯০১)

মহারানী ভিক্টোরিয়া লভিলা কবর ।

পৃথিবী ব্যাপিয়া উঠে শোকের লহর ॥

৬। বুদ্ধের তিরোভাব—(লতযয = ০৪৭৭)

লভে তথাগত মুক্তি যোগী যোগবলে ।

অহিংসা পরম ধর্ম প্রচারি ভূতলে ॥

৭। পলাশীর যুদ্ধ—(কযপয = ১৭৫৭)

কোন যুগে পলাশীর যুদ্ধের ঘটন ?

সিরাজের সনে হ'ল ক্লাইবের রণ ॥

৮। পানিপথ—১ম যুদ্ধ—(কপচহ = ১৫২৬)

কখন পাঠান চূর্ণ হইল ভারতে ?

ইব্রাহিম বাবরের যুদ্ধে পানিপথে ॥

৯। পানিপথ—২য় যুদ্ধ—(কপপহ = ১৫৫৬)

কি প্রকারে প্রভুভক্ত হিমুর মরণ ?

পানিপথে বৈরাম করিল সংঘটন ॥

১০। পানিপথ—৩য় যুদ্ধ—(কযহক = ১৭৬১)

কত যত্নে হনন করিল মহারাষ্ট্রে ।

দুরাগী আক্রম সাহ পানিপথ ক্ষেত্রে ॥

- ১১। অন্ধকূপ হত্যা—(কবপহ = ১৫৫০)
কলিকাতা যুদ্ধক্ষেত্রে পট্টনের হার ।
মাণিকচাঁদ পাইলেন বন্দীরক্ষা ভার ॥
- ১২। মিউটিনী—(কবপহ = ১৮৫৭)
করিল বারাকপুরে পট্টনেরা যুদ্ধ ।
মিউটিনী রূপে তাহা ছাইল দেশশুদ্ধ ॥
- ১৩। সতীদাহ নিবারণ—(কবচর = ১৮২৯)
করণায় বেণ্টিকের চিত্ত রহে ভরা ।
সতীদাহ নিবারণ করিলেন ভরা ॥
- ১৪। বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়—(ককরব = ১১৮)
কুমন্ত্রীর কথায় রাজ্য বখ্‌তিয়ারে দিয়া ।
পলায় লক্ষ্মণসেন নদীয়া অতীয়া ॥
- ১৫। রণজিৎ সিংহের মৃত্যু—(কবটর = ১৮৩৯)
কোহিনুরে বিমণ্ডিত টোপের রাজ্য ।
রণজিৎ মরণে পঞ্জাব ছারখার ॥
- ১৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—(কবরট = ১৭৯৩)
কর্ণওয়ালিস যত্নে রাজস্বের টান নাই ।
দশসাল বন্দোবস্ত হৈল চিরস্থায়ী ॥

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা তত্ত্ব ।

[“ও-পারের কথা”র লেখক ।]

মনকে যাবতীয় সংগুণে ভূষিত করাই প্রকৃত ধর্মবাচ্য । সংগুণের মাত্রানুসারে জীব ধর্মজগতে ক্রমশঃ শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হইলেন । অজ্ঞানতা বা মোহাক্রান্ততা জীবের শূদ্রাবস্থা । মস্তিষ্ক কর্ষণের কাল বৈশ্যাবস্থা । গার্হস্থ্যধর্ম বিধিমত পালন ও তৎসঙ্গে মনকে সংগুণসম্পন্ন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও ধর্মসাধনের কাল ক্ষত্রিয়াবস্থা । পরিশেষে গার্হস্থ্যধর্ম সম্পাদন করিয়া মনকে আত্মায় পরিণত করিবার ঐকান্তিক উত্তমের কাল ব্রাহ্মণাবস্থা । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানী বাচ্য হইলেন । সেই অবস্থায় জীব প্রকৃত স্বামী, সোহৃৎ, পরমহংস, রাজর্ষি, মহর্ষি ইত্যাদি পদবাচ্য হইলেন । ইহাই ধর্মকর্মের পূর্ণত্বাবস্থা ।

জীবদেহস্থিত মনই প্রকাশ্য কর্মকর্তা । বাষ্পের অপেক্ষাকৃত স্থূল অবস্থার নাম যেমন জল, আত্মার আংশিক ঘনীভূত অবস্থার নাম মন । মনকে আত্মায় পরিণত করাই দুর্লভ মানব জন্মোচিত কর্ম বা প্রকৃত সাধন । সূতরাং দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় ব্যতিরেকে জীবের পুঙ্খ নুশ ঘূচা অসম্ভব । মনের যাবতীয় গুণগুণরাশিকে অল্প সময়ের মধ্যে ধোত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । এই ধোতকার্যে বিশেষ যত্নশীল হইয়া যাঁহার যাহা জাগতিক কর্ম উহা কর্মক্ষয় হিসাবে কিন্তু মনঃপ্রাণ ঐক্য করতঃ সাধনের সঙ্কল্প ও চেষ্টা ধর্ম্যকর্মের নিম্ন অঙ্গ । ধর্ম্যকর্মের উচ্চ অঙ্গ বা মস্তিষ্ক মনকে যথাসাধ্য এক চিন্তায় বা কার্যে কেন্দ্রীভূত করা ও প্রত্যহ অবকাশ মত নির্জন ও মুক্ত স্থানে পরিভ্রমণ বা উপবেশন করা । উচ্চ বা সচ্চিন্তায় বা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া । মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের নিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির এককালীন পরিবর্তন যেমন অত্যা-বশ্যক, জীবধর্ম্য বা কর্তব্যকর্ম্যে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম এককালীন সাধন দ্বারা পারিপাট্য অর্জন করা জীবোচিত সাধন । এই সাধনের সাধন ফলে—অবশ্য অধ্যবসায়কে সম্বল করিয়া জীব স্থিরবিশিষ্ট চিন্তাকুশলতা লাভ করেন । পরে প্রত্যেক চিন্তাবীজ ইচ্ছালতা দেখা দেয় ও প্রত্যেক ইচ্ছালতা হইতে কর্ম-সুফল উৎপাদিত হয় ।

ঘটনাচক্রের পুত্তলিকাবৎ জীব নিজ নিজ ভাবে স্ব স্ব কর্ম সাধন করিতেছেন ও তদ্রূপ কর্ম সম্পন্ন করিয়া জীবধর্ম্য সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রত্যেকের বদ্ধমূল ধারণা । ধারণা অর্থে সংস্কার । সংস্কার হইতে চিন্তা ও চিন্তা হইতে সাধ মানব-হৃদয়-নদীতে কত শত বুদ্ধদসম অহোরহঃ দেখা দিতেছে ও বিলীন হুইতেছে । কিন্তু যখন কোন সংস্কার অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় বদ্ধমূল হয়, উহাই সেই পরিমাণে চিন্তার ও সাধের পুত্তলিকাসম মানসপটে নৃত্য করে । পরে সেই সেই পুত্তলিকায় স্ব স্ব ইচ্ছাবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহা চিন্তা ও ইচ্ছানুযায়ী সু বা কু কর্মফল প্রসব করে ।

আত্মা ও দুই মুখ বিশিষ্ট মন মানবদেহে অবস্থিত । একটি কাঠির মধ্যস্থলে আর একটি কাঠিকে দাঁড় করাইলে উভয়ে যে অবস্থায় থাকে, আত্মা ও মন তদ্রূপ অবস্থিত । আত্মার সন্নিকটস্থ মনের মুখটি আত্মায় সংলগ্ন বলিয়া সূচিন্তা-করণে ও সুকর্মসাধনে যত্নশীল । ইহার নাম সুধামুখো বা পাকা মন । মনের অপর মুখটি আত্মা হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া জীব প্রবৃত্তির দাস । ইহার

নাম গরলমুখো বা কাঁচা মন । আত্মা ও দুই মুখ বিশিষ্ট মন প্রকৃত জীববাচ্য । সূতরাং অস্থির পিঞ্জর ও চর্ম্মের আবরণ আত্মার ও মনের আস্তানা মাত্র । কলতঃ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মবাচ্য হইবার সাধ পুষিলে বা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে দেহজনিত ভেদাভেদ জ্ঞান হৃদয় ও মস্তিষ্ক হইতে বিধৌত করা বিশেষ কর্তব্য । সংস্কারের ও শিক্ষার দৌলতে মনকে সংগুণে পূর্ণ করা, কিম্বা মন হইতে ভেদাভেদ জ্ঞান রহিত করা, কিম্বা মনকে আত্মায় পরিণত করা, কিম্বা আত্মাকে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া হিন্দুদিগের যাবতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তির উদ্ভাবনা । জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম বিহিত বিধানে এককালীন সাধনে সচেষ্ট হইলে কি প্রকারে দেহস্থিত আত্মাই সন্তানবৎসলা জননী আকারে জীবকে শিবত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করেন অর্থাৎ স্ব স্ব রজ ও তমোগুণ হইতে ত্রিগুণাতীত করেন, এই মহশ্বভেদের উদ্ভাবনার নাম শ্রীশ্রীহর্গা প্রতিমা ।

জল হইতে তরঙ্গ উদ্ভূত, জলেই অবস্থিত ও পরিশেষে জলের সহিত মিলিত হয় । ষাঁহা হইতে উদ্ভূত তিনি জনকবাচ্য, ষাঁহার ক্রোড়ে তিনি জননী-বাচ্য, ষাঁহার সহিত মিলিত হইতে হয় তিনি স্বামিবাচ্য । তরঙ্গের পিতা, মাতা ও স্বামী একনাত্র বারি । এই বিধানে মনোরূপ তরঙ্গের জনক, জননী ও স্বামী একমাত্র দেহস্থিত আত্মা । আত্মা পরমাত্মার ক্ষু লিঙ্গ, সূতরাং জ্ঞানের, প্রেমের, শক্তির, শান্তির ও আনন্দের ভাণ্ডার । জীব মন আত্মার তুলনায় জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে শিশুসম । সন্তানের প্রতি পিতাপেক্ষা জননীরই অধিক মমতা ও সাধারণতঃ সন্তানের টান পিতাপেক্ষা জননীর প্রতি । সূতরাং আত্মাকে জননী-পদে বরিত করা জীবের পক্ষে প্রথমাবস্থায় সহজসাধ্য সাধন । উক্ত কারণে জীবদেহস্থিত আত্মা শ্রীশ্রীহর্গা আকারে কল্পিত ও পূজিত ।

পূজা করণ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা আবশ্যিক । পূজিত উপাদান জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, শান্তি, আনন্দ প্রভৃতি সংগুণে বিভূষিত ও তিনিই পূজারীর পিতা, মাতা বা স্বামী, এই সংস্কার বন্ধমূল করিয়া তাঁহার যাবতীয় গুণের আদর করাই প্রকৃত পূজাবাচ্য । এই প্রকার পূজার উপাদান পূজারীর দেহস্থিত আত্মা ও তাঁহার পূজারী পাকা মন । পূজার উপকরণ মনের যাবতীয় গুণাগুণ । ইহাই সাধিক পূজা । এষবিধ পূজা করণের ফলে দুই মুখবিশিষ্ট

মন আত্মার সংগুণাবলীতে ভূষিত হইয়া আত্মা সম অবস্থায় পরিণত হয় ও দেহান্তে আত্মাও চৈতন্যময়ী মন একজুটী হইয়া পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হয় । ইহাই সচ্চিদানন্দময় সাগরের সঙ্গম । ইতরাং ইহা ধারণাগম্য যে, পূজারী হইতে হইলে নিজ মনকে সংগুণে পূর্ণ করা বিশেষ কর্তব্য । সেই প্রকার মহাজন কর্তৃক একখণ্ড প্রস্তর বা কোন মৃগ্ময়ী মূর্তি অর্চিত হইলে পূজারীর মন চৈতন্যযুক্ত হওয়া প্রযুক্ত উহা তাঁহার স্থলদেহভার রক্ষণে ও প্রতিমা পূজা করণে এককালীন সমর্থ হয় । সেই অবস্থায় সেই মহাজনের আত্মা তাঁহার চৈতন্যযুক্ত মন কর্তৃক বাবা বাবা, মা মা, বা প্রাণবল্লভ প্রাণবল্লভ প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইলে যে কোন নির্জীব উপাদানে তাঁহার আত্মা প্রভাসিত হইয়া উহার সজীবত্ব প্রতিপাদন করে । একমাত্র এই উপায়ে যে কোন প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য সাধিত হয় । ইহাই আত্মার সন্দর্শন লাভের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বিধান-কারণ সহস্থিত আত্মায় লক্ষ্য রাখিয়া আত্মদর্শন বা উহা উপলব্ধি বা উপভোগ করা অপেক্ষা কোন প্রতিমায় বা চিত্রে নিজ নিজ মনকে কেন্দ্রীভূত করা তৎপরে ভক্তি বা প্রেম বলে উহার সজীবত্ব প্রমাণিত করা অস্ত্র সাধক হইতে আরও পক্ষে সরল পন্থা । এই মহান উদ্দেশ্যে হিন্দুজাতি মূর্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ধর্মাবলম্বীদিগের চক্ষে শূলসম বিধিলেও উহা এতকাল হইতে আদৃত ও মনে হয় প্রকৃততত্ত্ব আরও উদ্ঘাটিত হইলে ও উক্ত প্রকারের পূজারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অধিকতর আদৃত হইবে । আত্মা শ্রীশ্রী দুর্গাকারে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা ও দশভুজা । হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, বাণ, ঢাল, তরবারি, শূল ও ফণী । চোরা আখ্যাত অসুরের কেশগুচ্ছ ও ফণী দেবীর এক হস্তেই ধৃত । দেবী সিংহোপরি দণ্ডায়মানা ও সেই সিংহ কর্তৃক অসুর দংশিত হইতেছে । দেবীও শূল দ্বারা অসুরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতেছেন । প্রতিমার চালচিত্রে নানা মুনি, ঋষি ও দেবদেবী সহ দেবাদিদেব শঙ্কর মধ্যস্থলে উপবিষ্ট । দেবীর সন্নিকটস্থ বীণাপাণি ও লক্ষ্মীঠাকুরাণীদ্বয় । উক্ত ঠাকুরাণীদ্বয়ের সকাশে আসীন ময়ূরবাহন কার্তিকেয় ও মূষিকবাহন গণপতি ঠাকুর । গণপতি ঠাকুরের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা কলাবধু ঠাকুরাণী ।

জননী স্বভাবতঃ প্রেমময়ী । প্রেম মাধুর্য্যপূর্ণ বা মধুময় । যে যে পদার্থে মধু বিद्यমান, যথা ফুলের অন্তঃস্থল, গুড়, আম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি উহার প্রায়শঃ হরিদ্রাবর্ণ । শশাক হরিদ্রা বর্ণের চক্র দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া উহা মাধুর্য্যপূর্ণ । স্থলচিত্তার অভিব্যক্ত জীবকে কোন গুণের ধারণা করিতে

হইলে শূল নিদর্শন দ্বারা এই কার্য সহজসাধ্য। শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা এই হেতু তপ্তকাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিতা। জীব-জগতের কেবলমাত্র গুণের আদর করিতে অভ্যাস করিলে তবেই জীবমাত্রেরই গুণবান্-গুণবতী হওয়া নিতান্ত সম্ভব।

সাধক মাত্রই মর্মে মর্মে বুঝেন যে, সাধনকর্মে ঐকান্তিকতার সহিত নিরত থাকিলেও গরলমুখো মনের চোরা-গোপ্তা কদাচরণের জন্ত অনেক সময়ে নিষ্ফলতাই প্রাপ্য গণ্ডা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধনকর্মে সফলকাম হইতে হইলে কোন অদৃশ্য সহায়তার বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সময়ে আত্মারূপী গুরুকে মা, বাবা বা প্রাণবল্লভ পদে বরিত করিলে ও সাধকের দেহ, প্রাণ, মন ও সংসার সকলই সেই প্রেমময়ের বা প্রেমময়ীর এই ধারণা বন্ধমূল করিলে আত্মা সেই চৈতন্যময় চৈতন্যময়ী মনকে গরলমুখো মন হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত দশ-ভূজাকারে সহায়তা করেন। প্রতিমায় গরলমুখো মন চোরাগোপ্তা আচরণের জন্ত চোরা বা অসুর বলিয়া অভিহিত। গরলমুখো মনের জাগতিক যাহা কিছুতে দারুণ, আসক্তি। এই আসক্তি সমূহের ছেদনোপায় রোগ, শোক, তাপ, অর্থকষ্ট, ও যাবতীয় অভাব অশাস্তি। এই আসক্তিগুলি ছুদিত হইলে জীব-মুখে শূল বা ভীষণ দংশনসর্ম বিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু নিদারুণ কষ্টে মনায় কোন সাহসনা না পাইয়া দারুণ মহা-মোহে নিমজ্জিত হইয়া নিজ নিজ সংসারানুযায়ী চৈতন্যময়ের শরণাপন্ন হয়। জীব রোগ, শোক, তাপাদিকে বিধাতার নিঃসর্মতার নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিলেও অপেক্ষাকৃত চৈতন্যযুক্ত জীব এই প্রকার এক-একটি অবসাদকে নিয়ন্ত্রণ করুণা বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, চোরারূপী গরলমুখো মন হইতে পাকা মনরূপী সাধককে নিস্তার দিবার জন্ত দেবী অসুরের বক্ষ শূল দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন ও সেই চোরা মনকে চৈতন্য দিবার জন্ত জ্ঞান সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া তাহাতে জ্ঞান সঞ্চার করিতেছেন।

দেবী চৈতন্যদায়িনী। অসুরের কেশগুচ্ছ অর্থাৎ 'চৈতন' ধরিয়া এই কার্য সাধিতেছেন। জীবের মন হলাহলে পূর্ণ। 'বিষে বিষে বিষক্ষয়' হইয়া থাকে। এই হেতু গরলে পূর্ণ সর্পাকারে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী আকারে মনের গরল দেবী নাশ করিতেছেন। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কলঙ্ক-রটনা ও নানা প্রকার নির্যাতন প্রকৃত সাধক-সাধিকারও অনিবার্য প্রাপ্যগণ্ডা। এই সময়ে যাহারা স্থির ও ধীর থাকেন, আত্মা জননীসম্ম মার্ভৈ মার্ভৈ রবে সাহসনা প্রদান করেন ও বিপজ্জাল হইতে অভাবনীয়-উপায়ে সন্তানকে নিষ্কাশিত করেন। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত

দেবীর হস্তে ঢাল ও ভরবারি। জীবের দেহ ও প্রাণ সতেজ বা কার্যকারী অবস্থায় থাকিলে তবে মন একলক্ষ্য হইয়া কোন কৰ্মে সিদ্ধিলাভ করে। আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হইলে তবেই দেহরূপ বাঁকারি, প্রাণরূপ তাঁত ও মনোরূপ বাণ একলক্ষ্য হইয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে সক্ষম হয়। দেবীর হস্তে ধনুর্বাণ। অর্থাৎ আত্মাই এই দেহের, প্রাণের ও মনের অধিনেত্রী। সূতরাং তাঁহার ইচ্ছায় জীবের মন ও আত্মা সন্নিবিষ্ট হইয়া চালচিত্রে অবস্থিত শিব-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে। জ্ঞানের ও প্রেমের নিদর্শন—পদ্ম। পদ্মের বহিরাবরণ অর্থাৎ পাতাগুলি শুভ্রবর্ণ। শুভ্রবর্ণ অন্ধকারকে বিদূরিত করে। অন্ধকার বা কালো বর্ণ অজ্ঞানতা-নিদর্শক। সূতরাং শুভ্রবর্ণ জ্ঞান-নিদর্শক। এইজন্ত জ্ঞানময় হরের ও জ্ঞানময়ী সরস্বতীর বর্ণ শ্বেত। হরিদ্রা প্রেম-নিদর্শক বর্ণ। এই হেতু শ্রীশ্রী দুর্গার ও লক্ষ্মীঠাকুরাণীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চন। দেবীর হস্তে পদ্ম, অর্থাৎ দেবী একাধারে জ্ঞানময়ী ও প্রেমময়ী। সূতরাং দেবীর জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি নির্দেশক গঙ্গা প্রভৃতি গুণের ধারণা করিলে সাধক-সাধিকার উক্ত ষাবতীয় গুণে ভূষিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

দেবীর উর্ধ্ব হস্তে শঙ্খ ও অপর হস্তে সূদর্শনচক্র। মঙ্গল বা আনন্দ নির্দেশক ধ্বনি—শঙ্খধ্বনি—কারণ এই ধ্বনি দিব্যজ্ঞানোদ্দীপক ঙ্কারের প্রতিক্রম। হিন্দুশাস্ত্র মতে ঙ্কার শব্দ হইতে এই বিরাট বিশ্বের বিকাশ। সূতরাং চৈতন্যময় হইতে উদ্ভূত প্রথম শব্দ আর আর শব্দ হইতে অধিকতর চৈতন্যযুক্ত। যে ধ্বনির দ্বারা জীবের বিশেষ ভাবে চৈতন্য উদ্দীপন হইবার সম্ভাবনা, উহা নিঃসন্দেহ মঙ্গল বা আনন্দ-নিদর্শক ধ্বনি। দেবী সূদর্শন-চক্রের অর্থাৎ উত্তম বা দিব্যদৃষ্টির অধিকারিণী। সূতরাং দেবী দিব্যজ্ঞানের ও দিব্যদৃষ্টির একমাত্র অধিকারিণী। ফলতঃ তিনিই চৈতন্যদায়িনী।

জীবে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় চৈতন্যশক্তি বিद्यমান। এই শক্তিবলে জীবদেহ আনন্দ বা শান্তি-ঘটে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই কৰ্ম সাধিতে হইলে বৎসরের মধ্যে তিন দিন মাত্র নির্জনবাস নিতান্ত আবশ্যিক। এই হেতু উদ্বোধন প্রথা প্রচলিত। মানসসঙ্গ বর্জন করিয়া ও জাগতিক কৰ্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দিবসত্রয় উদ্বোধনের পর আরও তিন দিন আত্মারূপী জননী চিন্তায় বা পূজায় নিরত থাকিলে আত্মা জননী আকারে সেই জীবের গরলমুখো মনকে বিধ্বস্ত করিয়া সাধিকাকে লক্ষ্মী বা বাঁগাপাণি পদে ধরিয়া করেন ও সাধককে কার্তিকেয় বা গণপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। যে ধ্বনি

নিজ দেহ, প্রাণ, মন ও সংসার আত্মারূপী জননীর এই জ্ঞান প্রোথিত করিয়া জাগতিক যাহা কিছু কর্ম, কাম, কামের বা দেহাচ্যুতি হিসাবে সহাস্রবদনে সাধন করেন ও পরে অসত্য, ক্রোধ, দম্ব, অভিমান ও স্বার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া দশজনের সেবায় নিরতা থাকেন ও বিলাসিতাকে বর্জন করিয়া গৃহ বস্তাদি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন, তিনি জপধ্যানে বা তীর্থদর্শনে কালাতিপাত না করিলেও লক্ষ্মীপদে বরিতা হইয়া যেন যে রমণী মায়ামোহের উপাদান হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া আত্মার ধ্যানে তাঁহার গুণকীর্তনে নিযুক্ত থাকেন, তিনি বীণাপাণি পদে অধিষ্ঠিতা হইয়া যেন যে ব্রহ্মচারী হইয়া আত্মাকে জননীজ্ঞানে তৎচিত্তায় নিজ মনকে প্রোথিত করেন, আত্মার রূপায় গরলমুখো মন প্রভুপদ হইতে স্থলিত হইয়া ময়ূরদশ বাহক হয়। ময়ূর যেমন পুচ্ছ-বিষ্কারিত করিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করে ও দর্শকবৃন্দকে আনন্দে আপ্ত করে, ও পরে হলাহলে পূর্ণ বিষ্কার কুণ্ডের নিপাত সাধন করে, সেই ব্রহ্মচারী সাধকও আনন্দরসে লিপ্ত হইয়া জগৎকে আনন্দে ভাসান ও অবকাশ মত কাম, ক্রোধ, লোভাদি সম সর্পসমূহকে নিঃশেষিত করিয়া কমণীয়, অমুরাগণীয়, লোভনীয় ইত্যাদি হইয়া পড়েন। তৎপর দেহ, প্রাণ ও মন একলক্ষ্য করিয়া জগতের চির কল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এবম্বিধ কর্মসাধনে তৎপর বলিয়া তিনি দেবলোক-ষোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত। দেবলোকে এইপ্রকার কর্ম অহোরহঃ সাধিত হইতেছে। কিন্তু ইহলোকে জীব ইর্ষার, কুৎসার, দম্বের, ক্রোধের, কামের, লোভের ও মায়ামোহাদির ক্রীড়া-পুত্তলিকা সাজিয়াও আপনাদিগকে বিচক্ষণ-বিচক্ষণা নির্দ্ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

একগে গণপতি ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। গরলমুখো মনের প্রভাবে জীব হৃদয় ও মস্তিষ্ক স্মরণ্য তাহাদের কর্তব্য 'আমি' ও 'আমার' বুলিতে পূর্ণ। যতদিন এই দেহভার বহন করিতে হইবে, গরলমুখো মন হইতে পূর্ণমাত্রায় অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব; কারণ ইহার প্রধান কর্ম এই স্কুলদেহকে রক্ষা করা। পাকা বা স্কুধামুখো মনের কর্ম স্মৃতিস্তায় ও স্মৃকর্মে মিয়ুক্ত থাকিয়া স্কুধাময় আত্মার সহিত ক্রমশঃ মিলিত হওয়া। এই গরলমুখো মনই মায়াময়। কলতঃ মন থাকিতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মায়াময় বা অহংবুদ্ধি থাকিবেই থাকিবে। তবে এই অহংবুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ করিতে হইলে ধারণা বদ্ধমূল করা বিধেয় যে, আমি চৈতন্যময় বা চৈতন্যময়ীর সন্তান। স্মরণ্য আপন হিন্দা কেবলমাত্র

চৈতন্য—উহা লবই লব। এই উপায়ে জাগতি অহংবুদ্ধি পাহাড়-পর্বতের মত উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে অক্ষাশ পায়। বরং মূষিকসম ক্ষুদ্রাকারে সেই সাধকের পদতলে গুস্ত থাকে। সেই অবস্থায় সেই সাধক আপনাকে চৈতন্যযুক্ত মন, অর্থাৎ দেহী নয়, নির্দারণ করিয়া দেহস্থিত আত্মাকে কিম্বা আত্মায় অবস্থিত কোন মহাপুরুষের চিত্রকে গুরুপদে বরণ করেন। পরে সেই মহাপুরুষকে ধ্যান জ্ঞান করিয়া তাঁহার অদশানুযায়ী নির্বিকার ও নিঃশঙ্কচিত্তে জাগতিক ও পারলৌকিক কৰ্ম এককালীন সাধনে তৎপর হইয়েন। অর্থাৎ তিনি শঠতায়, দান্তিকতায় ও অত্নের মস্তকে হস্ত বুলাইয়া পাথের ও উদরায় সংস্থানের ব্যবস্থায় বা কোন প্রকার বাহ্যিক আচরণের বিশেষ বীতরাগ। বরং সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থপরতা, কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্যপালনকে মূল ধর্মজ্ঞানে কৰ্ম্মই ধর্ম ও ধর্মই কৰ্ম্ম এই মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করেন। এবম্বিধ আচরণের জন্ম তিনি শ্রীশ্রীরূপায়—বিনা আবেদনে কালক্রমে হস্তিসম নানাগুণে বিভূষিত হইয়া হস্তী অতি ক্ষুদ্র লোচনযুক্ত হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন। তদ্রূপ সেই সাধক চিত্রকে আত্মায় অধিষ্ঠিত রাখিবার জন্ম যত্নশীল থাকিয়া সূক্ষ্মদর্শী হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহার মনোভাব বিনায়াসে অবগত হইয়েন। হস্তীর কর্ণদ্বয় কুলাসম বৃহৎ। এই হেতু উহারা বিশিষ্ট ভাবে শব্দগ্রাহী, অর্থাৎ শিকার কালীন আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দেয় শিকারীয় কোন প্রাণী কতটা সন্নিকটস্থ ও উহা কোন প্রাণী। তদ্রূপ সেই সাধক কোন ব্যক্তির একটি মাত্র কথায় বুঝিতে সক্ষম হইয়েন, সেই ব্যক্তির চাল-চলন বা ধরণ-করণ কি প্রকার। সেই অবস্থায় তিনি শ্রেয়ক্রোধর বলিয়া পরিগণিত হইয়েন। গুজদস্তদ্বয় যেমন মূল্যবান্ ও হস্তীর শোভাবর্দ্ধনার্থ উহা নিবিষ্ট জীবদেহস্থিত কাম, ক্রোধ, লোভাদি দস্তগুলি নিকৃষ্ট কৰ্ম্মে সংযমতার সহিত ব্যয়িত হইলে কামে কমনীয়, রাগে অনুরাগনীয়, লোভে লোভনীয় ও মায়ায় মায়াতীত করিয়া দয়াবান্ করে। সুতরাং সেই সাধকের নিকট নর-নারী দলে দলে উপনীত হইয়েন ও স্বেচ্ছায় তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। হস্তী বলী ও নিরামিষভোজী। সেই সাধকও নিরামিষভোজী হইলেও তাঁহার মনের বলের জন্ম দেহের বল কম নহে। এই বলে বলীয়ান্ বলিয়া তিনি জাগতিক বা পারলৌকিক স্বার্থসাধনে কাহারও তোষামুদী করিতে কিম্বা সাধারণ জীবের মত মিষ্ট কথা অপব্যয় করিতে বিশেষ বীতশ্রদ্ধ। হস্তী বৃহৎ গুণ-

যুক্ত বলিয়া বায়ু দ্বারা উহার বৃহৎ উদর পূর্ণ করিতে সক্ষম । বায়ুই চৈতন্যের প্রধান উপাদান, কারণ ইহা প্রাণ, শক্তি, শান্তি, আনন্দ ও এমন কি প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম-সমন্বিত । হস্তীর সংযততার সহিত উহার বায়ু পূর্ণ করিবার আধার সুবৃহৎ বলিয়া হস্তী সূক্ষ্মদর্শী ও শব্দগ্রাহী । প্রাণায়াম কর্মে ও দেহ, প্রাণ ও মন বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিবার আয়োজন । নির্জনতা ও সংযততাকে আশ্রয় করিয়া যে সাধক প্রাণায়াম (Ionv: breath) কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, শিক্ষা ও কার্যকুশলতার জন্ত তিনি কালক্রমে; মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও দ্বিদল দেহস্থিত এই ছয়টি চক্রভেদ করিয়া সুদর্শন চক্রের অধিকারী হইবেন—অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন হইবেন । অতঃপর নিজ অহংবুদ্ধিকে মূষিকবৎ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া গুরুপীতিকরংমাবতীর জাগতিক ও পারলৌকিক কর্মে-সংযততার সহিত সাধেন বলিয়া শ্রীগুরু ঈক পদ্যের অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকারী ও জীবসমক্ষে ভগবৎতত্ত্ব উন্মুক্তনে যত্নশীল হইবেন । ফল-কথা, যথাসম্ভব নিঃসঙ্গ ও সংযত হইয়া দেহস্থিত আত্মা সহিত মনের সম্বন্ধস্থাপনে বিশেষ ভাবে সচেষ্টি হইলে গীতা, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল উপনিষদ, ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র বা গ্রন্থ পাঠ করিবার অসম্ভব না । সাধক সাংসারিক হইলে, কলাবন্দুরূপিণী খ্যাতি—যোলকলার মতো মহাত্মার সঙ্গিনী হয়, কিন্তু তিনি ঈর্ষা ও কুৎসারিত জীবের চিন্তার ও বাক্যের ভোজ্য-সেব্য হইবেন । যে জীবের যে যে অগুণগুলি নিজ হৃদয়ের স্তরে স্তরে লুক্কায়িত আছে, সেই ব্যক্তি অত্র জীবের বিশেষতঃ খ্যাতনামা ব্যক্তির সেই সেই অগুণ কীর্তনে বিশেষ লোলুপ । নিন্দিত ব্যক্তি কিন্তু ভাগ্যবান্, কারণ তাহার কর্মেতার অন্ততঃ আংশিক মাত্রায় অযাচিত ভাবে নিন্দকগণ গ্রহণ করেন ।

অতএব বুঝা গেল যে :—

- ১। ধর্মকর্মে সাধনের উদ্দেশ্যে, নিজ নিজ মনকে ক্রমশঃ সংগুণসম্পন্ন করা ।
- ২। নিজ মনকে সংগুণসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলে শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া সম্ভব ।
- ৩। ঈর্ষা, কুৎসা, দম্ব, ক্রোধ, লোভ, কাম, অসত্য, অধৈর্য, উচ্ছ্বাস, স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, কর্তব্যপালনে ওদাসীন্দ্ৰ প্রভৃতি বিসর্জন দিলে তবে পূজারী বা পুরোহিত হওয়া সম্ভব ।
- ৪। সেই প্রকার মহাজন কর্তৃক কোন প্রস্তরখণ্ড বা মৃগায়ী মূর্তি অর্চিত হইলে উহার সজীবত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব নহে ।

৫। সংস্কারের অর্চনা করিবার জন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে শালগ্রামশীলা, শিবলিঙ্গ ও প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা। এই পায়ের অজ্ঞ জীবও ক্রমোন্নতি বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

৬। জীব মনকে জাগতিক নানা মূর্ত্তি হইতে এক আদর্শ মূর্ত্তিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া সংস্কারসম্পন্ন করিবার এই-ই সরল পন্থা।

৭। চৈতন্যযুক্ত মনই প্রকৃত পূজারী ও দেহস্থিত আত্মাই পূজিত হইবার প্রধান উপাদান।

৮। আত্মাকে উপলক্ষি করিয়া তাঁহার সন্দর্শন লাভ করা অতীব দুর্লভ বলিয়া কোন এক আদর্শ মূর্ত্তির সহিত আপন পিতা, মাতা বা প্রাণবল্লভ সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ও সেই মূর্ত্তিতে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদি গুণগুলি আছে এই ধারণা বদ্ধ করিয়া তাঁহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলে জীবের পক্ষে অভাবের ও অশান্তির পরপারে যাওয়া সম্ভব।

আরো কুঝা গেল যে, শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার পূজাকরণের উদ্দেশ্য ;—

১। সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ মনকে ক্রমশঃ সংযত করিলে ও বিহিত বিধানে অহংবুদ্ধিকে খর্ব করিয়া জাগতিক ও পারলৌকিক কর্মসমূহ সম্পন্ন করিলে মহিলাগণ লক্ষ্মীঠাকুরাণী ও পুরুষগণ গণপতিঠাকুর পর্য্যন্ত হইতে পারে।

২। সংসারত্যাগী হইয়া নিজ নিজ চিত্তের মলিনতা দূর করিতে সক্ষম হইলে রমণীগণ স্বর্গপাদে বসিতা ও পুরুষগণ কার্তিকেয়-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বৎসরের ৩৫৯ দিন নিজ মনের উৎকর্ষতা সাধনের জন্ত যে জীব যত্নসহ থাকেন ও পরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রারম্ভে চতুর্থা, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী এই তিন দিন নিঃসঙ্গ হইয়া ও নির্জনে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াও, কখন বা বিচরণ করিয়া যথাসম্ভব একচিন্তায় নিজ মনকে দেহমধ্যে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলে, তাঁহারই দেবার অর্চনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। তৎপরে পূজার তিন দিবস আরও সংযত হইলে সেই সাধকের আত্মাই কল্পিত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রেমময়ী জননী সম সন্তানকে জ্ঞানের বসনে ও প্রেমের ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বস্থানে তিনি বিরাজিত ইহা প্রত্যক্ষ করান। তখন সেই ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী নিজ দেহমধ্যে ইষ্ট বিরাজিত ইহা উপলক্ষি ও সম্ভোগ করিয়া আনন্দের ঘট স্বরূপ শান্তিবারিতে পরিপূরিত হইলে ও সমাগত নরনারীকে সেই বারি দ্বারা তৃপ্ত করেন। পরিশেষে অহংবুদ্ধি লোপ পাওয়াতে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, প্রভু-ভূত্য, শিশু-বৃদ্ধ, সাধু-অসাধু, শত্রু-মিত্র, আপন-পর সকলের সহিত আলিঙ্গনে ও তাহাদের পদধূলি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে। ইহাই বিজয়া দশমীর আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য। হায় রে! কালের কুটিল গতির জন্ত, দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতি নান্য আচারের প্রভাবেও পুরোহিত আর গুরুঠাকুরদের দৌলতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভোপযোগী হিন্দুদিগের শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পূজা কি তামসিক পূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে!

পরলোকে অক্ষয়চন্দ্র ।

[শ্রী অক্ষয়চন্দ্র]

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটা স্তম্ভ খনিয়া পড়িল । বঙ্কিমযুগের প্রতিষ্ঠা-
বান লেখক ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আর
নাই । বিগত ১৬ই আশ্বিন রাত্রি ২য় ৫৫ মিঃ সময় বঙ্গসাহিত্যের এই উজ্জল
ভাস্কর পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ।

বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের এমন কিছু কৃষ্ণ কীর্ত্তি নাই যাহা তাঁহাকে চিরদিন
বাঁচাইয়া রাখিবে । তবে একথা সন্দেহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে,
তাঁহার ঞ্চয় সাহিত্যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা স্পষ্টবাদিতা আজকালকার দিনে
দুর্লভ । তাঁহার গুণাবলীর আদর্শে আধুনিক সাহিত্যসেবীগণের চরিত্র গঠন
হইলে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ আশা করা যায় ।

অক্ষয়চন্দ্র জীবনে অনেকগুলি দারুণ শোক পাইয়াছিলেন এবং তাহা সহ
ও উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । স্মৃতিতে পাই ১১।১২ বৎসর পূর্বে
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর দিবসে তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত
সাধারণভাবে কথাবার্তা, হাস্যপরিহাস করিয়াছিলেন । ভগ্ন হইয়া তাঁহার উপযুক্ত

সহ্য করিয়াছিলেন ।

‘বঙ্গবাসী’ ও ‘বাঙ্গালী’ হইতে অক্ষয়চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও সাহিত্য-
জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

“১৮৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চুঁচুঁড়ার বাটীতে তাঁহার জন্ম হয় । মৃত্যুকালে তাঁহার
বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল । ইনি, খ্যাতনামা সদরলা স্বর্গীয় রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুরের
একমাত্র পুত্র । ইঁহার শিক্ষা দীক্ষা স্কুল-কলেজে যথারীতি হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ইনি পিতার
কাছেই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন । বলিতে কি, ইনি বাল্যকাল হইতেই পিতার কাছে
সদৌ ভাবে থাকিতেন এবং পিতা হইতেই বঙ্গভাষার প্রতি ভক্তি ও শ্রীতি তাঁহার মনে স্থান
পাইয়াছিল । স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসর্গও ইঁহার চরিত্র গঠনের সহায়তা
করিয়াছিল । ইনি বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে বি-এল পরীক্ষায়
পাশ হইয়া মুর্শিদাবাদ-বহরনপুরে ওকালতী করিতে যান ; কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার এতই
অনুরাগ যে, কিছুদিন ওকালতী করিয়া আর তাহা ভাল লাগিল না ; এ ব্যবসায় ছাড়িয়া
সাহিত্যে তিনি মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন । সেই সময় বঙ্কিমবাবুর যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত,
তাঁহার গহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে যতদিন বঙ্কিমবাবু জীবিত ছিলেন, ততদিন উঁাদের
মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল ।

‘বঙ্গদর্শনে’ অক্ষয়চন্দ্র যীহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু বঙ্কিমবাবু নহেন, দেশবন্ধু,
লোকেই তাঁহাকে ধস্ত ধস্ত করিয়াছিল । তাঁহার ‘বঙ্গদর্শনে’র প্রবন্ধের মধ্যে ‘আবু’ চিহ্ন-

প্রসিদ্ধ । চুঁচুঁড়ায় বসিয়া তিনি "সাধারণী" নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । উহা সংবাদপত্র হইলেও সে সময়ের শিক্ষিতদের পক্ষে উহা সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল । ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অনেক সময়ে উভয়ে একত্র বসিয়া, "সাধারণী"র জন্ম নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন । এই সময় গবর্নমেন্ট ইহাকে প্রথম শ্রেণীর অনার্সি মাজিস্ট্রের নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এ কার্য ইনি অনেক দিন করিয়াছিলেন ।

'বঙ্গের প্রাচীন কাব্যসমূহ প্রথম সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করার বঙ্গদেশ চিরদিন তাঁহার কাঙ্ক্ষণী থাকিবে । ইহার ক্ষুদ্র একখানি কবিতাপুস্তক,—"গোচারণের মাঠ" যুক্তাক্ষরহীনতার জন্ম প্রসিদ্ধ । বহুদিন পরে "সাধারণী" করিয়া উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকা করিবার মানসে ইনি "নবজীবন"র প্রতিষ্ঠা করেন । যাহারা "নবজীবন" পড়িয়াছেন, তাহারা বুঝিবেন যে, অধুনাতন অসংখ্য মাসিক পত্রিকার তুলনায় "নবজীবন" কিরূপ উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা ছিল । দুঃখের বিষয়, "নবজীবন" বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই ।

প্রবীণ বয়সে তিনি হিন্দু ধর্ম সমাজ বিষয় অবলম্বন করিয়া 'সনাতনী' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । ঐ গ্রন্থ তাঁহার চিন্তাশীলতার অক্ষর নিশান । ইহার পূর্বে তিনি "আলোচনা" নামক এক প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লোক" নামক গ্রন্থে ইনি 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে ইহার পিতার ও ইহার নিজের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন । ইহারই লিখিত "চন্দ্রালোকে" নামক এক প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার "সমসাময়িকের দপ্তরে" গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

আজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন । তাহাকে বিভিন্ন সম্মানস্বরূপ পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন । লর্ড লিটনের প্রথম দিল্লী দরবারে ইনি সংবাদপত্রের অস্তিত্ব প্রতিনিধিরূপে গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দরবারে গিয়াছিলেন । অক্ষয়চন্দ্র পুস্তকাদি বেশী কিছু না লিখিলেও, তাঁহার মত 'সাহিত্যিক' আর নাই বলিলেই হয় । * * * চটগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে ইনিই সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন । 'আজ সেই আজীবন সাহিত্যিক, সূক্ষ্ম সমালোচক সাহিত্যপ্রাণ অক্ষয়চন্দ্রকে আমরা হারাইলাম এবং বঙ্গদেশ হারাইল । ইনি চিরকাল 'বঙ্গবাসী'র বন্ধু ছিলেন । "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং "বঙ্গবাসী"র ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সাহিত্য-শিষ্য । ইনি প্রায় ২৩ বৎসর কাল বিপত্তীক ছিলেন । বর্তমানে ইহার দুই পুত্র বর্তমান এবং উভয়েই কৃতা । * * * বঙ্গবাসী ।

* * *

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একে একে সকলেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন ;—
রহিলেন মাত্র জরাজীর্ণ দেহ লইয়া বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর । অক্ষয়চন্দ্রকে তিনি সর্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন । বঙ্কিমের অন্তান্ত সহচরগণ অবসরমত সাহিত্য সেবা করিতেন । কেবলমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্য সেবাকে জীবনের মুখ্যকর্ম করিয়া লইয়াছিলেন । বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের তিনি সর্বপ্রধান সহায় ছিলেন । 'বঙ্গদর্শনে' তিনি যে সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন,

তাঁহা বঙ্কিমের সমালোচন শক্তির সহিত তুল্য হইতে পারে। অনেকে অনেক সময় তাঁহার লেখাকে বঙ্কিমের লেখা মনে করিয়া ভুল করিত। সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে তেমন করণ কঠোর কশাঘাত করিতে এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তখনকার কালে আর কেহ তাঁহার সমতুল্য ছিলেন না। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার দ্বারা নিরপেক্ষ সমালোচক বাঙ্গালা দেশে আর একটা হইয়াছে কি না সন্দেহ। অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্বায় দেখিলেও তিনি তাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না ; আবার পরম শত্রুর সুখ্যাতির বিন্যাসেও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পূর্ণ লেখক এখন অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ লেখক এখন একটাও খুঁজিতে পাই না।

বাঙ্গালা ভাষায় রীতিমত রাজ-নীতির চর্চা তিনি সর্বপ্রথম 'সাধারণী'তে আরম্ভ করেন। 'বঙ্গদর্শনে' ও 'নবজীবনে' সাহিত্যালোচনা করিতেন, কিন্তু 'সাধারণী'তে রাজাপ্রজার কথা— দেশের সুখ দুঃখের কথাই বেশী আলোচিত হইত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যৌবনে সাধারণীতে যেরূপে রাজনীতির চর্চা করি ছিলাম, সেরূপভাবে, সেরূপ কথার যদি এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র করি, তাহা হইলে বার্ককে শ্রীকৃষ্ণ বাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে"—এ সাহস তখনকার কালে আর কোনও সাহিত্যসেবীর ছিল না। তখন বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া 'বঙ্গবাসী' পর্যন্ত সকলেই ভারতবাসীর রাজনীতিক আন্দোলনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। শুধু অক্ষয়চন্দ্রই কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া লড়িতেন। বঙ্গবাসীর সংস্রবে থাকিয়াও তিনি কংগ্রেসকে কখনও আক্রমণ করিয়াছেন না মনে হয় না। ভাবের ঘরে চুরি করিতে তিনি জানিতেন না।

শেষ জীবনটায় তিনি বরাবরই বাঙ্গালীর দক্ষিণ-বাঙ্গালীর দুর্দশা, দেশের দিকে দিকে সাহিত্য-সেবার উপদেশ দিবার পিপাসা বোধ করিতেন, তাঁহার বাঙ্গালীর দুর্দশার ও দুর্ব্যবহার জন্য রোদন দোষেতে পাইতাম। বঙ্কিম বলিয়াছিলেন,—"যে কণ্ঠ হইতে কাতনের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ বৃদ্ধ হউক, যে লেখনী আর্ন্তের উপকারার্থে না লিখিল, সে লেখনী নিফলা হউক।"—সাহিত্যসম্রাটের এ উপদেশ তাঁহার শিষ্য-সহচরদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের মত আর কেহ শুনে নাই। ইদানীং যখন কিছু লিখিয়াছেন, তখনই তাঁহার লেখনী আর্ন্তের উপকারার্থেই লিখিত।

তাঁহার জীবন—জীবন যাত্রার প্রণালী বাঙ্গালীর আদর্শ হইবার যোগ্য। তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক ব্যবহার হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। আন্তরিকতার অভাব এ দেশে পদে পদে অনুভব করি। কিন্তু তাঁহাতে আন্তরিকতা বড় প্রবল ছিল। ভগামি বা মেসী তিনি ছ'চক্ষের বিষ দেখিতেন। নিজে যাহা কর্তব্য মনে করিতেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। এজন্য অনেকে তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করিত, অনেকে বলিত যে, তিনি 'ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া' করিয়া পাগল হইয়াছেন। কিন্তু তিনি লোকের মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না। প্রাণ যাহা বলিত, তাহাই বলিতেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াও তিনি দেশের স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহার প্রধান কথাই ছিল এই—"আমরা অস্বাস্থ্য তরঙ্গ নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর তাহার পর আমাদের অন্য উপদেশ দিও।"

সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা আমাদের আদর্শ হইয়া থাকুক। সে স্বজাতি-প্রেমের—সে স্বদেশ-অনুরাগের যদি আমরা উত্তরাধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে তিনি স্বর্গ হইতে আমাদের আশীর্বাদ করিবেন।—তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য-সেবা সফল হইবে। * * * বাঙ্গালী।"

পরিচয় ।

[লেখক—ত্ৰিনিবারণচন্দ্র শশীশঙ্কর এম্.এ, বি-এল্.]

‘বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরে জল চললো বনে।
চললো সুরে আঁধি দেখি ব্রজরমণে।’

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য ।

মধুমাস চতুর্দশিগেই মধু। সমস্ত বহুর বায়ুগণ মধুময় হউক, নদীগণ মধুকরণ করুক, শুষ্কি সকল মধুফল প্রদান করুক, রজনী মধুরূপ হউক, প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হউক, পৃথিবীর ধূলাও মধুময় হউক, আকাশ মধুময় হউক, পিতা মধুযুক্ত হউন, স্বর্গ্য মধুময় হউন এবং গো মকল মধুমতী হউন।

এই মধুমাসে বিহঙ্গের ভাস্কর্য্যে মধুময় পক্ষীরা মধুময় হউন। মধুর বসন্তে, সমস্তই মধুময়। পার্থিবং রজঃ মধুময় হউক বা না হউক; ফুলে ফুলে মধু; মধুলুক্ক ভ্রমর ও অশ্রুপতঙ্গের গমনে ও গুঞ্জে, কোকিল ও অশ্রুপতঙ্গ বিহঙ্গের কুঞ্জে, মলয়ের নিঃশ্বনে সর্বত্রই সেই মধুমত্তা।

মানবের পক্ষে এই মধুমাসের মধুমত্তা;—প্রধানতঃ পুষ্পের সৌরভে; নব-কিশলয়ের ও লতাবল্লরীর শ্রাম-শোভায়, মলয়ানিলের মৃদু-ব্যজনে, বিহঙ্গকুলের স্নেহ সন্মিলনাকাজ্জকাত্ত-স্বর-লহরীতে, প্রকৃতির উন্নততায় মানবের প্রাণেও উন্নততা জন্মে, সেই উন্নততাই কবিকুলের “বসন্ত বর্ণনা”র সর্বদেশে কাব্যকলা-মুখে উদগীত।

মধুমাসের মাধুরী বর্ণনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্যের দাবী রাখি না। তাহার সর্বতোমুখিনী সম্পদ ও শোভার বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ ও সময় সকলের ভাগ্যে ঘটে না। হাটে, মাঠে, গোঠে; কাননে, প্রান্তরে, উজানে, ভ্রমণ করিতে করিতে মধুমাসের যে মাধুরী আমার গগনময় চিত্তকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনার উত্তম হইয়াছি, যে সমস্ত ধীমানেরা শুধু কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে কাল কাটাইতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন না।

মধুমাসে বিশেষ ভাবে অসংখ্য পুষ্প-গন্ধই উপভোগ করি। প্রকৃতি-মাতা, যেন আমার উপভোগের জন্যই এই “সৌরভের” আয়োজন করিয়া রাখেন। তাই কি ঠিক কথা? মানুষ কি স্বার্থপর! মানুষ কি অহঙ্কারী! মানুষ “আপন” ভিন্ন কাহাকেও চিনে না। বিশ্ব-নিয়ন্তাকে এই ভাবেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে :—‘হে ঠাকুর! তোমার কি দয়া! তোমার কি স্নেহ! আমার উপভোগের জন্য কতই না আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ! আমার আহারের জন্য যেমন নানা ফল মূল কন্দে ও শস্য-সন্তানে বহুকরাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, আবার আমার নয়নে তৃপ্তির জন্য, কতই রং বেরংএর সমাবেশে ভুলোক ও ছালোককে সুসজ্জিত করিয়াছ! আহা, ফুলের কতই বর্ণ! কতই শোভা! এ ত আমারই জন্য, আর আমারই নাসিকার তৃপ্তির জন্য—পুষ্পে পুষ্পে কতই সৌরভের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, ইত্যাদি।’

বটে? সমস্ত প্রকৃতিই মানবের ভোগের জন্য এই বিপুল আয়োজন করিতেছে? মানবের কত বড় অহঙ্কার! কত স্বার্থপরতা, কত অস্বস্তিরিতাই না এই আরাধনায় গোতিত হইতেছে! ফুলগুলি আমারই জন্য, আর আমারই বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য! সৌরভের সৌরভ আয়োজন আমারই জন্য! কত বড় স্পর্ধা! ভ্রান্ত মানব! তুমিও প্রকৃতির যেমন একটি সামান্য সন্তান, ঐ নয়নাভিরাম, নাসিকা-তৃপ্তিকর পুষ্পটো তেমন একটি সন্তান। তোমার দেহে, তোমার ইন্দ্রিয়-সমূহ, তোমার মনঃ, বুদ্ধি, চৈতন্য প্রভৃতিও যেমন তোমার মানব-প্রকৃতি বা “মনুষ্যত্ব” ফুটনের বা বিকাশের উপায় মাত্র; আর ঐ পুষ্পের নয়নাভিরাম বর্ণ-বিভা, সৌগন্ধ ও অন্তর্নিহিত মধু, সমস্তই তাহার “পুষ্পত্বের” বা ঔদ্ভিদিক জীবন-বিকাশের উপাদান। তদ্বারা যে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তিসাধন হয়, তাহা একটি আনুসঙ্গিক (accidental) ব্যাপার মাত্র। আমরা যেমন শস্যাদি উৎপাদন করিয়া আমাদের “মনুষ্যত্ব” বা মানব-জীবনের বিকাশেরই চেষ্টা করি, কুমুম সমূহও তাহাদের শোভা ও পরিমল দ্বারা তাহাদেরই “পুষ্পত্ব” বা ঔদ্ভিদিক জীবনবিকাশের বা উদ্বর্তনেরই চেষ্টা করে। প্রকৃতি-সন্তান মানবে, চৈতন্য ও বুদ্ধি বিকশিত হওয়ার, “নির্বাচন” দ্বারা কখন কখন পুষ্পের “পুষ্পত্ব” বিকাশের সহায়তা করিতে পারে; এবং যদিও ভোগের জন্যই এই নির্বাচন-ক্রিয়া (selection) সম্পাদন করে, কিন্তু তাহাতে পুষ্পের পুষ্পত্বই ফুটতর হয়। আমরা যদি কুমুম-গন্ধকে কেবল আমাদের নাসিকার তৃপ্তিকর বস্তু বলিয়া মনে না করি, এবং তাহাতে পুষ্প বা, উদ্ভিদ প্রকৃতির

বিবর্তনই না দেখিতে পাই, তবে “সৌরশক্তি” কার্যকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা কি তাহাই আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। আমরা ত “বিষয়”ই উপভোগ করি, ইন্দ্রিয় সমূহ সেই উপভোগের উপায় বা সজ্জা। “রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দা অমী বিষয়াঃ” রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দই বিষয়। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়, রস আশ্বাদনেন্দ্রিয় বা জিহ্বার বিষয়, গন্ধ স্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকার বিষয়, স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বকের বিষয়, আর শব্দ শ্রাণেন্দ্রিয় বা কর্ণের বিষয়। পঞ্চ মহাভূতের (ক্টিতাপ্তেজো মরুদোম) মধ্যে ক্টিতি ধর্মই নাকি “গন্ধ”। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, ক্টিতি-স্থিত সমস্ত পদার্থের একটা না একটা গন্ধ আছে। স্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে কোনও গন্ধ অনুভূত হয়, আর কোনও গন্ধ অনুভূত হয় না। কোনও গন্ধ নাসিকার তৃপ্তিকর, আবার কোনও গন্ধ নাসিকার অতৃপ্তিকর। সমস্ত প্রকার ভৌতিক পদার্থের যে গন্ধ তাহার আলোচনা হইতে বিরত থাকিলাম। সর্ব পদার্থেরই একটা না একটা বর্ণ আছে। বর্ণও যেমন পদার্থতত্ত্বের বিষয়ীভূত, গন্ধও তদ্রূপ পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।

পাশ্চাত্য ঋষি ডারউইন্ প্রভৃতি বিবর্তবাদীগণ, পুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা কেবলমাত্র একটি কারণে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাকে কোন স্থলে “প্রাকৃতিক নির্বাচন” কোনও স্থলে “যৌন নির্বাচন” বলা হইয়াছে। আর এই নির্বাচন-প্রণালী জড় ও উদ্ভিদে সমভাবে ক্রিয়াশীল। অনেক পুষ্পের বর্ণ-বিভার উৎপত্তি নাকি ভ্রমরাদি পতঙ্গকুলের আকর্ষণের জন্ম, তাহারা আকৃষ্ট না হইলে, অনেক পুষ্পের যৌন-সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, ‘পুং’-পুষ্পের পরাগ-মাথা পতঙ্গ দেহ ঘোষিত-পুষ্পের পরিমলের সহিত সম্মিলিত না হইলে, ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা হয় না। ইহার বহু দৃষ্টান্ত মনস্বী ডারউইনের “পুষ্পাদির গর্ভাধান” (Fertilization of the orchids) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার অনেক সুগন্ধ পুষ্পের গর্ভাধান ব্যাপারে, ভ্রমরাদির ঘটকালির কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। গোলাপাদি বহু পুষ্প এই শ্রেণীর।

বর্ণবৈচিত্র্য ও উজ্জ্বল্যে যদি কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, তবে সুগন্ধে তাহারা আকৃষ্ট না হইবে কেন? পূর্বকথিত “নির্বাচন” যদি বর্ণ-বৈচিত্র্য ও তাহার উজ্জ্বল্যের প্রতি, ‘কারণ’ হয়, তবে “সুগন্ধই” বা না হইবে কেন?

• স্রাণেন্দ্রিয় না থাকিলে জীবজগতের কি ক্ষতি বা অসুবিধা হইত? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। পরন্তু অগাণ্ড ইন্দ্রিয়সমূহ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন

উত্থাপিত হইতে পারে। দর্শনেত্রি-বিহীন বা অবিকশিত বা অর্ক-বিকশিত দর্শনেত্রিয়ুক্ত জীবকুলও এই ধরনের বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়; ছুঁচো প্রভৃতি জন্তু ও অত্যাগ্র কীট যাহারা মৃত্তিকা বা ধা বাস করে, তাহারা নেত্রবিহীন অথবা অবিকশিত নেত্র-সম্পন্ন। কোনও কোনও প্রাণীর শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত অবিকশিত। ইন্দ্রিয় সমূহ “জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ” এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আত্ম-রক্ষা এবং বংশ-রক্ষা। খাওয়া-নিঃস্রবণ, গ্রহণে, অনুসন্ধান, দর্শনেত্রিয়ের প্রয়োজন, শত্রু হইতে আত্ম-রক্ষা বা পলায়নে ও দর্শনেত্রিয়ের আবশ্যিকতা শ্রবণেন্দ্রিয় ও অনেক প্রাণীকে শত্রু হইতে “আত্মরক্ষার” সহায়তা করে। জিহ্বার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। ঔদরিকেরা তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনও প্রশ্ন করিবেন না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেও অনেক প্রাণী খাওয়াখাওয়া বিনির্গম করে এবং শত্রু-মিত্র বা পালয় এবং সারমেয়াদি জন্তুর পক্ষে শ্রবণেন্দ্রিয়, জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত চক্ষু কণ্ঠ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে।

মানবের পক্ষেই বা নাসিকার প্রয়োজনীয়তা কিয় কিম্বা? পৃথিবীতে পুষ্টিগন্ধ দ্রব্যাদি মানবের হিতকর নয়। এক নাসিকাই মানবকে বর্গিক হইতে দূরে রাখা করে। আবার উপর্যোগী খাওয়া গ্রহণেরও সহায়তা করে। খাওয়ার সুস্বাদু গন্ধ বা (flavour) বলি, তাহা নাসিকা দ্বারাই উপলব্ধ হয়। রামানুজ লক্ষ্মণ-দেব, সুপ্ননখার নাসাচ্ছেদন করিয়া যে কেবল তাহার অপমান করিয়াছিলেন, তাহা নয়; তাহার খাওয়াখাওয়া নির্বাচনেরও যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিলেন। নাসারন্ধ্রের সাহায্যে শরীরিক অত্যাগ্র বহুবিধ ক্রিয়া, বিশেষতঃ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনাদি ব্যাপার সংসাধিত হয়, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। গন্ধ গ্রহণই নাসিকার মুখ্য-ক্রিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায়, শুধু জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ নয়, তাহারই প্রাণীর চিন্তাক্রিয় উন্মেষ করে। সুখ ও দুঃখাদি (pleasure and pain) অনুভূতি দ্বারাই, প্রাণীর চেতনা জন্মে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত দ্বারা অস্বতঃ অপূর্ণ ভাবেও যে উদ্ভিদাদির চৈতন্য আছে, তাহাই প্রমাণিত হয়। এবং সেই অসম্পূর্ণ চৈতন্যও যে উদ্ভিদের অসম্পূর্ণ ও ক্রিয়দিকশিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ফুটিয়া উঠে, তাহা নিঃসন্দেহ। উদ্ভিদিক ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অত্যাগ্র আবিষ্কৃত হয় নাই, এইমাত্র কথা কিন্তু তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

ভ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য কি ভাবে সম্পাদিত হয়, সেটি মনোবিজ্ঞান ও জড়-
 বিজ্ঞানের কথা। বস্তু পদার্থনির্চয়ের অণু পরমাণু বাত্যা সম্বন্ধিত হইয়া
 নাসাভ্যন্তরস্থ ত্বক্ বিশেষ উত্তেজিত করিলেই ভ্রাণোপলব্ধি হয়। এই মতানুসারে
 স্পর্শেন্দ্রিয় ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—অর্থাৎ এতদুভয়
 ইন্দ্রিয়ের কার্যেই বাহুবস্তুর সহিত মানবদেহের সংস্পর্শ আবশ্যিক। এই মতের
 সমীচীনতা, অসমীচীনতা সম্বন্ধে কোনও বিতর্ক উপস্থিত না করিয়াও ইহা বলা
 যাইতে পারে যে, বস্তুর যে কোনও পরমাণু বা অণু সংস্পর্শেই ভ্রাণেন্দ্রিয়
 উদ্বোধিত হয়। বস্তুর কি জাতীয় অণু পরমাণুর সংস্পর্শে “ভ্রাণ” পাই তাহা
 বলা বড় সুকঠিন, এ সম্বন্ধে আমার বিজ্ঞ বন্ধু শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়
 তাঁহার সুলিখিত ‘গন্ধশীর্ষক’ প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য ও জ্ঞাত, সমস্ত বিষয়ই অতি
 বিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। গন্ধবিকীরণ সম্বন্ধে তিনি
 বলিয়াছেন—“গন্ধবিকীরণে solid particle ঘন কণা সমূহ বায়ু কর্তৃক সঞ্চারিত
 হওয়া আবশ্যিক নহে। গন্ধ উৎপাদক বস্তু বাষ্পজাতীয় বা বায়বীয়।” তাহা হইলেও
 ইহা দ্বারা অণু পরমাণুর সংস্পর্শ অস্বীকৃত হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন,
 “ফরাসী পণ্ডিত ~~একটি গন্ধবিকীরণে~~ ~~কি পরিমাণ অণু ক্ষয় হয়, তাহা নির্ধারণ~~
~~জন্য এক গ্রেণ্ কস্তুরী ২০ বৎসর কাল~~ ~~স্বাধীন দিয়াছিলেন, কিন্তু~~
 ওজন করিয়া দেখা গেল, ঠিক এক গ্রেণই আছে, ওজনে ধরা পাড়িতে পারে, এমন
 কিছুই কমে নাই। এ বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান আবশ্যিক।” তবেই ত
 গোল। বায়বীয় বা বাষ্পজাতীয় পদার্থের ত ওজন আছে, তাহাও অণু পরমাণুর
 সমবায় বা সংহতি। আমার বোধ হয়, এই ভ্রাণোৎপাদনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া
 এতই সুক্ষ্ম যে, তাহার ঠিক প্রকৃতি কোন যন্ত্রের সাহায্যে বা কৌশলে অত্য়পি
 নির্ণীত হয় নাই। বন্ধুবরের কল্পিত “microofactrometer” সুক্ষ্ম-গন্ধ-মান-
 যন্ত্র কবে আবিষ্কার হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। প্রাচীন এক মত আছে যে,
 জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে প্রতিনিয়ত গন্ধোৎপাদক কতগুলি অণু পরমাণু বায়ুর
 সহিত সর্বদাই বিকীরিত হইতেছে, সেই অণু পরমাণুর ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে
 আসিলেই ভ্রাণোপলব্ধি হয়, ইহাই “effluvia theory”।

সমস্ত পদার্থের বর্ণও যেমন বিভিন্ন, গন্ধও তেমন বিভিন্ন। মানবের চরিত্রও
 যেমন বিভিন্ন, তাহার গন্ধও তেমন বিভিন্ন, উদ্ভিদ সম্বন্ধে যৌন-সম্মিলনে
 “সুগন্ধের” প্রয়োজনীয়তা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। পশুদিরও যৌন-
 সম্মিলনে “গন্ধের” ব্যবহার অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; গন্ধই অনেকস্থলে

যৌন-সম্মিলনাকাজকার উদ্দীপক বা কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজক। মনুষ্যও এই পশু-ধর্মেরই বশবর্তী।

বিশ্ব-বিশ্রুত পাশ্চাত্য লেখক, প্যারিস মেটারলিক্, সুগন্ধ শীর্ষক এক প্রবন্ধে পুষ্পসার বা সুগন্ধ নির্যাস বহিকরণের প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গাজিপুরের গোলাপনির্যাস ও আতর বহিকরণ প্রণালীর বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন। সে প্রণালী পাশ্চাত্য প্রণালী হইতে অনেক বিভিন্ন। মেটারলিক্ বর্ণিত প্রণালীটি এই—বিরথানার গৃহটির মেজের উপরে পুরু জমাট চর্কি থাকে। তাহার উপরে সহস্র সহস্র পুষ্প ছড়াইয়া রাখা হয়, ঐ জমাট চর্কি কিছুকাল পুষ্পসার গ্রহণ করে, পরে সেই ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই প্রকার কয়েক বার পুষ্পসার গ্রহণ করার পরে, সেই চর্কির আর পুষ্পসার গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। সেই পুষ্পসার-পায়ী চর্কি হইতে, পুষ্পসার বহিকরণ ব্যাপার সহজ নহে, যে সে উপায়ে তাহা সংসাধিত হয় না, তদুপরি সুরা ঢালিয়া দিলে, সেই পুষ্পসার নিকাসনোপযোগী হয়। চর্কিও মদ মত্ত বা “মাতাল” না হইলে, সেই আভ্যন্তরিক পুষ্পসার পরিত্যাগ করে না। যখন অনেক সময়ে মানুষকে মাদক দ্রব্যের সাহায্যে মদ মত্ত করিয়া গুপ্ত ও সন্দেহপূর্ণ বাহির করা হয়, তখন চর্কি হইতে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন পুষ্পসার বাহির করা হয়।

দ্রব্যের গুণ যদি আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিকতার (spirituality) অনুরূপ বা কথঞ্চিৎ সমধর্মাবলম্বী থাকে, তাহা “গন্ধ”। অপরের এই আধ্যাত্মিকতা (spirituality) অনুভব করিতে যেমন বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক, “সুগন্ধ” গ্রহণের ক্ষমতা তেমন মানসিক শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের উপর নির্ভর করে। অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকে অনেক সুগন্ধের আদর করে না, বা সৌরভ উপভোগ ও অনুভব করিতে পারে না, যে সমস্ত সুরভি পুষ্প শিক্ষিত ও সভ্যজনের চিত্ত আকর্ষণ করে, সে সমস্ত প্রাকৃতজনেরা উপেক্ষা করে। শিশুগণ যেমন রংএর ঔজ্জ্বল্যে ও গন্ধের তীব্রতায়ই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ, স্বপ্ন-বিভেদ বা গন্ধের কোমল মাধুরী ইত্যাদি দ্বারা তদ্রূপ আকৃষ্ট হয় না, অসভ্য ও অশিক্ষিত জনগণও তদ্রূপ বর্ণ বা গন্ধের স্বপ্ন বা কোমল মাধুরী উপভোগ করিতে পারে না। যদি কেহ এই প্রসঙ্গ করেন যে, কুকুরাদি জন্তুগণ যে গন্ধ অনুভব করে তাহা ত মানবকুল কখনও পারে না; তদ্বত্তরে এই বলা যায়, তাহারা যে সৌগন্ধ ও সৌরভ অনুভব করিয়া সুখী হয়, ইহার প্রমাণ নাই। ইহা সকলেই

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এক সময়ে মৃগন ভি কস্তুরী ও তীব্র গন্ধ আতরের
 যে প্রকার আদর ছিল, গোলাপ যুঁই মঙ্গী বেল প্রভৃতি পুষ্পের মৃহ ও
 কোমল গন্ধে জনসমূহ সেরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। স্বল্প মৃহ ও কোমল গন্ধ
 গ্রহণের শক্তি মানবের শিক্ষা-কর্ষিত মানসিক শক্তির উপচয়ের উপর নির্ভর
 করিতেছে। সুতরাং ভ্রাণেন্দ্রিয়কে ক্ষুণ্ণকর্ণাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানেন্দ্রিয়
 বলিলে চলিবে কেন? ভ্রাণেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে এই আপত্তিও হইতে পারে যে,
 ইহা দ্বারা কোনও ললিত কলার উপভোগই সম্ভাবিত নহে। চক্ষুদ্বারা চিত্র,
 নৃত্য, নাট্য, স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতি কণ্ঠ উপভুক্ত হয়, কণ্ঠ দ্বারা সংগীত, কাব্য-
 কলা উপভোগ করা যায়, নাসিকা দ্বারা ত কোনও ললিত কলাই উপভোগ
 করা যায় না। এই আপত্তির বিলতা ও যুক্তিমত্তা অস্বীকার করা যায় না।
 কিন্তু আমরা ইহা কি মনে করিতে পারি না যে, নানা প্রকারের সুগন্ধি
 পুষ্পাদির সমাবেশে এক নূতন কলার সৃষ্টি হইবে? ইহাও কেহ বলিতে
 পারেন যে, “সুগন্ধ” ত বিলাস সামগ্রী, উহা পরিবর্জনীয়। কঠোর যোগ-
 মার্গাবলম্বীরা “সক সন্দনাদি” গন্ধদ্রব্য পরিহার করিয়া থাকেন, কারণ উহা
 যোগবিঘ্নকারী এবং ~~কিছু কিছু দ্রব্য~~। কিন্তু বিলাসবাসীরা ~~উহা~~
 পাদনেই শিক্ষা ও সভ্যতার অধিকাংশ আয়াস ও প্রয়াস পর্যাবসিত! যাহাকে
 আমরা ব্যবহারোপযোগী (useful) বলি, তদুৎপাদনে আর মানবের কত
 বুদ্ধি প্রয়োগের আবশ্যিক হয়? মাধুরী ও সৌন্দর্য্যোৎপাদনেই ত মানবের
 বিশেষত্ব! বিজ্ঞানবলে মানব যেমন নানা প্রকার কৃত্রিম রংএর সৃষ্টি করিতেছে,
 তেমন বহুবিধ কৃত্রিম গন্ধও উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কৃত্রিম কপূরই
 ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

পুত্র-দায় ।

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।]

(১)

আমড়াগাছির তারিণীবাবু শেষে পুত্রদায়ে ঠেকিলেন। লোকে কল্পাদায়ে
 ব্যস্তিব্যস্ত হয়, কিন্তু তারিণীবাবুকে পুত্রদায়ের অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুড়ু
 খাইতে হইল।

আজি কালিকার দিনে এ দেবী কথটা সম্পূর্ণ নূতন এবং নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হইতে পারে। সুতরাং ইহার একটু পূর্কীভাস দেওয়া আবশ্যিক।

পুত্র শিবনাথ যখন প্রবেশিকা-সময় উত্তীর্ণ হইয়া এফ-এ উপসাগরে পাড়ি জমাইতেছিল, তখন গাংপুরের অমর চৌধুরী অনেক সাধ্যসাধনার পর নগদ দেড় হাজার ও সাড়ে সাত শত টাকা গহনার সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া নলিনীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিয়া সংসার-সংসারের একটা প্রশস্ত খাড়ির কূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কূলে যে 'কণ্টক তরু' ছিল, তাহা তিনিও জানিতেন না, বৈবাহিক তারিণীবাবুও জানিতেন না; জানিতেন কেবল অদৃষ্টচক্রের নিয়ামক সর্বস্ব বিধাতা।

তারিণীবাবুর বিষয় সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ, তেজারতী কারবার এ সকলই ছিল, ছিল না কেবল হৃদয় নামক অদৃশ্য মূল্যবোধ। তা না থাকিলেও গ্রামের মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক; তাঁহার মত ধনী গ্রামে আর কেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার গৃহিণী আশ্রয় করিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহে বৈবাহিকের নিকট একটা গোটা না হউক, অর্ধেক রাজস্ব নিশ্চয়ই পাওয়া আসিল না, এবং ফুলশয্যায় যে জিনিষ পত্র আসিল, শুভামুখ্যায়িনী প্রতিবেশিনী-দিগের হিসাবে তাহার মূল্য সাড়ে এগার গুণা টাকার এক পয়সাও বেশী হইল না। ইহাতে তাঁহার হৃদয় নিহিত ক্রোধরাশি বিবুবিয়াসের প্রচণ্ড অনলোদগারের জ্বাল তীব্র বহ্নিশিখা বমন করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত অনলশিখায় কোমল-প্রাণা নলিনী দগ্ধ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই চারিটা উত্তপ্ত শিলাখণ্ড উর্দ্ধোৎক্লিষ্ট হইয়া গাংপুরে অমর চৌধুরী ও তদীয় গৃহিণীর মস্তকে পড়িতে থাকিল।

ইহার উপর আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। বিবাহের চারি মাস পরে তারিণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটি প্লীহার অতিরিক্ত ক্ষীণিতে উদর মাত্র সার হইয়া চারি বৎসর বয়সেই সংসার-যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। তাহার এই অকাল-মৃত্যু অল্প দোষটা কিন্তু প্লীহার ঘাড়ে পড়িল না, পড়িল নববধু নলিনীর ঘাড়ে। গৃহিণী কাঁদিয়া, কর্তার পায়ে মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, কি রাক্ষসী বৌ ঘরে আনলে গো, আমার সোণার গোপালকে নিশ্বাসে ছাই করে দিলে।"

কর্তা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায় হায়, তখন যদি কোষ্টটা দেখাতাম!"

এক বৎসরের মধ্যে অমরনাথ অনেকগুলি তত্ত্ব করিলেন। পাড়ার লোকে আপনা-আপনি বলাবলি করিত, 'এমন সব জিনিষ তারিণীবাবুর বংশে কেহ কখন দেখে নাই।' কিন্তু গৃহিণী বলিতেন, 'সকল তাঁহার পাদস্পর্শের যোগ্য নহে। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি বৈবাহিক বৈবাহিকার নীচতা স্বরণপূর্বক এমন সকল কথা বলিতেন, যে সকল কথা নলিনীর অন্তরে শেলের ছায় বিদ্ধ হইত।

কেবল শত্রুর শাণ্ডীর নিকট নহে, মায়ীর নিকটেও নলিনী ঘৃণা ও বিরক্তি ব্যতীত আর কিছু পাইত না। মৃত্যুতন্ত্র শিবনাথ মাতুর সন্তোষের জন্ত নিরপরাধা নলিনীকে কথায় কথায় 'এমন' মর্ষপীড়া প্রদান করিত, যাহাতে নলিনী এই চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই হিম্মতের সকল ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্ত লালায়িত হইত।

সোণায় সোহাগা মিশিল। বৎসরান্তে শিবনাথ এফ-এ পরীক্ষা দিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে তাহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শিবনাথের বন্ধুবান্ধবেরা ইহার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত যে, দিবসে কবিতা লিখিয়া, রাত্রে ~~কবিতা লিখিয়া~~ ~~কবিতা লিখিয়া~~ ~~কবিতা লিখিয়া~~ ~~কবিতা লিখিয়া~~ ~~কবিতা লিখিয়া~~ কোনও সহৃদয় পরীক্ষকই পরীক্ষার্থীকে পাশের তালিকায় ফেলিতে পারেন না। কিন্তু শিবনাথের মাতাপিতা এত কথা বুঝিলেন না, তাঁহারা অলক্ষণা বধুর ক্ষেই পুত্রের এই অকৃতকার্যতা রূপ দোষের আরোপ করিয়া নলিনীর উপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন।

ক্রমে উৎপীড়ন এতই চলিতে লাগিল যে, সন্নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগেরও তাহা ঘসফু হইল। তাহারা গোপনে অমরনাথকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু অমরনাথ এখন আসিলেন, তখন সব ফুরাইয়াছে, নলিনী অহিফেনের প্রসাদে বঙ্গের ফুর্সহ বধুজীবন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

অমরনাথ অগ্নে ছাড়িলেন না, তিনি পুলিশে সংবাদ দিয়া একটা গোলযোগ পাধাইলেন। কিন্তু তারিণীবাবুর অর্থের মর্হিমায় সে গোলযোগ সহজেই মিটিয়া গেল। অমরনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন। আর তারিণীবাবু প্রতিবাসিগণের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের অনিষ্টকামনায় ক্ষুণ্ণিকর হইলেন।

(২)

পতিবিয়োগে পত্নীর ব্রহ্মচর্যের বিধান আছে। কিন্তু পত্নীবিয়োগে পতির

শুমারীর দায়পরিগ্রহের নিবেদন করেন শাস্ত্রেই লাই। বিশেষ, বাঙ্গালীর ছেলের অন্নভাবে দুই দিন উপবাস ছিলো চলিয়া যায়, কিন্তু বিবাহ না করিলে এক বেলাও চলে না। সুতরাং বধুর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তারিণীবাবু পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন।

চারিদিকে ঘটক ছুটিল। বাঙ্গালী দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অভাব নাই। তাহারা দলে দলে আসিয়া সমস্তই তারিণীবাবুর দ্বারস্থ হইতে লাগিল। তারিণীবাবু প্রতিবাসীদিগকে টিটকারী দিয়া বুক ফুলাইয়া আপনার যোগ্য কুইয়ের নির্বাচন করিতে লাগিলেন।

কক কবহারে মর্গাহত প্রতিবাসীরাও এই সময়ে একটা বড় রকমের প্রতিশোধ লইল। তাহারা কখন গোপনে, কখন প্রকাশে আগন্তুক ভূদ্রলোকদিগের নিকট তারিণীবাবুর প্রথম বধুর মৃত্যুকাহিনী সালঙ্কারে কীর্তন করিতে লাগিল। শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া পড়িল। কন্যাদার দুর্ব্বহ হইলেও বধুহস্তার গৃহে, পত্নীঘাতকের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইল না। ঘটকেরা হাল ছাড়িয়া দিল, তারিণীবাবু প্রমাদ গণিলেন।

~~সমস্তই পিতার মৃত্যুর পুত্রপিতা~~ ~~কন্যাদার~~ ~~এম~~ ~~যেন~~ ~~কতকটা~~ ~~রুবিতে~~ ~~পারিল।~~ ~~তাহার~~ ~~উপর~~ ~~কন্যাপক্ষদিগের~~ ~~নিকট~~ ~~বার~~ ~~বার~~ ~~প্রত্যাখ্যাত~~ ~~হইল।~~ ~~যখন~~ ~~সে~~ ~~প্রতিবেশীদিগের~~ ~~কাছেও~~ ~~দুই~~ ~~একটা~~ ~~টিটকারী~~ ~~খাইল,~~ ~~তখন~~ ~~অপমানে~~ ~~লঙ্কার~~ ~~অনুভবে~~ ~~তাহার~~ ~~হৃদয়~~ ~~যেন~~ ~~জলিয়া~~ ~~উঠিল।~~ ~~মাতৃভক্ত~~ ~~পিতৃভক্ত~~ ~~শিবনাথ~~ ~~মাতাপিতার~~ ~~উপর~~ ~~খড়নহস্ত~~ ~~হইয়া~~ ~~উচ্ছ্বলতার~~ ~~পথে~~ ~~পদার্পণ~~ ~~করিল।~~

তারিণীবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, এবং কিরূপে এই ভীষণ পুত্রদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন।

(৩).

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তারিণীবাবুর ভেজারতী কারবার ছিল। গ্রামের অনেকেই তাঁহার খাতক। ইহাদের মধ্যে বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় একজন। বিধুবাবু কলিকাতায় সামান্ত বেতনে চাকরী করিয়া কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রথম কন্যা লীলাবতী যখন বিবাহযোগ্য হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাকে তারিণীবাবুর নিকট শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদে চারি শত টাকার এক তমুতক লিখিয়া দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে হইল।

সে আত্ম তিন বৎসর আগেকার কথা। বিধুবাবু এই তিন বৎসরে বহুকষ্টে মাস মাস সুদ মিটাইয়া দিয়া আসলে দেড় শত টাকার ওয়াশীল দিয়াছেন।

সুদ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বিধুবাবু আশা করিলেন, আর দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি অর্থী হইতে পারিবেন। কিন্তু তার একটা বৎসর পার হইবার পূর্বেই দেখিলেন, দ্বিতীয়া কন্যা বিমলা ছাদম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আর বিবাহ না দিলে নয়। পুরাতন ঋণের উপর নূতন ঋণ-ভার চাপিবার উদ্যোগ হইল। কিন্তু সে ভারের আশঙ্কায় কোন্ দ্বিতীয়া নিরস্ত হইয়া থাকিতে পারে? থাকিলেও চলে না, সমাজের তীব্র ক্রোধাত আসিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে।

বিধুবাবু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন। একটা দরিদ্র অন্নবিশ্ব পাত্র মনোনীত করিলেন। কিন্তু তাহাও তিন চারি শত টাকার কীমে নির্বাহ হইবে না। বিধুবাবু ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া দেড় শত টাকার যোগাড় করিলেন, বাকী দুই শতের অল্প তারিণীবাবুর শরণাপন্ন হইলেন।

সন্ধ্যার পর তারিণীবাবু বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন; নিকটে ছিল রামরূপ ঘোষাল। তারিণীবাবুর ভাণ্ডে মধু তরা ছিল, সুতরাং সকালে সন্ধ্যায় অনেক মক্ষিকা তাঁহার পাশে বসিয়া অবিরাম গুণ-গুণ ধ্বনি করিত। আজি কিন্তু আষাঢ়ের হর্যোগময়ী সন্ধ্যায় মক্ষিকার দল মধুর আশা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কুটারে আশ্রয় লইয়াছিল, কেবল রামরূপের পাশেই একা একা বসিয়া বসিয়াছিল। সে মধুর গুঞ্জে তারিণীবাবুর শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছিল, এবং তাঁহার প্রসাদী তাম্রকূটের উদ্ভাবনেষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছিল।

বিধুবাবু আসিয়া নমস্কার করিয়া এক পাশে স্থান গ্রহণ করিলেন। এক পরস্পর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তারিণীবাবুর নিকট আপনার কস্তাদারের ভীষণতা বিবৃত করিয়া দুই শত টাকা ঋণ-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া তারিণীবাবু ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, “টাকা দিতে তো আমার আপত্তি নাই, কিন্তু শুধ্বে কিসে? সাবেক বাকী এখনও আড়াই শো।”

বিধুবাবু অবনত মস্তকে বলিল, “তা হোক, আমি বেঁচে থাকতে আপনার এক পরস্যাও পড়বে না।”

রামরূপ বলিয়া উঠিল, “নিশ্চয়. নিশ্চয়। পরস্যা নাই বটে, কিন্তু বিধুবাবুর মত ধর্মভীরু লোক আজকাল জায় দেখা যায় না। তা’ আপনার মেয়ের বিয়েটা কোথায় ঠিক করলেন?”

অতঃপর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া রামরূপ বরের গাঁইগোত্র, কুলশীল, বিষয় আশয়, এমন কি কোন্ দিনে কোন্ লগ্নে বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহা

পর্যন্ত জানিয়া লইলেন। সমস্ত জানিয়া লইয়া একটু চিন্তার পর তারিণীবাবুর মুখের দিকে ঈষৎ কটাক্ষ বিক্রম করিয়া রামরূপ বলিল, “কিন্তু বিধুবাবু, আপনার যেমন মেয়ে, তার উপযুক্ত পাত্র হইল না।”

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, “কি করব বলুন, আমার যেমন অবস্থা।”

রাম। কিন্তু এ যেন বানরের গলার মুক্তার মালা দেওয়া হল। বুঝলেন তারিণীবাবু, যেন বানরের গলার মুক্তার মালা।

রামরূপের হাতে হুকটা দিয়া তারিণীবাবু সহাস্তে সিজ্ঞাসা করিলেন, “বল কি? মেয়েটা খুঁই সুন্দরী না কি?”

রামরূপ বলিয়া উঠিল, “পরমা সুন্দরী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরণ। সুন্দরী এবং বয়স্হা। আপনি যেমন খোঁজেন ঠিক তেমনটা।”

তারিণীবাবু মুছ হাসিলেন, বিধুভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন।

রামরূপ বলিল, “এক কাজ করলে হয় না তারিণীবাবু? আপনি তো আজ এক বৎসর ধরে সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি বলি, এই মেয়েটাকে ঘরে আনুন না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিধুবাবুর অবস্থা ভাল নয় বটে, তা আপনিও ভেবেছেন আপনার প্রত্যাশা বিধুবাবুর। আর আপনার অভাবই বা কি! আপনি কি বলেন বিধুবাবু?”

মস্তক কণ্ঠন করিতে করিতে বিধুভূষণ বলিলেন, “আমার তেমন ভাগ্য কোথায়?”

রাম। ভাগ্য! আপনার মত ভাগ্য কার? মেয়েটাকে তারিণীবাবু একবার দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বলছি “সব ঠিক। আপনার একটা পয়সা খরচ লাগবে না। তা হলে যে দিনটা ঠিক ক’রেছেন, ঐ দিনেই কাজ সেরে ফেলুন না?”

ভীতিবিকম্পিত কণ্ঠে বিধুভূষণ বলিলেন, “তা হয় না রাম খুড়া।”

চক্ষুর্ধ্ব বিস্ফারিত করিয়া রামরূপ বলিল, “হয় না? কেন, বাধা কি?”

বিধু। উনি স্বভাব, আমরা বংশজ।

রামরূপ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, “এই কথা! ওর অস্ত্র আটকাবে না। কুলীন বংশজ তো শাস্ত্রের বিধান নয়, ওটা বঙ্গালের একটা শয়তানী। আজকাল আর ও সব কেউ মানে না, তারিণীবাবুও মানুষের চান না।”

শঙ্কিত নেত্রে তারিণীবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিধুভূষণ বলিল, “উনি না মানলেও আমি মানি। জেকো শুনে আমি ঠুর কুল নষ্ট করতে পারব না।”

সহসা সেস্থানে বজ্রপাত হইলেও রামরূপ এতটা স্তম্ভিত হইত কি না সন্দেহ, কিন্তু বিধুভূষণের তেজোগর্ভপূর্ণ কণ্ঠস্বরে সে তদপেক্ষা স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া নীরব হইল। তারিণীবাবুর মুখে আঘাচের মেঘের ঘন ছায়া পড়িল।

• বিধুভূষণ উঠিয়া শুক মুখে একটা নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে তারিণীবাবু সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “মিছে এই অপমানটা করালে ঘোষাল?”

অপরাধীর গায় সত্তর দৃষ্টিতে তারিণীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রামরূপ উত্তর করিল, “তা বটে। কিন্তু কে জানত যে, লোকটার এত অহঙ্কার।”

তারিণীবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রামরূপ বলিল, “এখন উপায়?”

তারিণীবাবু বলিলেন, “উপায় আছে। যখন কথাটা তুলেছ, তখন সহজে ছাড়ি না। কুঁদের মুখে পড়লেই সব সোজা হয়ে যাবে।”

(৪)

বিধুভূষণ বুঝিতে পারিয়া ~~তারিণীবাবুর মুখে~~ ~~উঠিয়া~~ ~~বজ্ররূপে~~ ~~তাঁহার~~ ~~মস্তকে~~ ~~পতিত~~ ~~হইবে।~~ ~~কণ্ঠার~~ ~~বিবাহ~~ ~~দূরের~~ ~~কথা,~~ ~~হয়~~ ~~ত~~ ~~পৈতৃক~~ ~~জমিজমা,~~ ~~বাস্তুভিটা~~ ~~সব~~ ~~ছাড়িয়া~~ ~~দেশত্যাগ~~ ~~করিতে~~ ~~হইবে।~~ ~~এতটা~~ ~~বুঝিয়াও~~ ~~বিধুভূষণ~~ ~~সঙ্কল্পচ্যুত~~ ~~হইলেন~~ ~~না।~~ ~~মনে~~ ~~মনে~~ ~~প্রতিজ্ঞা~~ ~~করিলেন,~~ ~~সর্বস্ব~~ ~~যায়~~ ~~ঘাউক,~~ ~~মেয়ে~~ ~~আজীবন~~ ~~কুমারী~~ ~~হইয়া~~ ~~থাকে~~ ~~তাহাও~~ ~~স্বীকার,~~ ~~তথাপি~~ ~~বধূঘাতী~~ ~~পাপিষ্ঠ~~ ~~তারিণীচরণের~~ ~~গৃহে~~ ~~কণ্ঠা~~ ~~দিব~~ ~~না।~~

• সমাজে বিধুভূষণের গায় পিতার আধিক্য হইলে তারিণীবাবুর মত লোকের যথেষ্ট শিক্ষা হইতে পারে।

• বিধুভূষণের অনুমান মিথ্যা হইল না, অচিরাৎ দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে নালিশ রুজু হইল, এবং এক মাসের মধ্যেই তারিণীবাবু মায় খরচা তিন শত তিয়াত্তর টাকা পাঁচ আনা তিন পাই ডিক্রী পাইলেন।

তারিণীবাবুর শুভানুধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ কেহ বিধুভূষণের মঙ্গল কামনার আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল যে, এখনও যদি বিধুভূষণ তারিণীবাবুর পুত্রের হস্তে বিমলাকে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তারিণীবাবু তাহার সকল দোষ ক্ষমা করিতে পারেন; এমন কি, তাঁহারা বলিয়া কহিয়া বিধুভূষণকে ঋণমুক্ত করিয়াও দিতে পারেন। ইহার অন্ত্যধার তাহার সর্বনাশ সুনিশ্চিত।

বিধুভূষণ অকিঞ্চল ভাবে উত্তর দিলেন, “তারিণীবাবুর যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন ; আমি দেশত্যাগ করিব, তথাপি তাহার ঋণ নারীহস্তার গৃহে কণ্টা দান করিব না ।”

শুভাহুধ্যারিবর্গ বিধুভূষণের একই তাবী বোরতর অমঙ্গল করনা করিয়া স্মিরবাণ চিন্তে নিরস্ত হইলেন ।

এদিকে বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনের আর বিলম্ব নাই । বিধুভূষণ বহু কষ্টে অন্তহান হইতে টাকার বোগাড় করিয়া কস্তার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন, অপর দিকে মর্মান্বিত তারিণীবাবু ইহার প্রতিকূল চেষ্টায় প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি প্রথমে বরপক্ষীর নিকট ছই চারিটা মিথ্যা সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন তাহার নিরস্ত হইল না, তখন আপনার মানসম্মত বজার রাখিবার জন্য তারিণীবাবুকে কোমর বাধিয়া লাগিতে হইল । বিধুভূষণ অসহায়ের সহায় ভগবানকে স্মরণ করিয়া বিবাহের উত্তোগ করিতে লাগিলেন ।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পূর্বে বিধুভূষণ শুনিল, গ্রামের জনপ্রাণীও আর তাহার ঘরে আসিবে না । কারণ তাহার ~~কন্যা~~ ~~অনুচাবহার~~ ~~রজস্বলা~~ ~~হইয়াছে,~~ ~~সুতরাং~~ ~~বিধুভূষণ~~ ~~স্বামী~~ ~~তারিণী~~ ~~বাবুর~~ ~~কন্যা~~ ~~পতিতা~~ । পাপীর গৃহে আসিয়া কে তাহার ঋণ গ্রহণ করিবে !

বিধুভূষণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । এ সকলই যে তারিণীবাবুর চক্রান্ত তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না । বিধুভূষণ গিয়া গ্রামের অনেকের নিকট কাঁদাকাটা করিল, তাহাদের পায়ে হাতে ধরিল । কিন্তু ফল কিছুই হইল না । সকলের একই উত্তর, “পাঁচ জনকে বল, পাঁচজন ছাড়া তো হতে পারি না !”

কিন্তু সেই পাঁচ জন যে কে, তাহা কেহই দেখাইয়া দিতে পারিল না । অগত্যা বিধুভূষণ নিরস্ত হইয়া বিপদে বিপদভঞ্নের পদে আত্মসমর্পণ করিল ।

(৫)

সন্ধ্যার পরেই বাজনা বাজাইয়া, রঙমসাল জ্বলাইয়া বর আসিল । বিধুভূষণ অন্তরে দুর্মানাম জপিতে জপিতে বরধাত্রগণের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন । কিন্তু বরধাত্রীরা গ্রামের আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । তাহাদের মধ্যে ছই চারিজন সূচতুর লোক গোপনে অহুসন্ধানের জন্য প্রতিবেশীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে যাহা শুনিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া ত্রাড়াত্রাড়ি আসিয়া বরকর্তাকে জানাইলেন । বরকর্তা

নির্দারনের জন্ত গ্রামের জনৈক পরিচিত ডুডুহোকের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাঁহার মুখে প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া তিনি ছুটাছুটা যখন বিধুভূষণের বাড়ীতে আসিলেন, তখন বরষাত্রী সকলেই চলিয়া গিয়াছে । তারিণীবাবু বিপন্ন বিধুভূষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় দিতেছে ।

অমরনাথের দস্তোক্তি শ্রবণে তারিণীবাবু বিকট ক্রভঙ্গী করিয়া অমরনাথের দিকে চাহিলেন । কিন্তু অমরনাথ তাহাতে :দৃকপাত না করিয়া এক হাতে পুত্রের হাত অপর হস্তে বিধুভূষণের একটি হাত ধরিয়া বলিলেন, “এই লউন বিধুবাবু, আমার পুত্রকে ; ইহাকে কত্তা-সম্প্রদান করিয়া আপনার আতিথ্য রক্ষা করুন ।”

বাটার ভিতর মঙ্গলশঙ্খ সশব্দে বাজিয়া উঠিল । তারিণীবাবু বজ্রাহতের ছায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন । *

দীপালী ।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে ।]

মন্দিরে মন্দিরে আজি শোভে শ্রামাগ্রিনী,
উৎসবের উপাচারে মহা কোলহল,
সোহাগললিত ছন্দে স্ততি পুরোহিত
অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে দিতেছেন সবা-রক্তদল ।

গৃহে গৃহে শব্দ যন্তা কাসর নিনাদ
তুলসীর বেণীমকে মঙ্গল আয়তি
কেউলে কেউলে শোভে সহস্র প্রদীপ
দীপালীর মহাধ্বন শ্রামাপূজা রাস্তি ।

পথে পথে পূর্ণকৃত পল্লবেতে ঘেরা
যক্তিয সিঁদুর তাঁর আলিছে উজ্জল,
অদূরে গহনে বনে প্রতি শাখী শাখে—
দীপালীতে বাস্তি আলো জোনাকীর দল ।

গগন মগন ঘন ঘোর অমানিশা
তারকা আলিছে দীপ নীল শাড়ী পরি'
মহোন্মাদে হৃদিপদ্ম কুটি ওঠে মোর—
মুকুনেজে হেরে অই দীপ্ত বিভাবরী !

প্রতিকোণে প্রতিদিকে আকাশে অনিলে
ঘাটে ঘাটে তটে মাঠে জাহ্নবীর নীরে,
আলাইয়া লক্ষ দীপ অই মর্ত্যবাসী—
পরিহাস করে সবে মহান্ তিথিরে ।

অলে মহা হোমানল নৃপবিজ্ঞ হবি
রক্তমুখী অমানিশা পুলক বিহ্বল
হরবে হরবে অলে ধমনীর শিখা
শ্রামাগ্রী বোড়নী আজি কণক উজ্জল ।

শ্রী শ্রীকালীপূজা রহস্য ।

[“ও-পারের কথা”র লেখক ।]

নিজ নিজ সংস্কার, শিক্ষা ও অভিরুচি মত কোন কোন জীব ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকেন, আর কেহ কেহ এ কৰ্ম সাধন করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। যাহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধ করেন যে, ভগবান্ সশরীরে দেখা দিয়া তাঁহাদের যাবতীয় সাধ পূর্ণ করেন। আর যাহারা সাধন-ভজন কর্ষে বীতরাগ, ভগবান্ কর্তৃক বা যে কোন উপায়ে তাঁহাদের যাবতীয় অভাব ও অশান্তি বিদূরিত হইলেই তাঁহারা আপাততঃ পরিতুষ্ট থাকেন। উভয় পক্ষের জীবেরা মর্ষে মর্ষে না হউক, মুখের কথায় বুঝেন যে ভগবান্ই জীবের মা, বাপ ও স্বামী ও তাঁহারই লীলায় জীবের যাহা কিছু দুর্গতি। জীবের দুঃখভার হ্রাস না হইয়া যখন তাঁহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে চলিয়াছে ~~যখন যাহার পক্ষি-বৎসল-সদৃশ উপায়~~ হইতেছে না, ইহাও প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তখন জীবের কি ভাবে চলা বিধেয়? যাহারা মুখের কথায় দায়িত্ব মোচন করিতে প্রয়াসী নহেন, তাঁহারা গোপনে জগতের কল্যাণকামনায় আপনাদিগকে বিক্রীত করেন।

এ বিশ্বের আদৎ মালিক ব্রহ্ম। এক ব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত—নিগুণ ও সগুণ। পরমাত্মা নিগুণ ব্রহ্ম। বিরাট প্রকৃতি, বিশাল মন ও মহামায়া—সগুণ ব্রহ্ম। শ্রীশ্রীকালী বিরাট প্রকৃতির বা সগুণ ব্রহ্মের সসীম বা ধারণাগম্য মূর্তি। জীব সগুণ বলিয়া বিরাট প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। যতদিন দেহ-বুদ্ধি, জ্ঞান ও বর্ণভেদ বুদ্ধি, আমি-তুমি-বুদ্ধি ইত্যাদি ভেদাভেদ বুদ্ধি জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান, তত দিন জীব কেবল মনের দ্বারাই পরিচালিত। যতদিন গড়া-ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা-গড়া কর্ষে জীব প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন যে কেবল বিরাট প্রকৃতির ধারায় চলিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

কর্ষ ও ক্রমবিকাশ জগতের বিধান। বিরাট প্রকৃতিরই এই দুই বিধান। সুতরাং-জীবকেও এই দুই বিধানে চলিতে হইবে। জীব ইহজীবনে যাহা কিছু কর্ষ সম্পাদন করেন, সেই সেই কর্ষ করিয়া ইহজীবনের ও পরজীবনের সুখ ও শান্তিলাভের প্রত্যাশা রাখেন। ইহজীবনের সুখ ও শান্তি চাহেন না—

এ প্রকার জীবের সংখ্যা অতি কম জীব যেন অগুণে পূর্ণ, প্রত্যেক জীবই কম-বেশী সংগুণে বিস্তৃত। তবে ঘটনাচক্রে পড়িয়া বা সঙ্গ বা শিক্ষাপ্রভাবে প্রত্যেক জীবের অগুণ বা সংগুণ বিকশিত হইতেছে। পবিত্রতার অভাবে জীবের দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব। দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাবে জীবের অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও কার্যকুশলতা নাই। অমুক-তমুক সামগ্রী না পাইলে চলিবে না, এ ধারণা যখন দৃঢ়ীভূত হয়, উহা লইবই লইব, এই সঙ্কল্প মানবহৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। একটা মাত্র সঙ্কল্প হৃদয়ে এককালীন প্রোথিত হইলে সেই প্রকার সঙ্কল্প প্রভাবে চিন্তার ও কার্যের উন্মেষ হয়। কিন্তু উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ধৈর্য্যকে সঞ্চল করিলে চিন্তা-কুশলতা হইতে কার্য-কুশলতা আসিয়া যায়। আলস্য, অধৈর্য্য, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও দারুণ মোহাক্রমের নিমজ্জিত জীবের সঙ্গ করিলে চিন্তাশীলতা ও কার্যকুশলতা আনয়ন করা অলীক আশা মাত্র। বিহিত বিধানে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করিলে মানব মন অগুণাবলীর পরিবর্তে ক্রমশঃ যাবতীয় সংগুণে নিঃসন্দেহে পূরিত হয়— এক মুখে নয়, শত শত কণ্ঠে প্রকৃতি-সেবক বলিতে সক্ষম। কিন্তু জাগতিক কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া সকলের পক্ষে বিশেষতঃ হিন্দুজাতি রমণীকুলের— প্রত্যহ ~~বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করা~~ ~~অথচ নিজ নিজ চিত্তের~~ উৎকর্ষতা সাধনের জন্ত বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করা নিতান্ত আবশ্যিক। জনসাধারণের কল্যাণকামনায় এই জন্ত বিরাট প্রকৃতির সমীম মূর্তির আরাধনার, অর্থাৎ শ্রীশ্রীকালীপূজার ব্যবস্থা।

জগতের বিধান ক্রমধিকাশ, এ কথা বিস্মৃত হয়েন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু লাভ করা জীবের দারুণ আকাঙ্ক্ষা। মনে হয়, জীবের প্রধান দুর্গতির কারণ ইহাই। কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ঘটনাচক্রে পড়িয়া বিহিতবিধানে কর্ম সাধিতে সুযোগ বা সুবিধা পান না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কর্মসাধন করিয়াও সমুচিত ফল লাভ করেন নাই। যাহাদের অপেক্ষাকৃত অবকাশ কম, তাঁহারাই প্রায়শঃ কর্মশীল; কিন্তু যাহাদের অপেক্ষাকৃত অবকাশ বেশী, তাঁহাদেরই অবকাশ অভাবের অভিযোগটা বেশী। মনের নিভৃত স্থানে 'সাধের' চিন্তার আসন পাতিয়া রাখিয়া জাগতিক কর্ম সুসম্পন্ন করা ততটা কষ্টসাধ্য নহে। বরং এই প্রকার বিধানে চলিতে সচেষ্ট হইলে স্ফুটচিত্ততা ও কার্যতৎপরতা সেই জীব অল্পায়াসে লাভ করেন। যাহারা কোন কর্ম সাধন করিয়াও সমুচিত ফল পান না, তাঁহাদের জানা বিপ্লব যে, তাঁহাদের সংস্কার বা অভিক্রমি মার্জিত হয় নাই বলিয়া বা তাঁহারা যথাযথ

শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম বলিয়া তাঁহাদের 'হায়' 'হায়' বাণীই সম্বল করিতে হইয়াছে । ইহা জানা কর্তব্য যে, জাগতিক যাহা কিছু লাভের আশায় ভগবানের অর্চনা অনেক সময়ে নিষ্ফলতাই আনয়ন করে । প্রথমাবস্থায় কেবল মাত্র চৈতন্য অর্জনের জন্ত স্থাধন ভজন কর্মে নিযুক্ত থাকা বিধেয় । এই উপায়ে চলিয়া যে মাত্রায় চৈতন্য অর্জন করা হইবে, জীবের জাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষুধা সেই মাত্রায় আপন হইতে মিটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ।

• ক্রমবিকাশ বিধানে প্রবৃত্তি-ব্যাদি হইতে জীবকে নিবৃত্তি অবস্থাপন করা বিধাতার বিধি । এই ভবসংসার ভগবানের ও জীবের ঋণ মুক্ত হইবার বিশাল কারখানা । আত্মা মনের নিকট ঋণী, মন জীবনীশক্তির অর্থাৎ প্রাণের নিকট ঋণী, প্রাণ দেহের ও দেহস্থিত কীটানুকীটের নিকট ঋণী, জীব পরিবর্তনের নিকট ঋণী ও পরমাত্মা জগতের নিকট ঋণী । প্রত্যেকের কর্ম—নিম্নস্থ প্রত্যেককে চৈতন্য প্রদান করা । এই চৈতন্য প্রদান কর্মই ঋণশোধের আয়োজন । এইজন্ত ভগবান্ অবতার ও মহাজন আকারে এ ধরায় আসেন যান । ভেদাভেদ বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, দান্তিকতা প্রভৃতি নানা অশুণের গাঁটরি-পুঁটির সাজিয়া থাকিয়া এত ঋণ শোধ করা সহজ কথা নহে । সুতরাং জীবের পক্ষে ঋণমুক্ত হইবার সাধ—তা আবার অল্প সময়ের মধ্যে ছুরাশা মাত্র । কিন্তু জাগতিক কর্মসমূহ হইতে অবকাশ লাভে উৎসুক থাকিয়া বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করিলে, বিরাট প্রকৃতির কর্মাবলী পর্যালোচনা করিলে ও তাঁহার গুণাবলী দ্বারা হৃদয়, মস্তিষ্ক ও মন পুরিত করিতে যত্নশীল হইলে চিত্তের যাবতীয় মলিনতা, বিক্ষিপ্ততা ও অবসন্নতা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বিদূরিত হয় । ফলে এই প্রকার কর্মসাধন দ্বারা জীব শান্ততাবাপন ও কর্মঠ হইয়া জাগতিক অভাব ও অশান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া অল্প কথা, অদৃশ্য লোকের তত্ত্ব অবগত হইলে ও পুস্তক পঠন বিচার পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞানে, আসক্তির পরিবর্তে প্রেমে ও আসক্তির পরিবর্তে ইচ্ছা ও কার্যকারিণী শক্তিতে বিভূষিত হইলে । শ্রীশ্রীকালীপূজার অপর মহান উদ্দেশ্য এই । ফল কথা, বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করণই মানব-মনের উৎকর্ষতা সাধনের সহজসাধ্য উপায় । এই প্রকার উৎকর্ষতা সাধনে তৎপর হইলে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ করা সম্ভবপর । মানুষের কিন্তু “ঘোড়া ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়া” রোগ ।

• বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে উন্মুক্ত প্রকৃতির আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া কত সহস্র সহস্র জীব মহাজনবাচ্য হইয়া অজ্ঞাপিও জগতে পূজিত । প্রকৃতির

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া তাঁহার ধর্ম ও কর্ম জীবনে স্ব স্ব হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিস্তারের অদ্ভুত গবেষণার, অতুলনীয় প্রতিভার ও অনুকরণীয় কার্যকুশলতার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ অধ্যাপক ও উচ্চ উপাধিধারীগণ তাঁহাদের গুণাবলীর তুলনায় অর্কাটীনি মাত্র । ধর্ম-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য ও উদ্ভিদবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সৌরজগৎ প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞান তাঁহাদের চিন্তার, গবেষণার ও কার্যকুশলতার সুফল । কবি—প্রকৃতির কৌতুকশীল শিশু সন্তান, উদ্ভাবক—প্রকৃতির ধীর ও কর্মঠ সন্তান, কিন্তু প্রকৃতির পূজারীগণ তাঁহার অমূল্য রত্নাধিকারী বা সেই রত্ন প্রাপ্তাভিলাষী সুসন্তান । এই শেষোক্ত সুসন্তানগণ জনসাধারণের কল্যাণকামনায় শ্রীশ্রীকালী মূর্তি দ্বারা ব্রহ্মের সগুণ ও নিগুণ ভাবের যৎকিঞ্চিৎ রহস্যভেদ করিয়াছিলেন। সেই রহস্য ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হইয়া পাঠকপাঠিকা বর্গের সমক্ষে আমরা উপনীত ।

কালী শব্দভাবে শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মানা । তিনি বিবস্ত্রা, কিন্তু তাঁহার কটিদেশে নরকর সন্নিবেশিত । তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডমালা ও জিহ্বা রক্তপূর্ণ হইয়া নিষ্কাশিত । তাঁহার ~~চক্ষু~~ ~~দক্ষিণ~~ ~~ভাগে~~ দুই হস্ত ও বাম ভাগে আর দুই হস্ত । এই দুই হস্তের এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে নরমুণ্ড । তিনি কালবরণা, ত্রিনয়না ও তাঁহার কেশদাম বিগলিত ।

শব্দেহের কর্ম বা ক্ষুধা তৃষ্ণা বা সুখ দুঃখ বা ভেদাভেদ বুদ্ধি বা রূপ, রস, গন্ধাদির লালসা থাকে না ; স্তবরাং সেই দেহ থাকা বা না থাকা একই কথা । নিগুণ ব্রহ্ম কি ইহা বুঝাইতে ইহাপেক্ষা সহজ ও সরল উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয় । শবের কেশভার গুচ্ছীকৃত, তাঁহার হস্তে ডমরু, কর্ণে ধুতুরা ফুল, স্বক্ৰদেশে ফণী, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গলে হাড়মালা, ও সর্বশরীর ভস্মাবৃত । নিগুণ ব্রহ্ম যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া এক্ষণে কর্মজাল কেশগুচ্ছসম গুটাইয়া রাখিয়াছেন । তাঁহাতেই সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারী ডমরুবৎ ঔকার শব্দ নিহিত । জীবের কল্যাণের জন্ত তাঁহাকে গরলপূর্ণ ফণীসদৃশ প্রবৃত্তিকে, অলীক শোভায়ুক্ত ধুতুরা ফুল সদৃশ 'আমি' 'আমার' বুদ্ধিকে, ব্যাঘ্রচর্ম সদৃশ হিংসাকে ও হাড়মালা ও ভস্মসদৃশ জাগতিক বৈভবকে সাথের সাথী করিয়া রাখিতে হইয়াছে । এই প্রকার অসন ভূষণ রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবকে সগুণ অবস্থা হইতে নিগুণ অবস্থাপন্ন হইতে হইলে ও বিরাট প্রকৃতি বখাসম্ভব চৈতন্য প্রদান করিলেও জীবমন প্রবৃত্তি বা অহংবুদ্ধি বা ঈর্ষা বা

জাগতিক বৈভবের স্মৃতিশূন্য হইতে পারে না; সুতরাং জীবাশ্মা ও চৈতন্যময়ী মনকে একেবারে অব্যাহতি দিবার জগৎ নিগুণ ব্রহ্মকেই উপরোক্ত অণুগাবলী লইতে হয়। তবে নিগুণ ব্রহ্মে সেইগুলি বহিরাবরণের কার্য করে। ইহা ব্যতীত নিগুণ ব্রহ্মের শিরোপরি অবস্থিত—একটা ফণী ও গঙ্গাদেবী। ফণীই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যাহা বিরাট প্রকৃতি আকারে প্রকটিত। প্রত্যেক জীবে এই শক্তি বিद्यমানা ও ইহারই পূর্ণবিকাশে জীব কালে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাদেবী জ্ঞানের ও প্রেমের সম্মিলিত বিশ্বব্যাপিনী শক্তি। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন দৃষ্টি সম্পন্ন হইলেও এক্ষণে সে শক্তি স্তম্ভিত রাখিয়া নিগুণ ব্রহ্ম যোগারূঢ়। এই অবস্থায় প্রাজ্ঞচক্ষুঃ অর্দ্ধক্ষুট থাকে বলিয়া উহা অর্দ্ধচন্দ্রা-কারে ভালে অঙ্কিত। আর আর সর্বদিবয়ে নিগুণ ব্রহ্ম পূর্ণভাবে শবভাবাপন্ন হইলেও অর্দ্ধক্ষুট প্রাজ্ঞাচক্ষুই তাঁহার সজীবত্ব প্রমাণিত করিতেছে।

এক্ষণে ৬ কালীর কথা বলা যাউক। জলের উপর যেমন তরঙ্গ থাকে, কিম্বা বসিবার ও দাঁড়াইবার ভূমি থাকিলেই যেমন বসা বা দাঁড়ান সম্ভব, তেমনি নিগুণ ব্রহ্ম-ভূমির উপর সগুণ ব্রহ্ম বা বিরাট প্রকৃতি ধারণাগম্য ৬ কালী আকারে দণ্ডায়মানা। পরমাত্মাই বিরাট প্রকৃতি আকারে নিগুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে যাবতীয় কৰ্ম সম্পাদন করিতেছেন বলিয়া তাঁহার এক পদ শিবের বক্ষে ও অগ্র পদ অগ্রস্থানে রক্ষিত। ‘প্রকৃতি’ নারীবাচ্য বাক্য ও তিনি বিশ্বপ্রসবিনী। এই হেতু নারী আকারে চিত্রিত। এই প্রসব কার্য কিন্তু এরূপ ভাবে সাধিত হইতেছে যে, জগৎ উহার রহস্তভেদে অক্ষম। এই কারণে ৬ কালী এমন ভাবে দণ্ডায়মানা যে, উৎপত্তিস্থান গোপনে রক্ষিত। ৬ কালী বিবসনা। ইহার কারণ তাঁহাকে অষ্টপ্রহর প্রসব করিতে হইতেছে ও প্রকৃতি জগতের চক্ষে উন্মুক্ত। ৬ কালী কালবরণী এই কারণে যে, বিজ্ঞান মতে যে পদার্থ বর্ণশূন্য—উহা কালবরণ। ইহা ব্যতীত বেদান্ত মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের ছায়া মাত্র। ছায়া একমাত্র কালিমা বর্ণেরই ইহিয়া থাকে। প্রকৃতি রসে পূর্ণ। বায়ু, জল, ফল ও যাবতীয় খাদ্য রসে পূর্ণ। রমণীর রস স্তনেই থাকে, এই হেতু স্তন দুটী উন্নত অর্থাৎ দুগ্ধে পূর্ণ। সংস্কারবশতঃ জীবের ধারণা যে, চিত্রগুপ্ত আখ্যাত কোনজন মানুষের কৰ্মাকৰ্ম লিখিয়া রাখিতেছেন। ব্যোম বা আকাশ ফটো-নেগেটিভের মত। ইহাতেই গুপ্ত ভাবে মানবের কৰ্মাকৰ্ম গুপ্ত বা অলক্ষিত ভাবে চিত্রিত হইতেছে। ব্যোম বা আকাশ প্রকৃতির বক্ষঃস্থল ও তৎনিম্নস্থল স্বরূপ। মানব যাহা কিছু কৰ্মসাধন করিতেছে, উহা প্রায়শঃ

মস্তিষ্ক ও হস্ত দ্বারা সাধিত হইতেছে। যাবতীয় কর্মাকর্মগুলি একখানি ক্ষুদ্র চিত্রে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। এই হেতু যাহার দ্বারা কর্মগুলি সাধিত হইতেছে, উহাই ৬কালী অঙ্গে ভূষণ স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। ৬কালীর লোল-জিহ্বা রক্তে রঞ্জিত। কাহারও খাইবার সাধ হইলে উহা লালায় পূর্ণ হয়। প্রকৃতিই বিশ্বপ্রসবিনী ও রক্ষয়িত্রী বটে, কিন্তু তিনিই বিশ্বের লয়কর্ত্রী। এই ভাব দেখাইবার জন্য ৬কালীর জিহ্বা রক্তে রঞ্জিত ও উহা নিকাশিত। মৃত্যু সংখ্যা নির্ধারণ করিলে ইহাই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ শিশু, বালক-বালিকা, যুবা-যুবতী ও প্রোঢ়-প্রোঢ়া এ কয়েক শ্রেণীর জীবের সমষ্টিভূত মৃত্যুসংখ্যা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিশ্বের পাকা ফল স্বরূপ। কিন্তু আর আর জীবেরা বিশ্বের কাঁচা ফলসম—কাঁচা-ফলেই আটা খুরে। প্রকৃতির তিনটি চক্ষু—সদ্ব, রজঃ ও তম তিন গুণ নির্দেশক। তবে তিনটি গুণই সমভাবে বিঘমান থাকায় তিনি ত্রিকালজ্ঞী। ৬কালীর কেশদাম উন্মুক্ত ও চতুর্দিকে বিস্তৃত। সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে “আমার চুল যত, আমার কর্ম তত।” প্রকৃতির কর্ম অগণন ও চারিদিকে যাবতীয় কর্ম বিস্তারিত। যাহারা তাঁহাকে “মা মা” বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন, তাঁহাদিগকে তিনি ‘মাঠেঃ’ ‘মাঠেঃ’ রবে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। দক্ষিণ-দিকের উপরিস্থ হস্ত এই কার্য নির্দেশ করিতেছে। যাহারা তাঁহার নিকট ‘এ-তা’ দাও বলিয়া ভিক্ষা যাচিতেছে, তিনি ‘এই লও’ বলিয়া তাহাই দিতেছেন। দক্ষিণদিকের নীচের হস্ত ঐ ভাবে চিত্রিত। বাম উপরিস্থ হস্তে খড়্গ দ্বারা তিনি মায়ামোহাদি যাবতীয় বন্ধন ছেদন করিতেছেন। চতুর্থ হস্তে নরমুণ্ড শোভিত। জীব নানা অকর্ম বা কুকর্ম সাধন করিয়া যখন দেহপাত করে, ও মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, তখন কেবল মাত্র বুদ্ধির (অর্থাৎ মস্তিষ্কের) সহায়তায় বিশ্বজননীর শরণাপন্ন হয়। তখনই কিন্তু প্রকৃতি সেই জীবকে আশ্রয় দেন। অর্থাৎ তখন তিনি চৈতন্যদায়িনী হইয়া সেই জীবের চৈতন্য উৎপাদনে সচেষ্টা করেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে প্রত্যেক অবিকৃত মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীব (অর্থাৎ যাহারা দরকোচামারা বা এঁচোড়ে পাকা সমালোচক শ্রেণীভুক্ত নহেন) অন্নায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে :—

(১) ৬কালী অনার্থ্য রমণীর প্রতিমূর্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইবার কারণ নাই ;

(২) নিগুণ ও সংগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, বিশেষতঃ জনসাধারণকে ইহাই অতীব সহজ ও সরল উপায় ;

(৩) জীবের একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য ;

(৪) ব্রহ্ম যে ভাবেই পূজিত হউন না কেন, তিনি সর্বস্থানে ও সর্বভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া পূজাদি কৰ্ম সম্পাদিত হইলে জীবমন ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করে ;

(৫) পূর্বকালের হিন্দুমহাজনগণ ধর্মবিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ;

(৬) পরে তাঁহাদের অমূল্য জ্ঞান জগতের হিতকামনার ৮কালী ও পূর্বপ্রকাশিত শ্রীশ্রীদুর্গাকারে উপহার দিয়াছেন ;

(৭) বিরাট প্রকৃতির যথাবিহিত সঙ্গ করিলে জীব অভাব হইতে স্বভাবাবস্থা পাইতে পারে ;

(৮) বিরাট প্রকৃতির সঙ্গগুণে জীবের হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকশিত হয় বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য ;

(৯) আর আর ধর্মাবলম্বীদের মূর্তিপূজার ব্যবস্থা কুসংস্কার বা হীনতা-সূচক বলিয়া পরিগণিত হইলেও নিজ নিজ অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হিন্দুদিগের শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী ইত্যাদি মূর্তিপূজাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা বিশেষ দান্তিকতার ও মূর্থতার লক্ষণ ;

(১০) ঈর্ষা, কুৎসা, ক্রোধ, দান্তিকতা, স্বার্থপরতা, ভেদাভেদ বুদ্ধি ও জাগতিক যাবতীয় আসক্তিকে সম্বল করিয়া, জীব মাত্রই কোন-না-কোন ভাবে মূর্তিরই উপাসক ; সুতরাং জাগতিক নানা মূর্তির ও স্বকল্পিত মূর্তির উপাসক না হইয়া সুগঠিত ও অর্থপূর্ণ একটী মাত্র মূর্তিতে স্ব স্ব চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করাই মনকে উন্নত করিবার সরল ও সহজসাধ্য পন্থা ;

(১১) জীবমনকে পাশব বা আত্মরিক ভাব হইতে উদ্ধার করাই হিন্দুদিগের মূর্তিপূজার একটী কারণ ; সুতরাং পশু বলিদান প্রভৃতি কৰ্ম সাধন নিঃসন্দেহ অনাৰ্য্য বা আত্মরিক বিধান ;

(১২) হিন্দু দেব দেবীর আধুনিক ভাবে পূজা করণের জন্ত যাজক ও গুরুশ্রেণী ও তৎসঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নিঃসন্দেহ দায়ী, সুতরাং ইহার প্রতিকার করা কর্তব্য কৰ্ম ।

অতঃপর দোষ দেখা মানুষের এক বিষম ব্যাধি। এই ভাবে নিজ নিজ

মনকে গঠিত করিয়া মানুষ বাহ্যভাবে শিক্ষার ও সত্যতার উচ্চ সীমায় উপনীত হইলেও দিনের দিন অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়িতেছে। মানুষকে মূর্তির পরিবর্তে কেবলমাত্র গুণের আদর করিতে শিক্ষা দিয়া গুণগ্রাহী করাইবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগের যাবতীয় মূর্তিপূজার প্রবর্তনা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত কালীমূর্তির হস্তে খড়্গ ও নরমুণ্ড শোভিত। জীবের মায়া-মোহাদি বন্ধন ছেদন ও তৎপরে চৈতন্য প্রদান করা বিরাট প্রকৃতির মুখ্য কর্ম। আসক্তি পূর্ণ জীবকে নূতন করিয়া গঠিত করাই বিরাট প্রকৃতির বীরা বলিয়া দেবীর লোলজিহ্বা। সুতরাং খড়্গ, নরমুণ্ড ও লোলজিহ্বা কোনটাই বিভীষিকার হেতু নহে, বরং এইগুলি জীবের প্রতি দেবীর প্রকৃত দয়ার নিদর্শন। জীবকে অভয়দান ও যে যাহা চাহে উহা দান করা বিরাট প্রকৃতির আর দ্বিতীয় কর্ম। উক্ত যাবতীয় কারণে কোন ধর্মাবলম্বিদিগের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সমাজের কালী-মূর্তিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা—অকর্ম বা কুকর্মবাচ্য। এই প্রকার চাল-চলনের জন্ত তাঁহারা আপনাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন ও তৎসঙ্গে সমাজের ও দেশের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে—ইহা বুঝা কর্তব্য। তবে মনে হয়, পশু বলিদান প্রথা অবরোধ করিয়া জর্ধা, কান, ক্রোধ, লোভাদি যাবতীয় পাশব বৃত্তিকে বর্জন করাই হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য।

এক্ষণে পঞ্চ-মকার সাধন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাউক। এই সাধনের প্রকৃত তত্ত্ব জিহ্বারূপ মাংসকে তুলুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া (যাহা খেচরী মুদ্রা বলিয়া আখ্যাত) ও তৎপরে কোন একটি আসনের সহায়তায়—যথা বন্ধ পদ্মাসন, অর্ধ পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, গরুড়াসন, সূখাসন প্রভৃতি মনরূপ মুৎসকে নিরুদ্ধ করিলে মন ক্রমশঃ চৈতন্যময়ী হইয়া জীবদেহস্থিত আশ্মার সহিত মৈথুন ক্রমে নিরত হয়। এই সম্ভোগ কার্য দ্বারা জীব-মস্তিষ্ক হইতে সুখা (মদ্য) স্থরিত হয়। অতঃপর সাধক এই সুখা পান করিয়া অব্যক্ত আনন্দে আপ্ত হইয়া ও জাগতিক সম্ভোগ সুখকে অতীব ঘৃণ্য প্রতীতি করেন। মানবের পাশবিক বৃত্তির আধিক্যবশতঃ, বা শিক্ষার দোষে বা প্রকৃত শিক্ষকের বা প্রকৃত ছাত্রের অভাবে এই উচ্চতম সাধন-কর্ম হীনতম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই প্রকার সাধক-সাধিকার সংখ্যা এখন দিনের দিন হ্রাস হইতেছে।

সমালোচনায় বিড়ম্বনা ।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ।]

আজকাল বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করা এক মহা বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া দিলেই গ্রন্থকারগণ ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমালোচকের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা বাগ্‌বাজারের একজন 'তর্কতীর্থ' পণ্ডিত, তাঁহার এক ছাত্রের নাম দিয়া নব্যশাস্ত্রের অন্তর্গত "ব্যাপ্তিপঞ্চক" গ্রন্থের 'মাথুরী' টীকার বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের সমালোচনায় দেখাইয়াছিলাম যে, এই অনুবাদের প্রতি পৃষ্ঠা অশুদ্ধি-দোষে কলঙ্কিত। তর্কতীর্থ মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমালোচনার এক প্রতিবাদাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদাভাস তিনি নিজের নামে ছাপেন নাই—তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতাপুত্রকে 'উপাধ্যায়' সাজাইয়া প্রতিবাদটী তাঁহার নামে প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনার একটা কথাও প্রকৃত প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় আমাদেরকে কেবল গালাগালি করিয়াছেন। আমরা গালাগালিতে তত দুঃখিত হই নাই, কিন্তু প্রতিবাদকারী 'তর্কতীর্থ' উপাধিধারী হইয়াও যে এত ঘোর অশুদ্ধ কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিয়াছেন, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।

“ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে ।”

অনুবাদক “নব্যগণের মত এই যে—” এই ভাবে উপক্রম করিয়া “ভাবপদার্থের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে”—এইরূপ লিখিয়াছেন। আমরা এই কথারই প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, নব্য নৈয়ায়িকেরা শ্রায়শাস্ত্রের নানা গ্রন্থে ভাবপদার্থের অভাবাভাবকে প্রতিযোগীর স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, নব্য নৈয়ায়িক চূড়ামণি রঘুনাথ, “সিদ্ধান্ত লক্ষণে”র দীর্ঘতির শেষে “অভাবত্বক্ষেদমিহ নাস্তীদমিদং ন ভবতীতি প্রতীতি-সাক্ষিকো ভাবাভাবসাধারণঃ স্বরূপ সম্বন্ধ বিশেষঃ”—এই গ্রন্থাংশে অভাবত্ব বা ভাবাভাবসাধারণ, তথা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ মধুরানাথ ও জগদীশও যে অভাবাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ স্বীকার করেন,

ঠাহাদের গ্রন্থসন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও দেখাইয়াছিলাম। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, এই সকল গ্রন্থাংশের কোনওরূপ মীমাংসা করিতে না পারিয়া অল্প দিন হইল “ভাষাপরিচ্ছেদে”র পরিবর্তে যে অপ্রচলিত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নব্যগ্রন্থের আশ্রয় পরীক্ষায় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে, সেই ‘দীপিকা’ হইতে এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—“অভাবাভাবোহতিরিক্ত এব...ইতি নবীনাঃ।”

রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ-প্রমুখ নব্য নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠগণের লেখা কি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ‘দীপিকা’র কথায় উড়িয়া যাইবে? প্রতিবাদীর যদি ক্ষমতা থাকে, তবে উভয় লেখার সামঞ্জস্য রক্ষা করুন না! তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন,—আমাদের কাছে তু আর শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে আসিবেন না, আসিলে উক্ত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তদ্বয়ের মর্ম বুঝাইয়া দিতাম। সংক্ষেপে এই স্থানে কিঞ্চিৎ লিখিলাম, বুদ্ধি থাকে ত বুঝিয়া লইবেন।

রঘুনাথ শিরোমণি, ঠাহার স্বাধীন গ্রন্থ “পদার্থখণ্ডনে” অভাবাভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লাম্বতঃই এই গ্রন্থে অভাবাভাবকে অতিরিক্ত বলিয়াছেন,—অভাবত্ববুদ্ধির প্রমাদ রক্ষা ইহার হেতু নহে। “পদার্থ-খণ্ডনে”র টীকায় রঘুদেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

“ন চ ভাবাভাবসাধারণমভাবত্বমখণ্ডোপাধিরিত্যুক্তৌ নায়াং দোষ ইতি বাচ্যম্ এবং সতি লাম্ববাদেব ঘটভাবাভাবস্যাতিরিক্তত্বসিদ্ধেঃ।” (৫৫ পৃঃ)

এই অর্থেই রঘুনাথ, “বিশেষব্যাপ্তি”র ‘দীপিকায়’—“ন হি ঘটভিন্নভেদো ঘটত্বাদতিরিচ্যতে, আবশ্যকরূপঘটত্বেনৈবোপপত্তৌ অতিরিক্ত করনায়ানং মানাভাবাৎ” (চৌঃ সং ৩১২ পৃঃ)—ইত্যাদি সন্দর্ভে ঘটত্বাদি অল্পগত পদার্থের অভাবাভাবকে অতিরিক্ত না বলিয়া লাম্বতঃ অবশ্যরূপ ঘটত্বাদির স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। জগদীশও ‘নব্যাস্ত্র’ কল্পেই লিখিয়াছেন, “হিমাবৃত্তেরভাবত্বস্ত ভাবইবাভাবেপি মধ্যাৎ।” (চৌঃ সং ৩২৭ পৃঃ)

প্রতিবাদী এখন বিরুদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের মর্ম বুঝিলেন কি? প্রচলিত গ্রন্থে এই সকল মতবাদ স্পষ্ট নিবদ্ধ থাকিলেও প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, কেমন করিয়া অধ্যাপনা করিলেন যে, নব্য নৈয়ায়িকেরা অভাবাভাবকে অতিরিক্ত বলেন, আর প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা প্রতিযোগীর স্বরূপ বলেন! তার পর প্রতিবাদকারী আর এক কথাও শিখিয়া রাখুন, অভাবাভাব যে অতিরিক্ত, ইহা প্রাচীনেরাও বলিতেন। মথুরানাথ, “ব্যাপ্তিপঞ্চকে”র দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

“অভাবাভাবস্যাতিরিক্তত্বমতেন এতলক্ষণকরণাৎ।” অভাবাভাবের অতি-

রিক্ততামতে এই লক্ষণ করা হইয়াছে। ব্যাপ্তিপঞ্চকের লক্ষণকার অবশ্য নব্য নহেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক, 'শ্রায়লীলাবতী'কার বল্লভাচার্য্যও অভাবাভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করিতেন।

“লীলাবতীকারাস্তু অভাবত্বধিয়ঃ প্রমাত্তানুরোধেনাভাবাভাবোহতিরিক্ত এব । ন চানাবস্থা ঘটাত্যস্তাভাব প্রতিযোগিকস্তাত্যস্তাভাবস্যাত্যস্তাভাবো ঘটাত্যস্তাভাবানতিরিক্ত ইত্যাহঃ ।”—(পদার্থরত্নমালা, ২৫ পৃঃ)

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ মহাশয়ের অবশ্য এই সকল সূক্ষ্ম সন্ধান রাখা সম্ভবপর নহে। কেন না, তিনি মূলাষোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে “ঐৎ পঠিতং তদুত্তরবে সমর্পিতম্” করিয়াই পাথুরিয়াঘাটার পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন।

তর্কতীর্থ, মূলের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, “অনুমিতি-হেতু” পদের অর্থ—অনুমান যে প্রমাণ, তাহার যে অনুমিতি, তাহার হেতু, অর্থাৎ কারণ।” (২৩ পৃঃ)

আমরা এই অংশের সমালোচনায় বলিয়াছিলাম, “অনুमानে বর্তমান যে প্রমাণ্য, সেই প্রমাণ্যের অনুমিতির হেতুই এখানে ‘অনুমিতি-হেতু’ পদের অর্থ।” ইত্যাদি।

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, ইহার কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া কেবল নিরর্থক চীৎকার করিয়াছেন যে, “* * * অনুমান যে প্রমাণ সেই অনুমিতি এইরূপ লিখিয়াছেন। শাস্ত্রীজী এখানে কোনও দোষ না পাইয়া কেবল উপদেশ দিয়াছেন যে, * * *। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যেমন কাকের অর্থ বায়স, বৃক্ষের অর্থ মহীকুহ, এইরূপ অনুবাদ না হইলে শাস্ত্রীর মতে ভাল হয় না।”

পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমরা অনুবাদের যে দোষ দেখাইয়াছিলাম, বাগাড়ম্বর ভিন্ন এই প্রতিবাদে তাহার কোন কথাটার উত্তর আছে। মধুরানাথ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ‘অনুমিতি-হেতু’ পদের অর্থ অনুমাননিষ্ঠপ্রমাণ্যানু-মিতি-হেতু, আর অভিনব পণ্ডিতেরা অনুবাদ করিলেন,—প্রমাণের অনুমিতি। তার পর—“অনুমানের প্রমাণের যে হেতু, তাহার কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান” (২৬ পৃঃ)—এইরূপ অনুবাদ কি উন্নত-প্রলাপ নহে? মূল অনুবাদে ছাপা আছে, “অনুমান যে প্রমাণ, তাহার যে অনুমিতি”; এই দোষ উদ্ধার করিবার প্রত্যক্ষায়ে প্রতিবাদী উন্টাইয়া লিখিয়াছেন, “অনুমান যে প্রমাণ সেই অনুমিতি”। এই পরিবর্তনে প্রতিবাদীর বিদ্যা আরও প্রকটিত হইয়াছে।

উক্ত পরিবর্তিত অংশের যে কোনও অর্থই হয় না! প্রতিবাদী, 'তর্কতীর্থ' উপাধি-মণ্ডিত, এইরূপ ঘোর অশুদ্ধ কথার প্রচার করিতে তাহার একটু লজ্জাও করিল না ?

'ব্যাপ্তিজ্ঞান' লিখিতে 'জ্ঞান' পদটি পতিত হইয়াছে, 'ঘটত্বং নাস্তি' স্থলে 'ঘট্টো নাস্তি' ছাপার ভুল, ইহা বলিয়া প্রতিবাদী আর কত দোষ ঢাকিবেন ? প্রতিবাদকারী, আমাদের প্রকাশিত সমালোচনার প্রফ দেখিবার যে ভুল ধরিয়াছেন, সে ভুল পণ্ডিতেরা ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করিবেন না। 'জন্ম মূর্ত্ত' স্থলে 'অন্ম মূর্ত্ত' যে মুদ্রাকর-প্রমাদ, ইহা বালকেও বুঝে। কিন্তু 'ঘটত্বং নাস্তি' স্থলে যে কম্পোজিটার 'ঘট্টো নাস্তি' কম্পোজ করিতে পারে, তাহার গায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আছে, বলিতে হইবে।

ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদের বক্তা তর্কতীর্থ, সংসর্গাভাবকে সংসর্গারোপ-জন্ম প্রতীতি বিষয় অভাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই নির্দেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, রঘুনাথ, জগদীশ-প্রমুখ তর্কিকগণের মতে ভেদ-ভিন্নাভাবত্বই সংসর্গাভাবের নিষ্কণ্ট লক্ষণ। প্রতিবাদী ইহার কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া কাঁছনী সুরে গাহিয়াছেন,—

“প্রত্যেক কথার (?) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে যে মহাভারত অপেক্ষাও বড় গ্রন্থ হইয়া পরে (?)”

তর্কতীর্থ মহাশয় রাশি রাশি অশুদ্ধ কথা লিখাইয়া পুস্তক পূর্ণ করিতে পারিলেন, আর শুদ্ধ কথাটা লিখিলেই বুঝি মহাভারত হইয়া পড়িত ?

তর্কতীর্থ উপদেশ করিয়াছেন,—“কারণতা ও কার্যতা, যাহা কারণ ও কার্য, তাহার স্বরূপ হয়, সুতরাং পরমাণু পরিমাণ ভিন্ন সপ্ত পদার্থই হয়।” আমরা এই ঘোর অশুদ্ধ কথার খণ্ডন করায় প্রতিবাদী তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—

“* * * কার্যতা বা কারণতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসেন নাই, মোটামুটি সাধারণ ভাবে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এইরূপই লিখিয়াছেন।”

নব্যগ্রামের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদে বলিয়া ত প্রতিবাদীর দল খুব বিজ্ঞাপন জাহির করিয়াছেন। এইরূপ অশুদ্ধ কথার প্রচারই বুঝি সেই বিজ্ঞাপনের ফল ? তর্কতীর্থ মহাশয়কে ত কেহ মাথার দিবা দেয় নাই,—“ওগো, তুমি নব্যগ্রামের বঙ্গানুবাদ কর।” যদি প্রকৃত সিদ্ধান্ত গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে বৃথা এ বিড়ম্বনা কেন ? “ঘটং ভিন্দ্যাৎ পটং ছিন্দ্যাৎ —” এ উপায়েও ত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় ! ব্যর্থ যশের প্রত্যাশায় বঙ্গরাণীর অঙ্গ

কলঙ্কিত করা কেন ? এই আবর্জনাপূর্ণ অনুবাদ অপেক্ষা নব্যগ্রন্থের অনুবাদ না হওয়া ভাল ছিল। “ররং শৃগা শালা ন চ খলু পুনর্ঔষভঃ।”

জগদীশের ন্যূনতা পরিহারের উদ্দেশে অনুবাদক বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছাদির অসমবায়ী কারণ নাই। আমরা ইহার সমালোচনায় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, বুদ্ধি প্রভৃতির অসমবায়ী কারণ, আত্মমনঃসংযোগ। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, ইহার উত্তরে বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াছেন যে,—

“প্রাচীনগণ আত্মমনঃসংযোগকেও জ্ঞানাদির গ্রায় নিমিত্ত কারণই বলিয়া থাকেন, অসমবায়ী কারণের নাশে কার্যনাশ হয় বলিয়া অসমবায়ী কারণ বলেন না। * * * প্রাচীন মতানুসারে লিখিয়াছেন। সমালোচক ইহা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি ? গ্রায়শাস্ত্রের প্রায় সর্বত্র এইরূপ একটা না একটা মত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিতে হয়, ইহা সকল নৈয়ামিকই জানেন। শাস্ত্রীজীর প্রদর্শিত শঙ্করমিশ্রাদির বাক্যগুলি যে নব্য মতসিদ্ধ তাহা কে না জানে ?”

প্রাচীনের দোহাই দিয়া কেবল ধাপ্পা দিলেই ত হয় না,—প্রতিবাদী কোনও প্রাচীন গ্রায়গ্রন্থের লিপি উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন কি, প্রাচীনেরা আত্মমনঃসংযোগকে জ্ঞানাদির নিমিত্ত কারণ বলিতেন ? আর প্রতিবাদী তর্কতীর্থ যে বলিয়াছেন, কার্যনাশের প্রতি অসমবায়ী কারণের নাশ কারণ, ইহা ঘোর অশুদ্ধ কথা। অসমবায়ী কারণের নাশ হইলেই যদি কার্যের নাশ হয়, তাহা হইলে শ্রেনের ক্রিয়ানাশের পর শ্রেনশৈলের সংযোগ নষ্ট হয় না কেন ? শ্রেনশৈল-সংযোগের প্রতি ত শ্রেনের ক্রিয়াই অসমবায়ী কারণ। তার পর প্রতিবাদীর মতে জ্ঞানাদির নাশই বা হয় কেমন করিয়া ? জ্ঞানাদির যখন অসমবায়ী কারণ নাই, তখন তাহার নাশও নাই। তাহার সিদ্ধান্তানুসারে ত কার্যনাশের প্রতি অসমবায়ী কারণের নাশই কারণ। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ শিথিয়া রাখিবেন, অসমবায়ী কারণের নাশ, কার্যমাত্র নাশের প্রতি কারণ নহে,—দ্রব্যনাশের প্রতিই কারণ। রঘুনাথ শিরোমণি “পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে” স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

“দ্রব্যনাশে চ সর্বত্রাসমবায়িকারণনাশ এব কারণম্ নিত্যসমবেতদ্রব্যনাশে ক্লপ্তত্বাৎ।”—(৩৯ পৃঃ)

প্রতিবাদীর প্রধান অবলম্বন “তর্কসংগ্রহ-দীপিকা”তেও লেখা আছে,—

“সর্বত্র অসমবায়িকারণনাশাদ্ দ্রব্যনাশঃ”—

(নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের ৪০ পৃঃ)

“মুক্তাবলী প্রকাশ” মহাদেবতট্টও লিখিয়াছেন,—

“অসমবায়িকারণনাশস্ত্র দ্রব্যনাশজনকত্বাৎ।”—(১০৪ পৃঃ) গ্রায়শাস্ত্রের এই সকল সাধারণ কথা না জানিয়াও যাহারা নিজেকে ‘তর্কতীর্থ’রূপে বিজ্ঞাপিত করিতে চায়, তাহাদের সাহস ও ধৃষ্টতাকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশকৃত “তর্কামৃতে”র অনুবাদবসরে প্রাচীন মত অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাও এক হাসির কথা। মানিলাম, শঙ্করমিশ্র নব্য, কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ববর্তী শ্রীধরাচার্য্যও কি নব্য নৈয়ায়িক? তিনি যে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

“সুখাদীনাং সমবায়িকারণমাত্মা তত্র সমবায়াদাত্মমনঃসংযোগস্তেষামসমবায়িকারণম্।”—(১০১ পৃঃ)

ব্যাপ্তিকরণের ১৪টা লক্ষণই যে শিরোমণিকৃত বলিতে চায়, তাহার বিচার দৌড় কতদূর, তাহা পণ্ডিতেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

‘বিশেষের’ লক্ষণে ‘অন্ত্য’ শব্দের কোনও ব্যাখ্যা না থাকায় আমরা ভ্রুটি দেখাইয়াছিলাম। নির্লজ্জ প্রতিবাদী ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—

“অন্ত্য শব্দের অর্থ যে সমালোচকের জানা নাই, তাহা……বুদ্ধিতে আসে নাই।”

সমালোচকের কি কি জানা আছে, না আছে, তাহা নবীন গৌতম, তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রকে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিলে বুঝিতে পারিবেন। ব্যাপ্তিপঞ্চকের এই বঙ্গানুবাদে প্রথম শিক্ষার্থীর মহা উপকার হইবে—এইরূপ সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন ত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদীকেই জিজ্ঞাসা করি, বিশেষের লক্ষণে ‘অন্ত্য’ শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কি সাধারণের অজ্ঞাত নহে?

ব্যাপ্তিলক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখাইতে গিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় অমানবদনে উপদেশ করিয়াছিলেন,—“প্রশস্তপাদভাষ্যে ব্যাপ্তিলক্ষণ নাই। গ্রায়কন্দলীতেও তাহাই।” আমরা বিদ্যাপ্রকাশের এই উপহাসকর চেষ্টা দেখিয়া প্রশস্তপাদভাষ্য ও গ্রায়কন্দলীর গ্রন্থসন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের অনুমোদিত ব্যাপ্তিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। লজ্জার মাথা খাইয়া প্রতিবাদী ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন, “প্রশস্তপাদের ভাষ্যাদিতে যে ব্যাপ্তিলক্ষণ আছে, তাহা ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রসঙ্গে নহে। ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রসঙ্গে ব্যাপ্তির লক্ষণ করা হয় নাই বলিয়াই ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই বলিয়াছেন।”

নিজের অজ্ঞতা যে বুঝিতে পারে, তাহারও বুদ্ধি আছে বলিতে হইবে—
“ন বুধ্যতে ইত্যপি বুদ্ধিসাধ্যম্।” কিন্তু ইহারা ধৃষ্টতার এমনই মৌরসীপাট্টা
লইয়া বসিয়াছে যে, ভুল দেখাইয়া দিলেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ব্যাপ্তি-
নিক্রপণ প্রসঙ্গে যদি ব্যাপ্তিলক্ষণ না থাকে, তবে যে ব্যাপ্তিনিক্রপণ প্রসঙ্গই
হয় না। প্রতিবাদী কি ‘নিক্রপণ’ শব্দের অর্থ জানেন না? আমরা প্রশস্ত-
পাদভাষ্য ও ন্যায়কন্দলীর যে স্থান উদ্ধৃত করিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণ দেখাইয়াছি,
তাহাও ব্যাপ্তিনিক্রপণ-প্রসঙ্গ। তার পর যেখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধে অন্যান্য কথা
নিবন্ধ আছে, সেখানেও পূর্বোপদর্শিত অবিভাব অর্থাৎ অব্যভিচারিতত্বই
ব্যাপ্তিপদার্থ, তাহা কথিত হইয়াছে (১)। সূচীপত্র দেখিয়া কেবল কতকগুলি
গ্রন্থের নাম মুখস্থ করিলেই হয় না, গ্রন্থ বুঝিবারও সামর্থ্য থাকা চাই।

“ন্যায়কন্দলী” প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ও পরম ব্যুৎপন্ন নৈয়ায়িক ৬জয়নারায়ণ
তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ‘শাস্ত্রার্থসংগ্রহে’ স্পষ্ট যখন লেখা আছে, সমবায় স্বরূপ
সম্বন্ধে থাকে, তখন “তর্কামৃতে” কেমন করিয়া কালাকাশাদির ন্যায় সমবায়কে
অবৃত্তি বলা হইল, ইহা আমরা অনুবাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তর্কতীর্থ,
ইহার কোনও উত্তর করিতে পারেন নাই। সম্বন্ধবিশেষে অবৃত্তি হইলেই যদি
অবৃত্তি হয়, তাহা হইলে অভাবাদিও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া অবৃত্তি-
পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হয় না কেন?

“তদ্বচনাদান্নায়শ্চ প্রামাণ্যম্” (১।১।৩)—এই কণাদসূত্রের অশুদ্ধ অনুবাদ
করায় আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। এই আপত্তির উত্তরে প্রতিবাদী
কতকগুলি অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিয়াছেন। “বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতিবেদে” (৬।১।১)
—এই সূত্রে কণাদ নিজে বলিলেন, ঈশ্বরের উচ্চারিত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য,
আরু মবীন মল্লিনাথ, ব্যাখ্যা করিলেন কি না—ধর্মের প্রতিপাদক বলিয়া
বেদ প্রমাণ।

অরনৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট “ন্যায়মঞ্জরী”তে, ও মহাতার্কিক উদয়নাচার্য্য “আত্ম-
তত্ত্ববিবেকে” নানা বিচার বিতর্কের পর আশুপারমেশ্বরের প্রণীত বলিয়াই
বেদের প্রামাণ্য অবধারণ করিয়াছেন (২)। [ক্রমশঃ ।

(১) “সাধ্যাবিনাত্বত্বেন দর্শিতং লিঙ্গং”—(২৪২ পৃঃ)

“অসিদ্ধাবিনাত্বস্তাদি ভ্রান্ত্যা ব্যাপ্তিবচনং দৃশ্যতে”—(২৫০ পৃঃ)

(২) “তস্মাদাপোক্তবাদেব বেদাঃ প্রমাণমিতি সিদ্ধম্।”—শ্রায়মঞ্জরী, ২৫০ পৃঃ ।

“তস্মাদ্ বিকল্পাগমব্যাদাসেনা বেদাঃ ... পরমেশ্বর প্রণীতবাদেব ... প্রমাণমেবেতি নিয়মঃ।”

—আত্মতত্ত্ববিবেক, ৯৪ পৃঃ । (৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সংস্করণ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি.এ।]

কি যে এক হুঃসময় পড়িয়াছে, সাধারণতঃ নিরপেক্ষ ভাবে কেহ আলোচ্য গ্রন্থের দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধুতার খাতিরই দেখিতেছি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা শাসিত করে। ফলে অনেক পাঠকই কাঞ্চনব্রমে কাচ খরিদ করেন। সমালোচকের দায়িত্ব কত অধিক এবং তাহার ক্ষমতার অপব্যবহারের ফল কিরূপ বিষময়, তাহা অধিক চিন্তার বিষয় নহে। তথাপি, দলাদলির উপর এখনকার সমালোচনা নির্ভর করে। লেখক সমালোচকের অজানা হইলে অনেকটা নিরপেক্ষতার আশা করা যায় বটে, কিন্তু সমালোচক মহাশয় সেরূপ নবীন লেখকের রচনা লইয়া বিশেষ ভাবে নাড়া চাড়া করিয়া সময় এবং মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে চান না।

বহুদিন পূর্বে বান্ধব' মাসিকে একজন লেখক সমালোচনায় কয়েকটা শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রচনার ছিদ্রান্বেষণ করাকে তিনি 'মাসিক সমালোচনা' নাম দিয়াছিলেন। 'মাসিকাগণ যেরূপ ক্ষত স্থানেরই অন্বেষণ করে, এরূপ সমালোচনাতেও তদ্রূপ দোষের স্থান খুঁজিয়া প্রদর্শন' করা হয়।

সম্প্রতি গত ভাদ্র মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে 'বীরভূম বিবরণ' নামক গ্রন্থখানির একটা 'মাসিক সমালোচনা' বাহির হইয়াছে। সমালোচক এই গ্রন্থের গুণ দেখিতে পান নাই। শুধু তাহাই নহে; প্রকৃত দোষও তিনি দেখাইতে পারেন নাই। জোর করিয়া দোষ দেখাইতে গিয়া নিজেই কতকগুলি ভুলের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাহারই আমরা পরিচয় দিতেছি।

* *
*

"বীরভূম-বিবরণ" প্রথম খণ্ড—মহারাজ-কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয় সম্পাদিত এবং "বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতি" কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৯ ছই টাকা। ইহাতে বীরভূমের কয়েকটা পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা খাটি ইতিহাস নহে, কিন্তু ইতিহাসের অনেক উপকরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই খণ্ডে হেতমপুর, ভদ্রপুর, সূপুর, ভাণ্ডীরবন, বক্রেশ্বর, মঙ্গলডিহি, জোফলাই, কেন্দুবিষ ও শ্রামারুপার গড়, এই নয়টি স্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে অজ্ঞাতপূর্ব অনেক কথা আছে। এদেশে লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা মা সরস্বতীর সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। কিন্তু মহারাজ কুমার যে ভাবে মা সরস্বতীর সেবা করিতেছেন, এবং এ পুস্তকে যে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্পণীয়।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে রাঢ়-বঙ্গের ইতিহাসের একাংশ আলোচনা করিয়াছেন। কেন্দুবিষের নিকটবর্তী ঢেকুর বা ইছাই ঘোষের শ্রামারুপার গড়ের প্রসঙ্গে বীরভূম সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব বিবরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভদ্রপুর কাহিনীতে মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা লিখিত হইয়াছে—ঐতিহাসিকেরা তাহাতে লাভবান হইতে পারিবেন। ভদ্রপুর, সূপুর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে গৃহীত দেবমন্দির ও মূর্তির আলোকচিত্র সমূহ রাঢ়ের আনীত শিল্পনৈপুণ্য ও বৌদ্ধ, শাক্ত, প্রভৃতি ধর্মের প্রভাবের পরিচায়ক। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসার্পণীয় হইলেও, বীরভূম সম্বন্ধে এখনও অনেক অনুসন্ধান করিবার আছে। আশা করি, ক্রমে ক্রমে সমগ্র বীরভূমের অজ্ঞাতপূর্ব পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া বীরভূমের সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য করিয়া তিনি সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন।

* *
*

শ্রামারুপার গড়ের কাহিনী এ পুস্তকে কেন স্থান পাইয়াছে, ‘মানসী ও মর্শ্ববাণী’র সমালোচক মহাশয় সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। আমাদের মতে কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ “শ্রামারুপার গড়ের” কথা কেন্দুবিষ-প্রসঙ্গ হইতে উঠিয়াছে। কেন্দুবিষের অনতিদূরেই অজয় নদীর উত্তর তীরে ‘লাউসেন তলাউ’ বীরভূম জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। ‘শ্রামারুপার’ গড় জয় করিতে আসিয়া লাউসেন এই স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করেন বলিয়া এই স্থানটি উক্ত নামে বিখ্যাত। সুতরাং “শ্রামারুপার গড়” বর্ধমানের অন্তর্গত হইলেও, কেন্দুবিষ কাহিনীর সহিত তাহার ইতিহাস জড়িত, এবং সে প্রসঙ্গের অবতারণা আবাস্তর নহে। কাজেই, সমালোচক মহাশয় এক্ষেত্রে চমকাইয়া উঠিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এমন বলিতে পারি না। তার পর, ‘ভদ্রপুর’ সম্বন্ধে সমালোচকের আপত্তি যে, ইহা পূর্বে

মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং কুঞ্জঘাটার রাজবংশের বিবরণ অবাস্তর হইয়াছে। আমরা এ যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করিতে পারিলাম না। ভদ্রপুর যখন বর্তমানে বীরভূমের অন্তর্গত, তখন তাহার পুরিচয় এ পুস্তকে অবাস্তর হইবে কেন? এবং ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমারের বিবরণীর মধ্যে তাঁহার দৌহিত্র বংশের (কুঞ্জঘাটার রাজবংশের) কথঞ্চিৎ বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা মনে করি না। তার পর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন; “কুঞ্জঘাটার দুর্গানাথকে বলা হইয়াছে—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর। মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্রবংশের পোষ্যপুত্র হইয়াও নন্দকুমারের বংশধর—ইহা নূতন কথা বটে!” বংশধর অর্থে এখানে উত্তরাধিকারী, সমালোচক মহাশয় সেই টুকুই ভুল করিয়াছেন। পোষ্যপুত্র হইলে কি বংশধর হয় না? নাটোরের বর্তমান মহারাজা কি রাণীভবানীর বংশধর বলিয়া পরিচিত নন? কাশীমবাজারাধিপতি ভাগিনেয় হইলেও কি রাণী স্বর্ণময়ীর ‘বংশধর’ নন? বাস্তবিক আমরা বিশ্বিত হইয়াছি, এই ছেলেমানুষী কাঁচা সমালোচনা ‘মানসী ও মর্মবাণী’তে স্থান পাইয়াছে দেখিয়া! উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞ সম্পাদকস্বয়ং এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচককে কি শুনে প্রশ্ন দিয়াছেন, বুঝিতে পারি না।

তার পর, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার প্রণীত “হেতমপুর কাহিনী”র উল্লেখ করিয়া মুরলীধর চক্রবর্তী সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিষম ভ্রমাত্মক। কিশোরী বাবু হেতমপুর রাজবংশের পূর্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত না থাকায় মুরলীধর হইতে আরম্ভ করিয়া তদ্বংশ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু কুলগ্রন্থ হইতে এবং বাঁকুড়া জেলায় অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, এই রাজবংশ অতি প্রাচীন এবং মল্লভূমাধিপতির নিকটে মুরলীধরের পিতৃপিতামহের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। মুরলীধর বর্গির হাজ্জামে এবং তৎকালের উপদ্রবে সর্বস্বান্ত হইয়া বীরভূম রাজনগরে পলাইয়া আসেন, সুতরাং তাঁহাকে আজন্ম দরিদ্র বলি যায় না। হেতমপুর রাজবংশ তালিকার পাদটীকায় মুরলীধরের উর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ রুদাই বা রুদ্র সম্বন্ধে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় সন্দিহান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যদি লালমোহন বিজ্ঞানিধি সম্বলিত “সম্বন্ধ-নির্গম” (৩য় সংস্করণ) বিশেষ কাণ্ড ৪৭৮ পৃষ্ঠায় (ছান্দত বংশ) উল্লেখিত দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর হাশ্বাস্পদ হইতে হইত না।

‘ঋণ করিয়া জমিদারী খরিদ’ কার্য্য যতই ‘কঠিন’ হউক, ঋণানাথ সেই

উপায়েরই জমিদারীর মালিক হইয়াছিলেন। হেতমপুর রাজবাটীতে রক্ষিত পুরাতন তমস্কগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় ঋগদাতৃগণের নাম ও ঋণের পরিমাণ বিবৃত আছে—সমালোচক মহাশয় কি তাহা লক্ষ্য করেন নাই? লক্ষ্য করিবেনই বা কি করিয়া! নিন্দা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে কি কোনও দিকে লক্ষ্য থাকে?

তার পর, হেতমপুর-গ্রাম প্রতিষ্ঠার সময় লইয়া সমালোচক একটু টিপ্তনী কাটিয়াছেন। ৪৪ বৎসরে—বিশেষতঃ সেই অরাজকতার দিনে বর্গির বা তঙ্করের উপদ্রবে অথবা মড়কে—একখানি গ্রাম শ্রীহীন হওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং রেনেল সাহেবের মানচিত্রে তাহার নাম না থাকিলেও যে সে সময় এবং তৎপূর্বে সে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না, এমন কথা প্রমাণ হয় না।

তার পর সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন “পুস্তকের পাঠ্য-বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশ হেতমপুরকাহিনী।” আপন জন্মভূমি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অধিক পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁহার স্বগ্রামের যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিবরণীই তাঁহার নিকট আশা করি। রাজবংশের বিবরণ বিস্তৃত হইলেও পুস্তকের সম্পূর্ণতার জন্ত তাহা প্রয়োজনীয়। বিদ্বেষের ঠুলি চক্ষে দিলে অনেক জিনিসেই ‘বিভীষিকা’ জন্মায়—সে বিভীষিকার চিকিৎসা নাই।

* *

*

অপর কোন মাসিকপত্রের সমালোচনা লইয়া আমরা এত কথা বলিতাম না। কিন্তু সমালোচনার ছত্রে ছত্রে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের বাধ্য হইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইল। গ্রন্থে যে কোনও ত্রুটি নাই এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু সে সব ত্রুটি মারাত্মক নহে। কয়েক বৎসরের চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ গ্রন্থকার যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব পুরাতত্ত্বের সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, সেজন্ত তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেই ধন্যবাদার্থ, এবং উৎসাহ লাভের পাত্র। সুতরাং এরূপ গ্রন্থের সমালোচনার সহানুভূতির প্রয়োজন। দেশের দুর্ভাগ্য, তাই মাসিকপত্রের সমালোচনার স্তম্ভে আজকাল অনুগ্রহ ও নিগ্রহের আলা ও বিদ্বেষের কসরতের এত আধিক্য।

সাহিত্য-সমাচার।

প্রবাসীর প্রত্যগমন—(কাব্য)—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী প্রণীত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, কিন্তু মূল্য কিছু অতিরিক্ত ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে অপরিসীম নহেন। তিনি উপভাস, অমণ বৃত্তান্ত, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকর্তা। এই কাব্যখানি তিনি 'নয় বৎসর পূর্বে' রচনা করিয়া এতাবৎ season করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি পরিপক জ্ঞান ও বুদ্ধির সমন্বয়ে 'রিপুকর্ষ' চালাইয়া তিনি এই কাব্যখানি পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। 'মুখবুদ্ধে' তাঁহার মুকুটবিন্যাসটুকু উপভোগ্য।

ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সকল হয় নাই। কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, গত ১০ম বর্ষের অর্চনার 'কাব্য-কথা'র তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানেও তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধান। এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদারে বিব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য পূজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার অর্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্যময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার, কুবর্ণ, পুতিগন্ধ, কর্কশ স্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও তা কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বুদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বুদ্ধির নিয়মানুসারে বুদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিত্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুযায়িক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা কাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতঃ প্রাপ্ত বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখনই ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, 'যে আলোক জগৎ হলে কোথাও নাই' সেই আশ্চিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অর্থার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। 'কবি কই নামেরা শোধান বলিয়াছি।'

এই কাব্যখানির শুণের মধ্যে এই যে ইহা আগাগোড়া বুঝা যায় এবং ইহার ভাব সমস্তার জালে বেষ্টিত নহে।

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ।

[লেখক—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্ এ।]

হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রে মাংসের গুণ নির্ণয় প্রসঙ্গে জীবজন্তুর যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। স্ততরাং বিশেষ কৌতুকাবহ হইবে বিবেচনায় আমরা চরকসংহিতা ও বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় হইতে সেই শ্রেণীবিভাগ এস্থলে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

বাগ্ভটের শ্রেণীবিভাগই বিশেষরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া আমরা তাহাই প্রধান ভাবে অনুসরণ করিয়া চরকের বিভাগকে উহারই আনুসঙ্গিকরূপে গ্রহণ করিব।

বাগ্ভট প্রথমেই 'মৃগ' জাতিকে এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যথা :—

“হরিনৈশ কুরঙ্গস্য গোকর্ণ মৃগমাতৃকাঃ।

শশ শম্বর চারুঙ্ক শরভাঢ্যাঃ মৃগাঃ ॥”

চরক মৃগজাতির নাম আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

“পৃষতঃ শরভোরামঃ শদংষ্ট্রা মৃগমাতৃকাঃ।

শশোরণৌ কুরঙ্গশ্চ গোকর্ণঃ কোট্টকারকঃ ॥

চারুঙ্কো হরিনৈশৌচ শম্বরঃ কালপুচ্ছকঃ।

শম্ব্যশ্চ তরপোতশ্চ বিজ্জেরাঃ জম্বলাঃ মৃগাঃ ॥”

জাম্বল পশুদিগের নাম যথা—পৃষৎ, শরভ, রাম, শদংষ্ট্রা, মৃগমাতৃকা, শশ, উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ, কোট্টকারক, চারুঙ্ক, হরিন, এণ, শম্বর, কালপুচ্ছক, শম্ব্য এবং তরপোত।

ইহায় পর “বিষ্কির” নামক পক্ষিশ্রেণী; যথা :—

“লাববর্তীক বাতীর রক্তবস্ক কুহুতাঃ।

কপিঞ্জলোপচক্রাখ্য চকোর কুররাহ্ময়াঃ ॥

বর্ষুকো বর্ষিকাচেব তিষ্ঠিয়িঃ ক্রকয়ঃ শিখী।

কুহুটো বকককৌচ গোমর্দো গিরিবর্ষিকা।

তথা শারপদেজাত বারটাক্ষেষ্টি বিষ্কিরাঃ ॥”

“লাব, বটের, বাতীর, রক্তবর্ষক, কুকুট (অর্থাৎ বগুকুট বাহার চক্ষুর পাতা রক্তবর্ণ) গৌর তিত্তিরি, চক্রবাক, চকোর, উৎকোশ, ভারুই, বর্ষিকা (বর্ষক ভেদ), তিত্তিরি, ক্রকর, ময়ুর, কুকুট, বক, কাক, সারসপক্ষী, গিরিবর্ষিকা, দাঁড়কাক, ইল্লাভ (কাক বিশেষ) ও হংস, এই সকল পক্ষীকে বিষ্ণির কহে ।”

তৎপর ‘প্রতুদ’ নামক পক্ষিশ্রেণী, যথা :—

“জীবজীবক দাতাহ ভৃঙ্গরাজ শুকশারিকাঃ ।

লটা কোকিল হারীত কপোত চটকাদয়ঃ । প্রতুদাঃ ॥”

ইহার বিস্তার চরকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে :—

“শতপাত্রো ভৃঙ্গরাজঃ কোষষ্টির্জীবজীবকঃ ।

কৈরাতঃ কোকিলো দাতাহো গোপপুত্রঃ প্রিয়াম্বজঃ ॥

লটা লটবকৌ বক্রবটহা ডিণ্ডিমানকঃ ।

জটীহ্নুভিধাকোর লোহপৃষ্ঠ কুলিঙ্গকঃ ।

কপোত শুকশারিক্চিরিটী কঙ্কুযষ্টিকাঃ ।

শারিকাঃ কলবিহ্বল চটকোহঙ্গারচূড়কঃ ॥

পারাবতঃ পাণ্ডবিক ইত্যুক্তাঃ প্রতুদাঃ দ্বিজাঃ ॥”

“ ‘প্রতুদ’ পক্ষীদিগের নাম, যথা :—শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোষষ্টি, জীবজীবক, কৈরাত, কোকিল, ডাহক, গোপপুত্র, প্রিয়াম্বজ, লটা (লাট), লটবক, বক্র, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, হ্নুভি, ধাকোর, লোহপৃষ্ঠ, কুলিঙ্গক, কপোত, শুক, সারঙ্গ, চিরিটী, কঙ্কু, যষ্টিকা, শারিকা, কলবিহ্ব, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত এবং পাণ্ডবিক ।”

চতুর্থ শ্রেণী ‘বিলেশয়’ নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা :—

“ভেক গোধাহি খাবিদান্তা বিলেশয়াঃ ॥”

চরক এই শ্রেণীর নাম ‘ভূমিশয়’ দিয়া, এই শ্রেণীর জন্তুদিগের এই সকল নাম উল্লেখ করিয়াছেন :—

“শ্বেতঃ শ্রাম্যশ্চিত্রপৃষ্ঠঃ কালকঃ কাকুলীমৃগঃ ॥

কুচিকা চিল্লিতৌ ভেকো গোধা শল্লক গণ্ডকৌ ।

কদলীনকুলঃ খাবিদিতি ভূমিশয়াঃস্বতাঃ ॥”

“শ্বেতবর্ণ, শ্রামবর্ণ, বিচিত্র বর্ণযুক্ত মৃগ, কৃষ্ণমৃগ, কাকুলীমৃগ, কুচিক অর্থাৎ কুচে, চিল্লক, ভেক, গোধা অর্থাৎ গোসাপ, শল্লক, গণ্ডক, কদলী অর্থাৎ হরিণ বিশেষ, নকুল ও খাবিৎ এই সকল জন্তুকে ভূমিশয় বলে ।”

পৌষ, ১৩২৪] : জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ ।

পঞ্চম শ্রেণী 'প্রসহ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা :—

"গোখরাবতরোষ্ট্রাণ বীপি সিংহকর্কবানরাঃ ।
মর্জ্জার মুষিক ব্যাঘ্র বৃকবক্র তরক্ষবঃ ।
লোপাক জম্বুক শ্চেন চাষবাস্তাদ বায়সাঃ ।
শশয়া ভাস কুরর গৃধ্রোলুক কুলিন্গকাঃ ।
ধুমিকা মধুহাচেতি প্রসহা মৃগপক্ষিণঃ ॥"

"গো, গর্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, ঘোটক, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, ইন্দুর, ব্যাঘ্র, নেকড়িয়া বাঘ, বেজী, তরক্ষু, খ্যাকশিয়ালী, শৃগাল, শ্চেন অর্থাৎ বাজপক্ষী, নীলকণ্ঠ, কুকুর, কাক, হাঁড়িয়া বাজ, ভাস (শিখুবিশিষ্ট গৃধিণী), ক্রকণপক্ষী, গৃধ্র, পেচক, কালচটক, ফিঙ্গা ও পাপিয়া, এই সকল মৃগ ও পক্ষীকে 'প্রসহ' কহে।"

ষষ্ঠ শ্রেণী 'মহামৃগ' নামে কথিত হইয়াছে, যথা :—

"বরাহ মহিষাশ্বকুরুর রোহিত বারণাঃ ।
স্মরশ্চমরঃ খড়্গী গবয়শ্চ মহামৃগাঃ ॥"

"বরাহ, মহিষ, ন্যকু, রুরনামক হরিণ, রোহিত (লালবর্ণ হরিণ), হস্তী, স্মর (ঘোটকাকার হরিণ), চমর (যাহার চুলে চামর হয়), গণ্ডার ও গবয় ইহাদিগকে 'মহামৃগ' বলে ।

সপ্তম শ্রেণী 'জলচর' পক্ষীর শ্রেণী, যথা :—

"হংস সারস কাদম্ব বক কারণ্ডবপ্ৰবাঃ ।
বলাকোংক্রোশ চক্রাস্ত মদগু ক্রৌঞ্চাদয়োহপ্চরাঃ ॥"

চরকে ইহাদের সবিস্তার পরিসংখ্যা এইরূপ :—

"বক্ষ্যন্তেবারিচারিণঃ ।
হংসঃক্রৌঞ্চো বলাকাচ বকঃ কারণ্ডবঃপ্রবঃ ।
শরারী পুঙ্করাহশ্চ কেশরী মানভূগিকঃ ॥
মৃগাল কণ্ঠো মদগুশ্চ কাদম্বঃ কাকভূগিকঃ ।
উংক্রোশঃ পুণ্ডরীকাকো মেঘরাবোভুক্কুটী ॥
আরানন্দীমুখী বাটী স্মৃথঃ সহচারিণঃ ।
রৌহিণী কামকালীচ সারসো রক্ত শীর্ষকঃ ।
চক্রবাকস্তথাচাশ্চে খগাঃ সন্ত্যমুচারিণঃ ॥"

"জলচর পক্ষীদিগের নাম, যথা—হংস, ক্রৌঞ্চ, বলাকা, বক, কারণ্ডব, অর্থাৎ খড়্‌হাঁস, প্রব অর্থাৎ পানকোড়ী, শরারি, পুঙ্করাহ অর্থাৎ সারসপক্ষী, কেশরী, মানভূগিক, মৃগালকণ্ঠ, মদগু, কাদম্ব, কাকভূগু, উংক্রোশ, পুণ্ডরীকাক,

মেঘরাব, জলকুকুটী, আরা, নন্দীমুখী, বোটা, সুমুখা, সহচরী, রোহিণী, কামকালী, সারস, রক্তশীর্ষক এবং চক্রবাক প্রভৃতি ।”

অষ্টম শ্রেণী ‘মৎস্য’ শ্রেণী, যথা :—

“মৎস্যারোহিত পাণীন কুর্শ কুস্তীর কৰ্কটাঃ ।

শুক্টি শম্বোদ্র শবুক শকরী বক্ষিচন্দ্রিকাঃ ॥

চুলুকী নক্র মকর শিশুমার তিমিঙ্গিলাঃ ।

রাজী চিলিচিমাচ্চাশ্চ মাংসমিত্যাহবষ্টথা ॥”

“রুইমাছ, হাঙ্গর, কচ্ছপ, কুস্তীর, কাকড়া, ঝিগুক, শঙ্খ, উদ্বিড়াল, শামুক, পুঁটীমাছ, বাইন, চাঁদা, চুলুকী, নক্র (কুস্তীর বিশেষ—ঘড়িয়াল), মকর, শুকুক, রাজী (সামুদ্র মৎস্য) ও চিলিচিমাঙ্গি, ইহারা জলোদ্ভবত্বহেতু মৎস্যজাতি । শাস্ত্রকারেরা যুগ হইতে মৎস্য পর্য্যন্ত এই আট প্রকারকে মাংস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।”

এই অষ্ট শ্রেণী আবার ‘জাম্বল’, ‘আনুপ’ ও ‘সাধারণ’ এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা :—

“আচ্ছত্তা জাম্বলানুপা মধ্যো সাধারণো মৃত্তো ॥”

“উপরি উক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে আশু তিনটি (যুগ, বিষ্কির, প্রতুদ) ‘জাম্বল’, অশু তিনটি (মহায়ুগ, জলচর ও মৎস্যবর্গ) আনুপ এবং মধ্য দুইটি (বিলেশয় ও প্রসহ) উভয়চর নামে অভিহিত ।”

এই বিভাগত্রয়ের নামানুসারেই ‘স্থলচর’, ‘জলচর’ ও ‘উভয়চর’ এই সাধারণ ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে ।

জীব জন্তুর প্রাপ্তক বিভিন্ন সংজ্ঞাকরণের অতীব সুন্দর ব্যাখ্যা ‘চরক সংহিতা’য় এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

“প্রসহভক্ষয়ন্ত্যেতে প্রসহাস্তেন সংজিতাঃ ।

ভূশরা বিলশান্নিদানুপোহনুপসংপ্রয়াৎ ॥

জলেশনিবাসাজ্জলজা জলচর্যাচ্ছলেচরাঃ ।

স্থলজা জাম্বল্যুঃ প্রোক্তা যুগা জাম্বল চারিণঃ ॥

বিকীৰ্য বিষ্কিরাট্চৈব প্রতুদ্ব প্রতুদাস্তথা ।

ঘোনিরষ্টবিধাভেষাং মাংসানাং পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”

“যে সকল পশু ও পক্ষী জন্তুদিগকে সহসা বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে ‘প্রসহ’ বলে । গর্ত মধ্যে যে সমুদায় পশু ও পক্ষী বাস করে, তাহাদিগকে ‘ভূমিশয়’ বলে । জলার নিকট যে সমস্ত জন্তু বাস করে,

তাহাদিগকে 'আনুপ' জন্তু বলে। জলে বাস নিবন্ধন বিশেষ বিশেষ জন্তুকে 'জলজ' জন্তু কহে। যে সমুদায় প্রাণী জলে বিচরণ করে, তাহারা 'জলেচর'। যে সমস্ত জন্তু জঙ্গলে বাস করে, তাহারা 'জাঙ্গল' জন্তু নামে অভিহিত হয়। আর যে সমস্ত প্রাণী পদদ্বারা আহাৰ্য্য দ্রব্য—সমুদায় বিক্ষিপ্ত করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে 'বিক্ষির' জন্তু কহিয়া থাকে। আর যে সমস্ত প্রাণী আহাৰ্য্য দ্রব্য সমূহ ঠোট দিয়া খুঁটিয়া খায় তাহারা 'প্রতুদ' জন্তু নামে কথিত হইয়া থাকে। মাংস সকলের উৎপত্তি স্থান এই অষ্টবিধ উল্লিখিত হইল।”

ইহাদের মাংসের গুণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

“অসহাতুশয়ানুপ বারিজা বারিচারিণঃ ।
 গুরুক শিঙ্কমধুরা বলোপচয়বর্ধনাঃ ॥
 বৃষ্যাঃপরং বাতহরাঃ ককপিত্তবিবর্ধনাঃ ।
 হিতা ব্যায়ামনিত্যেভ্যোনরা দীপ্তাগ্নয়শ্চমে ॥
 অসহানাং বিশেষেণ মাংসং মাংসাপিনাং ভিষক্ ।
 জীর্ণার্শোগ্রহণী দোষশোষার্জনাং প্রযোজয়েৎ ॥”

“এই আট প্রকার পশু পক্ষীর মাংসের মধ্যে প্রসহ, ভূশয়, আনুপ, জলজ, ও জলেচর প্রাণিগণের মাংস গুরু, উষ্ণ, শিঙ্ক, মধুর, বল ও পুষ্টিবর্ধক, শুক্রবর্ধক, অত্যন্ত বায়ুনাশক, কফ ও পিত্ত বৃদ্ধিকারক, এবং যাহারা নিত্য ব্যায়াম বা পরিশ্রম করে, অথবা যাহাদের জঠরাগ্নির বিলক্ষণ দীপ্তি আছে, তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। মাংসাপি প্রসহ প্রাণীর মাংস, জীর্ণরোগ-পীড়িত, অর্শ রোগী, গ্রহণী ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।”

“লাবান্দ্রো বৈক্ষিরোবর্গঃ প্রতুদা জাঙ্গলামুগাঃ ।
 লঘবঃ শীতমধুরাঃ সকাষা হিতা নৃণাম্ ॥
 পিত্তোত্তরে বাতমধ্যে সন্নিপাতে কফানুগেণ
 বিক্ষিরা বর্ধকাদ্যন্তু অসহানান্তরা গুণৈঃ ॥”—চরক সংহিতা।

“লাব প্রভৃতি বিক্ষির জাতীয় জন্তুর, প্রতুদ জন্তুসমূহের এবং জাঙ্গল পশু-গণের মাংস লঘু, শীতল, মধুর ও কষায়-রস বিশিষ্ট। এই সকল জন্তুর মাংস পিত্ত প্রধান, বায়ুমধ্যম, এবং কফানুগ সন্নিপাতে বিশেষ উপকারী। বিক্ষির ও বর্ধকাদি জন্তুগণের মাংস প্রসহ প্রাণিগণের মাংস অপেক্ষা গুণবিষয়ে অল্পই বিভিন্ন।”

“গুরুক শিঙ্কমধুরা বর্গাশ্চাতোযখোত্তরম্ ।
 বৃক্রগুরুতো বন্যা বাতহরাঃ কফশিতলাঃ ॥”—বাগ্ভট।

“ইহার পর হইতে বিলেশাদি যে পাঁচটা বর্গ আছে, তাহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর শুষ্ক, স্নিগ্ধ ও মধুর রসবিশিষ্ট, অধিকতর মূত্র, শুষ্ক ও বলকারক, অধিকতর বাতঘ্ন এবং অতিশয় কফ ও পিত্তবর্ধক। অর্থাৎ বিলেশয় বর্গ অপেক্ষা প্রসহবর্গ অধিক পরিমাণে শুষ্ক, মধুর ও স্নিগ্ধাদি গুণবিশিষ্ট, প্রসহবর্গ অপেক্ষা মহামৃগ অধিক পরিমাণে উপরি উক্ত গুণবিশিষ্ট ইত্যাদি।”

“শীতা মহামৃগান্তেষু ক্রব্যাদাঃ প্রসহাঃ পুনঃ ।

লবণানুরসাঃ পাকে কটুকা মাংসবর্ধনাঃ ।

জীর্ণার্শো গ্রহণী-দোষ শোষার্শানাং পরং হিতাঃ ।”—বাগভট ।

“উক্ত বর্গ সকলের মধ্যে মহামৃগ (বরাহাদি) শীতবীৰ্য্য। প্রসহগণ মধ্যে ক্রব্যাদ সকল (যাহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে, যথা মার্জার, গৃধ্র, পেচক প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ লবণ রস, কটুপাক ও অতিশয় মাংসবর্ধক। ইহার জরা, অর্শঃ, গ্রহণী ও যক্ষ্মারোগে বিশেষ হিতকর।”

জন্তুদিগের অষ্ট প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইতে মেঘ ও ছাগ পৃথকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে :—

“ষোনিষতাবী ব্যামিশ্র গোচরান্নানিশ্চিত্তে ।”—বাগভট ।

“ছাগল ভেড়ার আবাস স্থানের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন উহাদিগকে উক্ত প্রকার বর্গের মধ্যে স্থির করা যায় না। যেহেতু ছাগল ও ভেড়া জঙ্গল ও আনুপ উভয় দেশেই বাস করে।”

এই সমস্ত পর্যালোচনা হইতে জীবজন্তুদিগের আহার বিহার আবাস প্রভৃতি যেমন হিন্দুদিগের সম্যক পর্যবেক্ষণের বিষয় হইয়াছিল—ইহাদিগের মাংস পর্যন্তও যে তেমনই সবিশেষ পরীক্ষার বিষয় হইয়াছিল এবং এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবেই যে জীবজন্তুদিগের শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়াছিল; তাহার বিশেষ প্রমাণই আমরা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি।

সমালোচনায় বিড়ম্বনা ৭।

(পূর্বানুবৃত্ত)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ।]

শঙ্করমিশ্র “যদ্বা—” বলিয়া যে ব্যাখ্যা কোশল প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যায় যে তাঁহার আস্তা নাই, ইহা বৈশেষিক দর্শনের সর্বশেষে পুনরভিহিত”

“তদ্বচনাদায়স্য প্রামাণ্যম্ভিত” (১০২১৯)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা দেখিলেই জানিতে পারা যায় ।

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ লিখিয়াছেন—“বরং শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদিষ্ট ‘ঈশ্বরোচ্চরিতত্ব প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য বলিলেই অত্রোত্ত্রাশ্রয় হয় । কারণ ইহাতে বেদবোধিত বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি হয় এবং সেই ঈশ্বর বাক্য বলিয়া বেদেরই প্রামাণ্য স্থির হয় । অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিয়া এ দোষ নিবারণ করিতে যাইলে ব্যভিচার হয় । কারণ ঈশ্বরবতার বুদ্ধ বাক্যও তাহা হইলে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে । অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলে জৈন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অনাস্তিক পদবাচ্য হইতেন না ।”

‘তর্কতীর্থ’রূপে পরিচয় দিয়াও যে প্রতিবাদী এমন ঘোর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিলেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় । ঈশ্বরোচ্চরিতত্ব প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য অবধারণ করিলে অত্রোত্ত্রাশ্রয় হয়, এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যে অসঙ্কোচে নির্দেশ করিতে পারে, তাহাকে—“অয়ং গৌরবিতো মহান্” বলিয়াই অভিনন্দিত করা উচিত । তর্কতীর্থ মহাশয় যে অত্রোত্ত্রাশ্রয় দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, নিত্য নির্দোষত্বরূপে বেদের প্রামাণ্যবাদী মীমাংসকেরা অনেক দিন পূর্বে নৈয়ায়িকদিগের নিকটে এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়াছিল ।—

‘বেদাৎ কর্তৃবোধে তু স্পষ্টমন্তোস্তসংশ্রয়ম্ ।

ততো বেদপ্রমাণত্বং বেদাৎ কর্তৃক নিশ্চয়ঃ ॥’

কিন্তু “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্তভট্ট যে এই পূর্বপক্ষের উত্তর করিয়াছেন, প্রতিবাদী তর্কতীর্থের এই বুদ্ধ বয়সেও কি তাহা জানিবার সুযোগ হয় নাই ? জয়ন্তভট্ট সমাধান করিয়াছেন ;—“যদপীতরেতরাশ্রয়মভাষি পুরুষোক্তে বেদে প্রামাণ্যং বেদপ্রামাণ্যাৎ পুরুষসিদ্ধিরিতি তদপি ন শম্যক্, পূর্বং পরিহৃতত্বাৎ । অনুমানাত্ প্রসিদ্ধে কর্তরি বেদবাক্যোক্তে প্রতীতৈরুপোদ্বলনমিষ্যতে ন হাগমৈকশরণ এব কর্তৃবগমঃ ।”—(শ্রায়মঞ্জরী, ২৩৮ পৃঃ)

“ঈশ্বরোচ্চরিত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য এবং বেদের প্রামাণ্য প্রযুক্ত ঈশ্বরসিদ্ধি—এইরূপে যে অত্রোত্ত্রাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছ, তাহা ঠিক নহে । কেন না, অনুমান প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ হন, তথাপি বেদবাক্য দেখাইয়া সেই সিদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করা হয়,—একমাত্র বেদই ঈশ্বর সিদ্ধির প্রমাণ নহে ।”

“মুক্তাবলীপ্রকাশে” মহাদেব ভট্টও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১) ।

(১) “একোক্তানুমানেনেশ্বরসিদ্ধৌ ওচ্চরিতত্বেন বেদস্য প্রামাণ্যনিশ্চয়াদ্ বেদোহপি বরং প্রমাণম্ ।”—মুক্তাবলীপ্রকাশ, ৩৬ পৃঃ ।

তার পর প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিলে ব্যভিচার হয়, ইহা সত্যই হাসির কথা । বেদে ঈশ্বরের পরিচয় থাকিলেও যে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইবে, আজ পর্য্যন্ত কি এ কথা তর্কতীর্থের প্রতিপত্তিরও পথিক হয় নাই ?

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”, “বিশ্বস্য কর্তা ভুবনশ্চ গোপ্তা” ইত্যাদি বেদবাক্যে ব্রহ্মের পরিচয় থাকিলেও ইহাতে নিঃসংশয়রূপে ব্রহ্মত্ব অবধারিত হইতে পারে না । কারণ, “নিগুণং পরমং ব্রহ্ম” ইত্যাদি পরম বাক্যে ব্রহ্মকে নিগুণ বলা হইয়াছে । ব্রহ্ম নিগুণ হইলে গুণের অন্তর্গত কৃতির অভাবও ব্রহ্মে সিদ্ধ হইয়া পড়ে । কাজেই ব্রহ্মে জগতের কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব—এই উভয় বোধক বাক্যই পাওয়া যাইতেছে । এখন ঈশ্বর জগতের কর্তা না অকর্তা—এই সংশয় উপস্থিত হইল—বেদবাক্যের সহায়তায় জগৎকর্তৃত্বাদিরূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইল না ; এইজন্যই অনুমানরূপ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইবে । অনুমানশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত কেবল আপ্তবাক্যের দ্বারা তত্ত্বাবধারণ হয় না । এইজন্যই মহাত্মারতের শাস্তিপর্বে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

“তত্রোপনিষদৈকং পরিশেষঞ্চ পার্শ্বিব ।

মখামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চার্বীক্ষিকীং পরাম্ ॥”

(মোক্ষ, ৩১৮।৩৪)

আর্বীক্ষিকী অর্থাৎ অনুমান-নির্কাহক তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই উপনিষদাদির প্রকৃত মর্ম আবিষ্কার করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ গুরু প্রভৃতি মীমাংসকগণ বিধি-প্রত্যয়শূন্য বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরবোধক বেদবাক্যগুলি স্তূত্যর্থবাদের মধ্যেই পরিগণিত । কাজেই অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ না করিলে নিরীশ্বরবাদীগণকে পরাজিত করিতে পারা যায় না । মদীয় অধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৬ রাখালদাস ঞ্জয়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত “অদ্বৈতবাদধ্বংসপরিশিষ্টে”র প্রথমাংশে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার লিপিবদ্ধ আছে । কেবল প্রতিশ্রুতির দ্বারা যে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না—ঈশ্বর সিদ্ধির জন্য যে অনুমানরূপ প্রমাণের অবতারণা করিতে হইবে, ইহা অতি স্পষ্টভাবে “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে—” (৩।১)—ইত্যাদি কেনোপনিষদের শঙ্করাচার্য্যকৃত বাক্যভাষ্যে ও আনন্দগিরিকৃত ভাষ্যটীকায় অভিহিত হইয়াছে (২) ।

(২) “তৎসিদ্ধির্ভগতো নিরতপ্রযুক্তেঃ । প্রতিশ্রুতিপ্রসিদ্ধিতি নির্ভ্য সর্ববিজ্ঞান ঈশ্বরে সর্বত্র
স্বনি সর্বশক্তি সিদ্ধেপি শার্গার্বনিষ্ঠরার্বমুচ্যতে ।”—শঙ্করভাষ্য, ২২-২৩ পৃঃ, আনন্দাশ্রমসং

প্রতিবাদী বে. বলিয়াছেন, ঈশ্বরোচ্চরিত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য হইলে ঈশ্বরবতার বুদ্ধের উপদেশও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে—এ আপত্তি আপত্তিই নহে । বুদ্ধ কি জগৎকর্তা ? ভগবান্, যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবা-
দৃষ্টের বৈচিত্র্য অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শরীরেই বেদ রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা প্রমাণ । সেই জগৎকর্তা পুরুষোত্তমের উপর নির্ভর করিয়াই লোকে বেদবাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকে । যে সকল বাক্য এই জগৎ-
কর্তা ভগবানের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, অথবা তৎকৃত বেদবাক্যের বিরুদ্ধ, শিষ্ট সম্প্রদায় তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত-
ভট্ট এই কথাই পরিস্ফুটভাবে লিখিয়াছেন,—

“কর্তা য এব জগতামখিলাস্ববৃত্তি
কর্ম্মপ্রপঞ্চপরিপাকবিচিত্রতাজ্জঃ ।
বিশ্বাসনা তদ্রূপদেশপরাঃ প্রণীতা
স্তেনৈব বেদরচনা ইতি যুক্তমেতৎ ।
আপ্তং তমেব ভগবন্তমনাদিনীশ
মাশ্রিত্য বিশ্বসিতি বেদবচঃসু লোকঃ ।
তেষামকর্তৃকতয়া ন হি কশ্চিদেবঃ
বিশ্রমমেতি মতিমানিতি বর্ণিতঃ শ্রাক্ ॥”

(শ্রায়মঞ্জরী, ২৪০ পৃ:)

“অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলে জৈনবৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অনাস্তিক পদবাচ্য হইতেন না”—ইহা অদ্বুত সিদ্ধান্ত । অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন, আর জৈন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আস্তিক হইয়া গেলেন—এ কার্য্যকারণ ভাব মন্দ নহে ।—
“বিষং বিষধরৈঃ পীতং মূর্চ্ছিতাঃ পথিকাস্রনাঃ ।” জৈন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বেদ-
সিন্দক, এই জগুই তাঁহারা নাস্তিক—“নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ।” ঈশ্বর স্বীকার করিলেই আস্তিক বা ঈশ্বর অস্বীকার করিলেই নাস্তিক হয় না । তাহা হইলে
• নিরীশ্বরবাদী মীমাংসক ও সাংখ্যাচার্য্যেরা আস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন না । দার্শনিক এই সকল স্থূল সিদ্ধান্তগুলিও যাহাদের জানা নাই, তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতেও লজ্জা বোধ হয় ।

“কথং তর্হীশ্বরসিদ্ধিরিত্যাকাজ্জামাহ—তৎসিদ্ধিরিতি । ননু শ্রত্যাদিতিক্লেবেষু সিদ্ধে
কিমিতি জগতো নিয়তপ্রবৃত্তিলিঙ্গকানুমানং সৃষ্টিতং তত্রাহ—শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিরিতি ।
যাবৎ তর্কেণ সম্ভবো নানুগৃহ্যতে তাবচ্ছাত্রপ্রতিপন্নোহপীষরো ন নিশ্চীয়তেহর্থাবাদকশকাপ্রতি-
বন্ধাদতঃ শাস্ত্রার্থশ্বেষরস্ত নিশ্চয়ার নিয়মায় সামান্ততোদৃষ্টমনুমানং শাস্ত্রাহুগ্রাহকরূপং হুত্রেণো-
চ্যতে ।”—আনন্দগিরি কৃত টীকা, ২২-২৩ পৃ: ।

তार्কিকপুস্তক তর্কতীর্থ মহাশয়ের উপদেশে নব্যন্যায়ের প্রতিপত্তি অধ্যায়ে ঘোষিত হইয়াছিল যে,—“এই মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে বেদে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয়, এবং এই পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যিক ।”

আমরা সমালোচনায় এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, “আত্মা” বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (৪।৫।৬)—এই বৃহদারণ্যক উপনিষৎস্থিত আত্মপদের অর্থ জীবাত্মা । সুতরাং পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয় এবং এই পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক শ্রবণাদি আবশ্যিক, ইহা নব্যন্যায়ের প্রতিপত্তি নহে । এ সম্বন্ধে আমরা বিশ্ব-বিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের রচিত “মুক্তিবাদ” গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছিলাম । ইহার উত্তরে প্রতিবাদী উদয়নকৃত “শ্রায়-কুসুমাজলি” গ্রন্থের—“স্বর্গাপবর্গয়োর্মার্গমামনস্তি মনীষিণঃ ।—” ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—“এ শ্লোকটায় কি বলে না যে পরমাত্মার জ্ঞান ও মোক্ষার্থ প্রয়োজন ?”

হরিদাস-কৃত কুসুমাজলি-বিবৃতি দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, জীবাত্ম-সাক্ষাৎকারের উপযোগী বলিয়াই এখানে উদয়ন ঈশ্বর-মননকে মুক্তির হেতু বলিয়াছেন । হরিদাস স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

“ঈশ্বরমননঞ্চাদৃষ্টদ্বারা স্বাত্মসাক্ষাৎকারদ্বারা বা মুক্তৌ হেতুঃ ।”

“কুসুমাজলি”র প্রধান টীকাকার বর্ধমানোপাধ্যায়ও এই কথা বলিয়াছেন (৩) ।

সুতরাং জীবাত্মার জ্ঞানই মুক্তির কারণ, জীবাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই পরমাত্ম-জ্ঞানকে মুক্তির হেতু বলা হয়—ইহাই “স্বর্গাপবর্গয়োর্মার্গম্—” ইত্যাদি কারিকার প্রকৃত মর্ম্ম । তার পর পরমাত্মার জ্ঞান মুক্তির হেতু, ইহা উদয়নাচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহা নব্যন্যায়ের প্রতিপত্তি হইল কেমন করিয়া ? উদয়নাচার্য্য কি নব্য নৈয়ায়িক ? তর্কতীর্থ মহাশয় যে এত ভালকাণা, দর্শাই ইহা আমরা পূর্বে জানিতাম না । প্রতিবাদী বলিয়াছেন, “যাহারা উত্তর মীমাংসার দত্ত মামেম, তাহারা দেখিবেন উপক্রমোপসংহারাদি উপায়ে আত্মা

(৩) ঈশ্বরমননক বদ্যপি স্মিত্যাজ্ঞানোল্লনদ্বারা নোপযোগি, তথাপি স্বাত্মসাক্ষাৎকার এব উপবৃত্ত্যতে । বদ্যহিঃ “সহি তত্ত্বতো জাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকারস্তোপকরোতি” ইতি ।—
প্রকাশ, ১০ পৃঃ ।

এখানে পরমাখ্যাবলিয়াই উত্তর মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।” “আখ্যা বা অরে
দ্রষ্টব্য :—” এখানে আত্মপদের অর্থ পরমাখ্যা—ইহা উত্তর মীমাংসার সিদ্ধান্ত
হউক বা পূর্ব মীমাংসার সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে ত আমাদের আপত্তি নাই ।
আমরা বলিয়াছিলাম, এখানে আত্মপদের অর্থ পরমাখ্যা—ইহা নব্যগ্রামের
প্রতিপাত্ত নহে । লেখক যদি স্বাধীন ভাবে বা নব্যগ্রাম ব্যতীত অগ্র শাস্ত্রের
ঐশ্বর্যবর্তনে বলিতেন, পরমাখ্যার জ্ঞান মুক্তির হেতু, তাহা হইলে আমরা কোনই
আপত্তি করিতাম না । ‘অপরের সিদ্ধান্ত—যে সিদ্ধান্ত রঘুনাথ-প্রমুখ নব্য
নৈয়ামিকেরা যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন—নব্যগ্রামের প্রতিপাত্ত
বলা হইয়াছিল, এইজন্যই আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম । উত্তর করা দূরে
থাকুক, প্রতিবাদী তর্কতীর্থ যে আপত্তিটা বুঝিতেও পারিলেন না, ইহাই
দুঃখের কথা ।

কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী এবং কণাদ-মতে অভাব অধিকরণ স্বরূপ—এইরূপ
সিদ্ধান্ত করায় আমরা সমালোচনায় প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক ইহার খণ্ডন করিয়া-
ছিলাম । শ্রীধরাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, শঙ্করমিশ্র, অমরকোবের টীকাকার মহেশ্বর
প্রভৃতির সুস্পষ্ট লিপি হইতে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী
নহেন, অভাবও তাঁহার মতে পদার্থান্তর । এমন কি, নবম অধ্যায়ের প্রথমে
মহর্ষি কণাদ স্বয়ং প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্মোচ্চাভাব ও অত্যন্তাভাবের নিরূপণ
করিয়াছেন । এই সকল স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াও প্রতিবাদী অসকোচে
লিখিয়াছেন,—“কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়া.....স্বক্ষদর্শিতার পরিচয়ই
দিয়াছেন ।” তথাস্তু ।—“জ্ঞানলব্ধুর্কিদঙ্কং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি ।” তার
পর আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, “কণাদের মতে আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসের
নাম মুক্তি এবং এই মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কারণ ।” এমন অভাব যদি
অধিকরণ স্বরূপ হয়, তাহা হইলে দুঃখ-ধ্বংসরূপ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইতে
পারে না ।” ইহার উত্তরে প্রতিবাদী লিখিয়াছেন,—“শাস্ত্রী মহাশয় যে যুক্তি
দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের হাশ্র সম্বরণ করা যায় না ।” প্রতিবাদী
তর্কতীর্থ ষেরূপ উল্লভ-প্রলাপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে অকারণ
হাসিবেন বা কাঁদিবেন, ইহা বিন্দুমাত্রও বিচিত্র নহে । অভাবকে অধিকরণের
স্বরূপ বলিলে মুক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না—এ যুক্তি আমাদের
স্বকপোলকল্পিত নহে ;—“ভাষারত্ন” ও “শাস্ত্রসিদ্ধান্তমঞ্জরী”তে এ কথা বিস্তৃত
ভাবে লিপিবদ্ধ আছে । তর্কতীর্থ মহাশয় কি শাস্ত্রশাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থগুলিও
দেখেন নাই ?

প্রতিবাদী লিখিয়াছেন, “হুঃখনিবৃত্তিকে যে মোক্ষ বলা হয়, তাহা অনাগত হুঃখের নিবৃত্তিই বৃত্তিতে হইবে, বর্তমান হুঃখ কণকাল পরে নষ্ট হইতে বাধ্য।” কি বুদ্ধি! যে হুঃখ উৎপন্নই হইল না, তাহার ধ্বংসও হইয়া গেল! অনাগত হুঃখের নিবৃত্তি যে সম্ভবপর নহে, এ কথা উদয়নাচার্য্য “দ্রব্যকিরণাবলী”তে ও শঙ্করমিশ্র “উপস্কারে” স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন (৪)। আমরা প্রতিবাদী তর্কতীর্থের হিতের জগ্ৰই বলি, তিনি যখন তর্কশাস্ত্রের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থগুলিও পড়েন নাই এবং যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বতির-অতল জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন, তখন পাণ্ডিত্য প্রকটনের উদ্দেশে বার্থ চেষ্টা করিয়া কেন আর লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হন? প্রতিবাদী আরও বলিয়াছেন যে, “যদি আত্যন্তিক হুঃখ ধ্বংসই মোক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে এই তত্ত্বজ্ঞানটী সেই আত্যন্তিকত্বরূপ বিশেষণাংশের প্রয়োজক হইবে।” ইহা যে খণ্ডিত মত, তাহা কি প্রতিবাদী জানেন না? মহাদেব ভট্ট, “মুক্তাবলীপ্রকাশে”র প্রথমাংশে ‘বদন্তি’-কল্পে উক্ত প্রাচীন মত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং “মুক্তাবলীপ্রকাশে”র টীকায় রামরুদ্র এই কল্পের অশ্বরস দেখাইয়াছেন যে, ‘বিশেষ্যের অপ্রয়োজক হইলেও যদি বিশেষণাংশের প্রয়োজকতা লইয়া বিশিষ্টের প্রয়োজকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘বহিঃ ধূমের প্রয়োজক’—এই ব্যবহারের স্থায় ‘বহিঃ ধূমবৎ পর্বতের প্রয়োজক’—এই ব্যবহারেরও আপত্তি হয়। (৫)

আমরা বলিয়াছিলাম, কণাদের মতে অভাব অধিকরণ স্বরূপ নহে। প্রতিবাদী ইহার উত্তরে “সিদ্ধান্তলক্ষণ” হইতে প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, নৈয়ায়িকেরাও সম্প্রদায়ভেদে কোনও কোনও অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলেন। অভাবাধিকরণক বা অভাব প্রক্রিয়োগিক অভাবকে যাহারা অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতানুসারে শিরোমণি, লক্ষণবাক্যস্থ ‘অত্যন্ত’ পদের সার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এক ত ইহা নির্দোষ পক্ষ নহে। জগদীশ লিখিয়াছেন,—“সম্প্রদায় ইত্যশ্বরসঃ”। তার পর এটা যে নৈয়ায়িকদিগের মত, তাহা প্রতিবাদীকে কে বলিল? আমরা বলি, উহা মীমাংসকবিশেষেরই

(৪) “অনাগতস্ত নিবর্তনিতুমশক্যত্বাৎ”—কিরণাবলী, ৯ পৃ:।

“অনাগতহুঃখনিবৃত্তেরশক্যত্বাৎ”—উপস্কার, ৬ পৃ:।

(৫) “বসমানাধিকরণহুঃখাসমানকালীনত্বরূপবিশেষণাংশে তত্ত্বজ্ঞানস্ত প্রয়োজকত্বাৎ... ইতি বদন্তি।”—মুক্তাবলীপ্রকাশ, ৪০ পৃ:।

“বদন্তীত্যশ্বরসোক্তাবনং তদবীজস্ত—” রামরুদ্রী, ৪১ পৃ:।

মত । নৈয়ায়িকেরা যে স্থলবিশেষে মীমাংসক মতেরও অনুবর্তন করিতেন, প্রতিবাদী তাহা “সিদ্ধান্তলক্ষণে”ই “নিত্যস্থখাতিব্যক্তেমুক্তিত্বমতে”—এই গ্রন্থাংশে দেখিতে পাইবেন ।• দ্বিতীয়তঃ সর্বত্র উক্ত সিদ্ধান্ত, স্বীকৃতও হয় নাই ; জগদীশ পরে লিখিয়াছেন,—“ইদমপি অভাববৃত্তিরভাবো ন অধিকরণ স্বরূপঃ... ইতি মতেন” ।—(২৯ পৃঃ জীং সং)

প্রতিবাদী বলিয়াছেন, কপিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি, কণাদকে ষট্‌পদার্থ-বাদী বলিয়াছেন । কণাদ যে ভাব পদার্থ ছয়টাই স্বীকার করিতেন,—শক্তি সাদৃশ্যাদি যে তাঁহার মতে পদার্থান্তর নহে, ইহা ত আমরাও বলি । কিন্তু কণাদ, অভাবের পদার্থান্তরতা স্বীকার করিতেন না, ইহা কি প্রতিবাদী কপিল ও শঙ্করের লিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারেন ? ভাব পদার্থের নির্বচন-অভিপ্রায়েই যে কণাদ তন্ত্রের প্রথমে ছয় পদার্থের ‘উদ্দেশ’ করা হইয়াছে,—অতঃ পরে যে বৈশেষিক মতে পদার্থান্তর, ইহা বরদরাজ কৃত “তार्কিক রক্ষা”র স্পষ্ট লিখিত আছে (৬) ।

কোটালীপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়কে ‘সিদ্ধান্তরত্ন’ বলিয়া উল্লেখ করায় প্রতিবাদীর মতে না কি কোনও দোষই হয় নাই । এখন হইতে কেহ যদি তর্কতীর্থ মহাশয়কে ‘রচনানুবাদে’র কাব্যতীর্থ বলিয়া স্থির করে, তাহা হইলে তিনি যেন আর ক্রুদ্ধ না হন ।

“অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপাথোজয়ুগং পুরদ্বিষঃ ।”—ইত্যাদি গদাধরকৃত মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি “পদপঙ্কজয়ুগং”—এইরূপ বিকৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করায় আমরা ক্রটি দেখাইয়াছিলাম । প্রতিবাদী ইহার উত্তরে আমাদেরকে বিক্রম করিয়া লিখিয়াছেন যে,—“পদপঙ্কজয়ুগঃ” পাঠ যে কোনও পুথিতে নাই, তাহা কি শাস্ত্রী মহাশয় ষড়্‌পাতিয়া দেখিলেন না কি ?” তর্কতীর্থ মহাশয়ের কি এটুকুও বুদ্ধি নাই যে ‘পদপাথোজ’ স্থলে ‘পদপঙ্কজ’ করিলে ছন্দোভঙ্গ হয় ? ইহা কি গণ্ড—যে একটা যা’ তা’ পাঠান্তর কল্পিত হইবে ?

(৩)—“কণাদত্ত্ব মনুষ্যত্ব লক্ষণমীচন্দ্র ইতি । তানিদানীঃ পদার্থানুদিশতি ।

ত্রয়ং গুণস্তথা কৰ্ম্ম জাতিশ্চৈতৎত্রয়াশ্রয় ।

বিশেষঃ সমবায়শ্চ পদার্থাঃ বড়িম্বে মতাঃ ॥”

—তार्কিকরক্ষা, ১৩০ পৃঃ ।

• এবং লক্ষিতা ষট্‌পদার্থী, এতন্তামেব ভাবান্তরকঃ বিশ্বমন্তর্ভবতি । ভাবব্যতিরিক্তোহভাব ইতি ভেনসহ সষ্টৈব পদার্থী ইতি নিয়মঃ ।”—ই, ১৬৩ পৃঃ ।

“প্রসন্নরাসব” নাটকে “ষেবাং কোমলকাব্য-কৌশলকলাগীলাবতী ভারতী —” ইত্যাদি শ্লোকটি লিখিত আছে, তথাপি প্রতিবাদী না কি প্রবাদানুসারে উক্ত শ্লোকটি রঘুনাথ-রচিত বলিয়াছেন। এই ‘প্রকৃষ্ট বাদ’ কি তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিজেরই মুখারবিন্দ নিঃসৃত ?

রঘুনাথ শিরোমণিকে অদ্বৈতবাদানুরাগী পণ্ডিত বলায় আমরা তাহার খণ্ডন করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, রঘুনাথ কেবলাবলি-গ্রন্থের “অত্র বদন্তি”-কল্পে ব্যতিরেকী অনুমান খণ্ডন করিয়া অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন,—অতএব তিনি অদ্বৈতবাদী। প্রথমতঃ ‘অত্রবদন্তি’-কল্পে যে শিরোমণির নিজস্ব, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। নিজের মত হইলে ‘বয়স্ক ক্রমঃ’ থাকিত। বরঞ্চ ইহা যে ভট্টমতের শঙ্কা, তাহা অগদীর্ষ প্রদর্শিত— “শঙ্কয়ং নব্যনৈয়ারিকানাং ভট্টানাং বা”—এই আভাসে বুঝিতে পারা যায়। ‘অত্রবদন্তি’-কল্পে ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব’ লক্ষণ যে মীমাংসক-মতানুসারে পরিষ্কার করা হইয়াছে, “কেবলাবলি”র প্রথমাংশের গদাধরী টীকা দেখিলেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গদাধর লিখিয়াছেন,—“তাদৃশহেতোঃ অব্যব্যতিরেকিত্তে তাদৃশহেতুকানুমানশ্চ মীমাংসকৈরভ্যুপপত্তব্যতয়া তেষাং সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ত্বশ্চ ব্যাপ্তিত্ত্বাভ্যুপগমবিরোধাত্।” তা’র পর অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেই যদি অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী শরর স্বামী, কুমারিল ভট্ট, প্রভাকর-প্রমুখ মীমাংসকগণও অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়েন। অর্থাপত্তির প্রামাণ্যবাদী বলিয়া মীমাংসকেরাই অধিক প্রসিদ্ধ। মথুরানাথ, “তত্ত্বচিন্তামণি”র ‘অর্থাপত্তি’ প্রকরণের ‘রহস্য’ নামক টীকার প্রথমে লিখিয়াছেন,—“অর্থাপত্তেরতিরিক্তপ্রমাণত্বং মীমাংসকাভিমতং নিরাচর্ষে।” মীমাংসা দর্শন হইতেই বেদান্তীরা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভূমিকায় একাধিক বার ‘বিষ্ণালয়গৃহকোণে’ লিখিত ছিল বলিয়া আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী তাহার উত্তরে “দৈনিক বসুমতী” হইতে প্রমাণ দিয়াছেন—“বিষ্ণালয় গৃহ নির্মাণ হইতেছে।” হা অদৃষ্ট! প্রতিবাদীর শেষে সংবাদপত্রের সংবাদ খুঁজিয়া প্রমাণ বাহির করিতে হইল। প্রতিবাদী আবার বৈয়াকরণ সাজিয়া গৃহের বিশেষণরূপে অব্যয়ের অন্ত ‘বিষ্ণালয়’ শব্দের একটা অর্থও বাহির করিয়াছেন,—“বিষ্ণাল অর্থাৎ জ্ঞানের লয় অর্থাৎ শেষ হয় যেখানে।” তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহই এই অর্থানুসারে ‘বিষ্ণালয়’। তাহার কাছে পড়িতে গেলে যে পূর্বেপার্জিত বিষ্ণালও লয় হয়, কাণ্ডিপঞ্চমের বঙ্গানুবাদই তাহার নির্দর্শন।

“ছর্গেশমনিনী”র গর্জপতি বিষ্ণাদিগুগজকে তাহার অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয় ?” ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, “রামকান্ত ।” তর্কতীর্থ মহাশয়ও সেইরূপ ছয় মাস ভাবিয়া আমাদের প্রত্যেক আপত্তির উত্তরেই ‘কিছু’ বলিয়াছেন । তবে একটা কথার উত্তর দেন নাই । তর্কতীর্থ উপদেশ করিয়াছিলেন,—মূর্ত্ত মাত্রেই দিগুপাধিত্ব স্বীকার করা হয় । আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিয়া “ব্যধিকরণ”, “সিদ্ধান্তলক্ষণ” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছিলাম, মূর্ত্ত-মাত্রেই দিগুপাধিত্ব স্বীকার করা হয় না,—জন্তু মূর্ত্তই দিগুপাধি হইয়া থাকে । তর্কতীর্থ যে এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না, তাহা নহে । বোধ হয় আমাদের প্রতি কুপাপরবশ হইয়াই ইহার উত্তরে ‘কিছু’ বলেন নাই ।

তর্কতীর্থ, বিনামার অন্তরালে থাকিয়া লিখিয়াছেন,—“শাস্ত্রী মহাশয় পরম পূজনীয় তর্কতীর্থ মহাশয়কে পর্য্যন্ত জড়াইয়াছেন, এটা কি ভদ্রতা ! ইহা কি শিষ্টাচার ?”

দুই শত টাকা গুরুদক্ষিণা লইয়া তর্কতীর্থ মহাশয় ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—যশের প্রত্যাশায় বিজ্ঞাপনে নিজের নামও ছাপিয়াছেন, তবে এখন আবার ধরা পড়িবার ভয় কেন ? যদি এতই ভয়, তবে নাম না ছাপিলেই পারিতেন ।

পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৩রাখালদাস শ্রায়রত্ন মহাশয় আমার অধ্যাপক, ইহা জানিয়াও তর্কতীর্থ লিখিয়াছেন,—“শাস্ত্রী মহাশয়ের গুরুর গুরু স্থানীয় সার্কভৌম মহাশয়, তর্কবাগীশ মহাশয়, তর্কভূষণ মহাশয়, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে পুস্তক দেখিয়া—”

সার্কভৌম মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয়, পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র, তর্কবাগীশ মহাশয়ও শ্রায়রত্ন মহাশয়কে অধ্যাপকের শ্রায় সম্মান করিতেন, সুতরাং তর্কতীর্থ প্রদত্ত উক্ত অযাচিত প্রশংসাবাদে সার্কভৌম মহাশয়, তর্কবাগীশ মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয় প্রীতি লাভ করিবেন না, প্রত্যুত লজ্জিতই হইবেন ।

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, উপসংহারে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—“তিনি (সমালোচক) এখন যদি এরূপ পুস্তকরত্নের প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে ।” আমরাও তর্কতীর্থ মহাশয়কে উপদেশ করিতেছি যে, তিনি কীর্ত্তিলাভের হ্রাশায়—“প্রাংস্তলভ্যে কলে

লোভাছড়াছরিব বামনঃ”—উপহাসাম্পদ না হইয়া এই জাতীয় ‘পুস্তক রত্নে’র প্রচার-চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। তর্কতীর্থ মহাশয় কি পশ্চাত্ত্বিত শ্লোকটী জানেন না ?

“জ্যোতিরিন্দ্রন কথং ন লজ্জসে

যৎ তমঃ শমরিতুং সমীহসে ।

এতদেব বহু কিং ন মন্তসে

যৎ তমত্র তিমিরেণ লক্ষসে ॥”

তর্কতীর্থ মহাশয় যে প্রতিবাদভাস প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা বেশ বুঝিয়াছি, “সাহিত্যে” প্রকাশিত সমালোচনা, তাঁহাদের গায়ে লাগিয়াছে। তাই ক্রোধাক্ত প্রতিবাদী, সমালোচকের প্রতি ভদ্রজনবিগর্হিত অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া স্বীয় শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। তর্কতীর্থ আরম্ভেই লিখিয়াছেন, “গত মাঘের সাহিত্য-পত্রিকায়.....ব্যাপ্তিপঞ্চকের অনুবাদ গ্রন্থে অযথা কতিপয় দোষারোপ করিয়া কোনও এক শাস্ত্রী এক সন্দর্ভ লিখিয়া স্বকীয় বিজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন।” “সাহিত্যে” প্রকাশিত সমালোচনার অযথা দোষারোপ করা হইয়াছিল—কোনও বিশেষজ্ঞের লিখিত এইরূপ পত্রের সহিত প্রতিবাদী তর্কতীর্থ মহাশয় যদি নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাদের এই লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তবেই ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর দিব,—নচেৎ নহে।

“বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অপ্রিয় আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

“লেখক মাত্রেই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে ‘আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্বসম্মত, অনিন্দনীয় * * *’ সমালোচক যদি ইহার অন্তথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। * * * সত্য জাতীয়দিগের সুখো কাহারও এক্ষণ রাগ হইলে তিনি সে রাগ গায়ে মারেন ; ছুই একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালি অন্ত যে কার্যে পরাধুখ হউক না কেন, কলহে কদাপি পরাধুখ নহে। সমালোচনার অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জনীয়। * * * ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপন আপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। * * * কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্ত অপরিসিদ্ধ লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ইর্ষাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ সকল রহস্যে বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলি ভাল মানুষকে মনুষ্যপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদের বড় দুঃখ।

অতএব বঙ্গীয় গ্রন্থসমালোচনা আন্দোলনের সশীতকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল-
কর্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংস-
নীর গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদের
হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখকসমাজকে জানাই যে আমরা বিষিনিন্দুক
নহি। * * * ”

বজ্রলেপ ।

[লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ।]

সংস্কৃত সাহিত্যে বজ্রলেপের নাম অতি সুপরিচিত। বজ্রলেপ শব্দটা
শুনিলেই আপাতত যেন একটা দৃঢ়তর পদার্থের কথা মনে উদিত হয়। কারণ,
বজ্রের দৃঢ়তা মানব সমাজে অতি সুপরিচিত। যদিও বজ্রের স্বরূপ কি? তাহা
সকলের নিকটই অপরিচিত, অর্থাৎ বজ্রের স্বরূপদর্শী বর্তমান সময়ে কেহই নাই,
তথাপি কোন একটা দৃঢ় পদার্থের তুলনা করিতে হইলে সকলেই প্রায় বলিতে
অভ্যস্ত যে, উহা বজ্রের মত শক্ত। বজ্রমুষ্টি ইত্যাদি শব্দও বজ্রের দৃঢ়তাই
প্রকাশ করিয়া থাকে। বজ্রের মত অবিনশ্বর লেপ বজ্রলেপ শব্দের যৌগিক
অর্থ বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির উত্তর রামচরিতে সীতার মুখে বজ্রলেপ শব্দের
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রেও উহার অবিনশ্বরতা কথিত হইয়াছে।
“বারানসীতে অন্তর্গেহে কৃতপাপ” বজ্রলেপের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।
অবশ্য সাহিত্যের এবং স্মৃতির বর্তমান পঠন পাঠন প্রণালীতে বজ্রলেপের স্বরূপ
জানিতে ছাত্র অধ্যাপক কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। কারণ, পরীক্ষা
দিয়া দলিল হস্তগত করিতে পারিলেই ছাত্র কৃতার্থ এবং অধ্যাপকও পুরস্কৃত
হন। পরীক্ষক মহোদয়গণ বজ্রলেপ টেপের খবরও রাখেন না, প্রশ্নেও এ সমস্ত
কথার প্রসঙ্গ থাকে না, সূতরাং বজ্রলেপ বজ্রলেপই যথেষ্ট।

কিন্তু প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কোতূহল নিবৃত্তির পক্ষে শিল্প সংসৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ
নির্ণয় একান্তই প্রয়োজন। অতএব আমরা উহার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা
করিব। খ্যাতনামা বরাহমিহির এই বজ্রলেপের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।
উহার মধ্যে চারি প্রকার বজ্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে
প্রথমোক্ত বজ্রলেপের উপাদান—কাঁচা তিন্দুক ফল (গাবু) কাঁচা কদবেল, শিমুল
ফুল, সাল্লিকি বৃক্ষের বীজ, ধ্বগ বৃক্ষের ছাল, এবং বচ। এই সমস্ত পদার্থ
সমভাগে গ্রহণ করিয়া এক ছোণ পরিমিত জলে কাথ করিতে হইবে। অনন্তর

অষ্ট ভাগাবশিষ্ট কাথ মামাইয়া তাহাতে ত্রীবাসক (প্রসিক্ক বৃক্ষনির্যাস) রস (বোল) গুগ্গুল, ভেলাগোটা, কুন্দুরুক, ধূনা, অতসী (মসীনা) এবং বেল এই সকল পদার্থের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। অনন্তর এই পদার্থ তপ্ত অবস্থায় প্রাসাদ (দেবালয় বা রাজভবন) হর্ম্য (ধনীদিগের দালান) বুলভী (বারেন্দ্র বিশেষ) শিবলিঙ্গ, প্রতিমা, ঘরের মেজে ও কূপ (ইন্দারা) এই সকলের উপরে ঢালিয়া দিলে এই লেপ কোটি বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় বজ্রলেপ—লাকা, কুন্দুরু, গুগ্গুল, গৃহধূম, কদবেল, বেলের মধ্যভাগ, নাগ ফল, নিম্বফল, গাব, মদনফল, মৌয়াফল, মঞ্জিষ্ঠা, ধূনা, রস এবং আমলা, এই সকল পদার্থের দ্বারা পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বজ্রলেপ প্রস্তুত করিলে পূর্বোক্তের মত গুণশালী হয়।

তৃতীয় বজ্রলেপ—ইহার উপাদান গো, মহিষ ও ছাগল ইহাদের শৃঙ্গ, গাধার লোম, মহিষের চর্ম, গো-শৃঙ্গ ও গো-চর্ম, নিম্ব ও কদবেল ইহাদের রসের সহিত কথিড গো মহিষ শৃঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা পূর্বোক্ত রীত্যানুসারে কঙ্ক প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার নাম বজ্রতল।

চতুর্থ বজ্রলেপের উপাদান—আট ভাগ সীস, কঁাস দুই ভাগ, ও এক ভাগ গিন্দল। এই লেপ বজ্রসজ্জাত নামে অভিহিত, এবং উহা ময়-কথিত।

বরাহমিহিরের উক্তিতে কেবল উপাদানেরই পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গো মহিষাদির শৃঙ্গ লোম প্রভৃতি কি ভাবে গালাইয়া তরল করিতে হইবে, তৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ যে গালাইয়া লেপের উপযোগী করা হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ময়কথিত বজ্রলেপের উপাদান কেবলই ধাতু পদার্থ—উহাদিগকে কিসের দ্বারা গালাইয়া কি ভাবে লেপের উপযুক্ত করা হইত, তাহাও কথিত হয় নাই। বহু শতাব্দীর পূর্ববর্তী যে সমস্ত প্রস্তর মূর্তি বর্তমান সময়ে 'দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে নিহিত বজ্রলেপ বরাহমিহির-বর্ণিত লেপের 'অবিনশ্বরতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু কি উপাদানে, কি রীতিতে উহা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বুকিবার কোনও উপায় নাই। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের উপদেষ্টা বহু আচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্যের বাহ্য্য সঙ্কেও মোটামুটি উহা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় বিশ্বকর্ষ-প্রবর্তিত অপরটি ময়কথিত। বিশ্বকর্ষ দেবশিল্পিরূপে এবং ময় অম্বর শিল্পিরূপে পরিচিত। বরাহমিহির প্রভৃতির গ্রন্থে উভয় মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বকর্ষ মতেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন ।

[“ও-পারের কথা”র লেখক ।]

কয়েক বৎসর পূর্বে ৬পুরীধামে যাইবার সাধ আমাদের প্রাণে দেখা দিয়াছিল । সেই সময়ে কিছুদিনের জন্ত কর্ম হইতে অবসরও পাইয়াছিলাম । তখন রেলওয়ে কোম্পানীর কৃপায় পুরী যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার আমাদের সাধের বহিতে ঘুতাহতি পড়িল । পাথের সংগ্রহ ও আবশ্যিক যাহা কিছু একত্র করিয়া আমরা সেই দিনই পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইলাম । কাহারও মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়া কর্মসাধন করা আমাদের বহুকালের অভ্যাস বলিয়া কেহই ‘হাঁ-না’ বলিতে সাহসী হন নাই । তবে ৬পুরীধামের কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থান করিবার জন্ত কোন কোন আত্মীয়-আত্মীয়া অনুরোধ করিতে ভুলেন নাই । যথাসময়ে ৬পুরী-ধামে পৌঁছিয়া বাসাবাটী অবেষণে নির্গত হইলাম । অল্প সময়ের মধ্যে শকটচালক এক সুবৃহৎ অটালিকার গেটের সম্মুখে গাড়ি থামাইল । অনু-সন্ধানে জানিলাম, উহাই আমাদের আত্মীয়ের বাটী । গেট ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পার হইয়া আত্মীয়ের একজন ভৃত্যের মারফৎ আমাদের আগমনবার্তা জানাইলাম । অনুমান পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের আত্মীয় ও আত্মীয়া উভয়েই দেখা দিলেন ও যথাবিহিত অভিবাদন করিলেন । অন্তত—বিশেষতঃ এক বাসাবাটীতে থাকিতে ইচ্ছুক, এই মত প্রকাশ করার, আমাদের আত্মীয়া বাস্পপূরিত লোচনে বলিলেন, “ভ্রা হ’লে আমরা আপনার শর !” এই কথা বলিয়াই তিনি ম্লানমুখী হইলেন । যাহাঁকে এক সময়ে ‘কোলে পিঠে’ করিয়া মানুষ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার আঁখিবারি আমাদের সঙ্কল্প শৃংগালের যুক্তিতে পর্য্যবসিত হইল । ‘যখন ইচ্ছা ও যথা ইচ্ছা যাইব ও আসিব ও বহির্বাটীর একটা নিভৃত গৃহে থাকিব’ এই প্রস্তাবে সম্মত করাইয়া আমরা তাঁহাদের বাটীতেই অবস্থিতি করিলাম ।

স্নান, আহারাদি সমাপন ও কিয়ৎকণ বিশ্রামের পর, বাটীর সন্নিকটস্থ সমুদ্রের লীলাদর্শনে ও বায়ু-সেবনে পুরীধামে প্রথম দিবস অতিবাহিত করিলাম । পর দিবস প্রাতে আমাদের আত্মীয়ের নির্বাচিত একজন পাণ্ডা

ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ৷জগন্নাথদেব-দর্শনে নির্গন্ত হইলাম। প্রায় দশ মিনিট পদব্রজে যাইয়া জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দিরের সুবৃহৎ সিংহদ্বারের নিকট উপনীত হইলাম। তখন কি এক অভিনব তাব অহংবুদ্ধিতে ক্ষীত এই মন-প্রাণকে অভিভূত করিল। সোৎসুকে বিস্তীর্ণ রাজপথ বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল, চক্ষুদ্বয় বারি সম্বরণ করিতে পারিল না। সার রবীন্দ্রনাথের “মুচড়ে দিও মাথা আমার সকল গর্কের তলে” এই গানটী তখন প্রকাশিত না হইলেও এই পোড়া প্রাণ ও মন একবাক্যে সেই কুথাই বলিয়া সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তখন স্মৃতি, পুরাতন চিত্রগুলি জাগরুক করাতে, নির্ঝাঁক হইয়া গম্ভীরভাবে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর জগন্নাথদেবকে দর্শন করাইয়া ৷ঠাকুরের চারিদ্বারে প্রদক্ষিণ করাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। পূজাদি দেওয়া ও আর আর স্থান দর্শন করা বিধেয়, এই কথা উত্থাপন করাতে পাণ্ডাঠাকুরের কোন প্রস্তাবই অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং পাণ্ডাঠাকুর যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমরা মন্দিরের অপেক্ষাকৃত এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলাম, পরে জানিলাম, গরুড়-স্তম্ভের নিকট বসিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিবার সাধটুকুও দেখা দিল। সেই সময় প্রাণ ও মন এক সাথে বলিয়া উঠিল, “তোমার ঐ বীভৎস মূর্তি ও ঐ খতালের মত চোখ দুটী দেখবার সাধ থাকলে তোমার ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতাম, কিম্বা কুষ্ঠাশ্রম-বাসীদেরকে প্রাণ ভ’রে দেখতাম। তা হ’লে কষ্ট করে এখানে আসবার দরকার ছিল না।”

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনুমান এক ঘণ্টাকাল বসিয়া থাকার পর এক অদৃশ্য শক্তির কার্যকারিতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই দেহ, সেই প্রাণ ও সেই মন আর নাই। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণের অবস্থাও অগুরূপ হইয়াছে। মনে হইল, আমরা যেন সে রাজ্যে যাই। কিন্তু উপবিষ্ট সেই স্থানে, যথায় গোষ্ঠবেশধারী অনুমান ১৫:৬ বৎসরের দুইটা বালক দণ্ডায়মান। নির্ঝাঁক হইয়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রাণ-মন কি-যেন-কি এক আনন্দে ও কি এক অব্যক্ত নেশায় মাতোয়ারা ভাবে ডুবিল, মজিল ও পরিশেষে আপনহারা হইল। কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বা কোন্ পুণ্যফলে দর্শনলাভ করিলাম তাহা বলিবার সাধ্য নাই। তবে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া বা মুক্তকণ্ঠে বলিতে

সাহসী যে, আমরা বাণ্যকাল হইতেই শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের ঘোরতর বিদেষী ছিলাম । মনে হয়, আমাদের দর্প উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিয়াই দর্পহারী এই খেলা আমাদের সহিত খেলিলেন । ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, আমরা দেবদর্শন লাভ করিবার বা তাঁর কথা শুনিবার কোন সাধই প্রাণে ঠাই দিই নাই । আহা মরি মরি ! উভয়ের কি মনোলোভা রূপ, কি সুন্দর ঠাম, কি অপরূপ সহাস্ত বদন, নুপুর সুশোভিত কি কমনীয় চরণযুগল ও কি নয়নানন্দকর ও জ্যোতিপূর্ণ লোচনদ্বয় । একজনের বর্ণ কতকটা উজ্জ্বলতম ব্লুব্রাক কালির মত ও আর জনের বর্ণ গৌর । অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই মূর্তিদ্বয় এখনও হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে । কতক্ষণ এইরূপ মাধুরী দেখিতে অবকাশ দিয়াছিলেন তাহা জানা নাই ; কিন্তু সে সুখ স্বপন ভাঙ্গিলে পর দেখি আমরা মন্দিরেই উপবিষ্ট আছি ও হস্ত-পদ শূন্য মূর্তিদেরই সম্মুখে । পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মীয়দের বাটীতে উপস্থিত হইলাম । সেই দিন তাঁহাদের সহিত সদলে সমুদ্র-স্নান হইয়াছিল । বৈকাল না হইতেই পূর্বদিন-বৎ সায়ংকাল পর্যন্ত সমুদ্রতীরে বিচরণ করিয়া কাটাইলাম ।

দ্বিতীয় দিবস মন্দিরের দ্বার খুলিতে না খুলিতে সিংহদ্বারে প্রথম দিবসের মত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম । পরে ৬ঠাকুরদিগকে সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিয়া পূর্বদিবসবৎ সেই স্থানে ও সেই ভাবে উপবিষ্ট হইলাম । অতঃপর পূর্বোক্ত অদৃশ্য শক্তির সহায়তায় তৎকালীন যে চিত্র মানস-চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা আজিও মানসপটে কখন কখন নৃত্য করিয়া থাকে । মস্তকমুণ্ডিত, কোপীনধারী, নাতি কৃশ নাতি স্থূল দেহবিশিষ্ট ও দিব্যকান্তিসম্পন্ন এক গৌরবর্ণ যুবাধিকার সদলে নৃত্য-গীতে বিভোর হইয়া উর্দ্ধতন রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, ইহাই সেই চিত্র । সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ কাটিয়া গেলে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল । আখি মেলিবামাত্র দেখি যে, ৬ঠাকুরকে ভোগ দিবেন বলিয়া পাণ্ডাগণ মন্দির জনশূন্য করিতে ব্যস্ত । তৎপরে বাটী আসিয়া পূর্ব দিবসের মত সমুদ্রস্নান ও যথাসময়ে আহাৰাদি সমাপন করিয়া বৈকাল হইতে সন্ধ্যা অতীত হইলেও সমুদ্রতীরে কখন বিচরণ ও কখন উপবেশন করিয়া কাটাইলাম ।

তৃতীয় দিবস আবার যথাসময়ে মন্দিরে উপনীত হইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলাম । সেই সময়ে পূর্ব দিবসদ্বয়ের অঙ্কিত চিত্রগুলি সৰ্ব্বদে বিশেষ সন্দেহান হইয়া আপন মনে বলিয়াছিলাম, “কতকগুলি পুতুলনাচ দেখিয়েছ বটে, কিন্তু

ঐগুলি যে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য, যদি যেখানে ব'সে আছি এখানেই কেহ এসে উপরি-উপরি তিন দিন তোমার 'নাম'-গান শুনার'। সে দিন কি জানি কোন্ লীলার কোনও চিত্র দেখি নাই বা কোনও কথা শুনি নাই।

চতুর্থ দিবস পুনরায় যথাসময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম ও যথাস্থানে বসিলাম। স্বকর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবার অর্ধঘণ্টা মধ্যে দুইজন বৈষ্ণব ভৈরোঁ। সুরে বৃন্দাবনলীলা গাহিতে গাহিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ব পূর্ব দিবসে কাহাকেও এই ভাবে আসিতে দেখি নাই বলিয়া কৌতূহল-পরবশ হইয়া আশিষ্টস খুলিলাম ও দুই ব্যক্তিকে দেখিলাম। প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রধান গায়ক, তিনি প্রোট, বলিষ্ঠকায় ও উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ, কৃশ ও কালবর্ণ। উভয়েরই হস্তে করতালি। আশ্চর্যের কথা, তাঁহারা, আমরা যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম, অল্পান অর্ধঘণ্টাকাল মধুবর্ণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা কত গান শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ প্রকার সুমধুর গান ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। পুনরায় এরূপ গীত শুনিতে পাইব কি না,—যাঁহার লীলার এ ভাগ্যোদয় হইয়াছিল—তিনিই জানেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও মন্দিরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঠিক সেই স্থানে উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় আসিলেন ও গাহিয়া চলিয়া গেলেন। তৎকালে আমাদের সন্দেহ ঘুচিয়াছিল বটে, কিন্তু মানবমূলত অবিখাস মাঝে মাঝে এই হৃদয়-রাজ্যটুকু সর্গের অধিকার করিয়া থাকে। এই জন্ত বলিতে হয়—হায়! মানব জন্ম!

আমরা সাত দিবস মন্দিরে ও সমুদ্রতীরে কাটাইয়া অষ্টম দিবসে জগন্নাথ দেবের ও আত্মীয়দের নিকট বিদায় লইলাম ও তৎপর দিবস ঘরের ছেলে ঘরে কিরিলাম।

ইংরাজি ১৯১৩ সালে আমাদেরকে আবার পুরীধামে ও অশ্রান্ত তীর্থে বাইতে হইয়াছিল। কিন্তু অর্থশালী-শালিনীদের সঙ্গত গুণে পূর্ববৎ আনন্দের বা উৎসুকতার বিন্দুমাত্র লাভ হয় নাই। তাই বলিতে সাধ হয়—অর্থ! তুমি দেখিতে গোল, না থাকিলে গোল, ও থাকিলেও গোল।

একদা ৮পুরীধামে কি কি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, সেই কথা সংক্ষেপে বলা-বাউক।

৮জগন্নাথ বৃষ্টিতে ব্রহ্মের নিওঁণ ও সগুণাবস্থা একত্র সন্নিবেশিত। নিওঁণ

ব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য ও অরূপ। ব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য হস্ত-পদ যাহা কৰ্মসাধনের প্রধান অঙ্গ-সৌষ্ঠব, উহা জগন্নাথ মূর্তিতে নাই। তিনি অরূপ, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জগন্নাথ অগ্ণাণ্য দেবদেবীর মত আকারবিশিষ্ট নহেন। নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে ইহা ধারণা হয় যে, ঐ মূর্তি কতকটা ঔকারবৎ। সাধারণ জীবের পক্ষে নিগুণাবস্থা ধারণা করা অসম্ভব বলিয়া জগন্নাথ, সূতদ্রা ও বলভদ্র এই তিন মূর্তি কল্পিত ও পূজাকরণ, ভোগরাগাদি প্রথা প্রচলিত। এই তিন মূর্তি সৰ্ব্বদা পরে আলোচিত হইবে।

৮পূরীধামে চারিটা তরঙ্গ বহমান। সমুদ্রের তরঙ্গ, বায়ুর তরঙ্গ, জীবের তরঙ্গ ও শ্রীশ্রীগৌরানন্দদেবের প্রেমের তরঙ্গ। এক স্থানে চারিটা তরঙ্গ বহমান থাকায় ইহা একটি অত্যাচ্চ তীর্থস্থান। বিরাট প্রকৃতির বিধানেই সমুদ্র তরঙ্গাকারে কখন দূরস্ত শিশুমম উঠিয়া-পড়িয়া ও নাচিয়া-তুলিয়া, কখন মত্ত হস্তিসম ভীষণ হইয়া ও কখন বা মদক্ষীত ও ক্রোধাভিত্ত নরপশুবৎ তর্জন-গর্জন করিয়া অবিরাম কত ভাবে কত রঙ্গ দেখাইতেছে। তীর সন্নিকটস্থ বারিরাশিই এই প্রকার আচরণ করিয়া বালুকা, ফেনা, ঝিগুক ও নানাবিধ অপরিচ্ছন্ন পদার্থে পূর্ণ। কিন্তু সেই তরঙ্গগুলিই বিশাল বারিরাশির সহিত মিলিত হইবার অবকাশ পাইলে উহাদের মলিনতা ও উচ্ছ্বলতা থাকে না। জীব অধীরতা, চঞ্চলতা, দাস্তিকতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি যাবতীয় উচ্ছ্বলতার জন্য সংসার-সাগরে কত না বিধ্বস্ত হইতেছে ও নিজ নিজ মন-প্রাণকে কত না অশুনে পূরিত করিয়া আখিবারি বা হায় হায় বাণী কঠে লইয়া, কালান্তিপাত করিতেছে। কিন্তু যে জীব স্থলাবস্থা হইতে চৈতন্যময়ের দিকে ধাবিত হন, তিনি ক্রমশঃ স্থির-ধীর হইয়া শান্তিনিকেতনের সুখ, বিহার ও আনন্দ উপভোগ করেন।

৯জগন্নাথধামে বায়ু সতত প্রবল বেগে ছ ছ করিয়া প্রবাহিত। সুস্থতা-অসুস্থতা, সরসতা-নীরসতা, আদর-অমাদর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সম্মান-অপমান, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, নির্ভয়-ভয়, মিলন-বিচ্ছেদ ইত্যাদি দুইটা ঘূর্ণ্যমান চক্র মধ্যে অবস্থিত অবস্থার নাম মানবজীবন। এই দুইটা চক্রের মধ্যে একটা চক্র সাধারণতঃ এককালীন-বেশী মাত্রায় ঘূর্ণ্যমান। প্রথম চক্র যাহা কিছু প্রীতি-প্রেম উপাদানে ও দ্বিতীয় চক্র যাবতীয় অপ্রীতিকর উপাদানে গঠিত। কোন জীবের ভাগ্যবলে প্রথম চক্র যখন দ্বিতীয় চক্রাপেক্ষা বেশী মাত্রায় ঘুরিতে থাকে তখন সেই ব্যক্তি নিজ অভিক্রটি বা সংস্কার বা শিক্ষামত কৰ্ম সাধন করেন।

কিন্তু সেই জীবের ভাগ্য-বৈশিষ্ট্যবশতঃ যখন দ্বিতীয় চক্র প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে তখন তাহার মন-প্রাণ অদৃশ্য সুখের ও শান্তির আশায় ছ হ করিতে থাকে। সেই অবস্থায় সেই জীব “কি করি, কোথা যাই, কার কাছে গিয়া এ জালা নিবৃত্তি করি” এই প্রকার মর্মান্বাহ লইয়া ছট ফট করিতে থাকে। বিরাট প্রকৃতির প্রবল ছ-ছকারের সহিত মানবের অল্প মাত্রায় ছ হ যুক্ত মন-প্রাণ মিলাইয়া দিলে সেই অবস্থায় শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সচ্ছন্দতা আনয়ন করে বলিয়া সূচিকিৎসক সমুদ্রতীরে বাস বা সমুদ্রযাত্রা বিধান দিয়া থাকেন। যে উপাদানের সহায়তায় সুস্থতা ও চিত্ত-প্রফুল্লতা আনয়ন করে বা বাহা মন-প্রাণের উন্মুক্ততা বর্ধন করে, তাগতে নিঃসন্দেহ চৈতন্যশক্তি প্রভূত পরিমাণে বিद्यমান। এই উপায়ে চৈতন্যশক্তি সঞ্চিত হইলে স্থূল চিন্তা ও কার্য্য হইতে বিরত হওয়া প্রযুক্ত প্রাণে ও মনে অপ্রচ্ছন্ন ভাবে অদৃশ্য সুখের ও শান্তির পিপাসা বর্ধিত হয়।

উপরোক্ত দুই বিধানে ৩পুরুষীধামে বিরাট প্রকৃতি (সর্গুণ ব্রহ্ম) জননী ভাবে জীবকে অনুক্ষণ ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে “জীব তোমরাও এক এক জন বিশাল সংসার সাগরের এক একটা ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ মাত্র ও তোমাদের উদ্বেলতাই তোমাদিগকে মলিন হইতে মলিনতর ও এমন কি মলিনতমও করিতেছে। অবকাশ মত তোমরা যদি আমায় নিঃসঙ্গ হইয়া উপভোগ কর, তাহা হইলে তোমাদের মন-প্রাণ ধৌত করিয়া উহাদের সহিত দেহেও শক্তি সঞ্চার করিব। তখন সেই শক্তিপ্রভাবে তোমরা ধৈর্য্যানুযায়ী বুদ্ধির পরিবর্তে জ্ঞানে ও আসক্তির পরিবর্তে প্রেমে ভূষিত হইয়া আমার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে চিরদিনের জন্ত বিরাজ করিবে।”

বায়ুর প্রবাহ কৃতকটা প্রত্যক্ষ ভাবে বহমান, কিন্তু জীবের চিন্তার ও কার্য্যের প্রবাহগুলি অপ্রত্যক্ষ ভাবে সতত বহমান। এই প্রবাহ প্রবাহিত বলিয়া জীব উহাতে ভাসমান হইয়া ভৌতিক জগতে পবেষণার ও উদ্ধারনার কার্য্যে কালক্রমে অগ্রগামী হইতেছেন। এই প্রবাহ বহমান বলিয়া যে ব্যক্তি যখন যে ভাবে নিজ নিজ প্রাণের ও মনের মোর্চাকবৎ অথচ নিভৃত কোষগুলি উন্মুক্ত করিতেছেন, সেই প্রভাবে কখন কুচিন্তার ও কখন বা সূচিন্তার স্রোতে পতিত হইয়া বাহা কিছু কর্ম সাধন করিতেছেন। অধুনা ভৌতিক চিন্তার ও কার্য্যের প্রাচুর্য্য হইলেও এককালে আধ্যাত্মিক চিন্তার ও কার্য্যের আধিক্য থাকার এ যুগেও মানব হৃদয় স্তব্ধ বা প্রেমশূন্য হয় নাই। ইহা ব্যতীত

যখনই জীব চৈতন্য হইতে স্থূল চিন্তায় ও কার্যে অভিভূত হয় তখনই এক একজন আদর্শ মহাপুরুষ এই সংসাররূপ লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক প্রবাহ পুনঃ প্রবাহিত করিয়া যান । রাজ্যবিপ্লব বা ভীষণ সমরানলও স্থূল চিন্তার ও কার্যের খরতর প্রবাহ রোধ করিবার জন্য বিধাতারই বিধান ।

কতকাল হইতে কত লক্ষ লক্ষ নর-নারী ৬জগন্নাথদেব দর্শন মানসে আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন । এক অপ্রচ্ছন্ন অথচ প্রভূত শক্তিসম্পন্ন আকর্ষণেই কেহ দাস-দাসী, কেহ সখা-সখী, কেহ বাৎসল্য ও কেহ বা প্রণয়িনী ভাবে ও প্রাণের আবেগে ৬পুরীধামে উপনীত হইয়াছেন ও হইবেন । সুতরাং সেই সেই জীবের চিন্তার ও কার্যের প্রবাহগুলি অদৃশ্য রাজ্যে গুপ্ত চিত্রসম প্রোথিত ! জীবের চিন্তা ও কার্য ভিন্নতর । সুতরাং ভিন্নতর চিন্তার ও কার্যের প্রবাহে ঘাত-প্রতিঘাত অনিবার্য । ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গের উৎপত্তি । এই হেতু ৬পুরীধামে ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গের অভাব নাই । যে প্রবাহ কত কাল হইতে ক্ষীণ ভাবেই প্রবাহিত হইতেছিল, একমাত্র শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেব কর্তৃক উহাই বিশালাকার ধারণ করাতে উহাতে কত শত তরঙ্গ শোভমান ।

যিনি ধীর, কর্মাঠ, ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী ও প্রভূত ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন তিনিই প্রকৃত পুরুষবাচ্য । কেবলমাত্র মনে অবস্থিত বলিয়া জীবের অধীরতা, ভেদাভেদ বুদ্ধিযুক্ততা, দুঃখে ও চিন্তায় বিমুগ্ধতা ও ইচ্ছাশক্তি-হীনতা সম্বল । ইহাই নারী-শ্রেণীভুক্ত জীবের লক্ষণ । এই হিসাবে একমাত্র পুরুষোত্তমই পুরুষবাচ্য ও জীবমাত্রই নারী-শ্রেণীভুক্ত ।

পূর্ণমাত্রায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া কোন দেবতা-স্থানে উপনীত হওয়া জীবের পক্ষে কতকটা অসম্ভব সাধন । তবুও যে জীব পুরুষোত্তমকে 'প্রাণবল্লভ' পদে বরিত করিয়া তাঁহাকে প্রাণের কথা প্রাণের ভাষায় জ্ঞাপন করেন, ৬জগন্নাথ সেই জীবের ভক্তির প্রতিদান স্বরূপ তাঁহার ষাটতীয় কালিমা নিজ অঙ্গে লেপন করেন । এইজন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কালো বরণ । অতঃপর সেই জীবকে নিজ অভিকৃতি মত সুসজ্জিতা ও হেমবরণী করিয়া তাহাকে সুভদ্রা ভাবে অর্থাৎ সুগুণসম্পন্ন করিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে স্থান দেন । তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বলভদ্র ভাবে তাঁহার অসামান্য প্রভাব ও অপরূপ রূপমাধুরী সেই নব নাগরীকে দর্শন করান । সেই অদ্ভুত দর্শনের ও প্রেমের বিনিয়োগের পর জীব-মন কাঁচা বা পুরনমুখো মন হইতে পাকা বা চৈতন্যময়ী মন হইয়া যায় । তখন সেই জীব স্বীয় হৃদি-রথোপরি আত্মরূপ জগন্নাথের বা নিজ প্রাণপতির সন্দর্শন লাভ

করিয়া মানবজন্ম ধন্ত করেন। ইহাই জগন্নাথদেবকে রথে দর্শন করা বলে। অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত রথে কাষ্ঠনির্মিত দেবতাকে দর্শন করিলে মানবজন্ম ধন্ত হওয়া—বিশেষ প্রেম ও বিশ্বাস ব্যতীত অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব। এই সৌভাগ্যোদয় হইলে মানব মন আত্মার সহিত বিহার-সুখ উপভোগ করে। ইহাই আদিরসের প্রকৃত লীলা। ইহাই রাসলীলার প্রকৃত তত্ত্ব। ইহাই শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবের প্রেমোন্মত্ততার কারণ। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটি পন্থা। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত ৬জগন্নাথই শ্রীশ্রীগোরাঙ্গাকারে ধরাধি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবই জীবের উচ্চতম রক্ষক (Guardian Angel) ভাবে ৬পুরীধামে অতাপিও বিরাজমান। অত্র স্থানে ঐ প্রকার জাজ্বল্য ভাবে বিরাজিত কি না, তিনিই জানেন। তবে ঐ অধমকে দেখাইয়াছেন তৎকালীন নবদ্বীপ এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত।

এক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্তর্গত চিত্র সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা যাউক। এ বিশ্ব সন্তোগের বিরাট লীলাক্ষেত্র বা মন্দির। কোমল ও কঠিন দুইটা উপাদান এই লীলার উপকরণ। অপরিমিত জ্ঞানের ও অক্ষুরন্ত প্রেমের সম্মিলন উচ্চতম সন্তোগ। এই সন্তোগই সচ্চিদানন্দময় বা হরদম তাজা অবস্থা। এই সন্তোগের সফল অনন্ত জীবন ও অপার আনন্দ। বিরাট আত্মার ও বিরাট প্রকৃতির বা বিশাল মনের সম্মিলন দ্বিতীয় স্তরের সন্তোগ। এই সন্তোগের ফল এই বিশ্বের সহিত যাবতীয় কার্যের ও চিন্তার উৎপত্তি। ক্ষুদ্র চৈতন্যময়ী মনের সহিত ক্ষুদ্র আত্মার সম্মিলন তৃতীয় স্তরের সন্তোগ। মনের উৎকর্ষতানুসারে নির্বিকল্প সমাধি, মহাভাব, সবিকল্প সমাধি ও ভাব এই সন্তোগের ভিন্নতর অবস্থা। সমাধি দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ, মহাভাব দ্বারা প্রেমের বিকাশ ও ভাব দ্বারা ভক্তির বিকাশ—তাহা আবার নিম্নস্তরের—হইয়া থাকে।

চতুর্থ বা নিম্নতম সন্তোগ কোমল মনের সহিত কঠিন মনের। ইহা মূল দেহের সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে ও ইহাই মানবের ও প্রাণিজগতের সন্তোগ সাধনের পন্থা। এই সন্তোগে স্থখের তুলনায় দুঃখের পরিমাণই অধিক। এই সন্তোগের যে মাত্রায় আড়ম্বর, সুখটুকু কিন্তু সে মাত্রায় স্থায়ী নহে। এই সন্তোগের প্রধান ফল সুস্থানাদি উৎপাদন বা সৃষ্টিরক্ষা।

আত্মা হইতে জীব মন উদ্ভূত, আত্মায় স্থিত ও পরে আত্মায় মিলিত হয়। সুতরাং মনের সহিত প্রথমাবস্থায় আত্মার সম্বন্ধ জনক ও জননী ভাবে। শেষ

সম্বন্ধ স্বামী ভাবে । জীব-দেহই আত্মার ও মনের বিহার-মন্দির । যাহারা দেহের মধ্যে নিজ নিজ মনকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইলেন তাঁহারা এই সন্তোগ সুখ উপভোগ করেন । এই সন্তোগ সুখ জীবনের অবশ্য প্রাপ্য, কিন্তু উপরি-উক্ত দুই প্রকার সমাধি-মহাভাব ও ভাব দ্বারা । এই সন্তোগের উচ্চতম ফল—সুশ্রুতি, সুদৃষ্টি, সু-ইচ্ছাশক্তি ও সু-কর্মসাধন শক্তির বিকাশ । এই সন্তোগের ফলে জীব মানবাকারে অবস্থিত থাকিলেও উচ্চতম দেবতা বা অবতার স্থান প্রাপ্ত হইলেন ও দেহান্তে উর্দ্ধতন রাজ্যে তাঁহাদের স্থিতি হয় । পরে কর্মের আরও উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেন । আভ্যন্তরিক সন্তোগ কার্য সাধনের ইহাই ফল । কিন্তু মানবমূলভ বিহার কার্যসাধনের ফল আসক্তির প্রাদুর্ভাব, অবিরাম হায় হায় ধ্বনি ও প্রায়শঃ পুনর্জন্ম ।

বিরাট বিশ্ব-মন্দিরের অভ্যন্তরে সংগোপনে উচ্চতম বিহার ও বহির্দেশের চতুর্পার্শ্বে নিম্নস্তরের সন্তোগ কার্য সংসাধিত হইতেছে, এই মহান ভবই স্থূল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝাইবার জন্ত মন্দিরস্থ মূর্তিগুলি ও বহির্দেশস্থ চিত্রগুলি সন্নিবেশিত ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুশ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন যে, যাহারা সম্বলশূন্য নহে তাহাদের ভাণ্ডার উত্তরোত্তর পূর্ণ হইবে, কিন্তু যাহারা সম্বলশূন্য বলিলেও হয়, তাহাদের সে সম্বল-টুকুও হারাইতে হইবে । মহাজন বাক্য বেদবাক্য । যাহারা ভক্তির, শ্রদ্ধার ও বিশ্বাসের কথঞ্চিং সম্বল লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে উপনীত হইলেন, তাঁহারা তত্রস্থ পূর্বেকৃত ভক্তির ও প্রেমের প্রবাহে ভাসমান হইয়া অল্পপম চৈতন্যধনে ক্রমশঃ ধনী হইলেন । কিন্তু যাহারা পাশববৃত্তিচয়কে হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রাখিয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে অতি অকিঞ্চিৎকর ওক্তি লইয়া কিম্বা মনোবৃত্তির বা চক্ষুর তৃপ্তির জন্ত দেখা দেন, তাঁহারা মূর্তি ও চিত্রগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা চিত্রগুলির যাবতীয় হাব-ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া পূর্বসঞ্চিত চৈতন্য শক্তিটুকু হারাইয়া ফেলেন । এই প্রকার জীবের মধ্যে কেহ কেহ এই মন্দির কোন্ ধর্মসম্প্রদায়ের, এই তত্ত্ব উদ্ঘাটনই যত্নশীল হইলেন । আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট এই শ্রেণীর জীব কত না বাহবা লাভ করেন ।

আত্ম-বাগানে প্রবেশলাভের সুবিধা পাইয়াও, এ বাগানটা কাহার, কি কি আত্মবৃত্ত আছে ও কোন্‌টাতে কত ফল হয় মনে হয় এই প্রকার তত্ত্ব আলোচনা করিবার জীবসংখ্যা অধিক ।

তাহা হইলে এই প্রবন্ধ হইতে ইহা বুঝা গেল যে, তীর্থস্থানে বাইরা যথাসম্ভব আয়োজন সাধন করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইলে নিম্নলিখিত বিধানে চলা বিধেয় :—

- (১) তীর্থযাত্রা সাধটুকু যথাসম্ভব গোপন রাখা ;
- (২) নিঃসঙ্গ হইয়া ও যৎসামান্য জিনিষ পত্রাদি লইয়া বাহির হওয়া ;
- (৩) এমন স্থানে থাকা, যেখানে চিন্তায়, কার্যে বা বাক্যব্যয়ে সময়ের অপব্যবহার না হওয়া সম্ভব ;
- (৪) শারীরিক সুস্থতা ও চিত্তপ্রফুল্লতা যাহাতে বর্ধিত হয় তৎপ্রতি প্রথম লক্ষ্য রাখা ;
- (৫) বাহ্যিক আড়ম্বর বা উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়া নিঃসঙ্গে দেব-দেবীর সমক্ষে উপনীত হওয়া ;
- (৬) যাহার প্রসাদ লাভ করিতে আসিয়াছি, উহা পাইলে তবে আর কিছু দেখিব, এই দৃঢ় সংকল্প করা ;
- (৭) দেব-দেবী জাগ্রত, এই ভাব মর্মে মর্মে পোষণ করিয়া সেইস্থানে নির্বাক ও নিঃসঙ্গ হইয়া উপবিষ্ট হওয়া ;
- (৮) তাঁহাকে আপন পিতা, মাতা বা স্বামী, এই ধারণা বন্ধমূল করিয়া প্রাণের ব্যথা সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করা ;
- (৯) দেব-দেবীর মূর্তি ধারণা না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের শূণ্যের ধারণা করা ;
- (১০) তাঁহাদের যাবতীয় সংগুণ দ্বারা নিজ দেহ, প্রাণ ও মন পূর্ণ করিতেছি, এই সিদ্ধান্ত করা ;
- (১১) যে যে তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইলাম না, উহা স্থির ধীর ভাবে দিনের পর দিন নিজ মনে আলোচনা করা ;
- (১২) স্মৃতি, স্মৃষ্টি, স্ম-ইচ্ছা ও স্ম-কর্মসাধন শক্তি নিজে লাভ করিয়া ও পরে সেই সেই উপায়গুলি অগতে জ্ঞাপন করিয়া ঋণমুক্ত হইব, এই সাধ পোষণ করা ।

বিচিত্র প্রসঙ্গ ।

[লেখক — শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম-এ, বি-এল ।]

কৃত্রিম রবর ।—ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—অভাবই আবিষ্কারের জনক । ইহা প্রকৃত সত্য কথা । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিজ্ঞানের প্রারম্ভে যখন ইউরোপের সমুদয় দেশ ফ্রান্সকে আক্রমণ করে এবং বাহির হইতে সমুদয় আমদানী বন্ধ করে, তখন ফ্রান্স অভাবের তাড়নায় নিজ দেশেই কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী বাহির করে । জার্মানীতেও বর্তমানে তাহা হইতেছে । আজ কাল নানা বিষয়ে রবরের একান্ত প্রয়োজন । বাইসিকল, গরুর গাড়ী হইতে চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কার্যে পর্য্যন্ত রবর না হইলে এক দণ্ড চলে না, সেই রবরের আমদানী ইংলণ্ড জার্মানীতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । এক্ষণে প্রকাশ—জার্মানী কৃত্রিম উপায়ে রবর প্রস্তুত-প্রণালী বাহির করিয়াছেন, উহা আসল সর্বোৎকৃষ্ট রবর অপেক্ষা আদৌ হীন নহে । কৃত্রিম রং প্রস্তুত দ্বারা নীল প্রভৃতি আসল সমুদয় রংএর শিল্প জার্মানী নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এইবার বা আসল রবর ঐ দশাপ্রাপ্ত হয় ।

পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বড় থিয়েটার ।—আমোদ্য প্রমোদের রাজা ফরাসী জাতি । পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় থিয়েটার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে । ইহার নাম প্যারিস অপেরা হাউস । ইহা ৯ বিঘা জমির উপর অবস্থিত । ইহার কেবল বাটী প্রস্তুত করিতে ৬০ লক্ষ টাকা লাগিয়াছে, ভিতরের অসাধারণ সাজসজ্জা সরঞ্জামের মূল্য স্বতন্ত্র ।

৫ বৎসরব্যাপী সতরঞ্চ খেলা ।—অন্ত সকল খেলা অপেক্ষা সতরঞ্চ বা দাবাবড়ে খেলায় অধিক সময় লাগে, এমন কর্মনাশা ও সময়নাশা খেলা আর নাই । তথাপি এক দান খেলায় ৫ বৎসর কাটিয়াছে, এরূপ কেহ শুনিয়াছেন কি ? পৃথিবীর এক দিকে অষ্ট্রেলিয়ার অপর দিকে আমেরিকার দুই ব্যক্তির মধ্যে খেলা হয় । ডাকে পত্রযোগে পরস্পরের প্রতি স্বল্প পর চাল পরস্পরকে জানান হয় । এইরূপ এক দান খেলা পাঁচ বৎসরের পর সম্প্রতি শেষ হইয়াছে ।

চিত্রের মূল্যবৃদ্ধি ।—এদেশে সাধারণ লোকে জানে না যে এক একখানা চিত্রের মূল্য কত হইতে পারে । পাশ্চাত্য দেশে চিত্রকরদের অঙ্কিত এক একখানা বিখ্যাত চিত্র লক্ষাধিক টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে । কোন কোন চিত্রের গুণ প্রথমে সকলে বুঝে না বা খ্যাতি হয় না । এ কারণে প্রথমে তেমন মূল্য হয় না, কিন্তু খ্যাতি বৃদ্ধি হইলে তদনুরূপ মূল্য বৃদ্ধিও হয় । ফ্রান্সের এক বিখ্যাত চিত্রকর (মোঁসো ড্যোসে) নৃত্যকারিণী রমণীর এক চিত্র করেন এবং ৩০০ মূল্যে বিক্রয় করেন । তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি দেখিয়া যান, সেই চিত্র ক্রমে হাত বদলাইয়া পরিশেষে ২৬১০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে ।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন ।—ইংলণ্ডে একটি ভদ্রলোকের বয়স ৮৬ বৎসর । তিনি এক কারখানায় প্রত্যহ দশটি ঘণ্টা কাজ করেন এবং ৮ মাইল দূরে নিজ বাড়িতে প্রত্যহ ফিরিয়া যাওয়া আসা করেন । কচিং এরূপ শুনা যায় ।

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা ।

অনাথের মা ।

[লেখক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ।]

একদিন অপরাহ্নে গঙ্গানান করিয়া ফিরিবার পথে দেখিলাম, গাছের তলায় একটা শীর্ণা রমণী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে ; আর, একটা শীর্ণ শিশু রমণীর বাহুদেশে আপনার মস্তক রাখিয়া, ওষ্ঠাধর ঈষৎ কল্পিত করিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না । তাহার নিকটে গিয়া শুনিলাম শিশু—অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে—বলিতেছে, “মা খাব—ম’রে গেলুম” ।

বুঝিলাম, অনাহারে তাহাদের এই দশা ।

আমি রমণীকে সন্ধান করিয়া বলিলাম—“হাঁ বাছা ! তোমার কি কেউ কোথাও নাই ?”

রমণী অতি কষ্টে চীৎকার করিয়া বলিল—“বাবা গো, বাছাকে আমার

বাঁচাও গো—আজ দু'দিন থেকে—” তাহার কণ্ঠ রোধ হইল, আর বলিতে পারিল না।

এই অপূর্ণ করণ দৃষ্টে পাবাণও গলিয়া যায়। আমার চক্ষুর জলে ভরিয়া উঠিল। বলিলাম—“রাত্তায় কি করব,—আমার বাসায় যেতে যদি কোন আপত্তি না থাকে ত'বল, তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাই।”

রমণী মাথা নাড়িয়া সন্মতি জানাইলে, তাহাদের বাসায় লইয়া আসিলাম।

কালীতে আমি একাই আছি। স্ত্রীর কষ্টকর মৃত্যুর পর হইতে আমার সমস্ত বিষয়াদি দরিদ্র গুরু-পুত্রকে দিয়া এখানে আসিয়া, সংসারের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। গুরু-পুত্র আমাকে মাসিক এক শত টাকা পাঠাইয়া দেন। এই টাকায় এখানে দান ধ্যান করিয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতেই আমার বেশি চলিয়া যায়।

বাসায় পৌঁছিয়া আগে বালকের মুখে খানিকটা দুধ ঢালিয়া দিলাম। বালক যেন একটু সুস্থ হইল। তার পর সেই রমণীকেও কিছু খাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, রমণী যে ঘরে শুইয়াছিল, সেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া দেখিলাম, রমণী পুত্রের মস্তক আপনার ক্রোড়ে লইয়া নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। বলিলাম—‘কঁাদছ’ কেন বাছা, কি হ’য়েছে?’

আমাকে দেখিয়া তাহার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। কঁাদিতে কঁাদিতে বলিল—“দেখুন না, বাঁচার বোধ হয় আর হ’য়েছে, ছেলে আমার বাঁচবে ত? সে ছেলেও যে এমনি ক’রে আমার কোলের উপর মাথা রেখে কোণায় চ’লে গৈছে; ওগো একে বাঁচাও গো, এও বুঝি তা’র মত পালিয়ে যাবে—”

আমি অশ্রুসর হইয়া ছেলের নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বথার্থই তাহার ভয়ানক অর। তাহাকে সাহসনা দিয়া বলিলাম—“ছিঃ বাছা, অত অধীর হ’লে কি চলে, এখন আমি ডাক্তার আনছি।”

যথা সময়ে ডাক্তার আসিয়া ওষুধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জননী তিন দিন তিন রাত্রি আহাঁর-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের সেবা করার সে অনেকটা ভাল হইয়া উঠিল। এই তিন দিনের ভিতরে রমণীকে দিনান্তে এতটুকু দুধ খাওয়াইতে আমাকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব। কিছু

অভাবে সে ছেলে আমার মুখপানে চেয়ে ম'রেছে, এখন এও যদি সেবা অভাবে মারা যার, তবে আর কি নিয়ে পোড়া প্রাণে বেঁচে থাকবো ?”

আরও ছই দিন পরে ছেলে পথা পাইলে, জননী স্নহ হইল। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এই পাঁচ দিন, কি জানি কেন, আমারও যেন আহারে রুচি ছিল না, নিদ্রায় শান্তি ছিল না। এই রমণীকে দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে আমার অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি যেন আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিত।

৩

প্রায় পনের দিন অতীত হইলে প্রাণপণ শুশ্রূষায় রমণী ও তাহার পুত্র বেশ স্নহ হইয়া উঠিল।

এত দিনের মধ্যে রমণীর পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পাই নাই। আজ যেন আমার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যাক্রমিক শেষ করিয়া তাহার ঘরে গিয়া ধীরভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাছা, তোমার চেহারা দেখে ত বোধ হয় না—তুমি ভিখারিণী। আমার কাছে তোমার পরিচয় দিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তা হলে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার কৌতূহল দূর কর।”

রমণী লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া ধীর ভাবে বলিল—“আপনি আমার পিতার কাজ ক'রেচেন, আপনাকে না বলার কিছুই নেই। তবে হতভাগীর করুণ কাহিনী শুনলে আপনি ব্যথা পাবেন ;—সে অনেক কথা।”

রমণী চূপ করিল।

আমি বিশেষ জিদ করায় রমণী বলিতে আরম্ভ করিল—“আমার স্বামী যখন চার বছরের ছেলে রেখে মারা যান, তখন এমন কিছু ছিল না, যাতে তাঁর সদগতি করি। পাড়া প্রতিবাসীরা দয়া ক'রেছিল তাই এ অভাগী তাঁর মুখ-অগ্নি করেছিল—”

বলিতে বলিতে অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। অনেক কষ্টে পূর্ব শোক সম্বরণ করিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—“তার পর ছেলে নিয়ে কি করব, কোথায় যাব, কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। অনেক ভেবে শেষে মনে হ'ল, আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা আছেন। তিনি জমিদার। আমাকে মাসে কিছু কিছু ক'রে সাহায্য করবার জন্যে তাঁকেই একখানি পত্র লিখলুম। ছ'চার দিনের মধ্যেই দাদা নিজে এসে আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন—”

রমণীর এই সকল কথা আমি বিভোর হইয়া শুনিতে লাগিলাম ।

সে বলিতে লাগিল—“বৌদি’ আমাকে পেয়ে কতই সুখী হ’লেন । তাঁর ছেলে পিলে ছিল না, আমার খোকাকে কোলে করে কত আদর করলেন । তার পর, অবৈলায় মান ক’রে শুদ্ধ হলেন । তাঁর ছেলে পিলে ছিল না বলে তিনি সব সময় শুদ্ধাচারে থাকতেন ।

“দাদা দান ধ্যান করতেন, বছর বছর বাড়ীতে পূজা আনতেন, সংসারের কোন কথায় তিনি থাকতেন না । বৈকালে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের সহিত ধর্মের আলোচনা করতেন ।

“সেখানে গিয়ে আমার কোনই অসুবিধা হ’ল না, তবে একটা অসুবিধা হ’ল এই যে, ছেলের জন্যে বৌদির সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আধটু খুঁটিনাটি হ’ত । ঐ ছেলে কি ছুঁয়ে দিলে, এই সব নিয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে একটু আধটু ঝগড়া হ’ত, আবার মিটেও যেত ।

“আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে, আমারই মত এক অভাগী ছিল । সেও বিধবা, তা’রও একটা ছোট ছেলে ছিল । কাম্বুজের মেয়ে বিধবা, তা’তে আবার তা’র বড় একটা কেউ ছিল না ; কাজেই তা’র বড় কষ্ট । সেই জন্যে আমি প্রায়ই তা’র সঙ্গে দেখাশোনা করতুম । এক দিন তার ভয়ানক জ্বর হ’ল । সে গরীব, কেবা দেখে, কেবা শোনে ! আমি দাদাকে গিয়ে এই কথা বললুম । দাদাও আপনার মত সদাশয় ছিলেন । তিনি তা’কে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টা করলেন, কত টাকা খরচ করলেন ; আমিও প্রাণপণে কত সেবা করলুম, কিন্তু কিছুতেই সে বাঁচল না । দশ দিনের দিন, তা’র এই ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে হতভাগী স্বর্গে চলে গেল । আর আমি ?—সেই দিন থেকে বাছাকে বুকে করে—”

রমণী আবার কাঁদিল । আঁখির স্নেহ ক্রমে সত্যে পরিণত হইতে লাগিল । আমারও চোক কাটিয়া জল আসিল । অতি কষ্টে চাপা গলায় বলিলাম—
“তার পর ?”

রমণী চোক মুছিয়া বলিতে লাগিল—“সেই দিন থেকে বাছাকে নিয়ে মানুষ করতে লাগলুম । দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল । আগে ছিল একটা ছেলে, এখন দু’টা ছেলে হ’ল । বাড়ীতে আরও উপদ্রব বাড়তে লাগল । বৌদি’ আমার উপর আরও বেশী বিরক্ত হতে লাগলেন । ছেলেগুলোকে কত মানুষ করতুম, তবু তা’দের আঁটতে পারতুম না । দাদা কেবল জেনেছিলেন, আমি

চারুর ছেলেকে মানুষ করছি, কিন্তু তার জন্মে বৌদি'র যে কত ঝগড়া বেড়েছে তা তিনি জানতেন না।

“একদিন বেলা ১১টার সময় বৌদি' আপনার ভাত বেড়ে খেতে ব'সেচেন। প্রথম গ্রাস মুখে তুলবেন, এমন সময় চারুর ছেলে একটা লাটু নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁ'র ভাতের খালায় ফেলে দিয়েচে। রাগে তিনি চীৎকার ক'রে ব'ললেন ‘হারামজাদা ছেলে, আমাকে খেতেও দিবিনি’। আমি অস্থ দিকে ছিলাম, দৌড়ে আসতেই বৌদি' আমাকে রেগে হাতমুখ নেড়ে চীৎকার ক'রে ব'ললেন—“এত উপদ্রব আর সহ হয় না। তুমি যা'ই বল ঠাকুরঝি, কিন্তু আমি আজ পষ্ট ক'রে বলছি, তোমার আর এক সঙ্গে থাকা হ'বে না—ওঁকে ব'লে আলাদা বাড়ী ক'রে থাক।” কাণ্ড দেখে আমার বড়ই ভয় হ'য়েছিল; তাতে আবার এই কথা শুনে আমার মনটা যেন কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। সুর টেনে বললাম—“হ'তে ছেলের মা, তা' হ'লে বুঝতে ছেলের কেমন দরদ। অত অহঙ্কার ভাল নয় বউ—না হয় ভিক্ষে মেগে খাব, তার অক্ষর কি! মাথার উপর ভগবান্ আছেন।”

“তিনি গর্জন ক'রে ব'ললেন—“তোমার ত বড় কড়া কড়া কথা ঠাকুরঝি, আমি কি মন্দ কথা বলিচি—তাই যাও না, ভিক্ষে ক'রে খাবার মজাটাই একবার দেখ না,—‘আপনি খেতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে’। এই কথা শুনে আমি লজ্জায় ও দুঃখে কেমন হয়ে গেলুম।

“আমি খেলুম না ব'লে বৌদি'ও সমস্ত দিন কিছু খেলেন না। তার পর রাতে বৌদি' আমার কাছে এসে আমার হাত দু'টা ধরে ব'ললেন “ঠাকুরঝি, রাগের সময় কি বলিচি ব'লে কি আরও রাগ ক'রে থাকতে হয়? উঠ খাও, তুমি রাগ ক'রে আছ ব'লে তোমার যেন ক্ষিদে পায়নি; কিন্তু আমার পেট জলে যাচ্ছে—”

“এই কথায় অভিমানে আমার ঠোঁট দু'টা ফুলে উঠল। ব'লে ফেললাম—‘না, আমি ভিক্ষে ক'রে খাব, ‘তবু যে লোক খাওয়ার খোঁটা দেয়, তার জন্ন আর স্পর্শ করব না।’ এই কথা শুনে বৌদি'র মুখখানি সাদা হ'য়ে গেল। কোন-কথা না ব'লে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। হায়! কেন সে সময় তাঁ'র পায়ে ধরি নি? যদি ধরতুম তা' হ'লে বোধ হয় বাছা আমার মরত না। কি করব, পোড়া অভিমান। আমায় পাগল ক'রেছিল। বাড়ীতে যে এত কাণ্ড হ'চ্ছিল দাদা তার গন্ধও পান নি।”

“এতক্ষণে, আমার সন্দেহ যে সত্য, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। ব্যগ্রভাবে বলিলাম—“বল বল, তার পর কি হ’ল, তার পর কি হ’ল, তার পর তুমি বুঝি সেই রাতেই তোমার ছই ছেলেকে নিয়ে বাড়ী থেকে কোথায় পালিয়ে গেলে?”—আমার ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিল।

রমণীর মনে যেন খটকা লাগিল। বলিল—“আপনি কি ক’রে জানলেন? দাদার সঙ্গে আপনার চেনা আছে না কি?”

আমি বলিলাম—“না, তা’ নয়, তোমার কথায় আমার অনুমান।”

রমণী নিঃসন্দেহে পুনরায় বলিতে লাগিল—“সেই রাতে ছেলে ছটাকে কোলে ক’রে গোপনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সমস্ত রাত তা’দের কোলে ক’রেই রাত্তা হাঁটলুম। জ্যোৎস্না ছিল বোলে অমন ক’রে হাঁটতে পেরেছিলুম। তার পর বেলা প্রায় চটার সময় আপনারই মত একটা সদাশয় বৃদ্ধ আমাদের আশ্রয় দেন। বৃদ্ধের কেউ ছিল না, তাঁ’রই কাছে প্রায় এক বছর কাটাই। তার পর আমার কপাল ভাঙ্গল,—বৃদ্ধ মারা গেলেন। আমরাও আবার যে পৃথিক, সেই পৃথিক হ’লুম।

“সেই দিন থেকে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করলুম। গান গাইতে পারি নে ব’লে, ভিক্ষাও কেউ দেয় না; তবে কেউ না কেউ দয়া ক’রে যা’ এক আধ মুঠো চাল দিত তাতেই যাহোক ক’রে ছেলে ছটাকে খাওয়াতুম। নিজে প্রায়ই উপবাসে থাকতুম। আগে চাকর ছেলেকে খাইয়ে তার পর যা’ থাকত তা’ই নিজের ছেলেকে খাওয়াতুম। তা’র খেয়ে যদি কোন দিন দু’টি বাড়ত তবেই নিজে খেতুম।

“এমনি ক’রে না খেয়ে খেয়ে, পথে পথে ঘুরে ঘুরে আমার দেহ ভেঙ্গে পড়ল। আর তেমন ভিক্ষে করতে পারতুম না। আমার জ্বর হ’ল। যা’ কিছু অন্ন স্বপ্ন পেতুম তা’রই এই বাছার একলারই কুলীত না, কি করব, তা’ই যা’ হোক ক’রে, বেশী কম ভাগ ক’রে ছ’জনাকে খাওয়াতুম। না খেতে পেয়ে আমার ছেলেরও অসুখ হ’ল। তখন তা’র মাথাটি আমার কোলের উপর রেখে ‘হা ভগবান্, হা ভগবান্’ ছাড়া আর কিছু করতে পারতুম না। তার পর—তার পর সব শেষ!

“এক দিন সে আমার মুখপানে চেয়ে “মা মা, জল দে, জল দে” বলতে বলতে কোথায় চলে গেল। হায় হায়! মরণকালে বাছা আমার একটু জলও খেতে পেল না!”

রমণী কণকাল নীরব থাকিয়া ঘুমন্ত ছেলের মুখে চুমু খাইয়া আবার বলিতে লাগিল—“বাবু, তা’র মৃত্যু ছিল সে ম’রেচে, কিন্তু ভগবান এখনও আমার মা ব’লে ডাকা বন্ধ করান নি। আমার এক ছেলে গেছে, এখনও এক ছেলে আছে। ম’শাই বলতে কি, বাছাকে আমার চাকুর ছেলে ব’লে একবারও মনে হ’র না,—মনে হয় এ যেন আমারই গর্ভজাত। হাঁ, তার পর তা’কে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দেবার পর, আমার যা’ যা’ হয়েছিল, তা’ আপনি জানেন।

“এই সময় আমার বুকের মধ্যে যে কি করিতেছিল, সে যে কত যন্ত্রণা তা’ প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। আমি অশ্রুট স্বরে বলিলাম—“মাধবী, অভাগী, তোর এই দুর্দশা ? ওগি ! এই হতভাগাই তোর যোগিন দাদা—”

মাধবী অবাক হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রছিল।

আমার মনে ভয় হইল। এই সময় এক প্রাণহীন বাতাস আসিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া দিল। প্রদীপ জালিয়া দেখিলাম, মাধবীর সংজ্ঞা নাই। ভাবিলাম, ভাল ক্লান্ত করি নাই।

অস্বপ্নের মধ্যেই তাহার জ্ঞান হইল। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, “বল দাদা বল—তোমার এ দশা কেন—বৌদি’ ভাল আছেন ত ?”

আমি বলিলাম—“হা অভাগী ! তুমি চলে আসবার তিন মাস পরে হঠাৎ গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দেয়, গ্রাম প্রায় উজাড় হ’য়ে যায়। তোমার বৌদি’ও সেই রোগে মারা যায়। এখন বুঝতে পারছি কেন সে মরবার সময় বলেছিল—“ওগো তোমরা যেমন কোরে পার একটবার ঠাকুরঝিকে এনে দেখাও। তা’ না হ’লে আমি স্থখে মরতে পারব না—অভাগী যে আমার কথার জালায় দেশ ছাড়া হ’য়েচে—” হায় ! বোন, সে সময় কত খুঁজেও তোমায় পাইনি, যদি পেতুম তা হ’লে বোধ হয় সে স্মৃত কষ্ট পেয়ে মরত না—”

মাধবী পুনরায় মূর্ছা গেল।



মীমাংসা-দর্শনে অলৌকিকবাদ।

[অধ্যাপক—শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্বতি মীমাংসাতীর্থ ।]

আমরা হিন্দু। বেদোক্তধর্ম আমরা আচরণ করিয়া থাকি। কথায় কথায় বেদের দোহাই দিই। অল্প ধর্মাবলম্বীরা আমাদের ধর্মের উপর দোষারোপ করিলে আমরা বলিয়া থাকি, ক্রম সত্য স্বরূপ অপৌরুষেয় অর্থাৎ স্বয়ম্ভু বেদ যে ধর্মের মূল, তাহা কি কখনও ভ্রমাত্মক হইতে পারে? কিন্তু ইহা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় হইলেও সত্য বলিতে বাধ্য যে, বেদ আমাদের ধর্মের মূল হইলেও—সর্বস্ব হইলেও—হিন্দু আমরা, বঙ্গবাসী আমরা—আমাদের অনেকেই—বেদ যে কি, কেনই বা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকে এবং এই অপৌরুষেয়বাদ বা অলৌকিকবাদের কতদূর প্রামাণ্য, আর বেদের শাসন-বাক্য অর্থাৎ বিধিবাক্য সমূহকে কি কারণে বিনা তর্কে নতশিরে মানিয়া চলি, তাহা জ্ঞাত নহেন। যে বেদ অলৌকিক—পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, দেবতা ও পিতৃলোকাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং তদনুসারে দেবতা ও পিতৃলোকাদির তৃপ্তিসাধন জন্ত ত্যাগরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে বলেন, সেই বেদ উন্নত প্রলাপবৎ উপেক্ষণীয় না হইয়া বরণ্য ও পূজ্যই কেন? আর এক কথা, বেদ কস্মিন্দুত গ্রন্থ অথচ ইহার কর্তা অর্থাৎ রচয়িতা কেহ নাই? ইনি স্বয়ম্ভু, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহা বোধ হয় অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। অনেকে আবার এই বিষয়কে আরব্য উপন্যাসের মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না।

বাস্তবিক ইহা বিশেষ রূপে ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই যে, রচয়িতা নাই অথচ গ্রন্থ হইল, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? এই বিষয়ে “মীমাংসাদর্শনে” যতদূর সম্ভব হইতে পারে সুন্দররূপে যুক্তিভাল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দর্শনে ধর্ম সম্বন্ধে বেদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া—কেন এই বেদ প্রামাণ্য, তাহার সিদ্ধান্তমুখে বেদ যে অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ-নির্মিত নহে এবং ইহা যে পুরুষ-নির্মিত হইতেই পারে না, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন

করিয়াছেন । অল্প মীমাংসাদর্শনের এই অলৌকিকবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।

মীমাংসাদর্শন বলেন, বেদ কোনও লোক-নির্মিত নহে । যদি ইহা লোক অর্থাৎ পুরুষ-নির্মিত হইত, তাহা হইলে উহার অর্থবোধ করা একান্ত অসম্ভব হইত ; তাহার কারণ বেদ আদি গ্রন্থ ইহার পূর্বে যে, কোনও ভাষায় রচিত কোনও গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ নাই । ইহা সকলেই নির্বিনায়ে স্বীকার করিয়া থাকেন । ধর্মশাস্ত্র সমূহে ও স্বয়ং বেদেও উক্ত আছে যে, বেদ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু সমূহের নামকরণ হইয়াছে । এখন এই বেদকে অপৌরুষেয় বলিলে ইহা বুঝা যায় যে, কোনও লোক স্বীয় কল্পনাবলে জগতের তাবৎ বস্তু সমূহের সংজ্ঞা সংযোজিত করিয়া এই বেদ রচনা করিয়াছেন । এখন দেখা যাউক, ঐ ব্যক্তি যিনি স্বীয় কল্পনাবলে বস্তু সকলের নামকরণ করিয়াছেন, তিনি অন্তর্কে উহা কি প্রকারে বুঝাইতে পারেন ? তখন এমন কোনও সাধারণ ভাষা ছিল না যাহার সাহায্যে তিনি এই সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-জ্ঞান অগ্রের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে পারেন । আর যদি কোনও ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহাই বা কিরূপে সাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল ? এইরূপে যাহাকেই মূল রূপে কল্পনা কর না কেন, শেষ স্বীকার করিতেই হইবে যে, এমন এক অলৌকিক অধুনাতন অজ্ঞাত ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থ ছিল, যাহা কেহই স্বজন করিতে পারে না । এখন এই পরিদৃশ্যমান বেদকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ অদৃষ্ট—অপরিচিত এবং অচিন্ত্য ভাষারচিত গ্রন্থের উপর এই অলৌকিকবাদ স্থাপন করিতে যাই কেন ? যখন অপৌরুষেয়বাদ স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তরই নাই তখন পুরুষপরম্পরাক্রমে মনীষিবৃন্দ যাহাকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিব না কেন ? হয় ত বলিতে পারেন, এই ভাবে জগতের সমুদয় ভাষার উপরই এই অলৌকিকবাদ স্থাপন করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা হইতে পারে না । কারণ, একমাত্র এই বেদ হইতেই জগতের যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মূল যখন সকলেরই এক, তখন ভাষা সকলের একরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে, মানব রসনা স্বভাবতঃই অলস ; জোর করিয়া প্রবৃত্ত করিয়া রসনা দ্বারা বাক্য সকল উচ্চারণ করাইয়া লইতে হয় । এমত অবস্থায় মনবগণ যত সংক্ষেপে ও সহজ কথায় মনোভাব অন্তর্কে বুঝাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে । দেশভেদে, জল বায়ুর বিভিন্নতা হেতু, প্রকৃতিভেদে

একই শব্দৰ উচ্চারণ ভিন্ন ভাব ধারণ কৰে । ইহা বুঝাইতে যুক্তিতর্কৰ অবতারণা নিরর্থক । এইৰূপে বিভিন্ন হইতে হইতে ক্রমশঃ জাতিভেদে সম্প্রদায়ভেদে দেশভেদে মূলতঃ একই ভাষা বিভিন্ন আকার ধারণ কৰিয়াছে ।

আর এক কথা—যদি এই বেদকে কোনও পুরুষ-নির্মিত ধরা যায়, তাহা হইলে সর্বত্র প্রায় পৃথিবীর তাবৎ দুৰ্গম প্রদেশেও সেই একই শব্দৰ দ্বারা একই বস্তু আখ্যাত হইতে পারিত না । যেমন গো শব্দ—এই গো শব্দ পৃথিবীর যত ভাষা আছে, সমুদয় ভাষাতে প্রায় একই ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে । (বাহুল্য ভয়ে ইহার বিশ্লেষণ ও অগ্ৰাণ্ণ উদাহরণ প্রদত্ত হইল না) একজন লোক কখনই সমগ্র পৃথিবী এবং অতি দুৰ্গম প্রদেশাদিতে উপস্থিত হইয়া প্রতি ব্যক্তিকে স্বীয় মনঃ কল্পিত ভাষা শিক্ষা দিতে পারে না । আর এক কথা, যেখানেই হিন্দু ধর্ম প্রচলিত আছে, সেই খানেই দেখিবে হিন্দুদিগের আচার, ব্যবহার, জপ, হোম, দেবপূজা, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি ঠিক একই ভাবে সুসাধিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, বেদ কখনও পুরুষবিশেষ প্রণীত নহে ; কারণ, এই সার্বজনীন সামঞ্জস্য পুরুষবিশেষের প্রযত্ন সাপেক্ষ হইতে পারে না ।

আর এক কথা, যাহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিতে চাহেন, তাঁহারা “অর্থা-পত্তি” নামক প্রমাণ দ্বারা উহা সিদ্ধ কৰিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন । “উভয় বাক্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তৃতীয় বাক্য অবলম্বন কৰিলে যাহার সমাধান সুসাধিত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে ।” যেমন স্থলকায় দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন কৰে না । এখানে অভুক্ত ব্যক্তির স্থলত্ব অসম্ভব, অতএব বিরোধ হইল, কাষেই এই স্থলত্ব ও দিবসভোজনত্বের বিরোধপরিহারার্থ অনুল্লিখিত তৃতীয় বাক্য রাত্রি ভোজনের কল্পনা কৰা হইয়া থাকে । তদ্রূপ এই স্থলে, রচয়িতা ব্যতীত গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পৰা যায় না, এখানে গ্রন্থ আছে কিন্তু রচয়িতা নাই, এই বিরোধ হইল, এই বিরোধ পরিহার জন্ত অজ্ঞাতনামা রচয়িতার কল্পনা কৰিয়া অলৌকিকবাদ প্রামাণ্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন কৰেন । বলা বাহুল্য যে, এই মতও বিচারসহ নহে । এখন দেখা যাউক, অর্থাপত্তির স্থল কোথায় ? যে স্থলে উভয় বাক্যের সমাধেয় বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই অর্থাপত্তির স্থল । কিন্তু এই স্থলে বিরোধেরই সম্ভাবনা নাই । কেন না, দৃষ্ট প্রমাণ বলে আমরা দেখিতেছি যে, এই বেদ গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া না যাইলেও গুরুপরম্পরাক্রমে পাওয়া গিয়াছে । অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় গুরুৰ নিকট এই বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইহাকে কেহই গ্রন্থকারের নিকট হইতে পায় নাই । কাষেই

এখানে গ্রন্থ দেখিয়া রচয়িতার কল্পনারূপ অর্থাপত্তির স্থল দৃষ্ট প্রমাণ বিরুদ্ধ হেতু হইতে পারিল না। কেন না, দৃষ্ট প্রমাণ অত্র সর্বপ্রকার প্রমাণ হইতে বলবন্তম।

ইহার উত্তরে অত্র পক্ষ বলেন, যদি কর্তার উপলক্ষি না হইলেই অপৌরুষেয় হয়, তাহা হইলে দুর্গম গিরিসঙ্কুল প্রদেশে অথবা গভীর অরণ্যমধ্যে যেক্ষেপ আরাম প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও তাহা হইলে অপৌরুষেয় বলিতে হয়। কারণ ঐ সকল কৃপাদিকর্তার উপলক্ষি হয় না, এবং উহারও লোকপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সিদ্ধান্তবাদী ইহার উত্তরে বলেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ ঐ সকল কৃপ আরামাদির কর্তা কেহ না কেহ ছিল; দেশোৎসাদন নিবন্ধন অথবা অত্র কোনও কারণ প্রযুক্ত লোকবাসের উচ্ছেদ হওয়াতেই ঐ সকল কৃপ আরামাদি কর্তাকে লোকে জানিতে পারে না; কিন্তু এই বিচার্যমাণ বেদ সম্বন্ধে ঐরূপ লোকপরম্পরার উচ্ছেদ অর্থাৎ সম্প্রদায় বিচ্ছেদ কখনই কোনও সুদূর অতীতেও হয় নাই। অর্থাৎ এমন কোনও সময় ছিল না, যে সময় এই বেদের পাঠন পাঠনা রূপ সম্প্রদায়ের প্রচলন ছিল না। অতএব বর্তমান সময়ে কর্তার বিস্মরণ সম্ভবপর হইলেও যদি ইহা পুরুষবিশেষের সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে, যৎকালে উহা বিরচিত হইয়াছিল, তৎকালে উহার কর্তাকে “পানিনি” প্রভৃতির গ্রন্থ কেহ না কেহ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন। ভারতবর্ষ এতদূর অকৃতজ্ঞ ছিল না যে, নিখিল তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানরত্নভাণ্ডার এই বিশাল বেদ প্রণেতাকে অনাদর ও উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতি জনধিজলে বিসর্জন দিতে পারে।

আর এক কথা বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয় আছে যে, এই বেদ কখনই পুস্তকাকারে লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই, পরমমেধাসম্পন্ন দ্বিজাতিগণ অতি পবিত্রভাবে সম্মান ও যত্ন সহকারে শোণিত ধারার গ্রন্থ ইহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং উপযুক্ত শিষ্যদিগকে মুখে মুখে উদাত্তাদি স্বর বিশেষের সহিত অভ্যাস করাইতেন। কায়েই ইহা ইদানীন্তন দুর্গম প্রদেশাদিতে প্রাপ্ত পুস্তকাদির গ্রন্থ তৎকালে গুরুপরম্পরা ব্যতীত প্রাপ্তির সম্ভাবনাই ছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা জ্ঞাতসঙ্গে বেদ-প্রণেতার নাম, শিষ্যবর্গের নিকট গোপন করিয়া গিয়াছেন, ইহা সম্ভবপরই হইতে পারে না।

যাক, এখন এই ভাবে বেদের অলৌকিকত্ব সূদৃঢ় করিয়া মীমাংসাদর্শনকার এই অলৌকিকরাদের উপর প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়াছেন।

এখন আমাদের বিশেষরূপে জানিবার বিষয়, মীমাংসাদর্শনের এই অলৌকিকবাদের উপর আমাদের আর্ধ্যধর্ম কিরূপ ধনী । এই অলৌকিকবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের এই ধর্ম কখনই “সনাতন” আখ্যাপ্রাপ্ত হইতে পারিত না ; এবং হয়ত চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদিগণের প্রবল তর্কে তথা বিধর্মিদিগের একান্ত নিষ্পেষণে এতদিন কোন অতল কাল-বারিধি গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত ।

এই ধর্ম অলৌকিক বলিয়া, সনাতন বলিয়া ইহা একটুও ভ্রম প্রমাদাদি পুরুষদোষ ছুঁই নহে । ইনি যাহা বলেন তাহাই ঋব সত্য, খাঁটি-সোনা, সর্বতোভাবে শ্রামিকাদি দোষ বর্জিত ।

জ্ঞানীদের সনাতন ধর্ম ব্যতীত সমুদয় ধর্মই পৌরুষেয়, স্তূতরাং পুরুষদোষ ছুঁই । আমরা যে ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করি, তাহা কোনও পুরুষবিশেষকে আশ্রয় স্থির করিয়া, তাহাকে দ্বার করিয়া নহে । শুদ্ধ ধর্মকে দ্বার করিয়াই ধর্মকে বিশ্বাস করি, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ভাবি, ধর্মের জন্ত তুচ্ছ প্রাণকে অনলে আহুতি দিই । এ বিষয়ে একটুও দ্বিধা করি না, একটুও সঙ্কোচ বোধ করি না ।

• আমরা জন্ম জন্মার্জিত কোটা পুণ্য ফলে এই অলৌকিক সনাতন ধর্ম-পরায়ণ গৃহে উদ্ভূত হইয়াছি, এই সনাতন ধর্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছি । আমরাই ধন্য, আমরাই কৃতকৃত্য । ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ওঁ ।

সত্যের আবরণ ।*

[লেখক—শ্রীনির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ।]

জেরাল্ড হাইডেন লক্ষপতির সন্তান ; কিন্তু ধনীর পুত্রগণ যেমন সাধারণতঃ পিতৃ-সঙ্ঘিত ঐশ্বর্য্য ভোগবিলাসে ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকেন, তিনি তাহা না করিয়া সেই সঙ্ঘিত ঐশ্বর্য্য আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন । তাঁহার নিয়মের এমন রীথারীধি ছিল যে, প্রাত্যহিক কোন কাজে কোন দিন এক চুল ইতর বিশেষ হইত না । তিনি সুপুরুষ ছিলেন এবং সচ্চরিত্র, দাতা ও বিনয়ী বলিয়া সমাজে

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন একটা বিমর্ষ জ্বাব তাঁহার মুখে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে, সেটা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতেন—“কৈ এমন ত কিছু নয়।” স্ত্রীকেও তিনি সর্ব-প্রকারে মুখে রাখিয়াছিলেন; তাহার সামান্ততম সাধেও বাধা দিয়া তিনি তাহার মনোকষ্টের কারণ হইতেন না।

স্ত্রী পেট্রিশিয়া হাইডেনও মধুর স্বভাবাপন্ন ছিলেন। স্বামীকে মুখে রাখা যে তাঁহার সর্বপ্রধান কর্তব্য— একথা তিনি এক মুহূর্তের জ্ঞাতও বিস্মৃত হইতেন না। মিশুক বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণের অন্ত ছিল না। যে নিমন্ত্রণ তাঁহার স্বামীর গৃহে অবস্থানকালীন সঙ্গদানে অন্তরায় হইত না, তিনি শুধু তাহাই গ্রহণ করিতেন।

স্বামীও বাধা নিয়মে আফিস যাইতেন এবং বাটা ফিরিয়া আসিতেন। পেট্রিশিয়া সে সময় অবগত ছিলেন বলিয়া তৎপূর্বেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। এমন একদিনও হইত না যে জেরাল্ড বাটা ফিরিয়াছেন কিন্তু পেট্রিশিয়া বাটাতে নাই। তিনি যেমন গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে নিপুণা তেমনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। কাহারও পীড়ার সংবাদ কর্ণগোচর হইলে আনন্দের সহিত তাহার সেবা করিতেন এবং দরিদ্র হইলে নিজ ব্যয়ে তাহার পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। তাই আনন্দের নিমন্ত্রণ অপেক্ষা পীড়িতের পরিচর্যায় নিমন্ত্রণ তাঁহার অধিক জুটিত।

একদিন জেরাল্ড আফিস হইতে ফিরিলেন কিন্তু পেট্রিশিয়াকে গৃহে দেখিতে পাইলেন না। বাধা নিয়মের এই ব্যতিক্রমে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; শেষে সুপকারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, হাঁসপাতালের একটা লোক আসিয়া আধ ঘণ্টা পূর্বে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্ত তিনি বার্ক লিভিংষ্টোনদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া সুপকারকে টেলিফোনি দ্বারা লিভিংষ্টোনদের জানাইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পেট্রিশিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। জেরাল্ড বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় তিনি পেট্রিশিয়ার বদনে একটা গভীর বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করিলেন। পেট্রিশিয়া জেরাল্ডের ভাবে তাঁহার প্রশ্ন বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “ও কিছু নয়। আমি শীঘ্রই ভেঞ্জিনের বেশ পরিধান করিয়া আসিয়া তোমার সহিত একত্র ভোজন করিতেছি; ভোজন করিতে করিতে হাঁসপাতালে যাহা যাহা ঘটয়াছিল, তাহা বলিব।”

যখন ভোজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন পেটু শিয়া বলিলেন, “কতকগুলি নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়া সবে ফিরিয়াছি, এমন সময় হাঁসপাতালের একটা লোক আসিয়া বলিল যে, একটা যুবতী মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া আহত হইয়াছেন । যুবতীর যে নাম বলিল, তাহা কখনও শুনি নাই, কিন্তু——”

জেরাল্ড কথা লুফিয়া লইয়া মূঢ় হাশ্বের সহিত বলিলেন “কিন্তু তুমি গেলে ।” এমন ভাবে এই কথাটা বলিলেন, যেন এ সংবাদ পাইয়া পেটু শিয়া যে ছুটিবে তাহা তাহার বিশেষ জানা ছিল ।

পেটু শিয়া কহিলেন “হাঁ, ঘাইলাম তো বটেই । যখন আমি হাঁসপাতালে পৌঁছিলাম, তখন হাঁসপাতালের লোকেরা আমাকে বলিল যে, আহত যুবতী বোধ হয় অল্পক্ষণই বাঁচিবে ; কারণ বাহিরে আঘাতের কোন গুরুতর চিহ্ন না থাকিলেও ভিতরের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে । তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে, কিন্তু ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে গেলে বলিতেছে, পেটু শিয়া অগডেন হাইডেনের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমি ঔষধাদি গ্রহণ করিব না । আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার এত আগ্রহ কেন ? নাম জিজ্ঞাসা করায় হাঁসপাতালের লোকেরা বলিল—নাম ক্যালভার্ট—জর্জিয়া ক্যালভার্ট ।”

জেরাল্ডের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, কিন্তু আলোর আবছায়ায় পেটু শিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না । পেটু শিয়া যখন এই ঘটনাটা বলিতেছিলেন, তখন কি জানি কেন ‘জর্জিয়া’ নামটাই কেবল জেরাল্ডের মনে উঠিতেছিল । যেই পেটু শিয়া নামটা উচ্চারণ করিলেন, আর যেন জেরাল্ড সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না ; তিনি উঠিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া পুনরায় আসনগ্রহণ করিলেন ।

পেটু শিয়া বলিতে লাগিলেন “হাঁসপাতালের লোকেরা আমাকে যুবতীর নিকট লইয়া গেল । দেখিলাম—জগতের সৌন্দর্য্য গায়ে মাথিয়া যুবতী নির্জীব ভাবে শয়ন করিয়া আছে ; আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার চিহ্ন-স্বরূপ কেবল মাঝে মাঝে মুখ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং মস্তক-ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে । আমাকে দেখিবামাত্র যেন তাহার সকল যন্ত্রণা দূর হইল ; ধীরে ধীরে কহিল যে, সে তোমাকে ভালবাসে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতে সাহস করিয়াছে । তাহার কথায় বুঝিলাম যে, তুমি যখন অনুস্থ হইয়া সাউথকোর্টের একটি পল্লীতে বায়ু-পরিবর্তনের জন্ত গমন কর তখন তাহার সহিত তোমার পরিচয় হয় । অত্যাঁকে তোমার মনে পড়ে কি জেরি ?”

প্রশান্তভাবে জেরাল্ড উত্তর করিল, “পড়ে।”

পেটি শিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম সে সেইস্থানে তাহার পিতামহ দ্বারা পালিত হইত এবং সেই নির্জন সাসেক্স পল্লীতে সে জীবনমৃত হইয়া বাস করিত। তোমার তথায় গমনের পূর্ব পর্য্যন্ত সে জীবনের সুখ বা ভালবাসা কাহাকে বলে, জানিত না। অদৃষ্টক্রমে তোমাদের একত্রাবস্থানের সুযোগ ঘটে এবং যত দিন যায় ততই সে তোমার প্রতি অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়ে। তোমরা প্রায় প্রত্যহই, হয় অখারোহণে নয় পদব্রজে বেড়াইতে বাইতে। এ সব কথা তোমার মনে পড়ে ?”

জেরাল্ডের স্মৃতি তখন সেই শান্ত সাসেক্স-পল্লীকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছিল—সেই কুঞ্জ-ঘেরা কুটীর, সেই কুসুম-কিঞ্জকসমা যুবতী, সেই গোলাপবাগে কত জ্যোৎস্না-সমুজ্জল বাক্যগর্ভ কত নিশি, বাক্যহীন মুহূর্ত্ত, শিরায় শিরায় কত তড়িৎ-প্রবাহ—পেটি শিয়ার প্রশ্নে তাঁহার সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; মস্তক আন্দোলিত করিয়া উত্তর দিলেন “মনে পড়ে।”

পেটি শিয়া বলিতে লাগিলেন “সে বলিল—তুমি কখনও তাহাকে একটা প্রেমের কথাও বল নাই; তুমি কেবল মাত্র তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে এবং কার্য্যে তোমার সংসাহসের পরিচয় দিতে। সে কিন্তু যৌবন-সুলভ অজ্ঞানতার বশে স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, তুমি তাহাকে ভালবাস এবং একদিন না একদিন তুমি তাহাকে মুখ কুটিয়া সে কথা বলিবে। সেই নির্জীব পল্লীতে বাস করিয়া তোমার সঙ্গপ্রাপ্তিতে সেই সময় জীবনে প্রথম তাহার মনে হইয়াছিল যে, সে প্রকৃতই বাঁচিয়া আছে—তাঁহার জীবন বার্থ নহে। তার পর একদিন রাত্ৰিতে তুমি তাহাকে জানাইলে যে, তুমি তথা হইতে চলিয়া আসিতেছ এবং সত্বরেই তোমার বিবাহ হইবে; আরও বলিয়াছিল যে, তোমার সেই নির্জন নির্বাসন তাহার সঙ্গপ্রাপ্তিতে সুখকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে জন্ত চিরজীবন তুমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তার পর সেখান হইতে তুমি চলিয়া আসিলে, এবং আমাদের বিবাহ হইল। কিন্তু জেরি! সেই বালিকার সুখ কাড়িয়া লইয়া আমি ভোগ করিতেছি—এটা নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যাপার বলিয়া আমার মনে হইতেছে।”

এক প্রকার বিষাদপূর্ণ মূহুর্ত্তে জেরাল্ডের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

পেটি শিয়া বলিতে লাগিলেন, “কিন্তু সে আমাকে বলিল যে, বহু চেষ্টা করিয়াও সে তোমাকে ভুলিতে সক্ষম হয় নাই। ভালবাসাই তাহার জীবনের

ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল । কিছু দিন থাকিতে থাকিতে তাহার এমন একটা ধারণা হইয়া গেল যে, তোমার কথা নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করা তাহার পক্ষে বোধ হয় পাপ নহে । বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ যে ভালবাসা তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম ;—আমি বোধ হয় সমস্ত ভাল ভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না ; কিন্তু সেই মুমূর্ষু বালিকা যখন বলিয়াছিল, তখন আমি সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম । আমি বলিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, তুমি সব বুঝিতে পারিতেছ কি না ।”

“আমি বুঝিতেছি, সব বুঝিতেছি”—জেরাল্ড অস্বাভাবিক গাঢ়স্বরে এই উত্তর করিলেন ।

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, “এই ধারণাটাই তাহার শূন্য হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল । তার পর তাহার পিতামহের মৃত্যুতে সে দারিদ্র্যের সর্ব-নিম্নস্তরে পতিত হয় । তাই আজ তিন দিন পূর্বে সে এই নির্দয় হৃদয়হীন সহরে আসিয়াছিল । পল্লী-নিবাসিনী সে, সহরের জনতায় অভ্যস্ত নহে, তাই রিজেন্ট ষ্ট্রীট অতিক্রমের সময় একটা মোটর, গাড়ী চাপা পড়িয়া বিষম আহত হইয়াছে ।”

উদ্বেগপূর্ণ ভগ্নস্বরে জেরাল্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার জীবনের কি কোনই আশা নাই ?”

পেট্রিশিয়া কহিলেন, “বিন্দুমাত্র না । হাঁসপাতালের লোকেরা ইহা জানাইবার পূর্বে সে নিজেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল । হাঁসপাতালের লোকেরা তাহাকে তাহার হুরারোগ্য আঘাতের কথা জানাইতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ, সময়ে সে সংবাদ না জানাইলে যদি সে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় তবে তাহাও ঘটয়া উঠিবে না । কিন্তু এমন আত্মীয় বা বন্ধু তাহার কেহই ছিল না । একবার ভাবিয়া দেখ প্রিয়তম,—কি তাহার অবস্থা ! কপর্দকহীন, বন্ধুহীন ভাবে হাঁসপাতালে মরিতেছে,—আর এত বড় জগতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে, তাহার হুঃখে একবার মুখেও ‘আহা’ বলে । কিন্তু হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল । সাধবী সে—তাই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে দেখিতে চাহিল না, কিন্তু আমাকে না ডাকিতে পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না । আমার মনে হয়, তোমার বিবাহের পরও তোমাকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়া সে অন্ততঃ হইয়াছিল এবং নীরবে যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল । সে সরল ভাবে তাহার এই মানসিক পাপ-আঘাত

নিকট ব্যক্ত করিয়া, তোমার নিকট তাহার প্রণয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অতি সহজ ভাবে আমাকে বলিল। বলিল—“ভাই! তোমার স্বামীর জীবন সুখে, সম্পদে, তোমার প্রণয়ে পূর্ণ হইলেও, অপর একটা নগণ্য রমণী তাঁহাকে যে আজীবন লুকাইয়া কত ভালবাসিয়াছিল—ইহা জানিলে তিনি অল্প—অতি অল্প আনন্দ পাইতেও পারেন; কারণ তিনি সচ্চরিত্র হইলেও,—পুরুষ।”

জেরাল্ড একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—“হে দয়াময়!”

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি তোমাকে তাহার ভালবাসার কথা জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলে সে অনেকটা শাস্ত ভাব অবলম্বন করিল। ক্রমে পরে সে অতি ক্ষীণস্বরে কতকটা অস্পষ্টভাবে বলিল, “মিসেস্ হাইডেন! আমার মনে হয়—আমার জীবনটা একবারে ব্যর্থ হয় নাই, কারণ আমি ঈশ্বরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে ভালবাসিয়াছি; তবু মনে হয়—জীবনটা আমার আদৌ ব্যর্থ হইত না যদি তিনি তাঁহার মনের এক কোণে আমাকে একটুও স্থান দিতেন। আজ যদি শুধু এইটুকুমাত্র জানিয়া যাইতে পারিতাম যে, তিনি আমাকে অতি অল্প একটুখানিও ভালবাসেন, তবে এই অন্তিম দিনে স্মরণ করিবার মত একটু কিছু পাইতাম, আর সেই স্মৃতিটুকু আজ আমার এই ভয়াবহ মৃত্যুকেও আনন্দে মগ্নিত করিয়া তুলিত। তার পর—”

জেরাল্ড ব্যগ্রভাবে যেন প্রতিধ্বনি করিলেন—“তার পর?”

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, “তারপর তা’র জীবন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; দেখিয়া আমার বোধ হইল—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। একটা নির্মল জীবন সুখের স্মৃতিটুকু লইয়াও মরিতে পাইবে না—ইহা ভাবিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। অকস্মাৎ আমি বলিয়া ফেলিলাম, “সে তোমাকে ভালবাসে জর্জিয়া! তোমাদের পরিচয়ের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে সে তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে সে আমাকে বাকদান করিয়াছিল, তাই সে তোমাকে তাহার প্রণয়জ্ঞাপন করিতে পারে নাই। করিলে, আমার নিকট অবিখ্যাসী হইত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে।” জর্জিয়ার আয়ত নীল চক্ষু স্বর্গীয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাচ ধীরে ধীরে বলিল ‘না, না, ইহা হইতে পারে না, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না।’ আমি উত্তর করিলাম, ‘ইহা সম্পূর্ণ সত্য; জেরাল্ড আমাকে ভালবাসে না—তাহা আমি জানি, কিন্তু সে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসে, তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভালবাসিলে।’

জেরাল্ড ! তুমি জান, আমি কখনও মিথ্যা বলি না এবং সে জন্য দুর্ভাগ্য অনুভব করিয়া থাকি ; কিন্তু সেই মৃত্যু-দ্বার সমীপস্থা বালিকার সম্মুখে আমি নির্জলা মিথ্যা বলিয়াছি এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই মিথ্যা বলার জন্ত আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না । তারপর যখন সে নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িল, যখন সকলে বলিল—এই শেষ, তখন আমি তাহার সেই মৃত্যুচ্ছায়া সমাকীর্ণ পাণ্ডুর বদনে চাহিয়া দেখিলাম, তাহা এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আভায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে । তখন আর কোন কথা আমার মনে হইল না, কেবল মনে হইতে লাগিল ‘আমি তাহাকে সেই শান্তি’ দিয়াছি, আমি তাহাকে সুখী করিয়াছি।’ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে প্রকৃত কথা আর জানিতে পারিবে না ।

জেরাল্ড ! তাহাকে এই প্রতারণা করায় কি আমার পাপ হইয়াছে ?

জেরাল্ড শান্তভাবে বলিলেন, “ঈশ্বর বাইবেলের লেখককে যে পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বাইবেল লিখাইয়াছিলেন, ঠিক সেই পবিত্রভাবেই তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়া আজ তোমার মুখ দিয়া মিথ্যা বলাইয়াছেন ।” তার পর জেরাল্ড এক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলেন—“শেষ যে সে প্রকৃত কথাটা জানিতে পারিয়াছে, এজন্য ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ ।”

মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী ।

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

দীনা ভারতমাতার অঙ্ক হইতে আর একটী মহার্ঘ রত্ন কাল-সাগরের অতল গর্ভে চির দিনের জন্ত বিচ্যুত হইল । সেই দিগন্তবিশ্রান্তযশাঃ অসাধারণ মনীষাশালী, কাশীবাসী ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী আর ইহলোকে নাই । গত ২রা ভাদ্র শনিবার পূর্বাঙ্ক ৭।। ঘটিকার সময়ে এই মনীষী-চুড়ামণি সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিয়াছেন ।

ভারতবর্ষে অনেক পণ্ডিত আবিভূত হইয়াছেন । সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীজীর মতন এমন সর্বশাস্ত্রপারগামী, সর্বদেশপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আজ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার নিকটে এই মহাপুরুষের পবিত্র প্রমুখ উৎখাপিত করিব ।

মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী, ১৯০৪ সনের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতে জন্ম লাভ করেন। কাশীর চারি ক্রোশ উত্তরবর্তী 'উন্দী' নামক গ্রাম, শাস্ত্রীজীর পৈতৃক বাসভূমি। তাঁহার পিতার নাম রামসেবক মিশ্র, মাতার নাম মতি রাণী দেবী। ইঁহার সরস্বপারীন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রীজীর পিতামহের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামসেবক মিশ্রই সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। রামসেবক ভগবান্ শঙ্করকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি শিব পূজায় ব্যাপ্ত থাকিতেন। শাস্ত্রীজীর পূর্বে তাঁহার পিতার চারিটা সন্তান হইয়া নষ্ট হয়, শাস্ত্রীজীই সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র। শাস্ত্রীজী ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার ললাটে স্নেহ তিলক ও জিহ্বায় ত্রিশূল চিহ্ন লক্ষিত হয়। এই অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিয়া সূতিকাগৃহের স্ত্রীলোকেরা ভয় পায় এবং কোনও ভূতপ্রেত আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া এই নবজাত শিশুকে ফেলিয়া দিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু শাস্ত্রীজীর পিতা এই ব্যাপারে বাধা দিয়া বলেন যে, "আমার গুরুর ভবিষ্যদ্বাণীতে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিশ্চয়ই ইঁহার কোনও অলৌকিকত্ব আছে, তোমরা ইঁহাকে ফেলিতে পারিবে না।" শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম সময়ে হুগল্ড 'চতুঃসাগর যোগ' ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয়, ৫ বৎসর বয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত, বেতিয়া মহারাজের তহশীলদার ছিলেন। শাস্ত্রীজীর ১১ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে বেতিয়ায় লইয়া যান। শাস্ত্রীজী বেতিয়ায় গিয়া প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠতিষশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। তার পর বেতিয়া নিবাসী পণ্ডিত অধিকা প্রসাদ মিশ্রের পরামর্শে শাস্ত্রীজীকে ১৩ বৎসর বয়সের সময়ে লবুকৌমুদী ব্যাকরণ প্রারম্ভ করান হয়। তাঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক বেতিয়াবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাণীদত্ত চৌবে। ইনি অদ্যাপি বেতিয়াতে জীবিত আছেন। ১৪ বৎসর বয়সে শাস্ত্রীজী কাশীস্থ গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক সুলতানপুর নিবাসী হুর্গাদত্ত পণ্ডিতের নিকটে লবুকৌমুদীর 'এধ' ধাতু হইতে পাঠারম্ভ করেন। 'এধ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি; শাস্ত্রীজী বলিতেন, "গুরুর অনুকম্পায় সেই অবধি আমার বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়।" শাস্ত্রীজী কলেজে পড়িবার সময়ে কাশীর তিন ক্রোশ দূরবর্তী কোনও গ্রামে থাকিতেন। সেই স্থান হইতে প্রত্যহ কলেজে আসিতেন। পাঠ্যাবস্থায় শাস্ত্রীজী প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে এক কলসী গর্জাজল লইয়া বিশ্বনাথের মাথায় দিতেন। ১৮ বৎসর বয়সের সময়ে শাস্ত্রীজীর পাণিনীয় ব্যাকরণ সংক্রান্ত

ভাষ্য টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়া যায়। তার পর তিনি কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন প্রধান গ্রামশাস্ত্রাধ্যাপক, বাঙ্গালী পণ্ডিত কালীপ্রসাদ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে হেতুভাসান্ত নব্যগ্রাম এবং নেপাল দেশীয় পুরমবুৎপন্ন তর্কিক গণেশ শ্রোতীর নিকটে আদ্যন্ত “খণ্ডনখণ্ড-খণ্ডা” পড়িয়াছিলেন। স্বামী শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকটে শাস্ত্রীজী মীমাংসাদর্শন ও “অদ্বৈতসিদ্ধি” অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রীজী যখন কলেজে গ্রাম-শাস্ত্র পড়েন, সেই সময়ে কলেজের ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক, অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কালশাস্ত্রী একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, “তুমি বুদ্ধিমান, আমার গুরু রাজারাম শাস্ত্রীর নিকটে তুমি যদি কিছু দিন ব্যাকরণশাস্ত্রের বিবিধ বিচারাদির অনুশীলন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তুমি অত্যন্ত উন্নত হইতে পারিবে।” শাস্ত্রীজী বিনীতভাবে উত্তর করেন যে, “তিনি বৃদ্ধ, আপনি যদি রূপাপূর্বক আমাকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।” কালশাস্ত্রী মহাশয় তাহাতে সন্মত হইলে শাস্ত্রীজী দুই বৎসর কাল তাঁহার নিকটে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সুস্মানুস্ম তথ্য সকল শিক্ষা করেন এবং শব্দখণ্ডের “ব্যুৎপত্তিবাদ” “শক্তিবাদ” পড়েন। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে তাঁহার ছাত্র-জীবন অতিবাহিত হয়। শাস্ত্রীজী বলিতেন, “আমি অনেকের কাছে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার সার শিক্ষা কালশাস্ত্রীর নিকটেই হইয়াছিল।”

শাস্ত্রীজী পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাশীর সংস্কৃত কলেজেই অধ্যাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও এক ঘটনায় ৪ বৎসর পরেই তিনি এই অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে কাশীতে দাক্ষিণাত্য-পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। সংস্কৃত কলেজেও তখন দক্ষিণী পণ্ডিতই অধিক ছিলেন। একবার শাস্ত্রীজীর অধিকাংশ ছাত্রই পরীক্ষা দিয়া অনুত্তীর্ণ হওয়ার তাহার মনে করে—কলেজের দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীজীর প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে তাঁহার ছাত্রদিগকে অগ্রায় ভাবে ফেল করিয়াছেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া শাস্ত্রীজীর ছাত্রবৃন্দ উপরিতন কর্তৃপক্ষের নিকটে পুনঃ পরীক্ষার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করে। কিন্তু এই ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অস্থায়ী অধ্যক্ষ রাইট সাহেবের মনে বিশ্বাস হয় যে, শিবকুমার শাস্ত্রীই কলেজের অসম্মান করিবার জন্ত ছাত্রবৃন্দের দ্বারা এইরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তিনি শাস্ত্রীজীকে পদচ্যুত করেন। ভিনিস সাহেব প্রিন্সিপাল হইয়া কলেজে অধ্যাপনার জন্ত শাস্ত্রীজীকে আবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর সন্মত হন নাই।

সহসা কলেজের কর্ম নষ্ট হওয়ার শাস্ত্রীজী একটু বিপন্ন হইয়া পড়েন। একটা বিবাহে বরযাত্রিক হইয়া তিনি দারভাঙ্গায় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে শাস্ত্রীজী, বিদ্যানুরাগী মহারাজ ৬লক্ষ্মীধর সিংহ বাহাদুরের সহিত দেখা করেন। রাজসভায় তিনি নানা শাস্ত্রের বিচার এবং “পার্বাজ্জটাঘনঘটা বৃষভধ্বজস্ত,” “প্রবিশতি জলমধ্যে শীতভীতা মৃগাকী” ইত্যাদি বহু সমস্যা পূরণ করিয়া প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মহারাজ লক্ষ্মীধর সিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শাস্ত্রীজীকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন। মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে ৫০০ টাকা মাসিক বৃত্তিতে রাজসভা-পণ্ডিত-পদ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীজী এক বৎসরকাল সপরিবারে দারভাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে বলেন, “আমি দারভাঙ্গায় একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিব, সেই বিদ্যালয়ে আপনি অধ্যাপনা করিবেন।” কিন্তু ঘটনাচক্রে শাস্ত্রীজীর আবার কাশীতেই আসিতে হইল।

মহারাজ লক্ষ্মীধর সিংহ, স্বামী বিণুদ্বানন্দ সরস্বতীকে মাসিক ৫০০ শত টাকা বৃত্তি দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামীজী মহারাজকে বলেন, “আমার টাকার কোনও প্রয়োজন নাই, তুমি ঐ টাকায় কাশীতে একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর।” স্বামীজীর আশ্রয়ানুসারে কাশীতে ‘দ্বারবন্দ-পাঠশালা’ নামক সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হয়। মহামহোপাধ্যায় ৬মুখাকর দ্বিবেদী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তাতিয়া শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিতেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবকুমার শাস্ত্রীজী, মহারাজকে বলেন, “দ্বারবন্দে আপনার সঙ্কলিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থাদির ত এখনও বিলম্ব আছে, ততদিন আমি আপনার কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে ইচ্ছা করি।” মহারাজ এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে শাস্ত্রীজী কাশীতে আসিয়া ‘দ্বারবন্দ-পাঠশালা’য় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। মহারাজ লক্ষ্মীধর সিংহের দেহান্ত হইলে বর্তমান দ্বারবন্দাধিপতি মহারাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর, ৫০০ টাকার স্থলে শাস্ত্রীজীর জন্ম মাসিক ৭৫০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। যতদিন শরীর কার্যক্ষম ছিল— এই বিদ্যালয়েই তিনি অধ্যাপনা করিয়াছেন। শাস্ত্রীজী স্থানান্তরে গেলে অনেক টাকা পাইতে পারিতেন, কিন্তু কাশীবাসের প্রলোভনে তিনি ঐ অন্নবৃত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বারবন্দাধিপতি যখন তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদে লর্ড কর্জনের অধিনায়ক গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করেন, সে সময়ে কাশী হইতে শাস্ত্রীজীও

নিমন্ত্রিত হইরাছিলেন। সেই উৎসবস্থলে শ্রীযুক্ত আশুবাবুর সমক্ষে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রীজীকে বলেন, “আপনি মাসিক ৫০০ শত টাকা লইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে আসুন না।” শাস্ত্রীজী কাশী-পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই।

শাস্ত্রীজীর জ্ঞান আবালা তপস্বী, অতি অল্পই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি পাঠাবস্থায় প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরে আত্মস্থ চণ্ডীপাঠ করিতেন। অধ্যাপক হইয়াও তিনি প্রতিদিন মনিকর্ণিকায় প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া বিদ্যালয়ে পড়াইতে যাইতেন। অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে প্রত্যহ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। শাস্ত্রীজী নিত্যশ্রদ্ধ ও প্রতি অমাবস্তায় পার্বণ করিতেন।

শাস্ত্রীজীর বিচার-মল্লতা পণ্ডিতসমাজে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, “আমরা পাঠাবস্থায় সভাক্ষেত্রে দেখিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী, কাশীবাসী পণ্ডিত চক্রের মধ্যস্থলে বসিয়া সোৎসাহে শাস্ত্রার্থ করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইত, কবে আমরা এইরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া শাস্ত্রীর বিচার করিতে অধিকার পাইব! সে দিন জীবন ধন হইবে।

শাস্ত্রীজী চিরদিন গুণবানের যথোচিত সমাদর করিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের প্রতি তাহার অত্যধিক শ্রদ্ধা ছিল। মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ই বলিয়াছেন, “যখন অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া কাশীতে আমরা একরূপ নিঃসহায় হইলাম, তখন শিবকুমার শাস্ত্রী যে আমার কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক, কিন্তু সভাক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় একটা সামান্য কথা বলিলেও তিনি সাগ্রহে শুনিতেন এবং অপর পণ্ডিতেরা গোলযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, ‘ভট্টাচার্য্য ক্যা কহতা জ্ঞায়, শুনো।’ আমি সভায় পূর্বপক্ষ করিলেই তিনি আমার সহায়তা করিতেন এবং যাহাতে আমার প্রতি কেহ অজ্ঞায় ব্যবহার না করিতে পারে, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিতেন।” শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন প্রভৃতি কাশীস্থ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণও শাস্ত্রীজীর অনুকূল ব্যবহারে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের অলোকসামান্য প্রতিভায় শাস্ত্রীজী এতই মুগ্ধ হইরাছিলেন যে, চিরদিন তিনি জ্ঞানরত্ন মহাশয়কে গুরুর জ্ঞান সম্মান করিয়া আসিয়াছেন। প্রতিভার মর্গ্যাদী রক্ষা করিতে কদাপি

তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। শাস্ত্রীজীর বিশ্বাস ছিল,—“শুণ্ধঃ পূজাহানঃ শুণিবু
ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।” একজন বালকের ঞ্গ দেখিলেও তিনি তাহাকে
যথোচিত আদর করিয়াছেন।

শাস্ত্রীজী স্বামী ভাস্করানন্দের জীবনী অবলম্বন করিয়া “বতীজীবনচরিতম্”
নামে একখানি অনতিবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্যে তিনি সংক্ষেপে
ষড়্দর্শনের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া পরিশেষে অদ্বৈতবাদেরই প্রাধাত্য স্থাপন
করেন। শাস্ত্রীজী এই গ্রন্থের এক খণ্ড মহামহোপাধ্যায় ৬মহেশচন্দ্র ঞ্য়রত্ন
মহাশয়কে উপহার দেন। ঞ্য়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ পড়িয়া এতই সন্তুষ্ট হন যে,
গ্রন্থ প্রাপ্তির ৩৪ দিন পরেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত
যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শাস্ত্রীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসেন। ইহার কিছুদিন পরেই ঞ্য়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে শাস্ত্রীজী
‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধিতে ভূষিত হন।

“বতীজীবনচরিতম্” ব্যতীত শাস্ত্রীজী “লক্ষ্মীশ্বরপ্রতাপি” নামক আর
একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে মহেশ ঠকুর হইতে দ্বার-
বঙ্গাদিপতিদিগের বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে। এই কাব্যরচনার জন্ত মহারাজ
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, শাস্ত্রীজীকে দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন। মদীয় পরম বন্ধু
ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিজ্ঞানরত্নকে পড়াইবার সময়ে শাস্ত্রীজী
নাগেশভট্টরূত “পরিভাষেন্দুশেখরে”র টীকা করিতে আরম্ভ করেন এবং মদীয়
অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ, মহোদয়ের একান্ত
অনুরোধে “মহিম্নঃ স্তোত্রে”র কতিপয় শ্লোকের টীকা লেখেন। এই উভয়
টীকা গ্রন্থই তিনি সমাপ্ত করিয়া যান নাই। তবে “লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা” গ্রন্থের
শাস্ত্রীজীর কৃত সম্পূর্ণ টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রীজীকে কেহ কখনও কোনও
গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, “যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বর্তমান
আছে, ক্রমশঃ তাহারই অধ্যয়ন অধ্যাপনা হ্রাস পাইতেছে, নূতন গ্রন্থ আর
পড়িবে কে ?” শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিতেন, “যে ভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর
আলোচনা ভারতবর্ষ হইতে ক্রমশঃ নির্বাসিত হইতেছে, তাহাতে আমার মনে
হয় যে, আর ৫০ বৎসর পরে ব্যাকরণ পড়িবার জন্তও ভারতবাসীকে ইউরোপ
প্রভৃতি দেশান্তরে যাইতে হইবে।”

শাস্ত্রীজী দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত “তত্ত্বচিন্তামণি”র
অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, “তত্ত্বচিন্তামণি”র তুল্য নানাবিষয়-
মোক্ষক গভীরার্থক গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই।”

শ্বশুরী মঠের শঙ্করাচার্য্য, শাস্ত্রীজীকে “সর্বতন্ত্রতন্ত্র পণ্ডিতরাজ” এই উপাধি অঙ্কিত স্বর্ণ পদক উপহার দেন। বামরার মহারাজও তাঁহাকে ‘অত্রৈব বিচারসঃ’ এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ করিয়া সোনার মেডেল দিয়াছিলেন। শাস্ত্রীজী কলিকাতার কাণ্ডকুজ-সভা হইতেও ‘বিচারমার্ভণ্ড’ উপাধি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। শাস্ত্রীজী যখন লাহোরে যান, তখন পঞ্চনদবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ঘোড়া খুলিয়া ফেলিয়া শাস্ত্রীজীর গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করেন। লাহোরের ওরিএন্টাল কলেজের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবদত্ত শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণও শাস্ত্রীজীর অভ্যর্থনার জন্ত উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রীজী এই কার্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, “এখানে অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, সুতরাং আমি কখনই ঘোড়া খুলিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে দিব না। এ অনুষ্ঠান শাস্ত্রসঙ্গত নহে।” লাহোরের হিন্দুসভা, শ্রী প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শাস্ত্রীজীকে অভিনন্দন-পত্র দেন। এই অভিনন্দন-সভায় জিষ্টিস্ সাদিলাল, অনারেবল রায় রামশরণ দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লাল হংসরাজ প্রভৃতি পঞ্জাবের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের নানা স্থানে শাস্ত্রীজীর এতই প্রতিষ্ঠা ছিল যে, শাস্ত্রে কি আছে না আছে, তাহা জানিবার জন্ত লোকে ব্যগ্র হইত না, ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রীজীর আদেশ শুনিয়াই তাহারা নিঃসন্দেহে কার্য্য করিত। গত বৎসর যখন আমাদের ইংরাজ গভর্নমেন্টের কতিপয় সৈন্ত মেসোপটেমিয়ার অবরুদ্ধ হয়, তখন অল্প খাদ্য সংগ্রহের উপায় না দেখিয়া উপরিতন সৈনিক কর্মচারী তাহাদিগকে অগত্য ঘোড়ার মাংস খাইতে আদেশ করেন। কিন্তু হিন্দু সৈন্তেরা তাহাতে ঘোর আপত্তি করে। পরে তাহারা বলে, “কাশীর শিবকুমার পণ্ডিত যদি আমাদের ঘোড়ার মাংস খাইবার ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে আমরা খাইতে পারি।” এই উপলক্ষে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট হইতে দুই জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সামরিক কর্মচারী শাস্ত্রীজীর বাটতে ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রীজী বলেন, “এইরূপ আপৎকালে প্রাণ রক্ষার জন্ত ঘোড়ার মাংস খাইলে পাপ হইবে না।”

শাস্ত্রীজীর দিগন্তবিশ্রান্ত কীর্তি—লোকোত্তর, পাণ্ডিত্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া গাঙ্গিক পত্রের কলেবরে সম্ভবপর নহে। ভারতের নানা স্থানে তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্রবৃন্দ জ্ঞানচর্চা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যেও গুরুচরণ বিদ্যা-ভূষণ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের শ্রীযুক্ত ঘামিনীকান্ত তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত

বহুবলত শাস্ত্রী, ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র বিহারী প্রভৃতি শাস্ত্রীজীর ছাত্র । বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকেরও তিনি বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন । ভারতের দুর্ভাগ্য, জ্ঞান-গগনের এমন উদ্দীপ্ত মরীচিমালী, জীবনের একরূপ মধ্যাহ্নেই অন্তমিত হইলেন ।

প্রায় তিন বৎসর পূর্বেই শাস্ত্রীজীর পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায় । সেই অবধিই নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে । মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব হইতেই তিনি শয্যাগত হইয়াছিলেন । যখন এই কাল ব্যাধি তাঁহাকে অত্যন্ত আক্রমণ করিয়া ফেলিল, তখন শাস্ত্রীজী গঙ্গাতীরে ঘাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠেন । তাঁহার অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে মণিকর্নিকায় আলোয়ারের মহারাজের শিবালয়-সংলগ্ন গৃহে আনয়ন করা হয় । এই স্থানে তিনি ১৬ দিন বাস করিয়াছিলেন । বর্ষাকালীন গঙ্গার বৃদ্ধিতে এই স্থান ডুবিয়া ঘাইবার আশঙ্কায় অতঃপর তাঁহাকে কেদার ঘাটে তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়ের গঙ্গুতটাস্থিত বাটীতে আনিয়া রাখা হয় । এই বাটীতে তিনি প্রায় দুই মাস কাল বাস করেন । এই সময় প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে কাঁদিয়া অধীর হইতেন । প্রায় সর্বদাই তিনি “সর্বধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”, “গঙ্গা বিশেখরঃ কাশী জাগতি ত্রিতয়ং যদি । তত্র নৈশ্রেয়সী লক্ষ্মীর্জায়তে চিত্রমত্র কিম্ ॥” ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বালকের স্থায় কাঁদিয়া উঠিতেন ।

মৃত্যুর বার দিন পূর্ব হইতে তাঁহার প্রবল জ্বর হয় । এই সর্বনেশে জ্বর আর ছাড়ে নাই । ২রা ভাদ্র প্রাতঃকালে তাঁহার অল্প অল্প শ্বাস হইতে থাকে । রাজা শশিশেখরেশ্বরের বাটীর গঙ্গার ধারের দরজা দিয়া শাস্ত্রীজীকে তীরস্থ করা হয় । ভাদ্র মাসের পরিপূর্ণ গঙ্গা, তাঁহার ভক্তকে সাদরে কোলে লইবার জন্যই যেন রাজার গৃহদ্বার পর্যন্ত আসিয়াছিলেন । গঙ্গাগর্ভে নীত হইবা মাত্র “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্বরন্”—এই শ্লোকটি শুনিতে শুনিতে ৭১ বৎসর বয়সে শাস্ত্রীজী নখর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়স-লক্ষ্মী লাভ করিলেন । ভারতের গৌরব-চূড়া খসিয়া পড়িল ।

সেকেন্দ্রিয়ার কুতবখানা ও উদ্ডপুৰ বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রবাদ ।

[লেখক—শ্রীশুক্ৰদাস সরকার, এম-এ ।]

কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত মোঃ মহম্মদ কে চাঁদ সাহেব শ্রীযুক্ত রাধালরাজ রায় মহাশয়ের সহিত হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় সম্বন্ধে *বাদানুবাদ প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণ কর্তৃক সেকেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত কুতবখানা দগ্ধ করার অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা ও “অনৈতিহাসিক” এবং তাহা “পুনরুল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগের প্রাণে ব্যথা দেওয়া বিচোন্নত ব্যক্তিগণের উচিত নহে ।” শ্রদ্ধাম্পদ মৌলবী সাহেব এইরূপ মিথ্যা কথা রটনার জন্ত মধ্যযুগের খৃষ্টান এবং “ইশলামবিদ্বেষী” খৃষ্টান মিশনারীদিগের স্কন্ধেই কেবল দোষারোপ করিয়াছেন । এরূপ কাল্পনিক অপবাদ সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যতই দূরীভূত হয় ততই মঙ্গল, কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, বাদানুবাদ বা আলোচনার নিযুক্ত হইয়াও এতদেশীয় সাহিত্যিকগণ অনেকস্থলেই ঐতিহাসিক প্রমাণাদির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন না । তাঁহারা এই কষ্টটুকু স্বীকার করিলে সাধারণ পাঠকগণের যে বিশেষ উপকার হয় তাহা বলা বাহুল্য ।

দেশীয় ঐতিহাসিকগণ এখন ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের কঙ্কাল-যোজনা করিতে ব্যস্ত । ভিন্ন দেশের ইতিহাস লইয়া তাঁহারা বড় মাসিক পত্রাদিতে আলোচনা করেন না । তাহার উপর মিশর দেশের ইতিহাস আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত নহে, সুতরাং কলেজে পঠদশায় তাহারা ইতিহাস-চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেরই মিশরদেশীয় ঘটনা সম্বন্ধে ভালরূপ জানিবার অবকাশ ঘটে নাই । কিছুদিন পূর্বে আমার সাহিত্যমোদী বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রণবদেব মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় আমাকে স্ট্যানলি লেন-পুল (Stanly Lane-Pool) রচিত মিশরের মধ্যযুগের একখানি ইতিহাস পাঠ করিতে দেন । পুস্তকখানি ১৯১৩ সালের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । ১২ পৃষ্ঠায় সেকেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার সম্বন্ধে আলোচনা আছে । লেন-পুল খৃষ্টান হইলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক । তিনি স্পষ্টই স্বীকার

করিয়াছেন যে, আরব সেনাপতি আমর (Amr) সেকেন্দ্রিয়ায় কোনরূপ লুটপাট বা অত্যাচার করেন নাই। আর করিবেনই বা কেন ? সেকেন্দ্রিয়া কতকগুলি স্বর্ভ স্বীকার ফলে স্বৈচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যদি *Viet armis* পরাভূত হইত তাহা হইলে সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া, শত্রুহস্তে, লুণ্ঠন বাজেয়াপ্তি প্রভৃতি অত্যাচারে নিপীড়িত হইত সন্দেহ নাই। প্রবাদ এই যে, মুসলমান-বিজয়কালে সেকেন্দ্রিয়ায় কম করিয়া প্রায় ৪০০০ হামাম বা সাধারণ স্নানাগার ছিল। বলা বাহুল্য, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উহা অতিশয়োক্তি বলিয়াই মনে করেন। এই ৪০০০ হামামের চুল্লি জ্বালাইয়া জল গরম করিবার জন্তই নাকি কুতবখানার যত্ন সঞ্চিত পুস্তকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল। গ্রন্থগুলি যে আরব দেশে নীত হইয়া রক্ষণকার্যের জন্ত, ইক্ষনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের “ভারতবর্ষে” বর্ণিত এই প্রবাদটি লেন-পুলের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। পূর্বোক্ত ঘটনাদির উল্লেখ কোনও প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক ঐতিহাসিক থুৎ-ধর্ম্মাবলম্বী জন্ অফ্ নিকিউ (John of Nikiu) বা মুসলমান লেখক ইব্ন আব্দেল হাকাম (Ibn-Abd-el-Hakam) বা তাবারী (Tabari) কেহই ঘূণাক্ষরে এ সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করেন নাই। জন্ অফ্ নিকিউ প্রজাদিগের রক্ষণ ভরণ সম্বন্ধে যত্নবান সেনাপতি আমরের শাসন-প্রণালী যে রূপ প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত এ প্রকার প্রবাদের কোন মতেই সামঞ্জস্য হয় না, সুতরাং মুসলমান জেতুগণের প্রতি আরোপিত এ অপবাদটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে কোনও সংশয় নাই। লেন-পুলের মতে পারস্য জয়কালে আরবগণ কর্তৃক অগ্নি-উপাসকদিগের পুস্তকাঙ্গি বিনাশের কাহিনীই এই জনপ্রবাদের মূলে অবস্থিত। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে, এই তথ্য-কথিত ঐতিহাসিক ঘটনার ৬০০ বৎসর পরে—খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আব্দেল লতিফ (Abd-el-Latif) এবং আবুল ফারাগ (Abu-l-Farag) নামক দুইজন মুসলমান গ্রন্থকার এই গ্রন্থাগার-বিনাশ বৃত্তান্ত প্রথমে জনসমাজে প্রচার করেন, সুতরাং কেবল মধ্যযুগের খৃষ্টান লেখক ও আধুনিক মিসরী-গণকে ইহার জন্ত দোষী সাব্যস্ত করিলে প্রকৃত ব্যাপারের ষথায়থ বর্ণনা হইবে বঞ্চিত মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে উদ্বণ্ডপুর বিহারে সঞ্চিত পুস্তকগুলি ধ্বংস হওয়ার কথা মনে

পড়িতেছে। তিব্বতীয় ইতিবৃত্তকার লামা তারানাথ মুসলমান আততায়িগণ কর্তৃক উদগুপুর ও বিক্রমশিলা বিহারদ্বয়ের বিনাশ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন * কিন্তু তাহা মগধবিজয়ের প্রায় পঞ্চশত বর্ষ পরে। পুস্তক ধানির রচনা-কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলিয়াই অনুমিত, সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে সুদীর্ঘকাল ব্যবধান হেতু ফারাগ ও আদেল লতিকের ইতিহাস রচনায় যেরূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছিল তারানাথের পক্ষে সেরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া যে একবারেই অসম্ভব, এ কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তারানাথের গ্রন্থ যত্নপূর্বক অনুশীলন ফলে উহা, এক্ষণে, সত্য ঘটনা ও অলীক কাহিনীর বিচিত্র সমাবেশ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। আধুনিক মতানুসারে গ্রন্থখানি আর কেবল অবিমিশ্র ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদের সংকলন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নহে। তারানাথ কর্তৃক কয়েকটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ-নিহিত পালরাজগণের কল্পিত বংশাবলী প্রভৃতি— তাঁহার মারাত্মক ভ্রমসমূহের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে + বৌদ্ধ “লামা” নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় Odium Theologicum এড়াইয়া যে কেবল প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে অবহিত ছিলেন, এ কথাও সকল ক্ষেত্রে বলা যায় না—তাই শুধু তারানাথের উপর নির্ভর করিতে হইলে উদগুপুর সজ্জারামস্থিত পুস্তকাদি বিনাশের কথা হয়তো সহজেই আধুনিক ইতিহাসে পরিত্যক্ত হইত কিন্তু সত্যসন্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস-সিরাজ তবকত্‌ নাসিরী গ্রন্থে নিতান্ত অকপট ভাবেই লিখিয়াছেন যে গিরিশীর্ষস্থিত উদগুপুর অধিকৃত হইলে “সেখানে বহুসংখ্যক পুস্তকাদি পাওয়া যায়। মুসলমানগণ—পুস্তকগুলি কি কি বিষয়ে লিখিত তাহা জানিবার জন্য কয়েকজন ‘হিন্দুকে † ডাকিয়া পাঠান কিন্তু ‘হিন্দু’গণ তখন কেহই জীবিত ছিল না। পরে জানিতে পারা যায় যে, সঁহর ও দুর্গ সমস্তই একটি বিস্তৃত শিক্ষাগার (কলেজ)। দেশীয় ভাষায় ইহাকে ‘বিহার’ বলে। ‡ পূর্বোক্ত বৃত্তান্তটিতে মুসলমানেরা যে পুস্তকগুলি

* (Vide Indian Antiquary Vol. IV. pp. 366-367 and R. D. Banerjee's Banglar Itihash Vol. I. p. 322)

+ (Vide Mr. S. Kumar in J. A. S. B. 1916 pp. 23-25)

† তবকত্‌ নাসিরীতে মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধগণ ভ্রমক্রমে হিন্দু বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

‡ (Vide Raverty quoted by R. D. Banerjee in his Vol. I. p. 321)

ধ্বংস করিয়াছিলেন, এ কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত নাই। বিহারবাসীগণ যত্নমুখে পতিত হইলে মুসলমান সৈনিকেরা অনাবশ্যক বোধে গ্রহসমূহ নষ্ট না করিলেও অন্ততঃ রক্ষক অভাবে—অঘোর কলে সেগুলি যে অল্প দিনেই ধ্বংস-মুখে পতিত হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় কষ্টকল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এক্ষেত্রে Error of Omission বা Error of Commission ভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আক্রমণকারিগণের প্রতি কি পরিমাণে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বিদ্বৎমণ্ডলী বিচার করিবেন।

প্রত্যখ্যান ।

[শ্রীমনিলাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল।]

(১)

গভীর নিশীথ। সুংসারের অধিকাংশ জীবজন্তুই ঘুমে অচেতন। বাঙ্গালার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে একজন মুসলমান অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি-সেবার জন্ত বিখ্যাত। মধ্য রাত্রে গৃহদ্বারে অতিথি দণ্ডায়মান শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া অতিথিকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাকে পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া ক্লাস্তিবিনোদনার্থ বিশ্রাম করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, ব্রাহ্মণ তাঁহার পাকের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যথাসময়ে অতিথির আহার শেষ হইয়া গেলে, ব্রাহ্মণ স্বহস্তে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ধোত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অতিথি বাধা দিয়া বলিলেন,—“মহাশয়, আমি মুসলমান, আমার উচ্ছিষ্ট আপনি স্পর্শ করবেন না।” ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—“আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে যে অতিথি, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, নারায়ণ স্বরূপ। আপনি অতিথি, নারায়ণ !”

আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া অতিথি বিদায়গ্রহণ করিতে উত্তত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণের অতিথিসংকারে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যাইবার সময় তাঁহার হাত হইতে একটি আংটি খুলিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন,—“ব্রাহ্মণ্য এই আংটিটি তুমি রাখ; কখনওকোন বিপদে পড়লে, দিল্লীতে গিয়ে এটি দেখালেই সবাই আমাকে চিনিবে দেবে।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“জা, অতিথিসেবার পুরস্কার স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতে নাই। আংটি আপনি ফেরত নিন, আমি

ইহা নিষ্ঠে পারলাম না।” অতিথি বলিলেন,—“না, ইহা তোমার অতিথি-সেবার পুরস্কার নহে। আমার আতিথ্যগ্রহণের স্মৃতিস্বরূপ এটি তোমার কাছে রাখ।” ব্রাহ্মণ এ প্রস্তাবে আর অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। অতিথি গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, আংটির উপর অবোধ্য ভাষার ছুঁটার কথা কি লেখা রহিয়াছে। তিনি সেটি ষড় করিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিলেন।

* * * * *

কথিত আছে, বাঙ্গালা প্রদেশ জয় করিবার পর সম্রাট আকবর শাহ প্রজাগণের অবস্থা সম্যক অবগত হইবার জন্ত বাগদাদের খালিফ হাক্কণ-অল-রসিদের স্থায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রে গ্রামের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকার গুণের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া কোতূহল চরিতার্থ করিবার জন্তই তাঁহার কুটীর-দ্বারে অতিথির বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(২)

ছু'এক বৎসর পরে ভাগ্যবিপর্যয়ে ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িল। ক্রমে দুইবেলা অন্ন জুটাও ভার হইয়া উঠিল। একদিন ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“দেখ, একটা কাজ করলে হয় না। আর কতদিন এমন করে উপবাস ধাবে! সেই মুসলমান-অতিথির সন্ধান একবার গেলে হয় না। তিনি ত বলে গেছেন, দিল্লীতে গিয়ে কাউকে সে আংটিটা দেখালেই তাঁ'র পরিচয় পাবে। তিনি এ বিপদে আমাদের একটা কিছু উপায় করে দিতে পারবেন বোধ হয়।”

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ যুক্তি মন্দ নহে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে কতি কি। পেটরা হইতে আংটিটি বাহির করিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে গিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিতেই একজন সম্রাস্ত মুসলমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ইনি সম্রাটের দরবারের একজন প্রধান ওমরাহ। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আংটি দেখাইতেই তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন,—একি, এ যে সম্রাটের নামাঙ্কিত তাঁহার খাস আংটি! ব্রাহ্মণ, এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?” সম্রাটের নাম শুনিয়াই ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া উঠিলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—“দেখ বাবা, এক মুসলমান অতিথি আমার বাড়ীতে এ আংটিটি আমাকে উপহার দেন, বলেছিলেন বিপদে

পড়লে দিল্লীতে এসে কা'কেও দেখালেই তাঁ'র পরিচয় পাব। সম্রাটের নামাঙ্কিত কি না, তা ত আমি বলতে পারি না !”

ওমরাহ প্রথম মনে মনে ভাবিলেন হয়ত এ আংটি ব্রাহ্মণ চুরি করিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণ যাহা বলিল, তাহা সত্য হইতেও পারে, আকবরের লীলা বুঝা ভার ! তিনি তখন প্রকাশে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—“আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল, আমি তাঁ'কে দেখিয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া এক মসজিদের সম্মুখে গিয়া অপেক্ষা করিতে ধরিলেন। সে দিন শুক্রবার, সম্রাট মসজিদের ভিতর নেমাজ পড়িতেছিলেন। ওমরাহ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। সম্রাট নেমাজ পড়ছেন ; মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেই তাঁ'কে আংটি দেখিও।”

ব্রাহ্মণ মসজিদের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ভিতরে সম্রাটকে নেমাজ পড়িতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সে রাত্রের অতিথি বলিয়া ব্রাহ্মণ চিনিতে পারিলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু পরে সম্রাট নেমাজপড়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া সম্রাট হাসিমুখে সাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন,—“দয়া করে যখন এসেছেন, চলুন, আজ আপনাকে আমার বাড়ী অতিথি হ'তে হবে। পরে আপনার কথা সব শুনবো।”

ব্রাহ্মণ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—“না, আপনার বাড়ী আর যাব না। আপনার কাছে আর আমার কোন দরকার নাই। আমি এসেছিলাম বটে, আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করবার জন্ত, কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আমার দূর হয়েছে। আপনি যখন নেমাজ পড়ছিলেন, আপনি ত তদগতচিত্তে ভগবানকে ডাকেন নাই ! আপনি কেবল তাঁহাকে বলছিলেন,—‘আমার মেয়ের বড় অসুখ করেছে, তাঁ'কে ভাল করে দাও, আমাকে ধন দাও, যশস্বী কর।’ তা দিল্লীসম্রাট হয়ে আপনার যখন এত জুতাব, তখন আমার অভাব আপনি দূর করবেন কি করে ? কিছু মনে করবেন না। আমি চললাম।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আকবর শাহ নির্বাক হইয়া একদৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “কি অদ্ভুত শক্তি ! ব্রাহ্মণ বা বলেন, তা'ত সবই সত্য ! আমি ত যথার্থই আমার মেয়ের অসুখের কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু ত ডাকি নাই !”

প্রতিবাদ ।*

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'অর্চনা'র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার বি. এ মহাশয়ের "সাহিত্য প্রসঙ্গে"র উত্তর না দিলে পাঠকগণ হস্ত মনে করিবেন সুধীর বাবুর কথার উপর আর কথা চলে না। তাই যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

লেখক মহাশয় যেমন সাহিত্য-প্রসঙ্গের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন "কি যে এক ছঃসময় পড়িয়াছে, সাধারণতঃ নিরপেক্ষ ভাবে কেহ, আলোচ্য গ্রন্থের দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধুতার খাতিরই দেখিতেছি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা শাসিত করে ইত্যাদি," আমিও তেমনই "সমালোচনার বিড়ম্বনা"র লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিহর শাহী মহাশয়ের কথায় বলিয়া লই "আজকাল বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করা এক মহা বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া দিলেই গ্রন্থকারগণ (বা তাঁহাদের নিয়োজিত লেখকগণ) ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমালোচকের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন।"

লেখক মহাশয় অন্ততঃ লিখিয়াছেন "সমালোচক এই গ্রন্থের গুণ দেখিতে পান নাই। শুধু তাহাই নহে; প্রকৃত দোষও তিনি দেখাইতে পারেন নাই। জোর করিয়া দোষ দেখাইতে গিয়া নিজেই কতকগুলি ভুলের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাহারই আমরা পরিচয় দিতেছি।" কিন্তু ছঃখের বিষয় সমস্ত লেখাটি পড়িয়া কোথাও সে পরিচয় পাইলাম না।

প্রথমতঃ "শ্রামারুপার গড়"এর কথাই ধরা যাউক। শ্রামারুপার গড় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ও ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল। শ্রামারুপাদেবী এখন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বরাকরের নিকটস্থ কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে "কল্যাণেশ্বরী" নামে পরিচিত। "কাঁতনে ডাঁড়া"ও অজয়ের দক্ষিণ তীরে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। 'বীরভূম বিবরণে'র লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকের কোথাও লেখেন নি যে, এ স্থান তিনটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। এমন কি ইছাই ঘোষের দেউলকে "বীরভূমের একটি দর্শনীয় সামগ্রী" বলা হইয়াছে। এ গুলিতে

* 'মানসী ও মর্দবাণী'র সমালোচক 'ব্রজরাজ' মহাশয় এই প্রতিবাদটি পাঠাইয়াছেন। অসুয়া তাঁহার প্রতিবাদটির প্রকৃৎ সুধীরবাবুকে দিয়া তাঁহার বক্তব্যটুকুও মতসহ প্রকাশিত করিলাম।—অর্চনা-সম্পাদক।

কি লেখকের কোশল প্রকাশ পায় না? লেখক বলিয়াছেন “কেন্দুবিশ্বের কথা উঠিলেই লাউসেন তলাওর কথা আসিয়া পড়ে। শামারুপার গড় মনে পড়িয়া যায়।” আমি ইহাতেই লিখিয়াছিলাম “মনে ত অনেক কথাই উঠে, তাই বলিয়া কি অবাস্তুর কথা বলিতে হইবে?” সুধীরবাবু ইহাতে মহা খাপ্পা হইয়াছেন। বীরভূমের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বর্ধমান জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলা ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কিয়দংশ দৃষ্টিপথে পতিত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে এই তিন জেলার ইতিহাসও মনে পড়িয়া যায়। সুতরাং এই তিন জেলার বিবরণও অবাস্তুর নহে। লাউসেন অজয়ের উত্তর তীরে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া চলে। কিন্তু যে শামারুপার গড় বর্ধমান জেলায় অবস্থিত তাহার ছবি দেওয়া চলে না।

সুধীরবাবু বোধ হয় ছবিগুলির জন্মবিবরণ অবগত নহেন। আমি নিজে সেই বিবরণ লিখিতেছি। তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন কেন্দুবিশ্বের কথায় সাধারণতঃ অন্নদেবের কথা মনে পড়িলেও ‘বীরভূম বিবরণে’র লেখকের মনে কেন শামারুপার গড়ের কথা উঠিয়াছিল আর কেনই বা বর্ধমান জেলার শামারুপার গড়ের ছবি বীরভূম বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩২১ সালের পূজার অবকাশে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক শ্রীসিন্ধেশ্বর সিংহ শামারুপার গড়ের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বাহির হন। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সহকারী সভাপতি ও বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি (অর্থাৎ বরের মাসিকনের পিসী), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শামারুপার গড়ের ছবি তুলিবার জন্ত ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া বীরভূমে অনুসন্ধান কার্য শেষ করিয়া সিন্ধেশ্বর বাবুর সহিত মিলিত হইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। ‘বীরভূম বিবরণে’র লেখক মহাশয় রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির সহকারী সভাপতির সঙ্গে পূর্ব হইতেই ছিলেন সুতরাং তিনিও শামারুপার গড় দর্শনকালে সঙ্গী হইলেন। মূল্য দিলে শামারুপার গড়ের ছবিগুলি রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সম্পত্তি হইবে এইরূপই কথা ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির আঁতুড়ে মৃত্যু হইলে ছবিগুলি বে-ওয়ারিশ হইয়া পড়ে। তখন কাজেই সহকারী সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছিতে কেন্দুবিশ্বের কথায় মহারাজ কুমারের শামারুপার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাই বর্ধমান সম্মিলনে পঠিত ৩৯ পৃষ্ঠার “শামারুপার গড়” প্রবন্ধ, বীরভূম বিবরণে ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়া “কেন্দুবিশ্বকাহিনী”র অন্তর্গত হইয়াছে।

ভদ্রপুর পূর্বে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ছিল অর্থাৎ যখন নন্দকুমার জীবিত ছিলেন তখন এবং তাহার বহুদিন পর পর্য্যন্ত বীরভূমের সহিত ভদ্রপুরের সম্বন্ধ ছিল না। এখন ভদ্রপুর বীরভূমের স্বকীয় সম্পত্তি হইয়াছে একথা আমি স্বীকার করিয়াছি; কোন আপত্তি করি নাই। তবে বীরভূম বিবরণের লেখক মহাশয়ের ইহা উল্লেখ করা উচিত ছিল। দৌহিত্রের বংশকে সাধারণতঃ কেহ বংশধর বলে না, অন্ততঃ হিন্দু বলেন না; সেইজন্য দৌহিত্র থাকিতেও অনেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া বংশ অব্যাহত রাখেন, “কুঞ্জঘাটার রাজবংশ নন্দকুমারের দৌহিত্র বংশের পোষ্যপুত্রের বংশ” এই কথা লিখিবার সময় আমি “দৌহিত্র” কথাটার জোর দিয়াছি; সুধীরবাবু দৌহিত্র কথাটা বাদ দিয়া “পোষ্যপুত্র” কথাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কোন রাজ বা রাজ্যের উত্তরাধিকারীক সময়ে সময়ে বংশধর বলা যায়, কারণ সেই উত্তরাধিকারী প্রকৃত বংশের না হইলেও রাজ্যের নামেই পরিচিত হইয়া থাকেন। কলিকাতার “শীল” বংশের উত্তরাধিকারী “লাহা” হইলে, শীলবংশ নাম থাকিবে না, লাহাবংশই হইবে। কিন্তু কাশিমবাজার রাজ্যের উত্তরাধিকারী কাশিমবাজার রাজবংশ বলিয়াই পরিচিত হইবে। কুঞ্জঘাটার রাজবংশ মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর ত নহেন, ঠিক উত্তরাধিকারীও নহেন, কারণ মহারাজের যে জামাতা জগচ্চন্দ্র তাহার জীবদশায় শত্রুতা-সাধন করিয়াছিলেন, সেই জামাতার পুত্র মহানন্দ রাণী জগদম্বার সমস্ত সম্পত্তি বল-পূর্ব্বক হস্তগত করেন, এ কথা ‘বীরভূম বিবরণ’ পাঠেই অবগত হওয়া যায়। আর এই সম্পত্তিও সমস্তই অস্থাবর। কুমার দুর্গানাথ পোষ্যপুত্র না হইয়া ঔরসজাত পুত্র হইলেও বৃষ্ণিতাম যে তাঁহাতে মহারাজ নন্দকুমারের শোণিতের অংশ আছে। দৌহিত্রের বংশ হইতে মহারাজ নন্দকুমারের জলপিণ্ডের আশাও ছিল না। সুতরাং কুঞ্জঘাটার রাজবংশকে মহারাজ নন্দকুমারের উত্তরাধিকারী স্বীকার করিলেও বংশধর বলা চলে না। মহারাজ নন্দকুমারের কনিষ্ঠ কন্যার বংশের দৌহিত্র বংশে বরঞ্চ মহারাজ নন্দকুমারের শোণিত-সম্পর্ক আছে। সে বংশের কেবল নাম মাত্র দেওয়া হইয়াছে, অথচ কুমার দুর্গানাথের বংশের খুঁটিনাটি করিয়া বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কুমার দুর্গানাথ হেতমপুর রাজবংশের সহিত দুইটি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

হেতমপুর কাহিনী-প্রণেতা কিশোরীলাল সরকার বলিয়াছেন, “মুরলীধর অতি দরিদ্র ছিলেন এবং রাধানাথ হীনাবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করেন।” বীরভূম বিবরণের লেখক মহাশয় ৩৮ পৃঃ পাদটীকায় এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

“কিন্তু অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা সরকার মহাশয়ের কথিত বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। যথাস্থানে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।” কিন্তু যথাস্থানে দেখিতেছি “চৈতন্যপত্নী (রাধানাথের জননী) দারিদ্র্যের পেষণে দারুণ দুর্দশায় পতিত হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে অতিকষ্টে কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন।” ইহাই কি বিপরীত বিবরণ? সুধীরবাবু রাধানাথের হীনাবস্থা সম্বন্ধে নীরব কেন? এখানে আমার ভুল, না বীরভূম বিবরণের সম্পাদক বা প্রকাশকের ভুল? মুরলীধর যে দরিদ্র ছিলেন এ কথা গ্রন্থকার ও প্রতিবাদকারী উভয়েই স্বীকার করেন। তবে গ্রন্থকার বলেন, “মুরলীধর তঙ্করের উপদ্রবে সর্বস্বান্ত হইয়া জীবিকা অন্বেষণে আসেন”, আর সুধীরবাবু মাত্রা চড়াইয়া লিখিয়াছেন “মুরলীধর বর্গির হাঙ্গামে ও তঙ্করের উপদ্রবে সর্বস্বান্ত হইয়া”। সুধীরবাবু “বর্গির হাঙ্গামে” কথাটা কোথায় পাইলেন? তিনি প্রতিবাদের আক্রোশে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ১০৫৭ সালের পূর্বে বর্গির হাঙ্গামা ছিল না। মুরলীধর রাজপুত্র হইলে তঙ্করের উপদ্রবে সর্বস্বান্ত হইতেন না, অনুসন্ধান ফলের এই দুর্বল যুক্তিকে সবল করিবার জন্যই কি তিনি “বর্গির হাঙ্গামে” কথাটা জুড়িয়া দিয়াছেন?

বাকুড়া জেলায় অনুসন্ধানের ফলে কোন্ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পুস্তকে প্রকাশ নাই, সুধীরবাবুও তাহা প্রকাশ করেন নাই। সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থ কুলপঞ্জিকা নহে। কোন কুলপঞ্জিকার নামও পুস্তকে নাই। আমি যে সম্বন্ধ-নির্ণয় বইখানি দেখিয়াছিলাম, তাহা সম্ভবতঃ ১ম সংস্করণের এবং তাহা আমার নিকটে এখন নাই। ঐতিহাসিক পুস্তকে প্রমাণপতিত দিবার সময়ে সকলেই পত্রাক দিয়া থাকেন, পুস্তক কোন্ সংস্করণের তাহারও উল্লেখ থাকে। এ সকলের অভাবে আমি যদি শ্লোকটা না পাইয়া থাকি, তজ্জন্ম কি কেবল আমারই দোষ? আর শ্লোকটিতেই বা কি প্রমাণ হয়? শ্লোকটিকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমি শব্দকল্পদ্রমে “রুদ্র” শব্দের অর্থ খুঁজিতে গিয়াছিলাম। “রুদ্রাই” রুদ্র শব্দের অপভ্রংশ, প্রথমে এ কথা মানিতে হইবে। তৎপরে শব্দকল্পদ্রমে রুদ্র শব্দের রাজা অর্থ না পাওয়া গেলেও তাহা সম্বন্ধ নির্ণয়-যুত শ্লোকের প্রমাণ-বলে স্বীকার করিতে হইবে। অবশেষে মানিতে হইবে, কাহারও নামের অর্থ যদি রাজা হয় তবে সে রাজাই ছিল। “এই রাজবংশ অতি প্রাচীন” এই বীমাংসা উপরের তিনটি স্বীকার্যের উপর নির্ভর করে। সুধীরবাবু যখন “বহুতার খাতিরে” সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন, তখন তিনি এই

স্বীকার্যগুলি সহজেই মনিয়া লুইবেন, কারণ পুস্তকের অনেক অতিরিক্ত প্রমাণ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা—“মল্লভূমাধিপতির নিকটে মুরলীধরের পিতৃ-পিতামহের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল,” “মুরলীধর বর্গীর হাজামে...সর্বস্বাস্ত হইয়া” ইত্যাদি। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা একথা মানিবে না।

রাধানাথ ঋণ করিয়া জমিদারী ক্রয় করিয়া কোন কৃতিত্ব দেখান নাই—আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য। যে লোক জমিদারী চালান ব্যাপার ভাল বুঝেন, ঘরে টাকা থাকিলে তিনি নগদ টাকা বাহির করিয়া জমিদারী কেনেন, নতুবা ধার করিয়া কার্যসাধন করেন, ইহার জ্ঞান পূর্ব পুরুষের গৌরব-কাহিনীর প্রয়োজন হয় না। দিল্লীর বাদশাহের কোন বংশধরকেও অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বাবুর্চিগিরি করিতে হইতেছে। তাঁহার পূর্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী কোন কাজেই লাগিতেছে না। আবার যে “পান বেচে খায় কৃষ্ণপাস্তী” তিনিও জমিদারী করিয়াছিলেন। সুতরাং ঋণদাতৃগণের নাম ও ঋণের পরিমাণ খুবই লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু সেগুলির সহিত আমার বক্তব্যের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

‘বীরভূম বিবরণে’ অনেক মারাত্মক ত্রুটি আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র আমি “অসাবধানতা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য রাখিলেই এ গুলি থাকিত না। প্রশংসা যে না করিয়াছি এমন নহে। আমি সমালোচনার একস্থানে লিখিয়াছি “এই সবল সত্যানুসন্ধিৎসা আজকাল নবীন ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিরল।” ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আমি আর জানি না। ভাবিয়াছিলাম আর কোন ত্রুটির উল্লেখ করিব না, কিন্তু হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা লইয়া একটা ত্রুটি ভাল করিয়া দেখাইতে হইল। রেনেল সাহেবের ম্যাপ ১৭৬৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অনুমান করেন “১৭২৬।২৪ খৃঃ হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ‘রেনেল সাহেব তাহার বহু পরে (১৭৬৯ খৃঃ) এ প্রদেশ জরিপ করিলেও তাঁহার মানচিত্রে হেতমপুরের নাম নাই।” “প্রতিষ্ঠিত হয়” ইহার পাদটীকায় আছে, “তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য”। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে হেতমপুর প্রতিষ্ঠার বৎসর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। বর্গীর হাজামে ৪৪ বৎসরের মধ্যে একখানি গ্রাম ত্রীভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ৪৪ বৎসর পরে—বহুকাল পরে কেমন করিয়া হয়? হেতমপুর ত্রীভ্রষ্ট হইয়া একটা নগণ্য পল্লী হইল আর অদূরস্থিত কৃষ্ণনগর গণনীয় পল্লী বলিয়া রেনেলের ম্যাপে স্থান পাইল কেন? লেখক যেমন বলিয়াছেন “তৎপূর্বে সে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না, এমন কথা প্রমাণ হয় না,” আমিও তেমনিই বলিব “তৎপূর্বে সে

গ্রামের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথাও প্রমাণ হয় না।” মোট কথা, হেতমপুর গ্রাম যে ১৭২৩-২৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা অনুমানমাত্র। আর এই অনুমানের মূল এই যে, হাতেম খাঁ হইতে হেতমপুর নামের উৎপত্তি। আর সেই হাতেম খাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল গ্রন্থকার বলিয়াছেন ১৭২৮ হইতে ১৭৩০ হাতেমখাঁর জন্ম, মৃত্যু ও বীরভূমে আগমনের কাল সমস্তই গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অনুমানকে প্রামাণ্য করিয়া লইয়া যে অনুমান করা হয়, সে অনুমানের মূল্য কি ?

আপন জন্মভূমি সম্বন্ধে লেখায় দোষ নাই, কিন্তু জন্মভূমির দোহাই দিয়া যদি আপনার বংশ, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকেই বড় করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে তাহা পারিবারিক বিবরণে স্থান পাইবার যোগ্য হয়, কিন্তু কোন অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন অংশের চিত্রগুলিও সেই কারণে এ গ্রন্থমধ্যে দেওয়া অগ্রাণ হইয়াছে। গৌরাঙ্গ মন্দিরের “অভ্রভেদী” চূড়া বলিয়া গৌরব করাও উচিত হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থকারের অহমিকা প্রকাশ পায়। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের স্বীয় চিত্র প্রদান করাও অগ্রাণ হইয়াছে। যদি তিনি সাহিত্যজগতে বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় পাঠক তাঁহার চিত্র দোঁখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। তখন প্রকাশকগণ (যেমন কবীন্দ্র রবীন্দ্র সম্বন্ধে ঘটিয়াছে) গ্রন্থকারের চিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিলে সুশোভন হইত। অন্ত্যান্ত মহারাজকুমার ও কুমারগণের চিত্রও কোন অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থমধ্যে দেওয়া ঠিক হয় নাই (বিশেষতঃ যখন হেতমপুর রাজবংশে জন্ম ও গ্রন্থকারের সহিত সম্বন্ধ থাকে। ভিন্ন অন্য কোন কৃতিত্ব তাঁহাদের নাই)। হেতমপুর-রাজের ঐশ্বর্যের চিত্র দেখাইতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন, “কোথাও কেবাটি, কোথাও টমটম জুড়ি, বাইসিকল ও মটর গাড়ী ছুটিতেছে, রাত্ৰিকালে কোথাও ইলেক্ট্রিক লাইট ও কোথাও গ্যাস লাইটের অত্যাঙ্গুল আলোকে যেন রাত্ৰিকে দিন করিয়াছে, পূজা ও পর্ব উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ, খেমটানাচ, বায়স্কোপ, মার্কাস” ইত্যাদি। এ সকল কথা যেভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে আত্মসন্তোষিতা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সকলই অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থের মারাত্মক ত্রুটি। সমালোচনা দীর্ঘ হইবে বলিয়া এ সকল কথাই উল্লেখ করি নাই।

লক্ষ্মীর বরপুত্র বেদিন প্রথমে বাগ্‌দেবীর পাঠতলে সমাগত হইয়াছিলেন,

সেদিন খুব বাহালা পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন যদি লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ধন্যবাদ চাহেন, তবে তাঁহাদিগকেও সাহিত্যিক কৃতিত্বলাভ করিতে হইবে। ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা যে, লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের তোষামোদকারীর অভাব হয় না, তাঁহারা শষ্ট কথা কখনও শুনিতে পান না। মহারাজকুমার বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন শুনিলেই করতালিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যেদিন এই সমিতি কিয়ৎ পরিমাণেও বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সমকক্ষতা লাভ করিবে, সেইদিন তিনি বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণের সমাদরলাভ করিবেন, কিন্তু তৎপূর্বে অকালে প্রশংসা করিয়া মহারাজকুমারের মাথা বিগুড়াইলে তাঁহার শত্রুতাসাধন করা হইবে।

ব্রজরাজ ।

উত্তর

শ্রীমুখীচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।

• উপরিলিখিত প্রতিবাদের উত্তরে আমি সংক্ষেপে ছ' একটি কথা বলিতে চাই :—

প্রথমতঃ “শ্রামারূপার গড়ে”র কথা। ‘কেন্দুবিষ কাহিনী’র শেষভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—‘কেন্দুবিষের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শেষ চিহ্ন আজিও অস্তহিত হয় নাই। পশ্চিমে ‘বিষমঙ্গলের টিপি’, পূর্বে ‘লাউসেন তলাও’, দক্ষিণে অজয়ের অপর তীরে ‘শ্রামারূপার গড়’ তাহার মহিমাম্বিত শ্রীকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়াছে। কেন্দুবিষের কথা উঠিলেই ‘লাউসেন তলাও’এর কথা আসিয়া পড়ে। শ্রামারূপার গড় মনে পড়িয়া যায়। ইছাইএর উচ্চ দেউল নয়নপথে প্রতিবিম্বিত হয়। ‘মুগুণ্ডলিকে ছাড়িয়া দিলে কেন্দুবিষ-কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।’ সেইজন্য শ্রামারূপার গড়ের বিবরণ কেন্দুবিষ-কাহিনীর পরিশিষ্টরূপে আলোচ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ইহা বর্ধমানের অন্তর্গত হইলেও ইছাই ঘোষের অভিযান সূত্রে কেন্দুবিষের অনতিদূরবর্তী ‘লাউসেন তলাও’র ইতিহাসের সহিত তাহার ইতিহাস অনেক জড়িত। কেন্দুবিষের সেবাইতগণই বহুদিন হইতে শ্রামারূপার পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং কেন্দুবিষের বর্তমান রাধাবিনোদ বিগ্রহ শ্রামারূপার গড় হইতে আনীত, সুতরাং কেন্দুবিষ প্রসঙ্গে শ্রামারূপার গড়ের কাহিনী একেবারে অবাস্তব নহে, এবং তাহার একটা সার্থকতাও আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমালোচক মহাশয় যদি

সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান, মুরশিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণা জেলার বিস্তৃত বিঘরণ দেওয়া হয় নাই কেন বলিয়া আক্ষেপ করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ নাচার। 'শ্যামারূপার গড়' যে সেন পাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত, গ্রন্থকার তাহা স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। ইছাই ঘোষের দেউলকে 'বীরভূমের একটি দর্শনীর সামগ্রী' বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক সত্য না হইলেও উপরি উদ্ধৃত বক্তব্য বোধ হয় তাহার কৈফিয়ৎ।

সমালোচক মহাশয় এ পুস্তকে শ্যামারূপার গড়ের কাহিনী-নিবেশের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা আমি অবগত নহি, সুতরাং সে বিষয়ে আমি কোন উত্তর দিতে অক্ষম, তবে আমার মনে হয়, ইতিহাসের দিক হইতে এ কাহিনী অবাস্তব নহে।

রুদ্র বা রুদাই সম্বন্ধে লালমোহন বিজ্ঞানিধি সংকলিত 'সম্বন্ধ-নির্ঘণ' (ছান্দত বংশ) হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। এই রাজবংশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বাঁকুড়া জেলার অনুসন্ধানের ফলে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা 'বীরভূম-বিবরণে'র দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত হইবে।

'রাধানাথের জমিদারী ক্রয়' সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন—'আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে এই ধার করিয়া জমিদারী খরিদ কার্য অতি কঠিন।' ইহাতে যে সন্দেহ পরিস্ফুট হইয়াছিল আমি তাহারই প্রতিবাদে পুস্তকে নিবিষ্ট ঋণদাতৃগণের নাম ও ঋণের তালিকার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সমালোচক মহাশয় এখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়াছেন। পূর্বপুরুষের গৌরব-কাহিনীর স্মৃতির যে কোন মূল্য নাই, হিন্দু সমালোচক মহাশয়ের কাছে আচ্ছ এই নূতন তথ্য গুণিলাম।

হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠার সময় লইয়া সমালোচক মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে 'হেতমপুর কাহিনী'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 'হেতমপুরে'র নামকরণ, বীরভূম-রাজ বাদিউজ্জমানের সেনাপতি হাতেম খাঁর নামানুসারে হয়। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ও এ কথা বলেন। এই বাদিউজ্জমান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন, তার পর ১৭৪৫ খৃঃ এই হেতমপুর দুর্গে এবং তরিকটবর্তী স্থানে রঘুজী ভোঁসলার সহিত তৎকালীন দুর্গাধিপতি হাফেজ খাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়—এক এই সময়েরই উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা হেতমপুর

গড় সুরক্ষিত হয় । এই প্রাচীর ও পরিখার চিত্র এখনও বর্তমান আছে । আসদজ্জমানের পর হইতেই হেতমপুর ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া নগণ্য পল্লীরূপে পরিণত হয় এবং সেই জন্ত রেণেলের (১৭৬৯ খৃঃ) মানচিত্রে তাহার উল্লেখ না থাকাকিছু বিচিত্র নহে ।

হেতমপুর রাজবংশের বিস্তারিত পরিচয় আমরা গ্রন্থকারের নিকট অবশ্যই প্রত্যাশা করি, তবে রাজেশ্বরের পরিচায়ক যে সমস্ত কথা তিনি বলিয়াছেন— তাহা কতকাংশে সঙ্গত নহে বলিয়া আমিও মনে করি, তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত অহমিকা-প্রকাশ বলিয়া আমার মনে হয় নাই ।

পরিশেষে সমালোচক মহাশয়কে আমি একটি কথা বলিতে চাই । আমি বীরভূমকাসী নহি । গ্রন্থকার বা তাঁহার স্বসম্পর্কীয় কাহারও সহিত আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষে কখনও পরিচিত বা ঋণী নহি এবং তাঁহাদের সহিত আমার উমেদারীর বা অনুগ্রহ-নিগ্রহের কোন সম্বন্ধ নাই, ও থাকিবার সম্ভাবনাও নাই ; সুতরাং আমার যাহা বক্তব্য, আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই বলিয়াছি । স্বার্থসিদ্ধির তোষামোদ বা প্রত্যাখ্যাতের নিফল আক্রোশ তাহাতে নাই । তাঁহার সমালোচনা একদেশদর্শী এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ-ভাব-দৃষ্ট ছিল বলিয়াই, আমি তাহার দু' একটি ক্রটি দেখাইয়াছিলাম ।

পাপের অধিকার ।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে ।]

শুভ মোর চঞ্চল অধীর

নাহি মানে বিবেকের বাণী,
অনুতাপে নিয়ন্ত অস্থির
বক্ষভরে রচে আত্মগানি ।

মন মোর অন্ধ মোহে ভরা

অবিরত সন্দেহ দোলায়,
ভাল বোধে তবু মন্দ করা—
রীতি তার ;—দুর্নীতি বিলায় ।

এ জীবন সত্য নথর

তবু তার এত আফালন,
অহঙ্কারে পূর্ণ এ অন্তর
বুড়ি শুধু পাপে নিমগন ।

সুখ চায় মোহাঙ্ক বাসনা

সুখ শুধু ভোগের বিলাস,
বিবেকের নাহি শোনে মানা
অধমের আত্ম অবিবাস ।

তুষাি যাচে বিষতিন্ত রস

—পর্যায়মুখ আপাত মধুর,
দুঃখশোকে কণিক অবশ
পুনরায় মত্ত ভরপুর ।

পাপ করে পুণ্যের বিচার

শ্রেষ্ঠ সে যে বুঝি অতুলন,
ধরমের আছে অধিকার
বুঝি সেটা মলীক ধপক ।

আদর্শ কোথায় ?

[শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম.এ।]

আদর্শ হইয়া সে দেশে এখনও মারা মারি চলিতেছে। তাহার আদর্শ হারাইয়া তাহার কুহকে কেবলি ছায়ার অশুসন্ধানে দিশেহারা হইয়া বেড়াইতেছে। আদর্শ না পাওয়াটা নৈরাশ্রেরই কথা। সেই না পাওয়াটাই তাই, সে দেশে আদর্শের পূর্ণলক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Ideal পাওয়া যায় না, তাহা যেন একটা মায়ী ! সে দেশের প্রকৃতিতে Commercialism বা দেনা পাওনার মধ্যে উঁচু দিকে তাকাইবা মাত্র ঝাপসা দেখানো কোন বিচিত্র কথা নয়। তাই Idealএর মহামায়ার সে দেশের ভাবুকগণ নানাভাবে ঘুরপাক খাইয়াছেন। ইহার অবশ্য প্রমাণের পরিমাণ নাই। অতএব কোটেসমের কণ্টকরচনা করিবার প্রয়াস অনাবশ্যক। কবিদের অবলম্বনে টেনিসনও “The Voyage” নামক কবিতায় এই ভাবেরই আভাস দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একমাত্র বক্তব্য যে, কবিদিগের দৃষ্টি যে সকল সময়ে দিব্য (Intuitive) হয় না, ইহাই কেবল একটা উত্তর হইয়া আছে।

আমাদের দেশে আদর্শকে কি ভাবে দেখা হইয়াছিল, “আদর্শ” শব্দটাই মনে হয় তাহার সঙ্কেত বহন করিতেছে। আদর্শ অর্থ দর্পণ। দর্পণে স্বরূপদর্শন হয়, দেহকে দেহরূপে দেখা যায়। দেহকে দেখিবার পক্ষে দর্পণের ত্রায় আদর্শের জ্ঞান অত্র পদার্থ নাই। আমার শরীরের, আমার রূপের উন্নতি-অবনতির মাপকাটা কেবল দর্পণ। ব্যায়াম করিয়া পেশীগুলি আদর্শে বা দর্পণে দেখিবার প্রথা আছে। আমার যেটুকু অবস্থা, তাহাই দর্পণে ধরা পড়ে। আদর্শে নিজের কথাই পাওয়া যায়। পেশীর অথবা সৌন্দর্যের সাধুনা করিয়া যেটুকু বৃদ্ধি হইল, সেই টুকুই আদর্শে দেখিব, কল্পনার মূর্তিখানি ক্ষটিকের আদর্শে উঠিবে না। নিজে বাড়িলে দর্পণ বাড়িবে না। আদর্শে স্বরূপদর্শনই হইবে; অপরূপ, উপরূপ, বা নীরূপ দর্শন ঘটবে না। আদর্শে নিজের আদর্শই উঠিবে। বর্ধনটা ক্রিয়ামাত্র, ক্রিয়ার কি ফোটো উঠে? স্বচ্ছ নয়নযুগল এক একখানি দর্পণ। নয়নের আদর্শে বা মাপকাটাতে সকল জিনিষ দেখা যায়। কিন্তু নয়ন নয়নকেই দেখিতে চায়। সে উপনিষদের অক্ষিপুরুষকেই দেখিতে চায়। “তুমি আছ নয়নে নয়নে”—এই হইল আদর্শ লাভ !

“অথ আধ্যাত্মিকম্।” এইবার দেহাতিরিক্ত বিষয়টির কথা ভাবা যাউক। সেটা যাই হউক, মনই হউক বা আত্মাই হউক (কোন কোন পূজাপাদ নৈরায়িক প্রমাণ করিয়াছেন—আত্মা ও মন এক), অথবা মনঃ আত্মার উপাধিযুক্ত ছাঁয়াই হউক, তাহা লইয়া ঝগড়া করিবার প্রয়োজন নাই। সেটা যে একখানি দর্পণের স্থায় পদার্থ তাহাই বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়। মনেতেও বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমার মনেতে অস্ত্রের মনের ফোটোগ্রাফ উঠে, অবশ্য মনটা মালিন্তশূন্য হইলে। তাহাই যদি হয়, তবে মনটা মাজাঘসা হইলে, তাহাতে আরাধ্য বস্তুর স্বরূপদর্শন ঘটবেই ঘটবে। ক্ষুদ্র, ভাবেও স্বরূপ হইতেই আদর্শ সৃষ্টি সম্ভবে। নিজের বা জাতির প্রকৃতি যেভাবে গঠিত হইয়াছে, প্রকৃত আদর্শ সেইরূপই হইবে। বণিকের আদর্শ বণিকের মতই হইবে। “আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তোমায় রচনা”, তাহাই ত স্বাভাবিক ও ভক্তজনের কথা। রামপ্রসাদ বিশ্বশক্তিকে নিজের মা রূপে দেখিয়া নিজে আত্মর্ষে ছেলে সাজিয়াছিলেন। কাস্ত ভাব ও স্ব-ভাব। রুদ্ধভাবে মন রুদ্ধচণ্ডীই চাহিবে, বৈষ্ণবচিত্ত বিষ্ণুই চাহিবে। এই আদর্শের বা স্বাধিকারের গোলমালে সাধনার ও সিদ্ধির গোলমাল হওয়াও বিচিত্র নহে।

আবার আদর্শ নিত্য। আদর্শ কি পাওয়া যায় না? ভারতীয় ধারণায় ত ইহার নিরন্তর আসে না। চিত্ত যদি আদর্শ বা দর্পণ হয়, চিত্তে যদি অহরহঃ অস্ত্রের স্বরূপ দর্শন হয়, তবে আমার চিত্তে আমার স্বরূপ দর্শন হইবে না কেন? আমার চিত্তে আমার চিত্তই দেখিব। ছুই সাম্না সাম্নি দর্পণের প্রতিবিম্ব অনন্ত Ad infinitum, বস্তুতঃ নিজের নিকট নিজের প্রতিবিম্বের সামর্থ্যই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় আদর্শও নাই, চিত্তও নাই, এক হইয়া গিয়াছে; আদর্শ ভাঙ্গিয়া লীন হইয়া গিয়াছে। তখন চিত্ত নাই, দর্শন নাই, কোন দর্শন নাই, সব গিয়াছে—শুধু এক অদ্বিতীয় মহাজ্ঞান আছে, তাহারও সমস্ত বন্ধনের উপাধির ঝঞ্জাটটা চুকিয়া গিয়াছে। দর্শনগুলি এই পরম দর্শনের অন্তই রচিত হইয়াছে, শুধু খণ্ডজ্ঞানের একীকরণই ইহাদের সঙ্গ। ভারতের যুগযুগান্তরের সাধনা, সাহিত্য ও কর্ম—এই মহা আদর্শে আত্মনিবেদন করিয়াছিল। এই উৎসর্গই একটা বিরাট যজ্ঞ। আর যজ্ঞের রূপে বিষ্ণুই সর্বত্র নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

এই-সমালোচনা

চিন্তা লক্ষ্যী—ঐনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম-এ, বি-এল, অগীত। "অর্চনা" "ভারত-

বিজ্ঞান" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত একাদশটি সন্দর্ভ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লেখকগণের সম্মান বিশেষ এই যে, তাহারা অথবা কোটেসান-সিকিত নহে। অবশ্য পরলোক, "বিজ্ঞান" প্রভৃতি প্রবন্ধে কোনও লেখক নূতন তথ্য লিখিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন ঋষিদের বক্তব্যসমূহ সৌন্দর্য্যিক নিয়ম করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু প্রাচীন তথ্যগুলি ঠিক পরিপাক করিয়া নিজের প্রতিভায় বহুবাটুকুকে সরস করিয়া বলিতে পারিয়া কৃতিত্ব আছে। ঐযুক্ত নিবারণ বাবু তাহাই করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধ "পরলোকে"—লেখক কেবল ভারতবর্ষের সম্মতন মত প্রকটিত করিয়া দাঁড় হন নাই, তিনি পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকদের দার্শনিক মত লেখেন করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের ভিতর ভাব ও ভাবার অসি-বুদ্ধি নাই। বেশ সহজ সরল ভাষায় তিনি আপনার বক্তব্য বলিয়াছেন। "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" এবং "সৌন্দর্য্য ও তাহার অভিব্যক্তি" প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন— "আনন্দরূপং" বলিয়া বাহাকে বুঝিয়া কল্প হইয়াছে, তিনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাহাকে ছাড়া কোব সৌন্দর্য্যই নাই। বাহা কিছু শোভা ও সৌন্দর্য্যশালী সকলই তাহার অনন্তরূপের সামান্য অভিব্যক্তি।" সকলে লেখকের এ কথায় বিশ্বাস করিবেন কি? "আনন্দরূপং"কে কেহ দেখে নাই—বিনি দেখেন তাহার আর কোনও ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং আনন্দরূপের আদর্শ লইয়া পার্থিব পদার্থের সৌন্দর্য্য নির্ণয় করিতে বাস্তব, যৌড়ার ডিমের সহিত মিলাইয়া পার্থিব পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিবার বিধির অনুরূপ। তাহার পর বিশ্বই তাহার রূপ। কিন্তু স্বরূপ সকলই তাহার বিশাল দেহের অন্তর্গত, সুতরাং এ বিশ্বাস লইয়া সৌন্দর্য্য বিচার করিলে বিরাটপূর্ণবহুর দেহের তারুতম্য করিতে হয়। এ যুক্তি ন্যায়াসমোদিত নহে। বরং ক্রমটা লেখক বেদিক হইতে বলিয়াছেন তাহার উল্টা। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থকে আমরা স্বরূপ বলি—সেই সকলের রূপ একত্র করিয়া সাধারণ লোক ভগবানের রূপের ধারণা করে। Anthropomorphic God এর ধারণার দুলে এই বিশ্বাস। "স্বপ্ন" প্রবন্ধে লেখক "ভূমি-সহায়ক" অনুবর্তী হইতে বলিয়াছেন। তাহা হইলেই—আনন্দখন সেই পরম পদার্থ লাভ হইবে।" আমরা বলি না। অদৃষ্টবায় ও প্রকৃষ্ণকারে অনেক পাশ্চাত্য মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। "যুক্তি" প্রবন্ধে হিন্দু-মনোবিজ্ঞান খুব সহজ ভাষায় বুঝান হইয়াছে। লেখকের এইটুকু বিশেষত্ব। অপর প্রবন্ধগুলিও দার্শনিক, অথচ কঠোর নয়—সুসংগত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে "হার্ভার্ট পেন্সানের তিরোভাব" নামক বক-রূপ প্রবন্ধটি বেশ সন্নিবেশিত হইল, সে কথার উত্তর লেখক দিতে পারেন, কিন্তু তাহার উত্তর যুক্তিযুক্ত হইবে কিনা তাহা জানা নাই। এই বক্তব্যসমূহ পুঙ্খ-সংগতরূপে জান ও সন্দর্ভ লিখন-

লেখকগণের সম্মান বিশেষ এই যে, তাহারা অথবা কোটেসান-সিকিত নহে। অবশ্য পরলোক, "বিজ্ঞান" প্রভৃতি প্রবন্ধে কোনও লেখক নূতন তথ্য লিখিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন ঋষিদের বক্তব্যসমূহ সৌন্দর্য্যিক নিয়ম করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু প্রাচীন তথ্যগুলি ঠিক পরিপাক করিয়া নিজের প্রতিভায় বহুবাটুকুকে সরস করিয়া বলিতে পারিয়া কৃতিত্ব আছে। ঐযুক্ত নিবারণ বাবু তাহাই করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধ "পরলোকে"—লেখক কেবল ভারতবর্ষের সম্মতন মত প্রকটিত করিয়া দাঁড় হন নাই, তিনি পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকদের দার্শনিক মত লেখেন করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের ভিতর ভাব ও ভাবার অসি-বুদ্ধি নাই। বেশ সহজ সরল ভাষায় তিনি আপনার বক্তব্য বলিয়াছেন। "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" এবং "সৌন্দর্য্য ও তাহার অভিব্যক্তি" প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন— "আনন্দরূপং" বলিয়া বাহাকে বুঝিয়া কল্প হইয়াছে, তিনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাহাকে ছাড়া কোব সৌন্দর্য্যই নাই। বাহা কিছু শোভা ও সৌন্দর্য্যশালী সকলই তাহার অনন্তরূপের সামান্য অভিব্যক্তি।" সকলে লেখকের এ কথায় বিশ্বাস করিবেন কি? "আনন্দরূপং"কে কেহ দেখে নাই—বিনি দেখেন তাহার আর কোনও ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং আনন্দরূপের আদর্শ লইয়া পার্থিব পদার্থের সৌন্দর্য্য নির্ণয় করিতে বাস্তব, যৌড়ার ডিমের সহিত মিলাইয়া পার্থিব পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিবার বিধির অনুরূপ। তাহার পর বিশ্বই তাহার রূপ। কিন্তু স্বরূপ সকলই তাহার বিশাল দেহের অন্তর্গত, সুতরাং এ বিশ্বাস লইয়া সৌন্দর্য্য বিচার করিলে বিরাটপূর্ণবহুর দেহের তারুতম্য করিতে হয়। এ যুক্তি ন্যায়াসমোদিত নহে। বরং ক্রমটা লেখক বেদিক হইতে বলিয়াছেন তাহার উল্টা। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থকে আমরা স্বরূপ বলি—সেই সকলের রূপ একত্র করিয়া সাধারণ লোক ভগবানের রূপের ধারণা করে। Anthropomorphic God এর ধারণার দুলে এই বিশ্বাস। "স্বপ্ন" প্রবন্ধে লেখক "ভূমি-সহায়ক" অনুবর্তী হইতে বলিয়াছেন। তাহা হইলেই—আনন্দখন সেই পরম পদার্থ লাভ হইবে।" আমরা বলি না। অদৃষ্টবায় ও প্রকৃষ্ণকারে অনেক পাশ্চাত্য মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। "যুক্তি" প্রবন্ধে হিন্দু-মনোবিজ্ঞান খুব সহজ ভাষায় বুঝান হইয়াছে। লেখকের এইটুকু বিশেষত্ব। অপর প্রবন্ধগুলিও দার্শনিক, অথচ কঠোর নয়—সুসংগত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে "হার্ভার্ট পেন্সানের তিরোভাব" নামক বক-রূপ প্রবন্ধটি বেশ সন্নিবেশিত হইল, সে কথার উত্তর লেখক দিতে পারেন, কিন্তু তাহার উত্তর যুক্তিযুক্ত হইবে কিনা তাহা জানা নাই। এই বক্তব্যসমূহ পুঙ্খ-সংগতরূপে জান ও সন্দর্ভ লিখন-

